বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

মুহম্মদ আবদুল হাই

সৈয়দ আলী আহসান

বাংলা
সাহিত্যের
ইতিবৃত্ত

www.icsbook.info

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

(আধুনিক যুগ)

মুহম্মদ আবদুল হাই
সৈয়দ আলী আহসান

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.icsbook.info

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এপিএইচ প্রথম সংস্করণ | এপ্রিল ১৯৭৯
চৈত্র ১৩৯৫

একাদশ মুদ্রণ | জুলাই ২০১০
আষাঢ় ১৪১৭

প্রচ্ছদ | কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পিউটার কম্পোজ | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | তিনশত টাকা মাত্র

BANGLA SAHITYER ITIBRITTO [ADHUNIK JUG]— *History of Bengali Literature (Modern Period) by Professor Muhammad Abdul Hai and Professor Syed Ali Ahsan. Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : April 1979 & 11th Print : July 2010*

Price : Tk. 300.00 Only.

ISBN 984 11 0434 X

www.icsbook.info

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে অনেক দিন হল। অষ্টম সংস্করণের জন্য এতদিন আমি গ্রন্থটি পুনর্লিখন, সংযোজন এবং সম্প্রসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমূল পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সংস্করণটি প্রায় একটি নতুন গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় পুনর্লিখিত হয়েছে এবং অনেকগুলি অধ্যায়ে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কয়েকজন কবিওয়ালার পরিচিতি সংযোজিত হয়েছে এবং পাঁচালী, কালী-বন্দনা এবং যাত্রা বিষয়ক নতুন তথ্যাদি সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাজা রামমোহন রায় সংক্রান্ত বিষয়টি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অংশটি সম্পূর্ণ নতুন করে লিখিত হয়েছে। এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন সংযোজন এবং প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক পরিচ্ছেদটি বর্তমান সংস্করণে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ একেবারে নতুন করে লেখা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিচ্ছেদে অনেক নতুন তথ্য এসেছে বিভাগোত্তর কথা সাহিত্য, বিশেষ করে ছোটগল্প অংশটি সম্পূর্ণভাবে নতুন সংযোজন। এ সংযোজনটি লিখেছেন ডঃ সরদার আবদুস সাত্তার। প্রবন্ধ সাহিত্য অধ্যায় বা অংশটি পুনর্লিখিত হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়টির নাম বাংলাদেশ অধ্যায়। এটি আমি নতুন করে লিখেছি এবং যতদূর সম্ভব বর্তমানে হাই লিখিত অংশগুলো এখন আর আগের মত নেই। ষষ্ঠ সংস্করণে সংযোজিত অংশগুলা উর্ধ্ব কমার বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়েছিল যাতে পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন কোনটি মরহুম হাই সাহেবের এবং কোনটি নয়। বর্তমান সংস্করণে যেহেতু একটি আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাই উর্ধ্ব কমা পরিহার করা হয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনরত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। নতুন তথ্যাদি গ্রহণ করতে হয় এবং পুরাতন তথ্যের সংশোধনও করতে হয়। একারণে পাঠকদের জন্য সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বশেষ সংস্করণটিই গ্রহণযোগ্য।

বর্তমান সংস্করণের পর ভবিষ্যতে আর কোন সংস্করণ আমি করে যেতে পারব কি না জানিনা। তবে গ্রন্থটি যাতে সব সময় আধুনিক এবং সচল থাকে সেজন্য একটি ব্যবস্থা রাখা হবে।

পঞ্চম সংস্করণ থেকে এ গ্রন্থটি আহমদ পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করে আসছে। সেজন্য আমি আহমদ পাবলিশিং হাউসের বর্তমান মালিক কল্যাণীয় মেছবাহউদ্দীন আহমদের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার সর্বশেষ এবং সর্বসময়ের জন্য কৃতজ্ঞতা পাঠক সাধারণের নিকট। তাঁরা এ গ্রন্থটি জনপ্রিয় রেখেছেন এবং সচল রেখেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান

৬০/১ উত্তর ধানমন্ডি.
ঢাকা-১২০৫
টেলিফোন : ৯১১৬৬৮৯
ভাদ্র ১৯. ১৪০৩
সেপ্টেম্বর ৩. ১৯৯৬

www.icsbook.info

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণের পরিবর্তন ষষ্ঠ সংস্করণের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলা গদ্যের পরিণতি' অধ্যায়ে অনেক নতুন নাম সংযোজিত এবং আলোচিত হয়েছে, তেমনি পরিবর্তন এসেছে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি' অধ্যায়ে। প্রবন্ধ সাহিত্য' অংশেরও পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। চেষ্টা করা হয়েছে যাতে গ্রন্থটি সমসাময়িক সময়ের উপযোগি থাকে। নির্ঘন্ট প্রস্তুত করেছেন শ্রীবিশ্বজিৎ ঘোষ, তাঁকে ধন্যবাদ।

৬০/১ নর্থ ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৫
১লা পৌষ ১৩৯৫

সৈয়দ আলী আহসান

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি আদ্যন্ত সংশোধিত হয়েছে, অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে এবং অনেক পুরনো বিবেচনা বর্তমান সময়ের আলোকে নতুনভাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রধানত মরহুম আবদুল হাই সাহেবের অংশে অনেক পরিবর্তন আনতে হয়েছে এভাবে পরিবর্তিত অংশগুলো তৃতীয় বন্ধনী/ঊর্ধ্ব কমার মধ্যে রাখা হয়েছে যাতে পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন কোনটি মরহুম হাই সাহেবের, কোনটি নয়।

সাহিত্যের ইতিহাস অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিবেচিত হয়, তথ্যগত সংশোধনতো আছেই, সাহিত্য মূল্যায়নেরও একটি দিক আছে। আমি যতোটা সম্ভব বর্তমান গ্রন্থটিকে সর্বাংশে সুন্দর করবার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথম দিকে অনেক অংশ সংক্ষেপীকরণ করা হয়েছে যেমন মীর মোশাররফ হোসেন অধ্যায়টি। আবার কয়েকজন লেখক সম্পর্ক কিছু কিছু বিবেচনা পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ অধ্যায়ে সংস্কারটি আমুল। বাংলাদেশের কবিতা এবং প্রবন্ধ অংশ দুটোই নতুন করে লিখিত হয়েছে। এ সমস্ত সংশোধন এবং পরিমার্জনার ক্ষেত্রে ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম আমাক প্রভূত সাহায্য করেছেন। এই গ্রন্থে যুক্ত পি-এইচ.ডি. প্রাপ্ত গবেষকদের তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। নির্ঘন্ট প্রস্তুত করেছেন ভীষ্মদেব চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ ঘোষ। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
২৪.১২.৮২

সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়েছে। যেখানে যেখানে পরিমার্জনার অথবা সংযোজনার প্রয়োজন ছিলো সে-সব স্থানে যথাযথভাবে পরিমার্জনা এবং সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি জনপ্রিয়তার জন্য আমি পাঠক সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ভার আহমদ পাবলিশিং হাউসের মালিক জনাব মহিউদ্দীন আহমদ গ্রহণ করায় আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা
২৬.৩.৭৯

সৈয়দ আলী আহসান

চতুর্থ সংস্করণ : আমার কথা

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি সংশোধিত হয়েছে। অনেক অংশ পরিমার্জিত এবং কিছু অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। মরহুম আবদুল হাই-এর অংশগুলোরও প্রয়োজনীয় তথ্যগত সংশোধন করা হয়েছে।

ঢাকা
২৫-৬-৭৪

সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের প্রথম সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। বিলম্বে হলেও ঢাকার ষ্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশ সংস্থা এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছিল। প্রস্তুত সংস্করণেও পুরানো বিষয়বস্তুর বহু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে এবং কোনো কোনো গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে নতুন তথ্যও সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব ও সম্ভাবনার ইংগিত দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলাম। এ-সংস্করণে পাকিস্তানোত্তর যুগের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের প্রথম বারের জন্য বিভিন্ন শাখার আলোচনা সংবলিত একটি অধ্যায় যোগ করা হল। তাতে আশা করি পূর্ববর্তী সংস্করণ দু'টির তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, গবেষক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের নিকট পূর্বের সংস্করণ দু'টির তুলনায় বর্তমান সংস্করণের ব্যবহারযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বেশ কয়টি ইতিহাস লিখিত হওয়া সত্ত্বেও পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের গ্রন্থটি ছিল বহুলসমাদৃত ও নির্ভরযোগ্য। বহু তথ্য সংবলিত নতুন উপাদান সংযোজনের ফলে প্রস্তুত সংস্করণের চাহিদা ও মর্যাদা যে তাঁদের কাছে আরো বৃদ্ধি পাবে আশা করি আমাদের সে দাবী নিরর্থক নয়।

পাকিস্তানোত্তর যুগের অধ্যায়টি রচনার জন্য বিশেষভাবে কথা-সাহিত্য, নাটক ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন আমাদের প্রীতিভাজন ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিরুজ্জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনসুর মুসা, সৈয়দ আকরম হোসেন ও ফজলুল হক এবং নির্ঘন্টটি তৈরী করে দিয়েছেন সৈয়দ আকরম হোসেন। কাব্যাংশ রচনার কাজে বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

প্রস্তুত সংস্করণটি প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন চট্টগ্রামের বইঘর। তাঁদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — **মুহম্মদ আবদুল হাই**

বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় — **সৈয়দ আলী আহসান**

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

www.icsbook.info

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৫৬ সালের জুন মাসে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটিশ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ইতিবৃত্তই প্রধানতঃ আমরা এ গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম, এ গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের কিছুটা সুবিধা হবে। আমাদের সে আশা নিরর্থক হয়নি। কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এটি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের কাছে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এ বিষয়ের ওপরে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বই হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। গত চার বছর ধরে এ বই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ায় তাঁরা নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।

এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বহু পূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগত অসুবিধার ফলে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতামুক্ত করে বাহিরে প্রকাশের সাহায্য নেওয়ায় এ বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজ ত্বরান্বিত হতে পেরেছে। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশনালয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মাস তিনেকের মধ্যে এ বই প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বর্তমান সংস্করণে পূর্ব-সংস্করণের দোষত্রুটি অনেকটা সারিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে তথ্য সংযাজন করেছি তার ফলে তুলনামূলকভাবে বইটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তুত সংস্করণে ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইয়ের মানও উন্নত হয়েছ।

এ সংস্করণও যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হল, আমরা এমন দাবী করি না। আশা করছি, পরবর্তী সংস্করণটি আরা উন্নত হবে পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় এ গ্রন্থে নেই, কেবল উদ্ভব এবং সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে মাত্র সে সাহিত্যের বিচিত্র কথা নতুনভাবে পরবর্তী সংস্করণে বলবার ইচ্ছা রইলো।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এবং গবেষণায় যাঁরা আমাদের পূর্বসূরী এ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে আমরা তাঁদের সকলের কাছেই ঋণী।

আমাদের স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মী ডক্টর আনিসুজ্জামান এ সংস্করণের প্রুফ দেখায় সহায়তা করেছেন এবং আগের বারের মতো এবারেও নির্ঘন্ট তৈরী করে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে না।

মুহম্মদ আবদুল হাই
সৈয়দ আলী আহসান

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

www.icsbook.info

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার ভার পড়ে জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান এবং আমার ওপর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর শহীদুল্লাহ আর আধুনিক যুগের (মূলত বৃটিশ আমলের) ইতিহাস রচনা করি আমি ও সৈয়দ আলী আহসান। আলোচ্য গ্রন্থের রচনা শেষ হয় ১৯৫৪ সনের প্রথম দিকে।

এ ইতিহাসটির পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু ক'রে ছেপে বের করবার সময় পর্যন্ত এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার জনাব আকবর উদ্দীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি যেভাবে এ বইটি পেছে বের করতে সহায়তা করেছেন, সেজন্যে সবার আগে আমি তাঁকেই অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে মুসলিম লেখকদের নিয়ে আমাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে এ কাল পর্যন্ত যে সব মুসলিম লেখককে আমরা আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করেছি তাঁদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন আলোচনা তো দূরের কথা, ধারাবাহিকভাবে তাঁদের সমস্ত লেখাও আমরা পাইনি। এ কাজ হাতে নিয়ে পদে পদে আমরা উপাদানের অভাব বোধ করেছি। এ সম্পর্কে জনাব ডক্টর শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন এবং জনাব আকবর উদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সময়ে সময়ে আলোচনা করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি তাছাড়া ডক্টর শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন এবং অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কম উপকার করেননি। তাঁদেরকে এবং রাজশাহীর চাক্‌রাইল-রেজওয়ান লাইব্রেরী'র কর্মর্তাদেরকে এবং আরও যাঁরা আমাকে এ কাজে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে সব উপাদান আমরা পেয়েছি তাও সাধারণের দুষ্প্রাপ্য বলে ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ সম্পর্কে প্রস্তুত গ্রন্থের প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোচনা করেছি। আশা করি, তাতে ছাত্রদের উপকার হবে।

মুসলিম লেখকদের সম্পর্কে আমরা যে শেষ কথা বলতে পেরেছি তার দাবী আমরা করি না। ইতিহাস-পরাঙ্মুখ বাঙালি মুসলিম জাতির কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের সাহিত্যিক সাধনার ধারাবাহিকতার একটা মোটামুটি ছবি আমরা দাঁড় করিয়েছি মাত্র।

www.icsbook.info

এতে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের কিছুটা সুবিধা হবে, আমাদের এইটুকু ভরসা।

বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে বের করা গেল না। এর ত্রুটিবিচ্যুতি ভবিষ্যৎ সংস্করণে দূর করবার আশা পোষণ করা ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে বাংলা সাহিত্যের এ ইতিহাসটি গৃহীত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ১৯৫৬

মুহম্মদ আবদুল হাই

www.icsbook.info

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

৩-১৫

বৃটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৬-৪৮

দোভাষী পুঁথি, কবিগান, কয়েকজন কবিওয়ালা, পাঁচালি বাউল, কালীবন্দনা, যাত্রা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৪৯-৭৪

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ: রাজা রামমোহন রায়; তত্ত্ববোধিনী সভা; মদনমোহন তর্কালংকার; তত্ত্ববোধিনী যুগ: অক্ষয়কুমার দত্ত; তারাশঙ্কর তর্করত্ন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ; খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী : গোলাম হোসেন ও শেখ আজিমুদ্দীন ; মুন্সী নামদার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের পরিণতি

৭৫-৯৬

বঙ্কিমচন্দ্র; রমেশচন্দ্র দত্ত; দামোদর মুখোপাধ্যায়; তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়; সমসাময়িক অন্যান্য লেখক; মীর মোশাররফ হোসেন; শেখ আবদুল লতিফ; নওয়াব ফয়জুন্নেছা; আর্জমান্দ আলী চৌধুরী; মুন্সী গোলাম কীবরিয়া; মোজাম্মেল হক; মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ; পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্য

৯৭-১৩২

(ক) ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক রচনা; মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ; মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন; শেখ আবদুর রহিম; মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী; দীন

www.icsbook.info

মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায়; শেখ আবদুল জব্বার; মুন্সী আবদুল লতিফ; কাজী আকরাম হোসেন।

(খ) ইসলামের মর্মব্যাখ্যা, তাসাওফ, ইসলামী নীতি ও সমাজ জীবন সংক্রান্ত রচনা–গিরিশচন্দ্র সেন।

(গ) পবিত্র কোরআনের অনুবাদ ও মর্মবাণী সংকলন।

(ঘ) হযরত মোহাম্মদ (দঃ), সাহাবী এবং অন্যান্য পীর পয়গম্বরদের জীবনী ও বাণী; এয়াকুব আলী চৌধুরী।

(ঙ) কারবালা সংক্রান্ত সাহিত্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি (রবীন্দ্র-যুগ)

১৩৩–১৭৮

রবীন্দ্রনাথ; জগদীশচন্দ্র বসু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; প্রমথ চৌধুরী; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কালীপ্রসন্ন ঘোষ; বিবিধ প্রকৃতির গদ্য; নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী; বেগম রোকেয়া; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী; কাজী ইমদাদুল হক; লুৎফর রহমান; তরীকুল আলম; নূরন্নেসা; খায়রুন্নেছা খাতুন; মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা; এস, ওয়াজেদ আলী; শাহাদাৎ হোসেন; ইব্রাহিম খাঁ; আকবর উদ্দিন; শেখ ফজলুল করিম; কাজী আবদুল ওদুদ; আবদুল মনসুর আহমদ; কাজ দীন মোহাম্মদ; মাহবুব-উল-আলম; কাজী নজরুল ইসলাম; মোহাম্মদ নজিবর রহমান; মোহাম্মদ কোরবান আলী ও ইদরিস আলী; মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী; মমলকুল ফাতেমা খানম; মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠী; আকবর আলী; আবুল ফজল; হুমায়ুন কবির; মুহম্মদ এনামুল হক; একরামুদ্দীন; শেখ হাবিবুর রহমান; সৈয়দ আবুল হোসেন; হাম্মদ গোলাম হোসেন; মোতাহার হোসেন চৌধুরী; মুহম্মদ মনসুরুদ্দীন; নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান; আবদুল কাদির; শামসুর নাহার মাহমুদ উপসংহার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলকাতা-কেন্দ্রীক নতুন সাহিত্য-জীবন

১৭৯–১৯৮

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

www.icsbook.info

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঊনিশ শতকের মহাকাব্যের ধারা

১৯৯-২২২

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নবীনচন্দ্র সেন; আনন্দচন্দ্র মিত্র; কায়কোবাদ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী; হামিদ আলী; যোগীন্দ্রনাথ বসু।

নবম পরিচ্ছেদ

গীতিকাব্য

২২৩-২৫২

বিহারীলাল; দীনবন্ধু মিত্র; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; মীর মশাররফ হোসেন; দেবেন্দ্রনাথ সেন; অক্ষয়কুমার বড়াল; স্বর্ণকুমারী দেবী; গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী: কামিনী রায়; মানকুমারী বসু; মোজাম্মেল হক; প্রিয়ম্বদা দেবী; অতুলপ্রসাদ সেন; শেখ ফজলুল করিম; গোবিন্দচন্দ্র দাস; রজনীকান্ত সেন; কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার; অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী; নিত্যকৃষ্ণ বসু; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; মুহম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ; মুন্সী দাদ আলী; আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী; সৈয়দ এমদাদ আলী; রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন; মোহাম্মদ গোলাম হোসেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলা নাটক ঃ ক্রমবিকাশ ও উদ্ভব

২৫৩-২৭৮

বাংলা নাটক ; হরচন্দ্র ঘোষ; প্রথম বিয়োগান্ত নাটক; তারাচরণ সিকদারের ভদ্রার্জুন; কালীপ্রসন্ন সিংহ; রামনারায়ণ তর্করত্ন; মাইকেল মধুসূদন দত্ত; দীনবন্ধু মিত্র; মনোমোহন বসু; জ্যেতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রাজকৃষ্ণ রায়; জাতীয়তামূলক কয়েকটি নাটক; মুসলমান রচিত সামাজিক নক্সা; শিমুয়েল রিপবক্স; মীর মশাররফ হোসেন; মোহাম্মদ আবদুল করিম; কাদের আলী; অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন; গিরিশচন্দ্র ঘোষ; অমৃতলাল বসু; সেক্সপীয়রের অনুবাদ; অতুলকৃষ্ণ মিত্র; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ; শরৎচন্দ্রের নাটক; নজরুল ইসলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কাব্য

২৭৯-৩২৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতা; রবীন্দ্রনাথের নাটক; রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস; রবীন্দ্রনাথ-জীবনের ঘটনাপঞ্জী; রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কাব্য; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত; মোহিতলাল মজুমদার; কাজী নজরুল ইসলাম; সমসমায়িক অন্যান্য কবিগণ; শাহাদাৎ

www.icsbook.info

হোসেন; বেগম সুফিয়া কামাল; ফজলুর রহীম চৌধুরী; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; জীবনান্দ দাশ: বিষ্ণুদে; অমিয় চক্রবর্তী; বুদ্ধদেব বসু; জসীমউদ্‌দীন; অনুবাদ কবিতা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের সাহিত্য

কথা সাহিত্য; উপন্যাস ও ছোটগল্প

৩২৫-৩৭৬

উপন্যাস ; সত্যেনসেন; আবু জাফর শামসুদ্দীন; আশরাফউজ্জামান; শওকত ওসমান; আবু রুশদ; সামস; রাশীদ কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ; সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ; সরদার জয়েনউদ্দিন; শহীদুল্লাহ কায়সার; রশীদ করীম; আবু ইসহাক; শামসুদ্দীন আবুল কালাম; আলাউদ্দীন আল আজাদ; জহির রায়হান; আবুবকর সিদ্দিক আবদুল গাফফার চৌধুরী; সৈয়দ শামসুল হক; রাবেয়া খাতুন; শওকত আলী; রিজিয়া রহমান।

ছোট গল্প ; আহমদ ছফা; আখতারুজ্জামান ইলিয়াস; সেলিনা হোসেন; হুমায়ূন আহমদ; ইমদাদুল হক মিলন এবং অন্যান্য।

নাটক; স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলন।

বাংলাদেশের লোকনাট্য এবং জসীম উদ্‌দীন।

প্রবন্ধ সাহিত্য; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; মুহম্মদ আবদুল হাই; সৈয়দ আলী আহসান; মুনীর চৌধুরী; আহমদ শরীফ; আনিসুজ্জামান; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

ভ্রমণ কাহিনী; সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা; জীবনীগ্রন্থ; আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা; রম্য রচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। লোক সাহিত্যের গবেষণা ও সম্পাদনা বিবিধ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন।

বাংলাদেশের কবিতা

৩৭৭-৩৯৭

ফররুখ আহমদ; আহসান হাবীব; সিকান্‌দার আবু জাফর; আবুল হোসেন; সৈয়দ আলী আহসান; তালিম হোসেন; সানাউল হক; সৈয়দ আলী আশরাফ আবদুল গণি হাজারী; আশরাফ সিদ্দিকী; আবদুর রশীদ খান; আবদুস সাত্তার; শামসুর রাহমান হাসান হাফিজুর রহমান; জাহানারা আরজু; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ; সৈয়দ শামসুল হক; আলাউদ্দিন আল আজাদ; মোহাম্মদ মাফজুল্লাহ; ফজল শাহাবুদ্দীন; আল মাহমুদ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান; রফিক আজাদ; আবদুল মান্নান সৈয়দ; নির্মলেন্দু গুণ; আবুল হাসান; শহীদ কাদরী; আজিজুল হক; আবু বকর সিদ্দিক; ওমর আলী; ফরহাদ মাজহার; মুহম্মদ নূরুল হুদা; আবিদ আজাদ; খন্দকার আশরাফ হোসেন।

www.icsbook.info

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি

মুহম্মদ আবদুল হাই
পুনর্লিখন : সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গেলে তার ধারাক্রম অনুসরণ করা যেমন কর্তব্য তেমনি বিভিন্নকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাহিত্যের যুগবিভাগ গুলো প্রধানত ঐতিহাসিক যুগ বিভাগকে অনুসরণ করে। ঐতিহাসিক যুগবিভাগের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা থাকে, জীবন ব্যবস্থাপনার কথা থাকে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও থাকে। এ সমস্ত কিছুই সাহিত্যকে লালন করে এবং সাহিত্যের মৌল প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মূল বিভাজন করা হয়েছে তিনটি : প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের সূত্রপাত পাল রাজত্বের আরম্ভ থেকে এবং শেষ সেন রাজত্বের পতনকাল পর্যন্ত। এ সময় ছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। এ কালের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম। বৌদ্ধরা এদেশের মানুষ ছিলেন। তাদের ধর্মীয় চিন্তায় জাতিভেদ ছিল না। বৌদ্ধদের শাসন এদেশে ছিল চারশত বছরের কিছু বেশি। হিন্দু সেনরা ছিলেন বহিরাগত। তারা এসেছিলেন কর্ণাটক থেকে। তারা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তারা এদেশে প্রকটভাবে জাতিভেদ প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধ আমলে ভাষা ছিল পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ। অবশ্য কিছু বৌদ্ধ শাস্ত্র সংস্কৃতেও তখন লিখিত হয়েছিল। সেনদের সময়কার ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সেনরা যে সংস্কৃতির পোষকতা করতেন সে সংস্কৃতি ছিল রাজন্যবর্গের সংস্কৃতি, সাধারণ মানুষের নয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটামুটি ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। একালে প্রাচীনযুগের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে, ধর্মীয়বোধের পরিবর্তন ঘটেছে, শিল্প চিন্তা এবং সাহিত্য চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর আগমন কাল থেকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা আমরা ধরে নিয়ে থাকি। এভাবে বাংলা সাহিত্য ধারার পটভূমিতে প্রথমে আমরা বৌদ্ধ প্রবৃত্তিকে পেয়েছি, পরে এসেছে হিন্দু সংস্কার এবং অবশেষে এসেছে ইসলামের বিশ্বাস। মধ্যযুগের সাহিত্য অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত। এর গতিপ্রকৃতিও বিচিত্র ধরনের। এই বিরাট যুগের মধ্যে বহু বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস কাজ করেছে। ইসলাম তো ছিলই, হিন্দু ধর্মের মধ্যে শক্ত মতবাদ, বৈষ্ণব মতবাদ এগুলো গড়ে উঠে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিও নির্মিত হতে থাকে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা তুর্কীদের শাসন পাই, স্বাধীন নবাবী আমলের শাসন পাই এবং মোগলদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকেও দেখি।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকে এই অঞ্চলে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। মোগল আমলেই ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকরা আসতে আরম্ভ

www.icsbook.info

করে। সপ্তদশ শতকে প্রধানত ইউরোপের অনেক জাতি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আসতে থাকে। এভাবে পর্তুগীজরা এসেছে, ওলন্দাজরা এসেছিল, ইংরেজরা এসেছিল, দিনেমার ও জার্মানরাও এসেছে। আমাদের বাংলা ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় এসমস্ত জাতির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তখন দুর্বলতা ছিল। শাসন ব্যবস্থার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ইংরেজ এদেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলার পতন এদেশের ইতিহাসে দীর্ঘকালীন অতীত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতির একটি পরিবর্তন সূচনা করল। সিরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধে হারিয়ে ক্লাইভ মীর জাফরকে নামে মাত্র নবাব রেখে দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। তখন মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু মীর কাসিম শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে পেরে উঠেননি। মীর কাসিমের পতনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল এদেশকে শোষণ করা। এত বড় একটি ঐশ্বর্যশালী দেশ হাতে পেয়ে কোম্পানীর লোকেরা অসম্ভব অর্থলোলুপ হয়ে উঠে এবং তাদের শোষণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এই শোষণেরই ফল। "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এর কিছুটা আভাস দিয়েছেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরেই এ দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের দিকে মন দেয়। ১৭৮৮ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত রাজস্ব ব্যবস্থার যে সব সংস্কারের চেষ্টা হয় তার চরম পরিণতি দেখা যায় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এতেও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারকদের শান্তি হয়নি। বাংলাদেশের মোট জমির তুলনায় সে আমলে নিষ্কর জমির পরিমাণও কম ছিল না; তার আয়ের পরিমাণও ছিল মোটা।

১৭৯৭ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি ফরমান ঘোষণা করলেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য অথবা গোষ্ঠীর জন্য নিষ্কর কোন জমি থাকবে না। এই নিষ্কর জমিতে সরকারের স্বাভাবিক স্বত্ব রয়েছে। এই স্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর নিষ্কর জমিতেও করারোপিত হয়। অবশ্য অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসকরা এই কর আদায় করতে পারেননি। অবশেষে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে নানা ধরনের মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা সাজিয়ে শেষ পর্যন্ত নিষ্কর জমিতে করারোপ সম্ভবপর হয়। এভাবে মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কর বা লাখেরাজ জমি ইংরেজদের হাতে চলে যায় এবং এসব জমির কর মুসলমানরা দিতে বাধ্য হয়। একমাত্র মুসলমানরাই এদেশে নিষ্কর জমি ভোগ করত। তার ফলে ক্ষতি হয় মুসলমানদেরই। মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত জমির আয়ের সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ল।

এ যাবৎ এ দেশের রাজভাষা ছিল ফারসী। লর্ড বেন্টিংয়ের শাসনকালে লর্ড মেকলের সুপারিশক্রমে ফারসীর স্থানে রাজভাষা রূপে গৃহীত হলো ইংরেজী। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এর ফল হলো সুদূরপ্রসারী। ভাষা ও সাহিত্যের দিক

www.icsbook.info

থেকে এ যে কত বড়ো বৈপ্লবিক ঘটনা তা সাহিত্যের ইতিহাসের যথাযথ আলোচনার সাহায্যেই বোঝা যাবে।

ইংরেজরা মুসলমানের হাত থেকে এ দেশের রাজশক্তি ছিনিয়ে নেয়। সেজন্য শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ধরে মুসলমানেরা যেমন ইংরেজদের সুনজরে দেখতে পারেনি, ইংরেজরাও মুসলমানদের তেমনি দেখেছে সংশয় ও সন্দেহের চোখে। অথচ একথাও সত্য যে, কোন রাজশক্তি তা যত বড়ই হোক না কেন, শাসিত দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন ছাড়া দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজদের যখন দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সম্পর্ক বিরাজমান, তখন এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে হাত করার এবং তাদের চিত্ত জয় করার সাধনা চললো ইংরেজদের।

একে মুসলমানেরা হারালো রাজশক্তি, তদুপরি এ দেশের শাসন-ব্যবস্থা হাতে পাওয়ার পরপরই এদেশে নিজেদের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং হোমের (ইংলণ্ডের) আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা যে কয়টি বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করলো তার সব কয়টিই গেল মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন ও নিষ্কর জমির বাজেয়াপ্তির পর দেখা গেল জমির মালিক মুসলমানেরা হলো নিঃস্ব এবং প্রজা ও মুসলমান ভূম্যাধিকারীর মধ্যবর্তী তহশিলদার, নায়েব, মুহুরী ও গোমস্তা প্রমুখ হিন্দু কর্মচারী ইংরেজদের অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে ভূস্বামী হয়ে উঠলো। এর উপরে রাজভাষা ফারসী সরিয়ে তার স্থানে ইংরেজী গ্রহণ করায়, চাকরি-নির্ভর অগণিত মুসলমানদের জীবিকার পথ বন্ধ হলো। বাংলাদেশের আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি জমি ও আনুষঙ্গিক অবলম্বন চাকরি, পর পর এ দুটো থেকেই বঞ্চিত হয়ে মুসলমানদের আর্থিক দুর্গতির আর অবধি রইলো না।

মুসলমান আমলে বাংলাদেশের রাজভাষা ছিল ফার্সী। একই সঙ্গে এটা ছিল সাংস্কৃতিক ভাষা। কোর্টের কাজকর্ম, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সব কিছুই ফার্সীতে হতো। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই ফার্সীর মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অবশ্য টোল ছিল যেমন মুসলমানদের আরবী শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা ছিল। ফার্সী ধর্মীয় ভাষা হিসাবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তার ফলে পার্থিব জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ফার্সীর একটি ব্যাপক প্রসার ছিল। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার জন্য ফার্সীর প্রয়োজন ছিল। ইংরেজরা এটা বুঝতে পেরে ফার্সীকে পুরোপুরি এদেশ থেকে তুলে দেন এবং ইংরেজীকে রাজভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। যারা চাকরিনির্ভর ছিল এবং যারা ইংরেজী জানত না ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী রাজভাষা হিসাবে গৃহীত হওয়ায় তাদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হিন্দুরা নিজেদেরকে ইংরেজদের আনুকূল্যে নিয়ে আসে যে কাজটা মুসলমানরা কখনোই করতে পারেনি। ক্ষমতার অধিকার ইংরেজদের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান হিন্দুরা বুঝতে পারে যে এখন থেকে ইংরেজী ভাষাকে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা তাদের কর্তব্য। তারা তাই ইংরেজীকে গ্রহণ করে। রাজা রামমোহনের মতো প্রাজ্ঞ মনীষী হিন্দুদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে হিন্দুরা তার সাহায্যে বুঝতে পেরেছিল যে জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোন পথ তাদের অবলম্বন করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য রাজা রামমোহন

www.icsbook.info

রায় হিন্দুদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন, যথার্থভাবে বলতে গেলে সেসময় তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং উদার মননশীলতার এবং সংস্কার মুক্ততার যে পরিচয় রাজা রামমোহন রায় দিয়েছিলেন তার তুলনা হিন্দু সমাজে খুব বেশি নেই। এদেশে ইংরেজী ভাষা সহসা আসেনি। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশের রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এবং দেশীয় ভাষা বাংলা শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি প্রেসিডেন্সী কলেজ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করতে গিয়ে কিছু বাঙালী হিন্দু পণ্ডিত ইংরেজদের গভীর সংস্পর্শে আসেন। এরা বাংলা গদ্যের সূত্রপাত ঘটান। তারপর হিন্দু কলেজে বাঙালী হিন্দুরা পড়াশুনা করতে থাকেন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন। এভাবে দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় এগিয়ে আসেনি এবং তার ফলে জীবনযুদ্ধে পরাজিত এবং প্রতারিত হয়েছে। হিন্দুরা প্রথম থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইংরেজদের কাঁচামাল বিলেতে রপ্তানী করে ইংল্যাণ্ডের ডান্ডি, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি শহরগুলোর দ্রুত প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হতে থাকে। যেমন ইংরেজদের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে তেমনি হিন্দুদেরও হয়। নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী এদেশে সৃষ্টি হয় এবং অনেক হিন্দু গ্রাম ছেড়ে কলকাতা অভিমুখী হন।

মুসলমানদের দুর্দশার আরেকটি কারণ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিবর্তন। মুর্শিদাবাদ ছিল নবাবী আমলে বাংলাদেশের রাজধানী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র। কলকাতা যখন থেকে রাজধানী হলো তখন থেকে কলকাতাই নতুন সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো। কলকাতার নতুন সাংস্কৃতিক জীবনে মুসলমানরা স্থান করে নিতে পারল না। মুর্শিদাবাদে যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অধিকার ছিল পুরোপুরি, কলকাতায় সে অধিকার আর রইল না। কলকাতায় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অধিকার হলো শূন্য। নতুন রাজনৈতিক এবং আর্থিক ব্যবস্থায় ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করে হিন্দুরা যখন অগ্রসর হতে লাগল তখন মুসলমানগণ ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে পুরোপুরি পিছিয়ে রইল।

পলাশীর যুদ্ধের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ অসহযোগ বৃহত্তর বাংলার মীর কাসিমের এবং মহীশুরে হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের হাতে হিংস্র সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। স্বাধীনতাকামী টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর বাংলা তথা এ উপমহাদেশের মুসলমানেরা কিছুদিনের জন্য হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ মানসিকতা থেকেই ধর্মের আকর্ষণ তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। ধর্মকে যথাযথভাবে আঁকড়ে না ধরা এবং ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্যেই ভারতে তাদের এ দুর্গতি-এ ধারণা তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানের মনে দানা বাঁধতে থাকে।

ভারতের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় আর্য বিজয়ের কাল থেকে শক্ হুন ও গ্রীক প্রভৃতি যে সব জাতি ভারতবর্ষে এসেছে, নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে ভারতবর্ষ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। ভারতের ইতিহাসে বহিরাগত ইসলামই এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে চিহ্নিত হয়ে রইলো, কিছুটা মিশ্রণ ঘটলেও পুরোপুরি হিন্দু ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে তারা হারিয়ে গেল না। ইসলাম এ দেশের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে নতুন স্বভাব এবং তাৎপর্য আনলো।

www.icsbook.info

তবে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুসলমানের উপর প্রভাবও বিস্তার করেছিল। বাংলা তথা ভারতীয় ইসলামে মধ্যযুগ থেকে হিন্দু প্রভাব কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার কিছু নমুনা দেখা যাবে উপমহাদেশে যেভাবে মুহর্‌রম অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে। মুসলমানদের সামাজিক পর্বগুলোর মধ্যে ইসলাম ধর্মের মতোই সংযম ও শালীনতার একটা দৃঢ় বাঁধন রয়েছে, অথচ মুহর্‌রমের জাঁকজমকজাত যে উল্লাস তা হিন্দু পূজাপার্বণগুলোর অনুকরণ। তা ছাড়া এর তাজিয়া নির্মাণ এবং দশম দিবসে মঞ্জিল মাটি তাও দুর্গা পূজার প্রতিমা গঠন ও দশমীর দিনে বিসর্জনের মতো। হিন্দুদের গুরুপূজা ও মুসলমানদের পীর পূজা, পীরের দরগায় উর্‌স এবং ওলী-আল্লাদের মাজারে অতিরিক্ত জিয়ারত উপলক্ষে শেষ পর্যন্ত সেগুলো হিন্দুদের তীর্থস্থানের মতো করে তোলা, বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মুসলমান সমাজে হিন্দুদের পৌরাণিক সমুদ্র দেবতার মতো খোয়াজ খিজিরকে মেনে চলা, তাঁকে লক্ষ্য করে ফাতেহা পড়ে হিন্দুদের পূর্বপুরুষদের নামে স্মৃতি-তর্পণের মতো নদীতে পয়সা ও মিষ্টান্ন তর্পণ করা, হিংস্র বন্য পশুদের উপরেও পীরের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বীকার করে পীরের সাহায্যে হিংস্র পশুদের শান্ত রাখা এবং তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি রীতি-নীতি ভারতীয় ইসলামে তথা বাঙালী মুসলিম সমাজ-জীবনে হিন্দু প্রভাবজাত। বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানদের এ রকম পীর ছিল জিন্দাহ্ গাজী বা কালু গাজী। নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের কালু গাজী বাঘের দেবতা কালু রায় নামে পরিচিত ছিল। কলেরা ও বসন্তের কুগ্রহ শান্তির জন্যে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ওলা ও শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তাদের কুগ্রহ ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য এ সব হিন্দুকে দেখা যেত গ্রামপ্রান্তের ও গ্রামের সামনের বড়ো অশ্বত্থগাছে ডাবের পানি, লাউ এবং এ ধরনের নাড়ী শান্তিকর খাবার দিয়ে আসতে। তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্যে বড়ো রকমের একটা উঁচু বাঁশে ছাগলের চামড়ার মধ্যে ধানের খড় পুরে একটা ছাগলই পুঁতে রাখার ভান করা হতো। মুসলমানেরাও এ সব বিশ্বাস করতো এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণে বিপদের দিনে এ সব কুসংস্কার মেনে চলতো। অসুখ-বিসুখে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে সাদকা দিত। গৃহপালিত পশু হারিয়ে গেলে সেগুলো পাওয়ার জন্যে মানত করতো। নদীতে নৌকা যাত্রার সময় দরীয়ার পাঁচ পীর ও পীর বদরের নাম করতো। বাংলার কর্তাভজা ও আউল-বাউল প্রভৃতি অসংখ্য দলও মধ্যযুগ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। মধ্যযুগের বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের বহু রচনায় এসবের সমর্থন পাওয়া যায়।

কর্তাভজা ও বাউল সম্প্রদায়ের নামের মধ্যে এ মানসিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট। তাছাড়া সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশে' ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রমুখ হিন্দু দেবতা ও উপদেবতাদের নবী বলে স্বীকৃতি দান এবং বাংলার 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' অনুসরণে 'নবীবংশ' রচনা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু প্রভাবের ফল। মুসলমানদের বিবাহে পণপ্রথা প্রবর্তন এবং টাকা-পয়সা আদান-প্রদান হিন্দু সমাজের অনুকরণ।

বাংলা তথা ভারতীয় ইসলামে ও মুসলিম সমাজে এ ধরনের হিন্দু প্রভাব মুসলিম আমল থেকেই অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। মুসলমানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা খসে গেলে শিক্ষা ও তবলিগের অব্যবস্থার ফলে তাদের মধ্যে এ অন্ধ মানসিকতা ও কুসংস্কার দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ কুসংস্কারপ্রীতি যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল স্যার মুহম্মদ ইকবালের এ উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে:

www.icsbook.info

Surely we have out-Hindued the Hindu himself: we are suffering from a double caste system, sectarianism and the social caste system which we have either learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which the conquered nations revenge themselves of their conquerors. (Quoted from the Hindustan Review in census of India report, 1911, XIV, Punjab, pt. I.p. 165).

সমাজ ও জাতীয় জীবনে এ হেন 'অ-ইসলাম' বা হিন্দু প্রভাব প্রশ্রয় পাওয়াকেই মুসলমানেরা তাদের সমস্ত ভাগ্যহীনতার কারণ বলে নির্দেশ করে। তাদের হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সর্ববিধ বেদাত ও শেরেকমুক্ত আদিম ও অকৃত্রিম ইসলামের পুনঃপ্রবর্তনই যে তার একমাত্র উপায় এ বিশ্বাস থেকেই তখন বাংলার মুসলমানেরা তাদের ধর্ম সংস্কারের দিকে মন দেয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ফারায়েজী ও সর্বভারতীয় ওহাবী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে আবদুল ওহাব নজদি আরব-ভূমিতে হযরতের অকৃত্রিম আদর্শ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে সংগ্রাম পরিচালিত করেন, তাই ইসলামের ইতিহাসে ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। আবদুল ওহাবের পর তাঁর ছেলে মুহম্মদ এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ওহাবীদের হাতে আসে এবং ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মক্কা তাদের হস্তগত হয়। তুর্কী সরকার যুদ্ধ করে ওহাবীদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং মক্কা পুনদর্খল করে নেয়, কিন্তু ওহাবীদের ধর্ম সংস্কার তাতে থেমে যায়নি।

উত্তর-ভারতের রায়বেরিলী নিবাসী প্রখ্যাত ধর্মনেতা সৈয়দ আহমদ এবং পূর্ব বাংলার ফারায়েজী নেতা হাজী শরীয়তুল্লা এবং পশ্চিম বাংলার ফারায়েজী নেতা হাজী নাসির আলী (তিতুমীর) হজ উপলক্ষে মক্কায় ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ভারতীয় ইসলামের সংস্কার আন্দোলনে এঁরা প্রবল প্রত্যয়ে নেমে পড়েন।

পূর্ব বঙ্গে ফারায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তুল্লা। তিনি ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলার অধিবাসী। তিনি অল্প বয়সে মক্কা যান এবং ১৮২৮ সালের দিকে পরিণত বয়সে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি খ্রীষ্টান ইংরেজ শাসিত তদানীন্তন ভারতবর্ষকে 'দারুল্ হর্‌ব' মনে করতেন। দারুল্ হর্‌বে মুসলমানদের ঈদ ও জুমার নামাজ সম্ভব নয়, শরীয়তুল্লা এ মতবাদ প্রচার করেন এবং হিন্দুদের দুর্গা পূজার মতো করে মুহররম পর্বানুষ্ঠানও তিনি ঘোর শরীয়ত বিরোধী মনে করেন; পীর পূজার বিরোধিতা করে ওস্তাদ ও শাগ্‌রীদের সম্পর্কের ভিত্তিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পীর মুরীদের সম্বন্ধ নিরূপণ করেন। শরীয়তুল্লার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে এ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার পড়ে তাঁর ছেলে মুহম্মদ মোহসীন ওরফে দুদু মিয়ার ওপর। দুদু মিয়ার আমলে এ আন্দোলন মাত্র ধর্ম সংস্কারে নিঃশেষিত হয়নি, অবস্থাচক্রে এ অঞ্চলের হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে ব্যাপক আর্থিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাগুলোকে কয়েকটি আঞ্চলিকভাগে ভাগ করে দুদু মিয়া তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা নিযুক্ত করেন। এ অঞ্চলে তাঁর প্রভাব স্থায়ী হয় উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত।

www.icsbook.info

পূর্ববঙ্গের ফারায়েজীদের এ সংস্কার আন্দোলন কালে পশ্চিমবঙ্গেও ফারায়েজী আন্দোলন চলছিল অপ্রতিহত গতিতে। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন নিসার আলী তিতুমীর। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার লোক ছিলেন। ১৮২৭ সালের দিকে হজ করে ফিরে আসার পর বঙ্গীয় ইসলামে শেরেক-বেদাতের বিরুদ্ধে তিনি এক রকম জেহাদ শুরু করেন। শরীয়তুল্লার মতো তিনিও পীর পূজার বিরোধী ছিলেন। হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য যেন বজায় থাকে সেজন্য মুসলমানদের দাড়ি রাখা এবং ইসলামী পোশাক পরিধান করা অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কল্যাণে লোকজন খাওয়ান এবং কবরের উপর সৌধ গড়ে তোলাও তিনি মনে করতেন শরীয়ত বিরোধী।

এসব সংস্কার আন্দোলনে হাত দিয়ে তিতুমীরকে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এ সংঘর্ষ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করে। যেসব মুসলমান তাঁর মতামত বরদাশ্‌ত করতে পারে নি তাদের সঙ্গেও তাঁর মতানুসারীদের সংঘর্ষ হয়।

এ আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, তিতুকে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব অবহেলা করে নারিকেল বাড়িয়ায় একটা স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এতে বিচলিত হয়ে ওঠে। বারাসাতের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার বিপ্লবী তিতুকে দমন করতে গিয়ে তিতুর হাতে বিপর্যস্ত হন। চব্বিশ পরগণা ও কৃষ্ণনগরের জেলা কর্তৃপক্ষ তিতুকে দমন করতে ব্যর্থকাম হলে তাঁদের সহায়তার জন্যে কলকাতা থেকে একটা পদাতিক বাহিনীসহ আসেন মেজর স্কট। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরি করে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ১৮৩১ সালের ২২শে নভেম্বর শাহাদৎ লাভ করেন। তার সঙ্গে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন তার সঙ্গীদের পঞ্চাশজন।

অবস্থাচক্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ফারায়েজীরা শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও সে সংঘর্ষ ব্যাপক কোন রাজনৈতিক আন্দোলনপ্রসূত ছিল না। ধর্ম সংস্কারই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ফারায়েজীদের এ আন্দোলনে বাঙালী মুসলমানের মনে সংগ্রামের নামে সেদিন যে প্রেরণা দেখা দিল তা-ই বাংলাদেশে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বৃহত্তর সর্বভারতীয় ওহাবী আন্দোলনের মানসক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে।

আদর্শবাদের দিক থেকে ফারায়েজীরা সরাসরি ওহাবীদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাদেরই সমগোত্রীয়। ফারায়েজী ও ওহাবীদের লক্ষ্য এক-তা ধর্মসংস্কার এবং আদি ইসলামের পুনঃসংস্থাপন। তাদের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু দেখা যায়, তা পদ্ধতির। ওহাবীরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে অন্তর এবং বাইরে জেহাদে বিশ্বাসী। জেহাদ যেমন একদিকে চিত্তশুদ্ধি ঘটায় অন্য দিকে সর্ববিধ সংগ্রামের জন্যে চিত্তকে করে রাখে সদাজাগ্রত। জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে ওহাবীরা জীবনসর্বস্ব ত্যাগী এবং অনমনীয়। জীবনব্যাপী জেহাদ পরিচালনার প্রয়োজনবোধে তারা হিজরতেরও সমর্থক। জেহাদের প্রশ্নে ওহাবীদের একরকম অত্যাধুনিক ফারায়েজী বলতে হয়; নইলে ভারতীয় ইসলামে শেরেক বেদাতের সংস্কার প্রশ্নে ফারায়েজী এবং ওহাবীরা একই মনোভাবাপন্ন।

ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন দিল্লীর শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৭০২-৬০ খ্রীঃ)। ইমাম গাজ্জালীর মতো দার্শনিক ভিত্তিতে তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা

www.icsbook.info

করতেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আদর্শ প্রচার করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল আজিজ। মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভেদী জ্বালা অনুভব করেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রশিষ্য বিখ্যাত ওহাবী নেতা সৈয়দ আহ্মদ। তিনি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে রায়বেরিলিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধিপ্রসূত আদর্শবাদ অন্তর্জীবনের ধ্রুব বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়ণে সৈয়দ আহ্মদ ছিলেন নিষ্করুণ এবং নির্মম। সৈয়দ আহ্মদের আদর্শবাদের সঙ্গে একান্তভাবে মিশেছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি, জাগ্রত চিন্তাশীল মন, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, অদম্য উদ্যম এবং অফুরন্ত সাহস।

পাঞ্জাব তখন শিখদের করায়ত্ত। পাঞ্জাবাধিপতি রণজিৎ সিং নামাজ পড়া, গরু জবেহ্ করা এবং প্রকাশ্যে আজান দেওয়া প্রভৃতি ধর্মাধিকার থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করেছিলেন। এ কারণে সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন (১৮২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে)। আবদুল আজিজের দুজন নিকট আত্মীয় ইসমাঈল এবং আবদুল হাই সৈয়দ আহ্মদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মতবাদ প্রচার এবং জেহাদে সহায়তা করেন। সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানে তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্যে সফর করে বেড়ান। ভারত-আফগান মুসলমান সমাজে সেকালে তাঁর নিষ্ঠা ও সততার জন্যে তাঁকে ইমাম রূপে আখ্যাত করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি একটা স্বাধীন সরকারও গড়ে তোলেন এবং পাঞ্জাবের রণজিৎ সিং-এর সঙ্গে বহু যুদ্ধ করে ১৮৩১ সালের মে মাসে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর ভক্ত শিষ্য ইসমাঈল এবং আরও অনেকের সঙ্গে শাহাদাৎ লাভ করেন।

সৈয়দ আহ্মদের জীবদ্দশায় ওহাবী আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে নি। মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলামের প্রতিষ্ঠা সৈয়দ আহ্মদের স্বপ্ন হলেও একই সঙ্গে শিখ এবং পরাক্রান্ত ইংরেজদের সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। এতে তাঁর বাস্তব বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজদের দ্বারা পাঞ্জাব বিজিত হবার পরই সৈয়দ আহ্মদের অনুবর্তী ওহাবীরা ইংরেজের সঙ্গে কলহে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের এ আন্দোলনের বৃটিশ-বিরোধী রূপ সিপাহী-বিদ্রোহের পরও বছর দশেক স্থায়ী হয়।

ওহাবী বিপ্লব যে কত সংঘবদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় তার ইতিহাস বিস্ময়কর। এ বিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'সীতানা', প্রচার এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বিহারে 'পাটনা' আর বাংলাদেশে ছিল ধন জন সংগ্রহের প্রশস্ত ক্ষেত্র। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, পাবনা, বগুড়া এবং রাজশাহী-বাংলাদেশের এ জেলাগুলোই এত দীর্ঘকাল ধরে এ আন্দোলনে অপরিমেয় অর্থ সাহায্য করে ও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক যুগিয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতায় আদর্শ স্থাপন করেছে। বাঙালী মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ যে কি তীব্র এবং বেগবান হয় ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। উইলিয়াম হান্টার সাহেবের Our Indian Mussalmans, are they bound to owe allegiance to the Queen? গ্রন্থে (১১০ পৃষ্ঠায়) এর কৌতুকাবহ বিবরণ পাওয়া যায় :

"পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওহাবী প্রচারকেরা সাধারণত বিশ বৎসরের কম বয়সের শত শত সরলমতি যুবককে, অনেক সময়ে তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে, নিশ্চিতপ্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্র্য ও

www.icsbook.info

বেদনা প্রবেশ করিয়েছে, আর আশা ভরসাস্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা স্থায়ী দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওহাবী পিতার বিশেষ গুণবান অথবা বিশেষ ধর্মপ্রবণ পুত্র বিদ্যমান, তিনি জানেন না কোন সময়ে তাঁর পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে। এই ভাবে যে সব যুবককে উধাও করা হয়েছে তাদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে।”

ভারতীয় ইসলাম থেকে শেরেক-বেদাত অপসারণ করে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রবর্তন প্রথম দিকে এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে এ বিপ্লব এমনভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ নেয় যে, ওহাবীরাই ইংরেজদের সঙ্গে মরণপণ অসহযোগিতা করে। এরাই মুসলমানকে ইংরেজদের সাহচর্য বর্জন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে, ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করিয়েছে, ইংরেজ নীলকরদের নীলচাষের দাদন নিতে দেয়নি, ওহাবী কৃষকরা ছলছুতোয় নীলকর জমিদারদের কাজ ফেলে সরে পড়েছে এবং হেলায় করেছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন। এ বিপ্লবের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নি; কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদও যেন এর কাছে হার মেনে নেয়।

ওহাবীদের চরিত্রবল, ধর্মযুদ্ধের নামে জীবনপণ, সততা, শীতাতপ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় এবং বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত দীর্ঘ হাজার মাইলেরও অধিক ব্যবধান দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা যে কি সাধনা ও আরাধনার পরিচয় বহন করে, ইতিহাসে তার নজীর শুধু বাংলার ওহাবীরাই। নিজের জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মকে বাঁচানোর জন্যে, দারুল্ হরবে দারুল্ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাদের এ আত্মত্যাগ সত্যিই তুলনাহীন।

সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিলিত হিন্দু ও মুসলমানের প্রথম গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এ কথা স্বীকার করতে হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-কর্তৃপক্ষের কতকগুলো ভুলই এ বিদ্রোহকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এ বিদ্রোহ ছিল সাময়িক, সেজন্য অল্পদিনের মধ্যে তা দমন করা সম্ভব হয়েছিল। এর পেছনে বহুদিনের পরিকল্পনা এবং দীর্ঘকালের কোন সাধনা ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে ওহাবী আন্দোলনের কোন যোগ না থাকলেও এ বিপ্লবে সৈয়দ আহ্‌মদের হাতেগড়া বহু মুজাহিদও যোগ দিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ শান্ত হবার পরেও শাসনকর্তৃপক্ষকে আরও বছর দশেক ওহাবীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহে সতর্ক ও সচকিত হয়েই ইংরেজ সরকার ওহাবীদের ওপর খড়্গহস্ত হয় এবং ১৮৬৪-৬৫ সালের 'ওহাবী বিচারে' শেষবারের মতো ওহাবীদের দমন করে।

ওহাবীদের আবেগ ও আন্তরিকতা সমালোচনার অতীত; তবে অশিক্ষা এবং আবেগপ্রবণতার জন্যই যে তারা ইংরেজ রাজশক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অনিবার্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে মেনে নিতে পারে নি, এও সত্য। মুসলমানদের দিক থেকে এ আন্দোলন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। রাজশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে কয়েক পুরুষ ব্যবধানে বাংলার মুসলমানেরা হারিয়েছিলেন তাদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছিলেন তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য; ফলে তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ধ আবেগ ও অজ্ঞতা। এ আবেগের বশেই তারা ইংরেজদের সঙ্গে তীব্র বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে দু-একটি পরিবার ছাড়া মোটামুটি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে

www.icsbook.info

বাংলার মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সিপাহী বিদ্রোহ এবং ওহাবী বিপ্লবের পরপরই উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ ইংরেজদের প্রতি আপোসমূলক মনোভাব পোষণ করেন এবং মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। স্যার সৈয়দের এ আন্দোলন 'আলীগড় আন্দোলন' নামে খ্যাতি লাভ করে এবং এরই ফলে: আলীগড় এ্যাংলো মোহামেডান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজই বর্তমানে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন এবং আলীগড় কলেজের দান উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের অগ্রগতির ইতিহাসে যেমন বিস্ময়কর তেমনি উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজীতে সৈয়দ আমীর আলী এবং সালাউদ্দীন খোদাবখ্‌শের ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাখ্যা, আর নবাব আবদুল লতিফের সহানুভূতি ও প্রেরণায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানদের কিছুটা আত্মস্থ হবার সুযোগ হলেও, সেকালে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের মতো কোনও বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা জন গ্রহণ করেননি। ইংরেজ ও মুসলমানের পারস্পরিক সংশয় ও সন্দেহের ভেতর দিয়ে শাসক ইংরেজ ও শাসিত মুসলমানদের মধ্যে ক্রমেই সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এ সুযোগে ভেদবুদ্ধির প্রবর্তক ইংরেজ হিন্দুকে করেছে কৃপা ও অনুগ্রহ বিতরণ। এ শতাব্দীর শুরুতেই হিন্দু সমাজ ক্ষণজন্মা ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রামমোহনের মতো নেতা পেয়েছিল। নিজেদের সুবিধায় এবং রামমোহনের মতো নেতার বুদ্ধি-বিবেচনার সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে যে সহযোগিতার সূত্রপাত করে, ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পরেও সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই সে সহযোগিতা ছিল সক্রিয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে হিন্দুরা যে আন্দোলন পরিচালনা করে তাতেই ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার সূত্রপাত হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদও হয়ে যায়; কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য সে সময় থেকে হিন্দুরা যে আন্দোলনের সূচনা করে, তা গান্ধীজীর অসহযোগ, খিলাফত আন্দোলন, বাংলার হিন্দু যুবকদের সন্ত্রাসবাদ এবং কংগ্রেসের আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে যে সহযোগিতা আরম্ভ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, মুসলমানেরা তা আরম্ভ করল দীর্ঘ এক শতাব্দী পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০৬) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। নির্জীব মুসলমানদের প্রতি ইংরেজরা যে অবিচার করেছিল, ১৯০৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পরপর কতকগুলো আইন প্রণয়ন করে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মাধ্যমে তারা যখন তার কিছুটা প্রতিকার করতে উদ্যত হলো তখন থেকেই হিন্দুরা মুসলমানদের ভুল বুঝেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যৎসামান্য ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে চাকুরিতে হিন্দুদের কিছু অসুবিধা হওয়ায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষির ভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তা পদ্ধতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ও পরিচালিত হয়েছে। অবশেষে এ বিরোধিতার পরিণতিতেই ভারত বিভক্তি ঘটলো।

www.icsbook.info

ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করে তাদের শাসনব্যবস্থা যেমন ধীরে ধীরে দৃঢ় করেছে তেমনি সে শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেও এ দেশে নানা ভাবে চালিয়েছে cultural conquest বা সাংস্কৃতিক বিজয়ের অভিযান; প্রথমতঃ এদেশবাসীকে ইংরেজী ভাষা শিখিয়ে; দ্বিতীয়তঃ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংরেজী মিশনারীদের সাহায্যে এ দেশের লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াসে। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সুফল ইংরেজদের দিক থেকেও যেমন, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের জন্যও তেমনি হয়েছে অবশেষে কল্যাণের। ইংরেজীর জ্ঞানভাণ্ডার এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিতকলার যাবতীয় সিদ্ধি ও সম্পদ আমাদের দেশেও জ্ঞানচোখ খুলে দিয়েছে। ইংরেজদের এ সাংস্কৃতিক বিজয় এ দেশের লোকের জন্যেও হয়েছে অভাবনীয় কল্যাণের; এতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, জীবনের মূল্যও হয়েছে নতুন করে নিরূপিত, আর হয়েছে বাংলার শিল্প-সাহিত্যের নবতম জন্ম। ধর্মের দিক থেকে কিছু সংখ্যক লোক খৃষ্টান হয়নি তা নয়, কিন্তু এ উপমহাদেশের মাটিতে বিশেষ করে বাংলাদেশে খৃষ্টধর্মকে রোধ করতে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের সমাজ ও ধর্মের যে ভাবে সংস্কার করতে হয়েছে, তার স্থবিরত্বে যে ঝাঁকুনি দিতে হয়েছে, তা থেকেই হিন্দু ও মুসলিম বাংলায় জন্মলাভ করেছে তার নবতর ধর্মবোধ এবং আপন ঐতিহ্য সচেতন সম্প্রদায়ের হাতে এ শতাব্দীর নতুন সাহিত্য। খৃষ্টধর্মকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামমোহনের প্রচেষ্টায় জন্মলাভ করেছে ব্রাহ্মধর্ম, রামকৃষ্ণ পরমহংসের হিন্দু ধর্মের নব ব্যাখ্যা এবং বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম প্রচার। খৃষ্টধর্মের আকর্ষণে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় উনিবংশ শতাব্দীতে যতটা মুগ্ধ হয়েছে এবং সাড়া দিয়েছে, মুসলমানেরা ততটা দেয়নি। তার কারণ বাংলার ফারায়েজী ও ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ আন্দোলনের পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টান হওয়ার প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। এ বিপদ থেকে বাংলার মুসলমানকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেন মুন্শী মেহেরুল্লা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশকে এবং বিংশ শতকের শুরুতে তিনিই ছিলেন মুসলিম বাংলার রামমোহন। এ অল্পশিক্ষিত মহাপ্রাণ মানুষটি সেদিন বাংলার গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের আত্মসচেতন করার জন্য বক্তৃতা ও সমাজসেবার যে প্রবল ঝড় বইয়েছিলেন তার যথাযথ মূল্য আজও নিরূপিত হয়নি। তাঁর সান্নিধ্যে এসে সেদিনের পাদরী জমিরুদ্দীন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুন্শী জমিরুদ্দীন নাম নিয়ে তাঁর শিষ্যরূপে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ত্যাগীপুরুষ বাগ্মীপ্রবর মুন্শী মেহেরুল্লাই মুসলমানদের জাতীয় চেতনামূলক, ইসলামের নিজস্ব ছাপ ও পরিচয় বহনকারী সাহিত্যসেবায় মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। মীর মোশার্‌রফ হোসেন মেহেরুল্লার কিছু পূর্ববর্তী হলেও তাঁরা সমসাময়িক কালের; সাহিত্যিক ও শিল্পীমানসিকতার দিক থেকে তিনি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মেহেরুল্লা প্রমুখ সংস্কারকের মানসিকতার মাপকাঠিতে ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন নি। তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল কায়কোবাদ থেকে শুরু করে শেখ আবদুর রহিম, মুনশী রেয়াজুদ্দীন, মোজাম্মেল হক প্রমুখ সাহিত্যিকের। এঁরা ইসলামী সাহিত্যের যে ইঙ্গিত নির্মাণ করলেন তা-ই এ-যুগের বাংলার মুসলমানের নিজস্ব সাহিত্য হিসাবে স্বতন্ত্র মত ও পথের দিগ্‌দর্শন হল।

www.icsbook.info

উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে মুসলমানেরা মহৎ ও উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করেনি, তাদের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। ওহাবী আন্দোলনের মানসিকতাবশত তারা তাদের দৃষ্টিকে করে রেখেছিল অতীতমুখী। মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা ভেবে স্বপ্নাতুর রোমান্টিক কবিদের মতো কিছু যে দীর্ঘশ্বাস তারা ফেলেনি তা নয়, কিন্তু তাতে সমাজ-জীবনের এবং বাংলা দেশের কোনও ছাপই পাওয়া যায় না। ইংরেজী জ্ঞানবর্জিত অর্ধশিক্ষিত কবিরা এ যুগে সারা শতাব্দীকাল ধরেই দোভাষী পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছে। একদিকে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং অন্য দিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা -এ দুইয়ের মাঝখানে এ শতাব্দীতে রচিত পুঁথি সাহিত্য যে ওহাবী আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল তার পরিচয় পাওয়া যায় এ সাহিত্যের রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মানসিকতা এবং তাদের ভাষা ব্যবহার থেকে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই এ সাহিত্যের সূত্রপাত হয় কিন্তু এক উনবিংশ শতাব্দীতে সারা বাংলাদেশ জুড়ে এ সাহিত্যের বিস্ময়কর ব্যাপকতা থেকে তখনকার দিনের বাঙালী মুসলমান সাধারণের মানসিক গতিভঙ্গির অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র দেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপনের জন্য যেভাবে এ গণসাহিত্য রচিত হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তার নজীর বড় বেশি পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ভদ্র বাংলা সাহিত্যের বদৌলতে এ সাহিত্য অপাংক্তেয় হয়ে বটতলায় আশ্রয় নিলেও আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লেখা অসংখ্য পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। এ সাহিত্যে ধর্মশাস্ত্র, উপদেশ, ইতিহাস, জীবনী, কাব্য ও রোমান্টিক উপাখ্যান বিষয়ক বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে। পুঁথি লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি অতীতাশ্রয়ী এবং আত্মকেন্দ্রিক। সম্ভবত দেশের রাজনৈতিক শক্তি হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বহির্জগতের ব্যাপার উপেক্ষা করে এতে আত্মতৃপ্তি এবং মিথ্যা সান্ত্বনা তারা পেয়েছিল।এ উক্তির প্রচ্ছন্ন সমর্থন মিলবে এ সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার থেকে। এতে প্রধানত আরবী-ফারসী শব্দই, এমন কি উর্দু সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদও বাংলা হরফে ডান দিক থেকে বাংলার পোশাক পরিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন আছে উক্ত শতাব্দীর হিন্দু-সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা, অন্য দিকে তেমনি একটি কৃত্রিম ভাষাকে জগতের সামনে তুলে ধরে তৃপ্তি পাবার প্রয়াস। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, উনবিংশ শতাব্দী বলতে এক পুঁথি এবং মীর মোশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের গুটি কতক রচনা ছাড়া বাঙালী মুসলমানের পক্ষে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মীর মোশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ প্রমুখ জনকয়েক মুসলমান সাহিত্যিক, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন ও হেম-নবীনের অনুপ্রেরণায় পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথ তৈরি করেছেন মাত্র। এঁদের পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুদশকে নিজেদের কৃষ্টি-সচেতন শেখ আব্দুর রহিম, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশ্‌হাদী এবং আরও যে কয়জন মুসলিম সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছেন, বলতে কি একালে তাঁরাই আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেছেন।

www.icsbook.info

ইংরেজ এবং ইংরেজী ভাষার প্রতি শতাব্দী কালের বিরূপতায় আর তাদের সঙ্গে নানা সংঘর্ষে মুসলমানেরা হলো বিপর্যস্ত, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজদের অনুগ্রহকামী হিন্দুদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপের মানবতাবাদে দীক্ষিত নব মানবতার বার্তাবাহী এমন কতকগুলো সৃষ্টিধর্মী মানুষের জন্ম হলো যাদের কাছে দেশ কালে কালে পেলো ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনজাত সৃষ্টি মহত্তম বাংলা সাহিত্য। মীর মোশাররফ হোসেন এবং নজরুল ইসলামকে বাদ দিলে দেখা যাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অংশটুকু মানুষের চিন্ময় কল্পনার যা অপরূপ বাঙ্ময় প্রকাশ তার সবটুকুই বাঙালী হিন্দুর সৃষ্টি।

দিগ্‌দর্শিকা

১. Hunter, W. W.—Our Indian Mussalmans.

২. Malick, A. R.—'British policy and Muslims in Bengal' (1757--1856), Dacca, 1961.

৩. কাজী আবদুল ওদুদ-শাশ্বত বঙ্গ (প্রথম সংস্করণ ১৩৫৮)।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোভাষী পুঁথি, কবিগান, কয়েকজন কবিওয়ালা, পাঁচালি, বাউল কালীবন্দনা, যাত্রা

সৈয়দ আলী আহ্সান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

দোভাষী পুঁথি

ভারতচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি। ভাষা ব্যবহারের চাতুর্যে, তীক্ষ্ণতায় কৌতূকপ্রিয়তায় এবং সমসাময়িক জীবনকে গ্রহণ করার প্রবণতার মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের মূল প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরে এসেছিলেন। সেজন্য অনেকে ভারতচন্দ্রকে অন্ত্যমধ্যযুগের কবি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। মধ্যযুগকে তাঁরা দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন- একটি আদি মধ্যযুগ অন্যটি অন্ত্য মধ্যযুগ, অন্ত্যমধ্যযুগে নাগরিক জীবনে আধুনিকতা প্রবেশ করেছে এবং ভাষার মধ্যেও এক প্রকার চলিত বিভঙ্গ এসে উপস্থিত হয়েছে। এর ফলে ভারতচন্দ্রের আধুনিকতায় একটি নতুনত্বের স্পর্শ ছিল। যাই হোক, ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান ঘটল একথা আমরা ধরে নিতে পারি। ভারতচন্দ্রের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সাহিত্যে একটি চরম শূন্যতা বিরাজমান ছিল। এ কালে বাঙালী জনসাধারণের আনন্দের উপকরণ যুগিয়ে এসেছিলেন কবিওয়ালারা এবং দোভাষী পুঁথিকারগণ। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও মননক্ষেত্রে বহুবিধ বিপর্যয় অতিক্রম করে যে সমস্ত কবিরা আপন অপটুতা এবং অক্ষমতার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভের বাইরে থেকে অতীতের সঙ্গে ক্ষীণ যোগসূত্র রক্ষা করে এসেছিলেন তারা হচ্ছেন এই কবিওয়ালারা এবং দোভাষী পুঁথিকারগণ। দীর্ঘকাল এরাই জনসাধারণকে তৃপ্তি দান করেছেন এবং জনসাধারণের সমর্থন নিয়েই তারা বেঁচেছিলেন, বক্তব্যে এবং প্রকাশভঙ্গিতে তারা সম্পূর্ণভাবে দেশীয় মনোভাবকে বহন করেছেন এবং এ কারণে বিষয়বিন্যাস ও বক্তব্যের দুর্বলতা সত্ত্বেও তাদের দানকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। এদের শক্তির উৎসে ছিল জনসাধারণের আনন্দ লাভের আগ্রহ। শিল্প নিপুণতার দিক থেকে বিচার করলে কবিগান এবং দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের মূল্য যত তুচ্ছই হোক না কেন, প্রাচীন কাব্যের ক্রমবিলীয়মান রশ্মির অস্পষ্ট আভা এসমস্ত রচনায় ধরা পড়েছে। সেকারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমধারা ও প্রবহমানতা এগুলোর দ্বারাই রক্ষিত হয়েছিল বলা চলে। ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই দোভাষী পুঁথির প্রচলন হয়েছে এবং সে সময় থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত যে সমস্ত দোভাষী পুঁথি রচিত হয়েছে সেগুলোকেই আমরা আমাদের বিচারের মধ্যে ধরব। কেননা ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকেই একটি নতুন সাহিত্য ধারা জন্ম নিয়েছে আমরা দেখতে পাই।

দোভাষী পুঁথিতে বাংলার সাথে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হত বলে, আমরা এই নামকরণ করেছি। এ-পুঁথির কিছু অংশ রচিত হয়েছিলো কলকাতায়, কিন্তু অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। শহরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিভিন্ন প্রয়োজনে একত্র হত, কেউ সৈন্যরূপে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যব্যপদেশে অথবা অন্য কোন সাময়িক

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে। এদের আনন্দ-বিনোদনের জন্য এ প্রকার মিশ্রিত ভাষায় দোভাষী পুঁথি রচিত হওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া পুঁথির বিষয়বস্তু রোমান্টিক এবং রহস্যময় প্রণয়োপাখ্যান, আনন্দ-পরিবেশনই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহার নতুন নয়, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা কাব্যেই প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিচয় দেবার জন্য এবং মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহারকে স্পষ্ট করবার জন্য আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমবারের জন্য এ ধরনের শব্দ-ব্যবহারের সৌন্দর্যগত সমর্থন আমরা অন্ত্য-মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় পাই। 'অন্নদামঙ্গলে'র সর্বশেষ অধ্যায় 'মানসিংহে' তিনি বলেছেন—

"মানসিংহ পাতশার হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুয়ানী।
পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদ-গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।"

হ্যালহেড সাহেব তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলছেন-"এ যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়া-পদের সঙ্গে অজস্র আরবী-ফারসী বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।" এ-ব্যাকরণ ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে-সময়কার বাংলা গদ্যের একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে-

"শ্রীরাম। গরিব নেওয়াজ শেলামত। আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়া শীকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাকালে একবেরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মাল গুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার হইতে আমিও এক চোপদার শরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি সন ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবি জগতাধিব রায়।"

তবে একমাত্র দোভাষী পুঁথির রচয়িতারাই এক প্রকার নির্বিকার ঔদাসীন্যেই আজ পর্যন্তও মিশ্রিত ভাষায় কাহিনী-কাব্য এবং অন্য বহুবিধ ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করে চলেছে। বাংলা শালীন সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এর বর্তমানে কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই।

হাওড়া হুগলীর সীমান্তে ছিলো ভুরশুট পরগনা। কবি ভারতচন্দ্রের নিবাস এরই উপকণ্ঠে বসন্তপুরে। এই ভুরশুট-মন্দারণে ইসমাইল গাজীকে উপলক্ষ করে একটি পীরের খান্‌কা বা আস্তানা গড়ে উঠেছিলো। আমরা দেখতে পাই যে, সতেরো-আঠারো শতকের ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল কাব্যে পীরের বন্দনা আছে। পীর ইসমাঈল গাজীই পরবর্তীকালে বড় খাঁ- গাজী রূপে বন্দনা পেয়েছেন। আঠারো শতকে এই বড়-খাঁ গাজীকে আশ্রয় করেই ভুরশুট মন্দারণে দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

এই ভুরশুট-মন্দারণে দুজন কবির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-একজন গরীবুল্লাহ্, অন্যজন সৈয়দ হামজা। গরীবুল্লাহ্‌র পিতার নাম শাহ্‌দুন্‌দি এবং বলিয়া হাফেজপুর তাঁর জন্মস্থান। গরীবুল্লাহ্ বড়-খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন। তিনি 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ হামজা এ-কাব্য সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা' নিশ্চয়ই

www.icsbook.info

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের বেশ আগে রচিত হয়েছিলো। 'আমীর হামজা' কাব্যটি উর্দু 'দাস্তান-ই-আমীর হামজা'র ভাবালম্বনে রচিত। উর্দু সাহিত্যে এ ধরনের দাস্তান-এর আরও উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আমীর হামজা' কাব্যে ইরানের শাহ্ নওশেরওয়ানের সঙ্গে হজরত রসূলে খোদার চাচা আমীর হামজার যুদ্ধ বর্ণনা আছে।

গরীবুল্লাহ্‌র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ-জোলায়খা'। এ গ্রন্থ ফারসী ইউসুফ-জোলায়খা কাব্য অবলম্বন করে লেখা। চারজন খ্যাতনামা ফারসী কবি ইউসুফ-জোলায়খার প্রণয় অবলম্বন করে কাব্যোপাখ্যান লিখেছিলেন। বাংলাতে ইউসুফ-জোলায়খা কাব্যের আদি রচয়িতা শাহ্ মুহম্মদ সগীর। 'ইউসুফ-জোলায়খা' রোমান্টিক কাব্যোপাখ্যান হওয়া সত্ত্বেও, কবি তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে পরিচিত সমাজ ও সংসার জীবনের বন্ধনকে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন উপকথার এবং ক্রিয়াকর্মের অনুশীলনে বাঙালী জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

"ছাড়িয়া আপন মান মুখের যে গুয়া পান
ছেড়ে শোয় বালিশ মাথায়।
ছাড়িয়া আপন বেশ তেল বিনা রূখা কেশ,
তেল বিনা গায়ে উড়ে খড়ি।
ছুরত সোনার বর্ণ, জীবন যৌবন ধন,
ছারখার যেন হৈল দড়ি।"

গরীবুল্লাহ্‌র অন্যান্য কাব্য হচ্ছে-'জঙ্গনামা' (মুহম্মদ এয়াকুব আলীর নামে প্রচলিত), 'সোনাভানের পুঁথি' (সৈয়দ হামজার নামে প্রচলিত) এবং 'সত্য-পীরের পুঁথি।'

গরীবুল্লাহ্‌র পর সৈয়দ হামজা কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি উদনা গ্রাম। হামজা এরই চার মাইল দূরে মৌজা বসন্তপুরে জীবন কাটিয়েছেন। হামজার জীবনকালে বাংলাদেশ দিল্লীর শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং নবাব আলীবর্দী ছিলেন বাংলার স্বাধীন নবাব। সৈয়দ হামজার জন্ম ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি চারটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-'মধুমালতী', 'আমীর হামজা' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'জৈগুনের পুঁথি', 'হাতেমতাই'।

দোভাষী পুঁথি-রচয়িতাদের মধ্যে হামজা সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। তাঁর ভাষা অর্থাৎ শব্দ ব্যবহার, উপমা-রূপক প্রয়োগ অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট নতুনত্বের এবং অনবদ্য আবেগের সঞ্চার করেছে। আনন্দজ্ঞাপক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করলেও তার মধ্যে মানবীয়বোধের পরিচয় আছে। নারীর রূপ-বর্ণনা নিছক অলঙ্কার হিসেবেই তাঁর কাব্যে নেই। এ রূপবর্ণনার পশ্চাতে হৃদয়াবেগের স্থিতি আছে।

সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' প্রকৃত প্রস্তাবে দোভাষী পুঁথি নয়। এখানে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। প্রাচীনকালের পুঁথি রচয়িতারা, যেমন আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী'তে এবং অন্যান্য পুঁথিতে সংস্কৃত বহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনি সৈয়দ হামজাও 'মধুমালতী'তে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আলাওল কিংবা অন্যান্য পুঁথি রচয়িতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানে যে, যেখানে অন্য সবাই শব্দ-ব্যবহার করেছেন পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য এবং অলঙ্করণের জন্য, হামজা সেখানে ব্যবহৃত শব্দে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগের পরিচয় বহন করেছেন। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি

www.icsbook.info

স্পষ্ট হবে। মধ্যযুগের কাব্যে দেখা যায় যে, কবিগণ নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনা করেছেন প্রতিটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্নভাবে নিরীক্ষণ করে এবং উপমার প্রাচুর্যে তাকে মহার্ঘ করে। আলাওল পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে পদ্মাবতীর মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে তার পায়ের নখ পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সমস্ত অংশ মিলে একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র গড়ে উঠেনি। তাছাড়া প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনায় অস্বাভাবিক উপমার প্রাচুর্য ঘটেছে, যেমন—

"পদনখ কিবা তার শশী নিষ্কলঙ্ক।"

কিন্তু সৈয়দ হামজার রচনায় আমরা এর ব্যতিক্রমই লক্ষ করি। সৈয়দ হামজা বিচ্ছিন্নভাবে নায়িকার বিভিন্ন অঙ্গ-গঠন বর্ণনা না করে তাকে পূর্ণভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন। যেমন 'মধুমালতী'তে আমরা পাচ্ছি-

"নানা হাস্য পরিহাসে মালতীর আসে পাশে
রূপসী গায়েন গান গায়।
যুবাগণ কুতূহলী কেহ দেয় করতালী
কেহ কেহ খঞ্জনী বাজায়।।
লইয়া সুবর্ণ ঝারি, আনন্দে কৌতুক করি,
কেহ কেহ দেয় জলধার।
নারিগণে আনন্দতে, অতি সরু গামছাতে,
বদন মোছন করে তার।।
নাওহিয়া মালতীরে, দ্বিতীয় পীড়ার পরে,
বসাইল মুছিয়া বদন।
দুই চারি সখী মিলে, সবে অতি কুতূহলে,
কেহ তার বদলে বসন।।
কোলে করি লইয়া দুলিচায় বসাইয়া,
নারিগণ বসিল বেড়িয়া।
তুরিত মঞ্জুরি রাণী, বস্ত্র অলঙ্কার আনি,
যোগাইল মালতী লাগিয়া।।
সহজে রূপের ভারে, আপনি চলিতে নারে
নবীন যৌবন তাহে ভার।
রূপের মুরারি বালি, ক্ষীণমধ্যা পড়ে ঢলি,
কেমনে বহিবে অলঙ্কার।।
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ, সূর্যের যেমন ধূপ
আভরণে কিবা প্রয়োজন।
এ ওরা ও অন্যে যত, দেশের চলন মত,
আনিল কিঞ্চিত আভরণ।।"

ভাষার দিক থেকে দোভাষী পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে 'মধুমালতী'র সাদৃশ্য নেই, কিন্তু উপাখ্যানের উপাদান এবং প্রকৃতির দিক থেকে আছে। প্রথমত, দোভাষী পুঁথির মতই এর উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, অবাস্তব এবং রোমান্টিক রসাশ্রিত; দ্বিতীয়ত, ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য দ্রুততা এবং নিশ্চিন্ত সংঘটনের পরিচয় আছে; তৃতীয়ত, দোভাষী পুঁথির মতো এটা পয়ার ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিতে লিখিত।

www.icsbook.info

'মধুমালতী' গল্পাংশ সংক্ষেপে এই–কিঙ্কর নগরীতে সূর্যভান নামে এক রাজা ছিলেন। এর রাণীর নাম কমলা এবং পুত্রের নাম ছিলো মনোহর। যুবা বয়সে এক রাত্রে মনোহর গৃহের বাইরে পালঙ্কে শয়ান ছিলো, এমন সময় কয়েকজন পরীর দৃষ্টি তার ওপর পড়ে। তারা ভাবলো যে এহেন রূপবান পুরুষের সঙ্গে একমাত্র রূপমঞ্জরীর কন্যা মালতীরই মিলন ঘটতে পারে। এই ভেবে পালঙ্কসহ ঘুমন্ত মনোহরকে তারা মালতীর গৃহের মধ্যে রেখে এলো। রাত্রিতে জেগে তারা একে অন্যকে দেখে বিভ্রান্ত হলো, অবশেষে উল্লসিত হয়ে অঙ্গুরী বিনিময় করলো। রাত্রি শেষের দিকে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তখন পরীরা এসে মনোহরকে তার দেশে নিয়ে গেলো। সকালে ঘুম ভাঙলে তারা একে অন্যকে না দেখে চরম দুর্ভাগ্যে আর্তনাদ করে উঠলো। মনোহর গৃহত্যাগ করে মালতীর সন্ধানে দেশের পর দেশ অতিক্রম করতে লাগলো। বহু বিপদের সম্মুখীন সে হল, আবার আশ্চর্যভাবে সমস্ত বিপদ সে অতিক্রম করলো। অবশেষে সে এলো এক দুর্গম প্রাসাদে। এখানে প্রেমা নামে এক কন্যা এক দৈত্যের হাতে বন্দিনী হয়ে আছে। মনোহর এ- দৈত্যকে সংহার করলো। প্রেমার কাছে সে আপন বেদনার কথা জানালো। প্রেমা তাকে শুভ সংবাদ দিলো যে মালতী তারই সখী এবং মালতীর সঙ্গে মনোহরের মিলনের সুযোগ সে করে দেবে। প্রেমার পিতৃভবনে প্রেমাকে স ঙ্গ নিয়ে মনোহর এলো। প্রেমা ফিরেছে সংবাদ পেয়ে কন্যাসহ রূপমঞ্জরী এলেন তাকে দেখতে। এখানে এক গোপন উদ্যানে মালতীর সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ হয়। অনেক দুঃখ-বেদনার কথা বলে তারা যখন উদ্যানের মধ্যেই শয়ন করেছে এবং নিদ্রাভিভূত হয়েছে, তখন অতর্কিতে রূপমঞ্জরী সেখানে এলেন, এবং অপরিচত পুরুষের সঙ্গে শায়িতা দেখে মন্ত্রপূত পানি ছিটিয়ে তাকে শুক পাখি বানিয়ে দিলেন। পাখি হয়ে উড়তে উড়তে মালতী এলো তারাচাঁদ নামক এক অপরিচিত রাজার রাজ্যে। সেখানে সে বন্দিনী হলো। সংবাদ পেয়ে তার মাতাও এলেন এবং তাকে মানব-রূপ দিলে । তারাচাঁদ সন্ধান করে মনোহরকে নিয়ে এলো। মনোহরের সঙ্গে মালতীর বিয়ে হলো এবং তারাচাঁদের সঙ্গে প্রেমার।

এ গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপাখ্যানটি পরীর রাজ্যের বা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের। এখানে সকল প্রকার অসম্ভব ঘটনাই নিশ্চিন্তে ঘটতে পারে। ভয়াবহ সংকট আসে আবার অতি সহজেই সে সমস্ত সংকট অতিক্রান্ত হয়।

ষোড়শ শতকের হিন্দী-অবধী ভাষার কবি মন্‌ঝন্ 'মধুমালতী' কাব্যের আদি রচয়িতা। এ-কাব্যের কয়েকটি রূপান্তর পাওয়া যায় ফারসী ভাষায়। অহমিয়া ভাষায়ও 'মধুমালতী' কাব্য রচিত হয়েছিলো।

সৈয়দ হামজার দ্বিতীয় পুঁথি 'ছহি জৈগুনের পুঁথি।' এখানে হযরত আলীর পুত্র হযরত হানিফার সঙ্গে এরেম শাহের কন্যা বিবি জৈগুনের বাহাদুরী এবং শক্তিমত্তার পরীক্ষার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিবি জৈগুন হিন্দু এবং হানিফা মুসলমান। জৈগুনের আত্মম্ভরিতা এবং পরাজয় এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে আমরা দেখছি সে ইসলামধর্ম অবলম্বন করছে। সুতরাং এক অর্থে অনেকটা স্থূলভাবে এবং হাস্যকরভাবে তো বটেই, কবি ইসলামের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে চেয়েছেন। দোভাষী পুঁথিতে এ ধরনের উপাখ্যান আমরা আরও পাই। একটি পুঁথিতে হযরত আলীর সঙ্গে বীর হনুমানের লড়াই বর্ণিত হয়েছে। হনুমান সেখানে চরমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। উর্দু সাহিত্যেও এ ধরনের অনেক কাহিনী আছে, যেমন- বোস্তান-ই-খেয়াল, দাস্তান-ই-আমীর হামজা, জঙ্গনামা-এ হযরত আলী ইত্যাদি।

www.icsbook.info

'ছহি জৈগুনের পুঁথি' অবলম্বন করে আমরা এখানে দোভাষী পুঁথির কিছু বিশিষ্টতার উল্লেখ করবো।

১. আরবী-ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ। এ-প্রয়োগ কখনও কখনও বৈশিষ্ট্যহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ পরিচিত বাংলা শব্দকেও বাদ দিয়ে অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- কুওত, কামাল, জাতপাক, কুন্, আজিম্ জার্‌রা, কদ্, দান্দান, হোসমন্দ, আন্দেশা, নেজা ইত্যাদি। যেখানে ইসলামী নীতি বা মুসলমান হিসেবে কারো মনের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, সেখানকার শব্দ-প্রয়োগ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। যেমন-

"সালাম করিয়া বলে তামাম সরদার।
তক্‌ছির করহ্ মাফ আমা সবাকার।।
পড়িয়া তোমার সাথে না হইনু ফতে।
আখেরে হইল দায় জান বাঁচাইতে।।
এখন তোমার পানা লিয়াছি আসিয়া।
আমা সবাকার তরে রাখ নেওয়াজিয়া।।
বিবি বলে যদি সবে বাঁচাইতে জান।
কলেমা পড়িয়া তবে হও মুসলমান।।
আল্লাকে একিন জান হইয়া মমিন।
খুশিতে কবুল কর মোহাম্মদী দীন।"

এখানে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি একান্তভাবে মুসলমানদের চিন্তা, দৈনন্দিন জীবন-যাপন এবং ধর্মার্চনার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত। এগুলো বাদ দিয়ে অন্য শব্দ সে-জায়গায় গ্রহণ করা চলে না। গ্রহণ করলে বক্তব্যের সুর-সংহতিতে আঘাত লাগে।

২. আরবী-ফারসী শব্দের নাম-ধাতুরূপে ব্যবহার, যেমন-রাত গোজারিয়া (∠ গুজর) গেল হইল বেহান'; 'নেরালা মহলে থাকি খোশালিত (∠খুশহাল) মন'; 'আমার আরজ ধর, গোনাখাতা মাফ কর, নেওজিয়া (∠নিয়াজ) রাখনা খেদমতে।'

৩.উর্দু বা হিন্দী ধাতুর ব্যবহার, যেমন—

'তুড়িল (∠তড়) কাফের যত, তাহা বা কহিব কত'; পাহাড়ের রাহে সবে চলে নেকালিয়া' (∠নিকাল); 'কতদূর গিয়া সবে রহে উতারিয়া' (∠উতার); 'তলওয়ার খেঁচিল (∠খিচ) বিবি বাদশাকে মারিতে,; 'তফাতে ডালিল (∠ডাল) মাটি নাহি রাখে কাছে' ইত্যাদি।

৪. আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী শব্দের নিশ্চিত ব্যবহার। শুধু শব্দই নয়, অনেকক্ষেত্রে বাক্যাংশও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-এয়ছা, কেয়ছা, তেয়ছা, দেলাসা, দোন, এক জর্‌রা, তেইসে, থোড়া, বড়া, দোছরা, তেছরা, গেরে, জীউ, মেরা,জান, ভালাবুরা বেটি, মুঝে, চৌদা, তক্, ভি, আবি, এত্তা, কেত্তা ইত্যাদি।

৫. উপমার সহজতা এবং স্পষ্টতা, যেমন-

'গোস্বাভরে হাঁকিয়া চলিল এক কালে। বাঘ কেন সান্ধাইল ছাগলের পালে।' 'কুমারের চাক যেছা ঘোরে চারিদিকে। হয়বত পড়িয়া গেল কাফেরের লোকে।।' 'কহতুবর মর্দানা বুঝিয়া আপনাকে। মেঘের গর্জন যেন এয়ছা হাঁক হাঁকে।।' 'আপনাকে বুঝ তুমি পাহাড় সমান। আমি বুঝি তুমি এক খেলাল প্রমাণ।' 'লস্কর লস্করে

www.icsbook.info

যদি হইল মোকাবেলা। ময়দানে পড়িল যেন চৌগানের খেলা।।' 'কাল নাগ জিনিয়া শিরের কেশ তার।'

পুঁথির সায়েরগণ আরবী-ফারসী শব্দ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, ভাষার ব্যাকরণসঙ্গত রূপেরও পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে বিবিধ আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের ব্যবহার তাঁরা করেছেন, যেমন- 'হইল হনুফা বিবি আগ বরাবর'-এখানে 'বরাবর' শব্দটি উপমায় ব্যবহৃত হয়েছে, আবার 'এমন হেকমত যার, সাবাস জিন্দেগী তার, লড়ে কে আমার বরাবর'-এখানে 'বরাবর' শব্দটি গৌণ কর্ম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র 'আলমের বিচে তেরা কিসের হুরমত'-এখানে 'বিচ্' শব্দটি সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পুঁথির সায়েরগণ নতুন পরিসরে বিদেশী শব্দ ও বাগ্‌ধারা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন বটে, কিন্তু বাংলা কবিতার ধারাকেও আবার অব্যাহত রেখেছেন। মধ্যযুগের কাব্যে সংস্কৃতানুগ কাব্যালঙ্কার যেভাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত, পুঁথিতে তার ব্যত্যয় ঘটে নি। পুঁথির কাব্যধারা প্রাচীন ধারারই অনুসরণ ও পরিপুষ্টি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিক্রমও বটে। ব্যতিক্রমের নিদর্শনগুলো দেখিয়েছি, এবার অনুসরণের কিছু পরিচয় দেব।

১. যমক-বিভিন্নার্থক একরূপ শব্দ বা অভিন্ন পারম্পর্যে গ্রথিত ধ্বনিগুচ্ছ। যেমন-

"করেন খাতেরদারি বিবির খাতির।"

অথবা— "কহ ভাই এয়ছা হাল কিসের খাতির।।
এরেম তাহার আগে কান্দিয়া কান্দিয়া।।
আওল আখের যত কহে বুঝাইয়া।।
মঞ্জির শুনিয়া কে খাতের করে তার।
যে আছিল গুজারিল নছিবে তোমার।।
এখন খাতের জমা রহ এইখানে।।
দেখিব আরবী যবে আসিবে ময়দানে।।"

২. অনুপ্রাস। যেমন—
'পরীস্থানে শাহা পরী বাদশা সে পরীর'-(প)
আমি তার পিঠপরে আছি পোস্তপানা'-(প)
'এরেমশাহের বেটী হানিফার হালাল'-(র, হ)

দোভাষী পুঁথির অনেক উপাখ্যান কোনো বিশেষ নায়ক, কোনো যুদ্ধ বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কোনো বিশেষ নায়ককে কেন্দ্র করে অনেক কবিই অনেক কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন। এরকম এক নায়ক-কেন্দ্রিক কাহিনীর ওপর হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির এবং উর্দু ভাষার দস্তানের প্রভাব পড়েছে।

পুঁথির সায়েরগণ বিভিন্ন নবী, হজরত রসূলে খোদা, চার খলিফা এবং এমামদের নিয়ে অনেক কাব্য-কাহিনী লিখেছেন। এ-ধারার মূল্যবান পুঁথি হচ্ছে 'কাছাছোল আম্বিয়া।' এর রচয়িতা তিন জন-রেজাউল্লা, আমীরুদ্দীন ও আশরাফ আলী। রেজাউল্লা হযরত আদম থেকে হযরত নূহ-এর কাহিনী পর্যন্ত রচনা করেছিলেন, আমীরুদ্দীন লিখেছিলেন হজরত রসূলে খোদার সঙ্গে বিবি খোদেজার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আশরাফ আলী লিখেছিলেন হজরতের বিয়ের বর্ণনা থেকে হজরত আলীর শেষ জীবন পর্যন্ত। গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে।

www.icsbook.info

অবশ্য রসূলে খোদার জীবন নিয়ে বহুদিন থেকেই কাব্য-রচনার রেওয়াজ চলে আসছিলো। আমরা এ-ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতান, জৈনুদ্দীন, শেখ চান্দ্ ও হায়াত মাহমুদের কাব্য সাধনার কথা উল্লেখ করতে পারি।

'জঙ্গনামা' পর্যায়ের অনেক পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 'জঙ্গনামা'র বিষয়ে প্রধানত কারবালার করুণ কাহিনী আছে। মুহম্মদ খানের 'মুক্তাল হোসেন' কারবালার কাহিনী নিয়ে লেখা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 'জঙ্গনামা'। রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ। রাধারমণ গোপ নামক জনৈক হিন্দু কবির 'ইমামের জঙ্গ' নামক একটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। পুঁথিটি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষ দিকে লেখা। 'জঙ্গনামা' পর্যায়ের সর্বশেষ রচনা সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের 'শহীদে কারবালা।'

হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করবার চেষ্টা করেছিলেন অনেক। এ সমস্ত পীরের মধ্যে খ্যাতিমান হচ্ছেন মাণিক পীর এবং সত্যপীর। আরো অনেক পীর আছেন, যেমন পীর মছন্দলি, বড়-খাঁ গাজী, পীর কালু শাহা এবং পীর গোরাচাঁদ। হিন্দুদের অধিকাংশ লৌকিক দেব-দেবীই এ-সমস্ত পীর হয়েছেন। যেমন মাণিক পীর হচ্ছেন ছদ্মবেশধারী শিব, পীর মছন্দলি হচ্ছেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিরূপ। এ-সমস্ত পুঁথি-রচয়িতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আছেন। অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্মপিপাসা মেটাবার জন্য এ-সমস্ত উদ্ভট উপাখ্যান রচিত হয়েছিলো।

দোভাষী পুঁথির রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে লায়লী-মজনু, গোলে বকাউলি, চাহার দরবেশ এবং হাতেম তাঈ-উপাখ্যান প্রসিদ্ধ। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুহাম্মদ খাতের লায়লী-মজনু কাব্য রচনা করেন। মুহাম্মদ খাতেরের প্রসিদ্ধ কীর্তি হচ্ছে দোভাষী পদ্যে শাহনামার সম্পূর্ণ তরজমা।

ইসলামী আহ্‌কাম-আরকান বা নিত্যকৃত্য, কোরআন-হাদীস বা তত্ত্ব গ্রন্থের অনুবাদ সুফী তত্ত্ব-বিষয়ক সাধনা-গ্রন্থ দোভাষী পুঁথিতে আমরা প্রচুর পাই। এ-পর্যায়ের অল্প কিছু গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করছি- সৈয়দ নুরুদ্দীনের 'দাকায়েকুল হাকায়েক' মালে মোহাম্মদের 'আহ্‌কামুল জোমা', জোনাব আলীর 'হকিকাতুচ্ছালাত', মোহাম্মদ ছাদেকের 'জামালাতুন ফোকরা।'

দোভাষী পুঁথি-রচয়িতাদের মধ্যে একমাত্র গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়দ হামজাই আঠারো শতকের, অন্য সকলেই উনিশ শতকের। কবি হিসেবেও একমাত্র গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজাই উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কাব্যগত কোনো মূল্য নেই, তার কারণ, প্রথমত এবং প্রধানত প্রতিভাবান কবির অভাব; দ্বিতীয়ত ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রের ফলে বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন এলো সে পরিবর্তনের সঙ্গে পুঁথি-রচয়িতাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তাঁরা অন্ধভাবে প্রাচীন ধারারই পোষকতা করছিলেন। তৃতীয়ত, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অভাব তাঁদের কাব্যকে প্রাণহীন করেছিলো।

www.icsbook.info

কবিওয়ালাদের আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকের আরম্ভে। তবে এর পিছনেও কবিওয়ালা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ড. সুশীল কুমার দে কবিওয়ালাদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টি। রাসু এবং নৃসিংহের জন্ম হয়েছিল ১৭৩৪ থেকে ১৭৩৮ সালের মধ্যে। হরু ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল ১৭৩৮ সালে এবং নিতাই বৈরাগীর জন্ম হয়েছিল ১৭৫১ সালে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়া চলে যে ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এরা সমৃদ্ধির স্তরে উঠেছিলেন এবং কবিগানকে সমগ্র দেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। প্রধান প্রধান কবিওয়ালারা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রামবসু নামক কবিওয়ালার মৃত্যু ঘটে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে। এদের পরে এদের অনুসারীরা কাব্যক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং এভাবে কবিওয়ালাদের ধারাক্রম পরীক্ষা করে সুশীল কুমার দে তিনটি ভাগে এদেরকে বিভক্ত করেছেন ঃ ক. ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যে সমস্ত কবিগণ ছিলেন, খ. যে কবিগানগুলোর প্রচলন ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যে; এবং গ. যে সমস্ত কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৮৩০ এর পরে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সমস্ত কবিগান সংরক্ষণ করে এগুলোর উপর আলোচনা লিখেছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তবু যাই হোক তাঁর মাধ্যমে আমরা কবিগানের কিছু নিদর্শন পেয়েছি।

www.icsbook.info

কবিগান

উপস্থিত ক্ষেত্রে হঠাৎ বিষয় নির্বাচন করে ছন্দোবদ্ধ পদ রচনা যাঁরা করতেন তাঁরাই 'কবিওয়ালা' বলে পরিচিত ছিলেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে সাময়িক খ্যাতি অনেকে পেয়েছেন, কিন্তু সত্যিকারের কবি নামের যোগ্য কেউ ছিলেন না। কবিগান রচনার পশ্চাতে কোন শিল্পসাধনার পরিচয় নেই। এগুলো লিখিত হয়নি, উপস্থিত ক্ষেত্রে মুখে মুখে রচিত হয়েছে মাত্র। আসরে দুই পক্ষ উপস্থিত থাকতো। কোনও সাময়িক বিষয় অথবা গতানুগতিক রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বন করে এক পক্ষ মুখে মুখে গান রচনা করতো, অন্য পক্ষ ততক্ষণ পাল্টা জবাবের জন্য প্রস্তুত হতো।

এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের এককালের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় সাহিত্যক্ষেত্রে যখন অপরিসীম শূন্যতা বিরাজমান, তখনই কবিগানের প্রচলন হয়। আনন্দের অন্য কোনও সাহিত্য-সম্পদ যখন ছিলো না, তখনই সাধারণ লোক কবিগান নিয়ে মেতে উঠলো।
মধ্যযুগে শাহী দরবারের সমর্থনে এবং পোষকতায় কাব্য রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। ইংরেজ আমলে শিল্প ও সাহিত্যের আনুকূল্য করবার লোক যখন রইলো না, তখন পূর্বতন জমিদারদের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বিলাসী সন্তানেরা কবিওয়ালাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হল। অরুচিকর এবং অশ্লীল কাব্যেই এদের প্রধান আনন্দ ছিলো। এদের দ্বারাই আঠারো শতকের শেষভাগে এক বিকৃত রুচিপূর্ণ নাগরিক সংস্কৃতি কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

কবিওয়ালাগণ মুখে মুখে কবিতা বলেছেন কিন্তু কখনোই এগুলো লিখে রাখেননি। তাছাড়া সেসময় ছাপাখানাও ছিল না। কবিওয়ালাদের সমর্থকদের মধ্যে অনেক বড় জমিদার এবং মহাজন ছিলেন, কিন্তু তারাও কখনো কবিগান সংগ্রহ করার কথা ভাবেননি। হরু ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ। তিনি ইচ্ছে করলে হরু ঠাকুরের গানগুলো সংগ্রহ করে রাখতে পারতেন। কিন্তু সেসময় এগুলো যে সংগ্রহ করা প্রয়োজন তা কেউ চিন্তাও করেনি। তৎকালীন সমাজ জীবনে উৎসব আনন্দের প্রয়োজনে কবিগানের আসর বসত এবং সেটাতেই ছিল কবিগানের সফলতা। ১৮৫৪ সালে সর্বপ্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিগান সংগ্রহ আরম্ভ করেন এবং সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার পাতায় তা ছাপতে থাকেন। সংবাদ প্রভাকর ছিল ঈশ্বর গুপ্তেরই সংবাদপত্র। এভাবে সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমেই আমরা কবিগানের সঙ্গে পরিচিত সবার সৌভাগ্য লাভ করি।

কবিগানের অনেক রকমফের ছিল। যেমন, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিগানকে বলা হতো 'মালসী।' এছাড়া ছিল সখী-সংবাদ, বিরহ এবং খেউড়-লহর। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ তার গৃহে তার বিশেষ ফরমায়েসে কবিগানের আসর বসাতেন।

www.icsbook.info

এগুলোকে বৈঠকীগান বলা হতো। খেউড় ছিল আসলে অশ্লীল নর-নারীর দেহগত সম্পর্কের গান। খেউড় ছাড়া আরো ছিল আখড়াই এবং হাফ-আখড়াই। বৈঠকী গানকেই আখড়াই বলা হতো। হাফ-আখড়াইয়ের বিষয়ের মধ্যে আমরা 'সখী-সংবাদ'ও পেতাম। 'তরজা' এবং 'ঝুমুর' গানে অশ্লীল অঙ্গবিন্যাস ছিল এবং কাম-বাসনা চরিতার্থের কথা থাকত। এসব গানে দুটো দল থাকত। যারা গানের মধ্যেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে রত হতো এবং 'উতোর' গাইতো অর্থাৎ দুদলের মধ্যে গানের কথা কাটাকাটি হতো। কবিগানের আরেকটি ভঙ্গি ছিল পাঁচালী। পাঁচালীতে গল্প শোনা হতো। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, "বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।" কবি ভারতচন্দ্র খেউর গান সম্পর্কে লিখেছেন যে নদে-শান্তিপুর থেকে খেউড় গান এসেছিলো। ভারতচন্দ্র বলছেন ঃ

"নদে-শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শোনাইব।"

"সখী-সংবাদ" যদিও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ছিল কিন্তু এগুলোকে লৌকিক গানও বলা যায়। 'সখী-সংবাদের' মধ্যে "প্রভাতী" বলে একধরনের গান ছিল। এটাকে "ভোর গানও" বলা হতো। এই গানের মধ্যে সকাল বেলা রাধা অথবা কৃষ্ণের নিদ্রা থেকে জাগরণের সংবাদ থাকত অথবা উষালগ্নে রাধার খণ্ডিতা রূপের বিবরণ থাকত।

ড. সুশীল কুমার দে কবিগানের সঙ্গে বৈষ্ণব গানের একটা সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। বৈষ্ণব সঙ্গীতে যেমন মান, মাথুর, বিরহ, গোষ্ঠ এ সমস্ত বিষয় থাকত তেমনি বৈষ্ণব গানের অনুকরণে কবি গানেও এ সমস্ত বিষয় এসেছিল। নিতাই বৈরাগীর একটি গানে আমরা বৈষ্ণব গানের সম্পূর্ণ রেশ পাই ঃ

"শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
বঁধূর বাশী বাজে বুঝি বিপিনে।।
নহে কেন অঙ্গ অবশো হইলো,
সুধা বরিষিলো শ্রবণে ।।"

তবে সকল দিক বিবেচনা করলে একথা বলতে হয় যে, কবিগান ছিল এক ধরনের সামাজিক উৎসবের এবং আনন্দের গান। এগুলোকে তৎকালীন সময়ে কেউ কখনো কাব্যমর্যাদা দেয়নি। এগুলো লোক সাহিত্যের পর্যায়েও পড়ে না। লোক সঙ্গীতের নিজস্ব একটি ধারাক্রম এবং আবহ আছে, সেগুলো নাগরিক বিলাসমত্ততার গান নয়। কিন্তু কবিগান ছিল নাগরিক বিলাসমত্ততার গান। কবিগান রচয়িতারা অনেকেই এসেছিলো নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে। এদের মধ্যে মুচি ছিল, ময়রা ছিল, ছুতার ছিল, স্বর্ণকার ছিল, তাঁতী ছিল, ফিরিঙ্গিও ছিল। এদের সংখ্যাই ছিল বেশি। উচ্চবর্ণের কয়েকজন ছিলেন, যেমন— হরু ঠাকুর, রাসু, নৃসিংহ, রামবসু এবং এরকম আরো কয়েকজন। কিন্তু এরা ছিলেন খুবই নগণ্য।

কবিগানের চারটি বিভাগ ছিলো-গুরুদেবের গীত (বন্দনা), সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড়। প্রত্যেক বিভাগে দুটি করে গান-একটি প্রধান গান যাতে 'ধুয়া' ও 'চিতান' (বা 'পরাধুয়া') আছে এবং অন্যটি দু-তিন চরণের ছোট গান।

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক অধ্যাত্ম-রূপকের কীর্তন স্থূল অশ্লীলতায় পরিণত হল কবিগানে। কীর্তনে আন্তরিকতা এবং রসমাধুর্য আর রইলো না। অশিক্ষিত বা

www.icsbook.info

অর্ধশিক্ষিত লোকের দলগত প্রতিযোগিতায় 'চাপান' ও 'উতোরের' মধ্যে কবিগানের সৃষ্টি, তাই শিল্পচাতুর্য এবং আন্তরিকতা এর মধ্যে আশা করা চলে না। (প্রথম দল যে বিষয়ে গান গায়, তাকে বলে 'চাপান', এবং উত্তরে দ্বিতীয় দল যে গান গায় তাকে বলে 'উতোর'।)

দোভাষী পুঁথির মতই কবিগানের মধ্যেও সমাজ এবং মানবজীবনের কোন বিশিষ্ট পরিচয় নেই। কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে এজন্য যে, এক সময় কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতির সমর্থনেই কবিগান গড়ে উঠেছিলো।

মুখে মুখে রচিত হত বলে এবং শ্রোতাকে চমক লাগিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিলো বলে, কবিগানে শব্দ-ব্যবহারের কিছু কৌশল আমরা লক্ষ করি, যেমন-

১. একই শব্দ একাধিকবার অল্প ব্যবধানে বা ব্যবধান ছাড়াই ব্যবহার করে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করা।

২.একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা।

৩. ছন্দভঙ্গির পরিবর্তন করা।

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে—রঘু মুচী, হরু ঠাকুর, রামবসু, এন্টুনী ফিরিঙ্গি, নিতাই বৈরাগী। একটি লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার এই যে, কবিওয়ালাদের মধ্যে মুসলমান কেউ নেই, এবং হিন্দুও যাঁরা আছেন তাঁরা নিম্ন শ্রেণীর। শোনা যায় সৈয়দ হামজা কিছু কবিগান রচনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি।

কবিগানে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ব্যাপক প্রভাব না পড়লেও, বৈষ্ণব কাব্যের প্রেম-বৈচিত্রের 'খেলা', 'ছল', অথবা 'লীলা' নতুন কালের রস-নিবেদনের ভিত্তি হয়েছিল। কবিগানে কৃষ্ণ হয়েছেন 'নট-চূড়ামণি' অথবা 'রসিক শেখর'। বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসুর কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

১. সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হল অপমান।
শ্যামকে সাধলেম না ফিরে চাইলেম না
কথা কইলেম না রেখে মান।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
নাড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে।
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ আবার একি অপূর্ব্বরাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়।।

২ গেল গেল কুল কুল, যাক্ কুল, তাহে নই আকুল।
লয়েছি যাহার কুল সে আমার প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূল হন্ আমায়
অকূলের তরী কূল পাবে পুনরায়।
এমন ব্যাকুল হয়ে কি দুকূল হারাবো সই।
তাহে বিপক্ষে হাসিবে যত রিপুচয়।

এই রুচিবিকারের যুগে রামনিধি গুপ্ত কিছু রসঘন প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। টপ্পা রচয়িতা হিসেবেই নিধিবাবুর একমাত্র খ্যাতি। নিধিবাবুর সমসমায়িক কবি শ্রীধর কথক প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

www.icsbook.info

এই যুগে দোভাষী পুঁথি ও কবিগান ছাড়াও প্রধানত নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকৃতির কবিতা ও গানের পরিচয় পাওয়া যায়-

১. কালীবন্দনা। রামপ্রসাদের অনুকারীরা কোনোক্রমে এ ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

২. ভারতচন্দ্রের অনুকরণে রচিত বিবিধ প্রণয়োপাখ্যান।

৩. প্রাচীন পুরাণ, মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ-মহাভারতের অনুকরণে রচিত কাহিনী-কাব্য। এ পর্যায়ে জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশীখণ্ড' ও 'শ্রীকরুণানিধানবিলাস' গ্রন্থ দুটির উল্লেখ করা চলে।

৪. পাঁচালী ও যাত্রা। পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে শক্তিশালী কবি ছিলেন দাশরথি রায়। শুধু পৌরাণিক বিষয় নিয়েই নয়, সমসাময়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও প্রচুর উপভোগ্য পাঁচালী তিনি লিখেছেন।

৫. সারি ও জারি গান। পূর্ববাংলায় প্রচলিত ছিলো। এখনো আছে। 'সারি' হচ্ছে শ্রম সঙ্গীত তথা নৌকা বাইচ ইত্যাদির গান আর 'জারি' হচ্ছে মহরমের ঘটনা-আশ্রয়ী শোক-গীতি বা বিলাপ সঙ্গীত।

কয়েকজন কবিওয়ালা

গোঁজলা-গুঁই ঃ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১, ১২৬১ বাংলা তারিখের সংখ্যায় গোঁজলা গুঁই নামক একজন কবিওয়ালার উল্লেখ করেন এবং কিঞ্চিত পরিচিতি প্রদান করেন। তিনি সেখানে লেখেন যে তাঁর কালে সম্ভবত দেড়শ বছর আগে গুঁই-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। গুঁই-এর একটি কবির দল ছিল এবং তারা ধনীদের গৃহে কবি-গান করত। ঈশ্বরগুপ্ত গুঁইকে প্রথম কবিওয়ালা বলে চিহ্নিত করেছেন। গুঁই-এর তিনজন শিষ্যের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন— লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস এবং রামজি দাস। হরু ঠাকুর ছিলেন রঘুনাথ দাসের শিষ্য এবং নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী লাল নন্দলালের শিষ্য ছিলেন। গুঁই যে কবিগানগুলো রেখে গেছেন সে কবিগানগুলো টপ্পার ধাঁচে রচিত এবং তিনি একটা বিশেষ ছন্দ প্রবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন যেগুলো পরবর্তীকালেও অনুসৃত হয়েছিল। এই ছন্দ প্রকরণের শুরুতে আমরা প্রথম মহড়া পাই; এরপর ক্রমান্বয়ে আসে 'চিতান' এবং 'অন্তরা'। কবিগানের ছন্দ প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ বিভাজন পাওয়া যায়। এই বিভাজনের ধারাক্রম হচ্ছে 'চিতান', 'পরচিতান', 'ফুকা', মেলতা', 'মহড়া', সওয়ারি', 'খাদ', 'দ্বিতীয় ফুকা', 'দ্বিতীয় মেলতা' এবং 'অন্তরা'। 'সংবাদ প্রভাকর' এর কার্তিক, ১২৬১ সংখ্যায় রাম বসুর একটি গানকে এই বিশেষ ছন্দ বিভাজন করে দেখানো হয়েছে। আমরা নিম্নে তার উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১ চিতান। গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি সুস্বপন।
১ পরচিতান। এল হে সেই আমার তারাধন।
১ ফুকা। দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে মা কই মা কই আমায় দেখা দাও দুখিনীরে।
১ মেলতা। অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি, আনন্দেতে আমি আমি লয়।
মহড়া। ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।
সওয়ারি। উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়।

www.icsbook.info

খাদ। কন্যাপুত্র প্রতি বাৎসল্য তায় তাচ্ছিল্য করা নয়।।
২ ফুকা। আঁচল ধরে তারা বলে ছি মা কি মা, মাগো,
ওমা মা বাপের কি এমনি ধারা।
২ মেলতা। গিরি তুমি যে অগতি বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।
অন্তরা। মা হওয়া যত জ্বালা যাদের মা বলবার আছে তারাই জানে।
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে।

রঘুনাথ দাশ

কবিওয়ালা রঘুনাথ দাশ নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন। তিনি লৌহকার অথবা তন্তুবায় ছিলেন। এ সম্পর্কে যথার্থ নির্দেশনা আমরা পাই না। তাঁর জন্মস্থান ছিল সালকিয়া, কেউ কেউ তাঁর জন্মস্থানকে গুপ্তিপাড়া বলে উল্লেখ করেছেন। রঘুনাথ দাশের খুব কম সংখ্যক ভণিতাযুক্ত গান আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থে যে গানটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটি আমরা এখানে উপস্থিত করছি ঃ

"ধিক ধিক তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন, সে চাহে না আমি তার যোগাই মন।।
যেখানেতে না রহিল মানী জনের মান, সে কেমন অজ্ঞান, তারে সঙ্গে প্রাণ
সেধে কেঁদে হয়ে গেছে কলঙ্কভাজন।
একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন, কেহ সুখে থাকে
কেহ দুঃখে জ্বালাতন।
শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধেয়ায় সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ।।
সখী, পিরীতি পরম ধন জগতের সার, সুজনে কুজনে হলে হয় ছরিখার।
সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই, কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরেপরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন।
হেন অরণ্য রোদনে ফল আছে কি, এ হতে সুখী একা যে থাকি
ধরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন।।
যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ আছে
কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,
অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন, এ হেন মিলন না দেখি কখন
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে দুজন।

কেষ্টা মুচি

নামেই সুস্পষ্ট যে কেষ্টা মুচি নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন জনপ্রিয় ছিলেন যে হরু ঠাকুরের মতো উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কবিওয়ালাও তাঁর সঙ্গে কবির লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। ঈশ্বরগুপ্ত বহু চেষ্টা করেও কেষ্টা মুচির কবিতা উদ্ধার করতে পারেননি, কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তার লিখিত প্রবন্ধে কেষ্টা মুচির কবিখ্যাতি সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেছেন।

www.icsbook.info

রাসু (১৭৩৪-১৮০৭) এবং নৃসিংহ (জন্ম ১৭৩৮ সাল)

এঁরা সহোদর ভ্রাতা ছিলেন এবং এক সঙ্গে কবিওয়ালা হিসেবে গান করতেন। এদের যে সমস্ত গান পাওয়া গেছে সেগুলো যুগ্ম ভণিতায় আছে বলে আমরা বলতে পারি না কোন ভ্রাতা কোন গান রচনা করেছেন। এরা কায়স্থ পরিবারে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে এঁরা রঘুনাথ কবিওয়ালার দলে যোগদান করেন। ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা পেয়েছিলেন। এঁদের লিখিত একটি গানের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

"প্রাণনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে ॥
পাৰ্ব্বতীনাথেরো অৰ্দ্ধ শশধরো
সবিতা অৰ্দ্ধ কপালেতে।
আমারো নাগরো সেজেছেন সুন্দরো
চন্দন সিন্দুর ভালেতে ।।
হায়! মথনেরো বিষো ভখিয়ে মহেশো
নীল কণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম অতি অনুপাম
জগতে রয়েছে ঘোষণা ।।
আমার নাগরো গিয়েছিলেন কারো
কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো এনেছেন্ নিশানো
আঁখির অঞ্জন গলেতে ।।"

এঁরা দুভাই বিরহ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন।

হরু ঠাকুর
(১৭৪৯-১৮১২)

হরু ঠাকুরই একমাত্র কবিওয়ালা যার প্রচুর পদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কবিওয়ালারা সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন। তাদের মধ্যে বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ একজনকেই পাচ্ছি যিনি হরু ঠাকুর। হরু ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল সিমলা কলকাতায় ১১৫৬ বাংলা সনে। তাঁর পিতা কল্যাণচন্দ্র পুত্রকে প্রথমে পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পুত্র পাঠশালা অতিক্রম করে উচ্চ শিক্ষার দিকে গেলেন না। সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁকে কবিওয়ালাদের দলে নিয়ে এল। রঘুনাথ দাসের সাহায্যে তিনি সখের কবিওয়ালার দল গড়ে তুললেন। তাঁর সুনাম ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শোভা বাজারের জমিদার রাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে তিনি কয়েকবার গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর হরু ঠাকুর তাঁর সখের দলকে পেশাদারী দলে

www.icsbook.info

পরিণত করেন। হরু ঠাকুর অনেক ধরনের কবিগান লিখেছেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রীতি-গীতি। প্রীতি-গীতি আসলে হচ্ছে নরনারীর প্রেমমূলক গান। তার অন্যান্য বিষয়ের গান হচ্ছে বিরহ, সখী-সংবাদ, আগমনী, ভবানী বিষয়ক, লহর এবং খেউড়। হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদ বিষয়ক একটি গানের উদাহরণ আমরা নিম্নে দিচ্ছি :

"শ্যাম তিলেক দাঁড়াও
হেরি চিকন কালা বরণ। শ্যাম তিলেক দাঁড়াও
এ অধিনীর মনের মানস পুরাও।।
সাধ মম বহুদিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশিটি বাজাও ।।
নির্জনে এমন না পাব দরশন
যাক নিশি যাক্ জানুক গুরুজন।
তাহাতে নহি খেদিতে শুন ওহে ব্রজনাথো
ও বংশীরো গুণ কত বিশেষে শুনাও।।
শ্যাম, শুন শুন যাও কেন রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ।।

নিতাই বৈরাগী
(১৭৫১-১৮২১)

নিত্যানন্দ দাশ বৈরাগী নিতাই বৈরাগী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কবিওয়ালা হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি একজন ভাল গায়ক ছিলেন এবং এটাই তার জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ কারণ। নিতাই বৈরাগী সখী-সংবাদ রচনায় দক্ষ ছিলেন ; চন্দননগরে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে কুঞ্জদাশ বৈষ্ণবের গৃহে নিতাই বৈরাগীর জন্ম হয়। বড় হয়ে তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিতাই বৈরাগীর একটি গানের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

"প্রেয়সি তোমার প্রেমধার
আমি শুধিলে কি তাহা শুধিতে পারি।
তুমি যে ধনো খাতকে দিয়েছ করজো
পরিশোধে তাহা পরানে মরি।।
মনোরাধা রেখে তোমারো স্থানে
লইলাম প্রেম করজো করি।
সে ধারো উদ্ধারে হইবে কেমনে
লাভে মূলে হল দ্বিগুণ ভারি।
পীরিতি নগরে বিষমো সাথী মনো চোরেরো ভয়।
বসতি ইহাতে দায়।।
নয়নে নয়নে সন্ধানো মন অমনি হরিয়ে লয়।।"

www.icsbook.info

রামবসু
(১৭৮৬-১৮২৮)

এর পুরো নাম ছিল রামমোহন বসু। হুগলী নদীর দক্ষিণ তীরে সালকিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। কবিওয়ালা হিসেবে ইনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিন প্রকৃতির গান তিনি রচনা করেছিলেন—সখী সংবাদ, বিরহ এবং আগমনী। তার বিরহ সঙ্গীতগুলো বৈষ্ণবী ধাঁচে রচিত নয়। ওগুলোর মধ্যে তাঁর নিজস্বতা ছিল। এই নিজস্বতার গুণে তিনি সাহিত্য রসিকদের কাছে আজ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে আছেন। তাঁর বিরহ সঙ্গীতের মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রুপ আছে এবং ক্রোধ আছে। এগুলো থাকার ফলে তার গানে একটি আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়েছে, যাকে হালকা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাম বসুর আগমনী গানগুলো বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের একটি সুন্দর পরিবেশ তুলে ধরেছে। এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় আবেশের চাইতে সাংসারিক আবেশটাই প্রবল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কোন রচনায়, রাম বসুর গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন— মেনকার ক্রন্দন যেন গৃহাশ্রয়ী বাঙালী মাতার ক্রন্দন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা রাম বসুর একটি আগমনী গান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"তারা-হারা হোয়ে নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কৈ।
আমার সেই তারা হারা ত্রিগতের সারা বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্র বদনে ডাকছে মা মা মা বোলে।
উমা যত হেসে কয় ওতো হাসি নয়
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে ।।"

১৮৩০ এর পর কবিগানের আর জয়জয়কার ছিল না। তবু ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা শহরে জমিদার-গৃহে কবিগানের আসর নিয়মিত বসত। এ সময়ের কবিগান কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য স্বাদ বহন করেনা। এ সময়কার কবিওয়ালাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ড. সুশীল কুমার দে উল্লেখ করেছেন। তারা হচ্ছেন ঃ নীলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর, এন্থনী ফিরিঙ্গি, ঠাকুর দাশ সিংহ, ঠাকুর দাশ চক্রবর্তী, ঠাকুরদাস দত্ত, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, জগন্নাথ বণিক, লক্ষীকান্ত, ভীমদাশ মালাকর, বলরাম দাশ কাপালী, মতি পসারী, বসু, রামানন্দ নন্দী এবং আরও কয়েক জন। একজন মুসলমান কবিওয়ালার নাম ড. দে উল্লেখ করেছেন, তিনি হচ্ছেন হোসেন খাঁ। হোসেন খাঁ তরজার প্রবর্তক ছিলেন। কবির লড়াইয়ে মতি পসারি তার বিরুদ্ধ পক্ষে থাকতেন।

রামনিধি গুপ্ত
(১৭৪১-১৮৩৮)

রামনিধি গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে নিধু বাবু বলে পরিচিত। নিধু বাবুর টপ্পা নামে একটি গানের প্রকরণ এক সময় প্রচলিত ছিল। ধ্রুপদ এবং খেয়ালের মতো টপ্পাও একটি গীত-পদ্ধতি ছিল। অবশ্য এ পদ্ধতিটা ছিল অনেকটা হালকা ধরনের। শব্দটা মূলত

www.icsbook.info

হিন্দী। এর অর্থ হচ্ছে উছলে উছলে পড়া। তার থেকে এর অর্থ করা হয়েছে হালকা মাপের গান। এ গানে অস্থায়ী ও অন্তরা আছে। যে সময়কার কথা আমরা আলোচনা করছি সে সময় কবিগান, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ-কীর্তন এবং বাউল গানের প্রচুর প্রচলন ছিল। এগুলোর মধ্যে টপ্পা ছিল মূলত এক ধরনের বৈঠকী গান। রামনিধি গুপ্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের টপ্পা গানের প্রধান এবং জনপ্রিয় কারুকার।

রামনিধি গুপ্তের জন্ম হয় বাংলা ১১৪৮ সনে। সেই হিসেবে ইংরেজী সন হচ্ছে ১৭৪১। ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাম্‌তা গ্রামে তাঁর মাতুল রামজয় কবিরাজের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন হরিনারায়ণ কবিরাজ। তিনি কলকাতার নিকটস্থ কুমারটুলীতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ১৭৪৭ সালে তাঁর পিতা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং সেখানেই তিনি সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সে সময় ইংরেজীও শিখেছিলেন। রামনিধি গুপ্ত কলকাতায় অবস্থানকালে তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক প্রবণতাবশত সঙ্গীত চর্চা করতে থাকেন এবং অল্প সময়ে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি একজন মুসলমান ওস্তাদের কাছে ভারতীয় সঙ্গীতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং হিন্দী টপ্পা গানের অনুকরণে সর্বপ্রথম রচনা আরম্ভ করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি টপ্পা গানের মাধ্যমে এত বেশী খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন যে শোভাবাজারের বটতলায় বিরাট এক ছাউনী টাঙ্গিয়ে টপ্পা গানের আসর বসানো হতো। সে আসরে ধনী-দরিদ্র সকলেই উপস্থিত থাকত। পরে এ আসরটি বাগবাজারের রসিকচাঁদ গোস্বামীর বৈঠকখানায় স্থানান্তরিত হয়। নিধু বাবু পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে কলকাতার মহাজন জমিদার এবং বড় বড় লোকদের বৈঠকখানায় তাঁর ডাক পড়ত। যদিও তিনি কবিওয়ালা ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিজে বাংলা ১২১২-১৩ সনে কলকাতায় একটি নতুন ধরনের আখড়াই দল গঠন করেন। নিধু বাবু তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে তার গানের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম 'গীতরত্ন গ্রন্থ', বাংলা ১২৪৪ এবং ইংরেজী ১৮৩৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নামপত্রে লিখিত ছিলঃ "গীতরত্ন গ্রন্থ' শ্রী রামনিধি গুপ্ত রচিত গৌড়ীয় সাধু ভাষায় নানা প্রকার ছন্দে রাগ-রাগিনীর সহিত সঙ্কলিত হইয়া বাংলা সন ১২৪৪ সালে কলিকাতা বিদ্বন্মোদ প্রেসে মুদ্রিত হইল।"

কবি ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি নিধুবাবুর সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করেন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। তিনি নিধুবাবুর টপ্পার রচনারীতি, বৈশিষ্ট্য এবং ভাবের উন্মাদনা বিস্তারিত আলোচনা করেন। নিধুবাবুর টপ্পা ছিল প্রেমমূলক এবং কিছুটা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, কিন্তু তার আবেগ ছিল আন্তরিক এবং প্রেমের সহজ রূপকে প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। শোনা যায় মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দের শ্রীমতি নামক জনৈকা রক্ষিতার প্রতি নিধুবাবুর আকর্ষণ ছিল। তাকে লক্ষ করে অনেক গান তিনি রচনা করেছিলেন।

নিম্নে নিধু বাবুর গান থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

১. নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন।।

www.icsbook.info

আঁখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ।।
২. তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ।।
আর কি সেরূপ ভুলি প্রেম তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিন লবে শমনে।।
কে ও যায় চাহিতে চাহিতে
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে।
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে।।
৩. আনন্দ ভব কবি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জন
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গজনে।।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত মুখপদ্ম প্রফুল্লিত
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন খঞ্জনে।।
৪. না হতে পতন তরু দহন হইল আগে
আমার এ অনুপাত তারে যেন নাহি লাগে।।
চিতে চিতা সাজাইয়া তাহে দগ্ধতৃণ দিয়ে
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে।।
৫. বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ না পারি রাখিতে
কাতর নয়ন মনে লাগিল কহিতে।
শুনি মন করে ধ্যান প্রাণেরে বাঁচাতে
চাক্ষুস বিহীনে নাহি উপায় ইহাতে।।

নিধুবাবু দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন এবং ৯৭ বছর বয়সে বাংলা ১২৪৫ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নিধুবাবুর পরে টপ্পার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়নি। আমরা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য টপ্পা রচয়িতার নাম পাই। তাদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীধর কথক। শ্রীধর কথকের জন্ম ড. সুশীল দে ১৮১৬ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত রতন কৃষ্ণ শিরোমণি। আমরা নিম্নে শ্রীধর কথকের কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

১. ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।।
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালবাসি
তাই শুধু দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে।।
২. ঐ যায়, যায়, চায় ফিরে সজল নয়নে
ফিরাও গো, ফিরাও গো ওরে অমিয়-বচনে।
হেরি ওর অভিমান দূরে গেল মোর মনে
অস্থির হতেছে প্রাণ প্রতি পদার্পণে।।

www.icsbook.info

৩. তার প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কন্টক হীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিতো।
প্রেমসাগরেরি জল হত যদি সুশীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিতো।।

শ্রীধরের টপ্পা গানের বিষয় নিধুবাবুর মতো প্রেম, কিন্তু শ্রীধর আগ্রহ ও মিলনের কথা বলেননি, বলেছেন প্রত্যাখ্যাত প্রেমের কথা। মনে হয় এই বিরহটি তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে উৎসারিত।

শ্রীধরের পর আরও কয়েকজন টপ্পা গানের কবির উল্লেখ আমরা পাই। এদের মধ্যে কালী মির্জা নামক একজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। কালী মির্জার আসল নাম ছিল কালীদাস চট্টোপাধ্যায়। টপ্পা ছাড়াও শ্যামা বিষয়ক কিছু গান তিনি রচনা করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম নামক একটি সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থের কথা সুশীল দে উল্লেখ করেছেন। এ সংগ্রহের মধ্যে কয়েকজন টপ্পা রচয়িতার গান পাওয়া যায়। যেমন কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র সরকার, শিবচন্দ্র রায়, আনন্দ নারায়ণ ঘোষ এবং আশুতোষ দেব। বেলুড়ের যদুনাথ ঘোষ 'সঙ্গীত মনোরঞ্জন' নামে একটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। আরও কয়েক জন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন হরিমোহন রায়, রামচাঁদ বন্দোপাধ্যায় এবং দয়াল চাঁদ মিত্র।

পাঁচালী

পাঁচালী সঙ্গীতের উদ্ভব কবে থেকে হল এটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। তবে আমরা জানি যে উনবিংশ শতাব্দীতে দাশরথি রায় পাঁচালী সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করেছিলেন। কি অর্থে পাঁচালী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যে পাঁচালী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কবিরা পাঁচালী লিখেছেন ভণিতায় এমন কথা উল্লেখ থাকত। 'পরাগলি মহাভারত' অনেক সময় 'ভারত পাঁচালী' বলে পরিচিত ছিল। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম নিজের পরিচিতি সূত্রে লিখেছেন যে তিনি 'পাঁচালী প্রবন্ধের' রচয়িতা। এভাবে আমরা 'শনির পাঁচালী', 'ষষ্ঠীর পাঁচালী', 'মনসার পাঁচালী' এরকম অনেক পাঁচালীর উল্লেখ পাই। এগুলো আসলে ছিল পালা গান। দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে কাহিনী কাব্য এবং পালা গান পাঁচালী বলে আখ্যায়িত হয়েছে। ড. সুশীল কুমার দে পাঁচালী এবং নাচাড়ির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যে সঙ্গীত নৃত্য সহযোগে গীত হয় সেগুলো নাচাড়ি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পাঁচটি বিভিন্ন বৃত্তের সমন্বয়ে যে সঙ্গীত গড়ে উঠেছে সেটাই হবে পাঁচালী। যেমন গান, সাজবাজানো, ছড়া-কাটান, গানের লড়াই এবং নাচ এই পাঁচটি ভঙ্গি একত্র হয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন সেটাই হয় পাঁচালী। পাঁচালীর মধ্যে বর্ণনামূলক কথা থাকত, গান থাকত এবং কথকতা থাকত। দাশু রায়ের সমকালীন একজন পাঁচালী গীতকার মনোমোহন বসু তাঁর-'মনোমোহন গীতবলী'র

www.icsbook.info

ভূমিকায় পাঁচালীর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যাটি পাঁচালী বুঝবার জন্য সহায়ক হবে বলে আমি নিম্নে তা থেকে বিস্তৃত একটি উদ্ধৃতি দিলাম :

"নব্য সম্প্রদায়ের গোচরার্থ পাঁচালী বস্তুটা কি একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। যদিও হাফ্-আখড়াই ও দাঁড়া-কবির ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সঙ্গীত সংগ্রাম হইত, কিন্তু উহাদের ন্যায় ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন একদল পূর্ব্বপক্ষরূপে আসরী গান গাহিলে অপর দল উত্তরপক্ষরূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন, পাঁচালীতে তৎপরিবর্তে পূর্ব্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হইত। যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়া কাটাইতে ও গান গাইতে পারিতেন সে দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিমতী হইয়া নিশান লাভ ঘটিত।

"পাঁচালীর প্রণালী এইরূপ। হাফ্-আখ্ড়াই-এর ন্যায় তান্পুর, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্যযন্ত্র, ইদানিং ঐক্যতান বাদ্যের ফুলুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফ-আখড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত। সে বাদ্যের নাম 'সাজ-বাজানো।' সাজ-বাজনার পর 'ঠাকরণ-বিষয়' বা 'শ্যামা-বিষয়'। প্রথমেই শ্যামা বিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাইবার পর কাটানদার উক্ত বিষয়ের ছড়া কাটাইতেন। অর্থাৎ ঐ কার্য্যের উপযুক্ত কোনো এক ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গির সহিত কখনো বা সহজ গলায়, কখনো বা এক প্রকার সুরের সাহায্যে, কখনো বা পদ্য, কখনো বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চস্বরে ছড়া বিন্যাস করিতেন। কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের রোমাঞ্চ হইত। ফলত সুকবির রচনা ও সু-কাটানদার কর্তৃক যোজনা হইলে নানা রস উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ছড়া কাটানো হইলে সকলে মিলিয়া আবার গান।"

মনমোহন বসুর বিবরণটিতে পাঁচালী সংক্রান্ত সকল ব্যাখ্যাই উপস্থাপন করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পাঁচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়ে থাকে। দাশরথি রায়ের পূর্বে পাঁচালী রচয়িতা হিসেবে গঙ্গারাম নস্করের নাম পাওয়া যায়। দাশরথি রায়ই ছিলেন পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য ও অনুকারীদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়ে থাকে তারা হচ্ছেন বজ্রমোহন রায়, সন্ন্যাসী চক্রবর্তী, নবীন চক্রবর্তী, রসিক রায়, ঠাকুর দাস দত্ত, গোবর্ধন দাস, কেশব চাঁদ, নন্দ লাল রায়, কৃষ্ণধন দাস এবং যদু ঘোষ। কাব্যরূপ হিসেবে পাঁচালীর প্রসার ঘটেছিল ১৮২৫ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

দাশরথি রায়

দাশরথি রায়ের বাবার নাম ছিল দেবীপ্রসাদ রায় এবং মাতার নাম ছিল শ্রীমতি দেবী। এদের বসতবাটি ছিল বর্ধমানের কাটোয়ার বাধমুড়া গ্রামে। দাশরথির জন্ম হয় বাংলা ১২১২ অর্থাৎ ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে। দাশরথি রায় স্কুল অথবা টোলে কোন প্রকার শিক্ষা লাভ করেননি। তিনি তাঁর পিতার নিকট যা কিছু জানবার জেনেছিলেন। তিরিশ বছর বয়সে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর প্রথম পাঁচালী আখড়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আজীবন পাঁচালী ছিল তাঁর কর্ম সাধনা। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তাঁর পাঁচালী সংগ্রহ ও প্রকাশিত হয়। প্রথম সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে।

www.icsbook.info

দাশরথি রায় যে সমস্ত বিষয়ে পাঁচালী রচনা করেছিলেন তার মধ্যে ৪টি মূল বিষয়কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি ১. 'কৃষ্ণচরিত' ২. 'রামায়ণ আখ্যান' ৩. বিভিন্ন দেব-দেবীর আখ্যান এবং ৪. সামাজিক ঘটনা। 'কৃষ্ণ চরিতে'র মধ্যে যেসব বিষয় পরিবেশিত হত সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জন্মাষ্টমী, গোষ্ঠলীলা, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, প্রভাস মিলন। 'রামায়ন-আখ্যান'-এ রামচন্দ্রের বিবাহ, বনগমন ও সীতাহরণ, লক্ষণের শক্তি-শেল, ভাগীরথের গঙ্গা-আনয়ন এবং এ রকম আরও কয়েকটি। বিভিন্ন দেবদেবী বিষয়ক পাঁচালীতে আমরা পাই প্রহলাদ-চরিত, দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুর যুদ্ধ ইত্যাদি। সামাজিক ঘটনা নিয়ে লেখা পাঁচালীগুলো বিশেষ উপভোগ্য হত। যেমনঃ বিধবার বিবাহ, কর্তাভজা, বিরহিনীদের বিরহ বর্ণন, বিরহ, স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব নয়নচাঁদ ও সোনামণি, কলিরাজার উপাখ্যান ও চার ইয়ারী, বিরহ, প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ, নলিনী-ভ্রমর এবং ব্যাঙের বিবাহ।

দাশরথি রায়ের পরে পাঁচালী রচনায় যাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রজমোহন রায়। তাঁর ৩২টি পালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর জন্ম হয়েছিল হুগলীর তেতুলিয়া গ্রামে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। রসিক রায় (১৮২০-১৮৯২) প্রচুর পাঁচালী লিখেছিলেন। তার পাঁচালী সংগ্রহ নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুর দাশ দত্ত (১৮০১-১৮৭৬), নন্দলাল রায় এবং মনমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)-এঁরা তিনজন এ সময়ের উল্লেখযোগ্য পাঁচালী পালা রচয়িতা।

বাউল

বাউল শব্দটির অর্থ নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন যে বাউল শব্দটি 'বাউর' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে বাতুল অথবা পাগল। মূর্খ অথবা অজ্ঞান। এর অন্য একটি অর্থও আছে। তা হচ্ছে সহজ সরল। সম্ভবত সহজ সরল অর্থটি বাউলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ যারা সহজ সাধনা করেন এবং ধর্মীয় রীতি প্রকরণ মানেন না। সকল ধর্মে ধর্ম সাধনার কতগুলো বিশেষ রীতি প্রকরণ আছে যেগুলো ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। সেগুলোকে বাদ দিলে ধর্মার্চনা হয়না। কিন্তু বাউলরা কখনো রীতিবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চান না। তারা সংসারত্যাগী মুক্ত পুরুষ। যে ব্যক্তি একবার বাউল তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে সে হিন্দু হোক অথবা মুসলমান হোক তাকে বাউল হতে হলে নিজস্ব ধর্মের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।বাউলদের বিশিষ্টতা হচ্ছে তাদের সাধনাই হচ্ছে সঙ্গীতচর্চা। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তারা সংসার ত্যাগের বাসনা জ্ঞাপন করেন এবং ভগবানের সঙ্গে মিলিত হন।

বাউল সাধনার মধ্যে হিন্দুদের তন্ত্র এসেছে, মুসলমানদের তাসাউফ এসেছে। কিন্তু বাউলরা তন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি অথবা তাসাউফের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। তারা নিজস্ব সাধনকল্পে নিজেদেরকে মিশিয়ে দিয়েছে।

বাউল-গানের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জীবন কিছু নয়, দেহও কিছু নয়। এগুলো হচ্ছে মানুষের জন্য বিরাট বন্ধন। এই বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত হতেই হবে। বাউলরা বিবাহ করেন না, কিন্তু রমণী গ্রহণ করেন। এই রমণী তাদের সাধন প্রক্রিয়ার অংশ। বহু প্রাচীনকালে বাংলাদেশে অন্ত্যজ সমাজে সহজিয়া সাধনা বলে একটি সাধনা ছিল।

www.icsbook.info

এই সহজিয়া সাধনতন্ত্রের লোকেরা সহজে আনন্দ লাভের চেষ্টা করতেন। তাদের কাছে মানুষে মানুষে কোন ভেদ ছিল না। সকল মানুষই তাদের নিকট বন্ধন দশায় পার্থিব নিপীড়নে আবদ্ধ। এই নিপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার সাধনাই ছিল সহজ সাধনা। লক্ষ করা যাচ্ছে যে বাউল সাধনার মধ্যেও এই সহজ সাধনার প্রকাশ ঘটেছে। বাউলরা সহজ সাধনার অনেক কিছুকে গ্রহণ করেছে। তাদের জীবনে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন নেই, পিতামাতার বন্ধন নেই। তারা সর্বতোভাবে উদাসীন। সেকারণে বাউলদের বংশগত কোন অতীত নেই। তারা বংশের আশ্রয়মুক্ত, নির্ভেজাল মানুষ।

বাউলদের বিরাট দান হচ্ছে তাদের সঙ্গীত। যেহেতু সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই বাউল সাধনার প্রকাশ সুতরাং বাউলদের পরিচয় পেতে হলে তাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আমাদের এগুতে হবে। বৈষ্ণবরা যেমন গানের মধ্য দিয়ে তাদের প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করেন, বাউলরাও তেমনি গানের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনাদর্শকে প্রকাশ করেন। বাউলদের সঙ্গে সহজিয়া সাধকদের মিল আছে, বৈষ্ণব সাধকদের মিল আছে, আবার তেমনি সুফী সাধকদেরও মিল আছে। কিন্তু বাউলরা এদের কোনটাই নয়।

বাংলাদেশে যারা বাউল গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিলেন হিন্দুও ছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল। তবে এরা এমন একটি জীবনচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন যেখানে জাতিগত অথবা ধর্মগত কোন প্রশ্নই উঠত না। যাদেরকে আমরা বাউল বলি তারা সকলেই যে বাউল ছিলেন তা নয়, অনেকে পুরোপুরি সূফী সাধক ছিলেন এবং পীরের কাছ থেকে অধ্যাত্ম্য সাধনায় দীক্ষা নিয়ে সাধক হয়েছিলেন, কিন্তু তারাও মরমী গানের রচয়িতা বলে বাউল হিসেবে পরিচিত, যেমন পাঞ্জু শাহ্। মরমী গান রচনা করে বাংলাদেশের বহু দরবেশ ও ফকিরগণ বাউল বলে পরিচিত হয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে সূফীদের 'মারেফাত' ও 'তাসাউফের সঙ্গে বাউল গানের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। যদিও এক সময় বাউল গানের চর্চা গ্রামাঞ্চলেই ছিল এবং নগর জীবনে এর বিশেষ অনুপ্রবেশ ঘটেনি, কিন্তু বর্তমানে বহু গবেষক বাউল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে বাউল গানকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। এ সমস্ত গবেষকগণ বাউল সঙ্গীতের মধ্যে নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং বিভিন্ন সাধনার ইতিহাস সন্ধান করে সঙ্গীতগুলোর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। তান্ত্রিক মতবাদ, বৌদ্ধ সহজিয়াদের চিন্তাধারা, যোগপ্রক্রিয়া এবং সূফী তত্ত্ব এ সমস্ত কিছু পণ্ডিতগণের আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে। তবে যে কথাটা সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে— এ গানগুলো পরীক্ষা করলে আমরা কয়েকটি সত্য আবিষ্কার করি। সেগুলো হচ্ছে প্রথমত সীমাবদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয়ে লালিত একটি জীবন-চর্চা; দ্বিতীয়ত পার্থিব অভিলাষহীন মানবচিত্তে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা জাগে তার পরিচয়; তৃতীয়ত পরম পুরুষকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে একটি আনন্দ। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তার 'হারামণি' নামক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "বাউলেরা মনের মানুষের সন্ধানে ঘুরিতেছে, মনকে ইহাতে পারিভাষিক শব্দে মগজ বলিয়া ধারণা করা যায়। মগজই আমাদের জীবনের নিয়ামক। মগজ যাহা ভালবাসে তাহাই আমাদের প্রিয় ও ভালবাসার ধন। বাউলদের ব্যবহারিক জীবন দর্শন আশ্চর্য। বাউলরা অধ্যাত্ম্যবাদী, কিন্তু এই অধ্যাত্ম্যবাদ দেহাত্মবাদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। জড় মানবদেহ তাহাদের প্রধান সাধন লক্ষণ ও অবলম্বন। নাথ সাধনার সঙ্গে তন্ত্র সাধনার তথা বাউল

www.icsbook.info

সাধনার যোগাযোগ রহিয়াছে। কায়া সাধনা নাথপন্থীদের একটি প্রধান সাধনা। তান্ত্রিকদের ও বাউলদের কাব্য সাধনার রীতি ও উদ্দেশ্য একই।"

বাউল গানের স্রষ্টাদের মধ্যে লালন শাহ সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। বাউল গীতি রচয়িতা হিসেবেই তিনি যে প্রসিদ্ধ ও গৃহীত হয়েছেন তাই-ই নয়, বর্তমানে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বাংলা ভাষার একজন মহৎ কবি। তিনি এক সময় রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিলেন। লালন শাহ মানবাত্মাকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং পাখির উপমা দিয়ে তাঁর কয়েকটি অসাধারণ গান রয়েছে। এই পাখির উপমাটি রবীন্দ্রনাথকে খুবই অভিভূত করেছিল এবং তিনিও তার অনেক কবিতায় পাখির উপমা টেনে এনেছেন। লালন শাহর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্তমানে নানাবিধ অনুসন্ধানের ফলে ধারণা করা হচ্ছে যে লালন শাহর জন্ম হয় ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু জেলায় ১৭৭২, মতান্তরে ১৭৭৪ সালে। অনেক গবেষক বলেছেন যে তিনি কুষ্টিয়ার এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করুন না কেন এবং যে গৃহেই তিনি জন্মগ্রহণ করুন না কেন তিনি যে একজন অসাধারণ কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের বিচার মতে লালন শাহ শৈশব- কৈশোরে গৃহত্যাগী হয়ে শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কুষ্টিয়া শহরে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই সাধক হিসেবে ক্রমশ পরিচিত হতে থাকেন। লালনের সাথে কাঙাল হরিনাথের সংযোগ ছিল। কাঙাল হরিনাথও বাউল গান রচনা করতেন। ফিকির চাঁদ বলে তিনি বাউল সমাজে পরিচিত ছিলেন। কাঙাল হরিনাথের আশ্রমে লালন যাতায়াত করতেন বলে মনসুরউদ্দীন উল্লেখ করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনও লালন শাহকে জানতেন বলে মনসুরউদ্দীন উল্লেখ করেছেন। লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও তার পিতা দেবেন্দ্রনাথের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে জানা যায়। জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন শাহের একটি ছবি অঙ্কন করেছিলেন। এটাই বর্তমানে লালন শাহের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি বলে স্বীকৃত। নিম্নে আমরা লালন শাহের কয়েকটি গান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

১. এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই।
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই।।
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।।

২. এলাহি আল আমিন আল্লা
বাদশা আলামপনা তুমি।
ডোবায়ে ভাসাইতে পারো
ভাসায়ে কেনার দাও কারো।
যা করে তাই হবে তোমার
তাইতো তোমায় ডাকি আমি।।

৩. পারে লয়ে যাও আমায়।
অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়।।
আমি একা রইলাম ঘাটে।

www.icsbook.info

ভানু সে বসিল পাটে।।
তোমা বিনে মোর সঙ্কটে
না দেখি উপায়।।

লালন ফকিরের একটি গান রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল, গানটি নিম্নে উদ্ধৃত করছিঃ

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতেম তাহার পায়।
চিরদিন পুষলেম পাখী
বুঝলেম না তার ফাঁকি-জুঁকি
দুধকলা দিই খায়রে পাখী তবু ভোলে না তায়।।"

লালন ফকিরের অন্য একটি গান এই-

"আমার আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় দেখ না লুকায়
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি আমার চোখের ঘোর তো যায় না।
আত্মরূপে কর্তা হরি
মনের নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা
বেদবেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা।
আমি আমি কে বলে মন
কে জানে তার চরণ কারণ
সাঁই লালন বলে মনের ঘোরে চোখ থাকিতে কানা।।"

লালন শাহের এই অসাধারণ গানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা অপূর্ব রূপকগত ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হয়েছে-

'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
(সেথা) এক পড়শী বসত করে।।
গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা তরণী পারে।'

লালন শাহের পর মরমী গানে যিনি খুব খ্যাতি লাভ করেন তিনি পাঞ্জু শাহ। পাঞ্জু শাহের জন্ম বাংলা ১২৫৮ সনে, যশোর জেলার শৈলকূপা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম খাদেন আলী খন্দকার। পিতার নিকট পাঞ্জু শাহ আরবী-ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সূফী তত্ত্বে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং পীরের নিকট থেকে অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গীকার পেয়েছিলেন। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন 'ইশকি সাদেকী গওহর' নামে। এ পুঁথিতে অনেক তত্ত্বকথা পাওয়া যায়। পাঞ্জু শাহের মৃত্যু হয় বাংলা ১৩২১ সনে। আমরা নিম্নে পাঞ্জু শাহের একটি গান উদ্ধৃত করছি ঃ

"অধর ধর আমার মন
তোর ভব-বন্ধন দূরে যাবে
ওরে তুই এড়াবি শমন।।

www.icsbook.info

মন ধরবি যদি অধর মানুষ, ধর গুরুর চরণ।।
এই মানুষে সেই মানুষ আছে,
সে ঘরের মধ্যে ঘর বান্ধিয়ে কাজল কোঠায় রয়েছে,
এবার গুরু দয়া করবে যাবে, সেই পাবে পাবে রূপ দরশন।
মানুষ নীরে-ক্ষীরে বিরাজ করতেছে
তার স্থূল আছে ব্রহ্মাণ্ড পরে, মূল পাতালে গিছে,
সেই মূলের সাধন গুরু জানে
তা জেনে মন কর সাধন ।।
সে দ্বারে উল্টা খেলা যে জন খেলতেছে
সে নীরে-ক্ষীরে ভিয়ান করে অধর ধরেছে,
ও সাঁই হিরু চাঁদের বাক্য ভুলে,
অধীন পাঞ্জুর হয় মরণ ।।"

আরেকজন উল্লেখযোগ্য বাউল কবির নাম শীতলাং শাহ্‌। শীতলাং শাহ্‌র জন্ম হয় ১২০৭ বঙ্গাব্দে, সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার শ্রীগৌরী মৌজায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। শীতলাং শাহের প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মদ সলিম শাহ্‌। আমরা নিম্নে শীতলাং শাহ্‌-র একটি গানের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"অবুঝ মন ও তোর কালা ধলা আছে স্মরণ।
ও তোর কর্ম দোষে হইল বিড়ম্বন রে।।
আপনার কর্ম ফলে জন্ম হৈল ভব কূলে হে।
কালাধলা ভুলিলে যে ভুলে রে, অবুঝ মন।।
ভব কূলে আসি ভাই, পূর্ব কথা মনে নাই হে।
সে দোষেতে বন্ধুয়া না পাই ওরে, অবুঝ মন।।
সঙ্গেতে মানিক লইয়া ভিঙ্গা আইল ভরা দিয়া।
ফিরে ডিঙ্গা ভাসিয়া সায়রে রে।।
সায়রের নাই পার, ভবসিন্ধু নৈরাকার।
নিজ নাম জপয়ে আল্লা রে।।"

আরেকজন প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত রচয়িতার নাম শেখ ভানু। তার পিতার নাম মুনশী নসরুদ্দিন। তিনি সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। মুহম্মদ মনুসরউদ্দীন তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক বলেছেন। তাঁর নিম্নের গানটি জনসমাজে খুবই প্রচলিত ঃ

নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা
নিশীথে যাইও ফুল বনে।
নয় দরজা করিয়া বন্ধ লইও ফুলের গন্ধ
অন্তরে জপিও বন্ধের নাম।
জ্বালাইও দিনের বাতি ফুটুক ফুল নানা জাতি হে
কত রঙ্গে ধরব ফুলের কলি।
ডাল পাতা বৃক্ষ নাই এমন ফুল ফুটাইছে সাঁই হে
ভাবুক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতে।

www.icsbook.info

অধীন শেখ ভানু বলে ঢেউ খেলাইও আপন দিলে
পদ্ম যেমন ভাসবে গঙ্গার জলে।"

হাসন রাজা একজন বিখ্যাত লোককবি। রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজার মরমী গানের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় হাসন রাজার নাম উল্লেখ করে হাসন রাজাকে জগদ্বিখ্যাত করেছিলেন। তিনি বিশেষ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতীতেও যেমন বর্তমানেও তেমনি তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয় কবি। 'হাসন উদাস' নামে তাঁর একটি কাব্য সংগ্রহ রয়েছে। হাসন রাজার জন্ম হয় ১২৬১ বঙ্গাব্দে, সিলেটে। তার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে ঠিক জানা যায় না। তার একটি বিখ্যাত গানের উদ্ধৃতি আমরা এখানে দিচ্ছি ঃ

"লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ী ভালো নয় আমার।
কিসের ঘর বাইনব আমি শূন্যের মাঝার।।
ভাল করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।।
এই ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে।
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।।
হাসন রাজায় বুঝত যদি বাঁচব কত দিন।
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙিন।।"

গগন হরকরা নামে একজন কবির কথা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আমরা প্রথম জানতে পারি। তিনি গগন হরকরার একটি গানের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গানের দুটি ছত্র আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায় সেই মানুষে, তার উদ্দেশ্যে,
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।।

এরা ছাড়া আরও অনেক বাউল কবি ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ যাদুবিন্দু, বাকের শাহ, চণ্ডী গোঁসাই, রশীদ এবং শিলাইদহের গোঁসাই গোপাল।

কালী বন্দনা

নিধুবাবু এবং তাঁর সময়কার টপ্পাগানের রচয়িতা যখন প্রেম ও বিরহের গান রচনা করছিলেন প্রায় তখনই ভক্তিমূলক গানেরও চর্চা চলছিল। আমরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ভক্তিমূলক গান হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে পেয়েছিলাম, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী কেবল ভক্তিমূলক গান ছিল না, তার মধ্যে প্রবল মানবিক আবেদন ছিল। অন্যদিকে উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে সমস্ত ভক্তিমূলক গানের চর্চা বাংলাভাষায় হয়েছিল সেগুলো মূলত তন্ত্র সাধনার সঙ্গে জড়িত। এগুলো প্রধানত ছিল কালী বন্দনা। কালী বন্দনা হিসাবেই এগুলোকে আমরা বিচার করব, এসব গানে মানবিক আবেদনের কোন প্রেক্ষিত ছিল না। মূলত শক্তির উপাসনা থেকে এ সমস্ত গানের উদ্ভব। এদেশে অষ্টাদশ শতকে শাক্ত সাধনার প্রাবল্য দেখা যায় এবং এই শাক্ত সাধনা তান্ত্রিক সাধনারই হেরফের মাত্র। এগুলোকে আমরা কাব্য হিসাবে পুরোপুরি বিবেচনা করতে পারি না।

www.icsbook.info

এগুলো মূলত সাধন পদ্ধতির সঙ্গেই যুক্ত। এই ধারার এ সময়কার প্রধান কবি ছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি প্রথাগত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর রচয়িতা। কিন্তু এই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে তিনি শক্তির উপাসনায় পর্যবসিত করেছিলেন। সুন্দরকে যখন শূলীদণ্ডাজ্ঞা দেয়া হলো তখন সুন্দর কালীর স্তব করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্ত হয়েছিলেন।

যারা কালী সাধক তারা ঈশ্বরকে মাতা রূপে ভজনা করে এবং একেই তারা বলে আদ্যাশক্তি। রামপ্রসাদ কালীকে বিশ্বমাতা হিসাবে ভজনা করেছেন। মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল কবিতায় আমরা আদ্যাশক্তির ভজনা পেয়েছি। বৈষ্ণব কবিতায় বাৎসল্য রস যেখানে আছে সেখানে কিন্তু নারীকে মাতৃরূপা হিসাবে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়। রাম প্রসাদের পূর্বে কোন কবি কালী বন্দনাকে কাব্যরূপ দিতে পারেননি। রামপ্রসাদই প্রথম কবি যিনি মাতৃরূপ ভজনার মধ্যে কাব্যগত মাধুর্য খুঁজে পেয়েছিলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে কালীবন্দনা রচনার ক্ষেত্রে আরো অনেকে এসেছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেক কালী বন্দনা রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পুত্র শিবচন্দ্র এবং শম্ভুচন্দ্র কালীবন্দনা রচনা করেছেন। অনেকগুলো গানের ভূমিকায় মহারাজা নন্দকুমারের নাম পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে মাতা হিসাবে ভজনা করা বাঙালী হিন্দুদের মানসিকতার অনুকূল। বাঙালী হিন্দুদের পূজার মধ্যে মাতৃবোধের প্রশ্রয় আছে। যেমন দুর্গা পূজার মধ্যে মাতৃপূজার প্রশ্রয় আছে। রামপ্রসাদের গানগুলো পাঠ করলে মনে হয় তিনি এ সমস্ত গানের মধ্য দিয়ে একটি গভীর সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এ গানগুলো সত্যিই যেন তাঁর তন্ময় মুহূর্তের রচনা। রামপ্রসাদ ভক্ত হিসাবে নিজেকে একজন শিশু বলে অনুভব করেছেন। শিশু যেমন মায়ের কাছে আবদার করে তিনিও তেমনি কালীর কাছে আবদার করেছেন। রামপ্রসাদ তাঁর গানের মধ্যে আবদারের এমন সব বাহুল্য এনেছেন যা সত্যিই একটি শিশুর মানসিকতায় আপ্লুত। আরো যারা রামপ্রসাদের অনুকরণে এ সমস্ত গান রচনা করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। যেমন- নরচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র এবং নরেশচন্দ্র।

রামপ্রসাদের মাতৃভাবের কবিতাগুলো বৈষ্ণব বাৎসল্য রসের কবিতার সঙ্গে বেশ অনেকটা মিলে যায়। তাছাড়া রামপ্রসাদ কালী-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্তনও লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুকরণে তিনি মাতা ভগবতীর গোষ্ঠ, রাস এবং মিলন লীলা বর্ণনা করেছেন। রামপ্রসাদ তার আগমনী গানে বৈষ্ণব আদর্শকে অনুসরণ করেছেন বলা যেতে পারে। রামপ্রসাদ নিজে অনেক গানে বলেছেন যে, বিষ্ণু এবং শক্তির মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই এবং এভাবে কালী এবং কৃষ্ণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কমলাকান্ত তাঁর একটি গানে লিখেছেন

> "জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
> সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।।
> কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ুর পুচ্ছ শোভিত তায়।
> কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়।।
> হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দানবচয়ে করে সভয়।
> (কভু) ব্রজপুরে আসি বাজাইয়া বাঁশী ব্রজবাসী-মন হরিয়া লয়।।
> যেরূপে যেজন করয়ে ভজন সেইরূপে তার মানসে রয়।

www.icsbook.info

কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে ফসলমাঝে কমল উদয় ।।"

রামপ্রসাদের পরে যারা কালী বন্দনায় খ্যাতি অর্জন করে তাদের মধ্যে দেওয়ান নন্দকিশোর রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নন্দকিশোর রায় বর্ধমান রাজার দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান রঘুনাথ রায় আরেকজন কালী বন্দনার কবি। ইনি নন্দকিশোরের ভ্রাতা। দেওয়ান রঘুনাথ শাক্ত ছিলেন না, তিনি কালী বন্দনাও লিখেছেন এবং বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতো বৈষ্ণবীয় পদ রচনা করেছেন। এই ধারার অন্য একজন কবির নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি বর্ধমানের মহারাজা তেজসচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গান রচনা করেছেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কমলাকান্ত পদাবলী নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে কমলাকান্তের ২৫০টি গান ছিল।

সুশীল কুমার দে রামপ্রসাদ এবং তার পরবর্তী কবিদের কালী বন্দনাকে আন্তরিকতাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এ সমস্ত কবিরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাদের গভীর আবেগকে কালী বন্দনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টি রহস্য এবং তাৎপর্যকে তাঁরা ভগবতী কালীর সাধনার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন।

যাত্রা

যাত্রা এক ধরনের নাটকীয় বিনোদন; কিন্তু যাত্রা নাটক নয়। নাটকের নিজস্ব একটি ধারা আছে যা যাত্রার ধারা থেকে ভিন্ন। যাত্রা অতীতেও ছিল এবং এখনো আছে। খোলা জায়গায় জনসাধারণের বিনোদনের জন্য যাত্রার আসর অতীতে বসত; এখনো বসে। নাটকের জন্য যে ধরনের মঞ্চের প্রয়োজন হয়, যাত্রায় সে ধরনের মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। যাত্রার মধ্যে একটি অপরিণত ব্যবস্থাপনা আছে। কিন্তু এই অপরিণত ভাবটিই যাত্রার বিশিষ্টতা। যাত্রায় মঞ্চ সজ্জার কোন বিশিষ্টতা নেই এবং যাত্রায় চরিত্র চিত্রণও নেই। যারা যাত্রায় অভিনয় করেন তারা একটি বিশেষ ধরনের বাকভঙ্গিতে এবং উচ্চারণে যাত্রার কাহিনীটি বর্ণনা করে যান। মূলত যাত্রা হচ্ছে কাহিনী বর্ণনার এক ধরনের কৌশল। নাটকে আমরা চরিত্র নির্মাণ এবং বিকশিত হতে দেখি। কিন্তু যাত্রায় সে কৌশল এবং ব্যবস্থা নেই। যাত্রার কুশলীরা কেউ রাজা সাজেন, কেউ রাণী সাজেন, কেউ মন্ত্রী সাজেন, কেউ সভাসদ সাজেন এবং এ সমস্ত রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে তারা সবাই মিলে একটি কাহিনীর বর্ণনা করে যান। যাত্রার একটি অস্বাভাবিক বিলম্বিত ভঙ্গিতে পাত্র-পাত্রীরা কথা বলেন এবং এই ভঙ্গিটাই যাত্রার জন্য বিশিষ্ট। যাত্রায় কোন চরিত্রের বিশ্লেষণ নেই এবং বিকাশ নেই। যাত্রাওয়ালা কখনো একজন নাট্যকারের কাছে এসে দাঁড়াতে পারেন না, এটা সম্ভবপরও হয়না। যাত্রা ও নাটকে উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন। যাত্রা যাদের সামনে অভিনীত হয় নাটক সাধারণত তাদের সামনে অভিনীত হয় না। যাত্রা কোন একটা বিশিষ্ট স্থানে নিয়মিত যে হয় তা নয়। একই যাত্রা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। কবিওয়ালাদের যেমন কবিগানের বায়না দেয়া হতো এবং বায়না নিয়ে কবিওয়ালারা বিভিন্ন বৈঠকখানায় এসে কবিগান শুনিয়ে যেতেন, যাত্রাওয়ালারাও তেমনি ফরমায়েস পেলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যাত্রার পালা অভিনয় করে আসেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে এবং তার আশেপাশে যাত্রার পালা বসত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা ছাপিয়ে ছিলেন। সেখানে পরমানন্দ

www.icsbook.info

অধিকারী নামক একজন অধিকারীর যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের অবাক লাগে একথা ভেবে যে উনবিংশ শতাব্দীর এই যাত্রা পরিশীলিত হয়ে আধুনিক নাটকে পরিণত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। অন্য একটি ধারা অনুসরণ করে আমাদের ভাষার নাটক বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় প্রথম নাটকের সূত্রপাত হয়। পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অবলম্বন করে আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের সূত্রপাত ঘটান। ইংল্যাণ্ডের ইংরেজী নাটক তাদের মধ্যযুগের ধর্মীয় মরমীবাদী নাট্যভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। আমাদের নাট্য ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছিল, যে কথা একটু আগেই বললাম।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় অনেক শখের যাত্রাদল গড়ে উঠে। এদের মধ্যে গোপাল উড়ে'র যাত্রাদল বিখ্যাত ছিল। যে সমস্ত যাত্রা সেসময় প্রদর্শিত হয়েছিল সেগুলো মূলত হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যানের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল, যেমন "কৃষ্ণলীলা", "কালীয় দমন যাত্রা", "চণ্ডীলীলা", "রামলীলা", "মনসার কথা"। এসময় একটি কাহিনী খুব জনপ্রিয় ছিল। সেটি হচ্ছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। অনেক যাত্রাদল এ কাহিনী অবলম্বন করে তাদের যাত্রা প্রদর্শন করত। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ভক্তি ধারার সময় থেকেই যাত্রা এদেশে চলে আসছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এ যাত্রার প্রদর্শিত বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। যাত্রায় সমসাময়িক ঘটনা স্থান পেতে থাকে। যেমন, কালুয়া-ভুলুয়ার কাহিনী এবং মেথর ও মেথরাণীর কাহিনী। এগুলো মূল যাত্রার মাঝখানে প্রদর্শিত হতো। যে কয়জন যাত্রাওয়ালার যাত্রা কাহিনীর নিদর্শন আমাদের হাতে মুদ্রিত রূপে এসে পৌছেছে তারা হচ্ছেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোপাল উড়ে এবং গোবিন্দ অধিকারী। রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন তার "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে কৃষ্ণ কমল সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কৃষ্ণ কমলের পূর্ব পুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে নদীয়া গিয়ে বসতি করেছিলেন। কৃষ্ণকমলের জন্ম নদীয়ার একটি বৈষ্ণব পরিবারে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর পিতা মুরলীধর গোস্বামী তাঁকে সাত বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে নবদ্বীপে। কৃষ্ণকমলের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র কামিনী কুমার গোস্বামী তাঁর তিনটি যাত্রার পালা প্রকাশ করে। এ পালাগুলোর নাম "স্বপ্ন বিলাস", "রাই উন্মাদিনী" এবং "সুবল সংবাদ"। গোবিন্দ অধিকারী আরেকজন যাত্রাপালা রচয়িতা। তিনি গোবিন্দ বৈরাগী বলেও পরিচিত। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি প্রথমে একজন কীর্তনিয়া হয়েছিলেন এবং একটি কীর্তনিয়ার দলও গঠন করেছিলেন। পরে তিনি কীর্তনের দলকে যাত্রার দলে পরিণত করেন। তাঁর একটি যাত্রার পালার নাম "কালীয় দমন।" তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। গোপাল দাস অন্য একজন যাত্রাওয়ালা। গোপাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না শুধু এইটুকু সংবাদ পাওয়া যায় যে শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

যাত্রা ক্রমশ মূল্য হারাতে থাকে এবং কলকাতা শহরে নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পর ভদ্র সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে যাত্রা বঞ্চিত হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর রত্নাবলী নাটকের ভূমিকায় তার কালের যাত্রার সমালোচনা করেছেন এবং যাত্রার পরিবর্তে সংস্কৃত ও ইংরেজী ধাঁচে রচিত নাটকই যে গ্রহণযোগ্য সে কথা বলেছেন।

www.icsbook.info

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণ,
রামমোহন রায়, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ,
কালীপ্রসন্ন সিংহ, খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী,
গোলাম হোসেন এবং আজিমউদ্দীন

মুহম্মদ আবদুল হাই
সংযোজন ও পুনর্লিখন : সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

মানুষ গদ্যে কথাবার্তা বলে, এটাই তার স্বাভাবিক বাকরীতি। কিন্তু সাহিত্যকর্মে লক্ষ্য করা যায় যে গদ্যের ব্যবহার হয়েছে অনেক পরে, কিন্তু প্রথমে সাহিত্য-কর্মের একমাত্র ভাষা ছিল কবিতা। মানুষ নিশ্চয়ই কবিতায় কথা বলত না কিন্তু গদ্যের রীতি প্রকরণ না জেনেই গদ্যে কথা বলত। অন্য ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা ঘটেছে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে গদ্যের আরম্ভটি অন্য ভাষার তুলনায় অনেক পরের। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আমাদের দেশে কবিতাই ছিল সাহিত্যের ভাষা, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে গদ্যে সাহিত্য রচনা হয়নি। গদ্যে কিছু কিছু লেখা যে হয়নি তা নয়, তবে সেগুলো সাহিত্য পদবাচ্য নয়। বহু প্রাচীনকালে শূন্যপুরাণ গ্রন্থে গদ্যের কিছু অস্পষ্ট উদাহরণ মেলে কিন্তু সেগুলি গ্রহণযোগ্য গদ্য নয়, মূলত অষ্টাদশ শতকের শেষেই গদ্যের প্রচলন যে হতে থাকে এটা অনেকটা স্বীকৃত। তখন থেকে যে গদ্যের প্রচলন আমরা দেখি তা ছিল দলিল-দস্তাবেজে এবং চিঠিপত্রে। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে পর্তুগীজ পাদ্রীরা মধ্য পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এক ধরনের বাংলা গদ্য ব্যবহার করতে থাকেন। তাদের প্রয়াসে বাংলা গদ্য রচনার পথ কিছুটা সুগম হয়। পর্তুগীজ পাদ্রীদের রচিত বাংলা গদ্যের ধারাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। এ ধারার প্রথম গ্রন্থ দম আন্তওনির রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২০। এই বইটিতে ধর্মান্তরিত দম আন্তনিয় হিন্দুধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। এ গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের দিকে লিখিত হয়েছিল। পর্তুগীজ পাদ্রীদের রচিত অন্য একটি গ্রন্থের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৯১। পর্তুগীজ পাদ্রী মনোএল দ্য আস্-সুমসাম ঢাকার ভাওয়ালে অবস্থানকালে ১৭৪৩ খ্রীঃ ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন। উক্ত বছরেই এই গ্রন্থটি লিসবনে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়।

মনোএল-এর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি পর্তুগালের এভোরা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অগাস্তিয় যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে এক স্থানে গ্রন্থের রচনাস্থল নাগরী, ভাওয়াল বলে উল্লেখিত আছে। গ্রন্থটি পর্তুগীজ এবং বাংলা উভয় ভাষায় রচিত কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটি রোমান হরফে লিপিবদ্ধ। গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য বিষয়াদি গুরুশিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের সারবত্তা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলির মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে ক্রুশ চিহ্নের ব্যাখ্যা। বইতে এ কথাটি 'সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ' বলে লিখিত আছে। অন্য একটি বিষয় হচ্ছে মহান পিতা সম্পর্কে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে। এটার নাম মনোএলের

www.icsbook.info

ভাষায় 'পিতার পড়ন এবং তাহান অর্থ'। আরেকটি অধ্যায় হচ্ছে বিশ্বাসের রহস্য। এটার নামকরণ মনোএলের ভাষায় হচ্ছে, 'আ৷ধাড় ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার, শিখাইবার উপায় তরিবার।'

মনোএলের রচনা থেকে একটি অংশ নিচে উদ্ধৃত হচ্ছে :

"গুরু বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলা; এমত হয়। আর কহ; সিদ্ধি ক্রুশ করিলে ভূতের কুমতি নি দূর যায়?

শিষ্য। হোয়; ভূতের কুমতি দূর যায় এবং ভূতেও পলায় এহি শোনার প্রমাণ শোনো। এক রাহোয়াল (রাখাল) মেড়ির আছিল। তাহারে ভূতে বাজি দিয়া কহিল, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস্, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাখোয়ালে কহিলো : ভালো, তোমার দাস হইব, তোমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল : তবে আমার গোলাম হইলে তোর উচিত নহে ধর্ম্মঘরে যাইতে, এবং সিদ্ধিক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না, এমত যে করে সে আমার গোলাম, এহি আমার আজ্ঞা, তাহা পালন করিবি; এমত যদি না করিস্ তোমারে বহুত বহুত তাড়না দিবাম। রাখোয়ালে কহিল: যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব। যদি এমত না করি, তোমার যা ইচ্ছা সেই হইবেক।

অনেক দিন অভাগ্য রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিলো। তাহার পর একদিন মুনিষি অ (মনুষ্য) বশ করিয়া ধর্ম্মঘরে লইয়া গেল। ধর্ম্মঘরে এক পাদ্রী আছিলেন সেই বড় সাধু। তিনি লোক সকলেরে কহিলেন, তোমরা রাখোয়ালের উপরে সিদ্ধি ক্রুশ করো। এমত লোক সকলে করিল। তখন ভূতের বগ· কোর্দ (ক্রোধ) করিয়া রাখোয়ালেরা অনেক তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাদ্রী রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতের তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূতে আরো বেশ কোর্দ (ক্রোধ) করিয়া পাদ্রীরে কহিলো, এহি মুনষিও (মনুষ্য) আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত। তাহারে এড়িয়া দিও না, তোমারেও শাস্তি দিবাম। পাদ্রী কহিলেন তাহারে এড়িয়া দিব না, আমারে যাহা করিতে পারিস তাহা করো। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্র করিল যে পাদ্রীর মুখ বেকা (বাঁকা) হইল। এহা দেখিয়া লোক সকলে ঘরে পলাইয়া গেল।

তখন পাদ্রী সিদ্ধি ক্রুশ করিলেন, এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে, এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পলাইয়া গেলো। রাখোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কনফেসার করিল; নির্মল ধর্ম ভক্তিরূপে লইল এবং পুনর্বার পাইল যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।"

মনোএল বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণও লিখেছিলেন। এই ব্যাকরণটি পর্তুগালের লিস্‌বন শহর থেকে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ বইটি অবশ্য বাংলা ব্যাকরণের সম্পূর্ণ রূপরেখা নয়। এর মধ্যে প্রধানত বাংলা থেকে পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত কিছু শব্দ আবার পর্তুগীজ থেকে বাংলায় অনূদিত কিছু সংখ্যক শব্দের সংকলন রয়েছে। কিছু সংখ্যক অর্থ কিন্তু খুব কম নয়। গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭৭। এতেই বুঝা যায় এ গ্রন্থটি মূলত একটি অভিধান ছিল। প্রথম ৪০ পৃষ্ঠায় ব্যাকরণের কিছু রীতিনীতি বুঝানো হয়েছে।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের প্রশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে ফেলেছে। এই কারণে এ সময় শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা ইংরেজদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রায় এই সময় নাথানিয়েল

www.icsbook.info

হ্যালহেড নামক একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান বাংলাদেশে আসেন। তিনি এখানে এসেই বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলা ভাষার দক্ষতা অর্জন করেন। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংরেজীতে 'Grammar of the Bengali Language' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এটাই বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ ছিল। বলা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বাংলা ব্যাকরণকে জানবার প্রথম প্রচেষ্টা হ্যালহেড ব্যাকরণে ধরা পড়ে। ব্যাকরণটি আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং এই আটটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়েই নামবাচক শব্দ, ক্রিয়াবাচক শব্দ, বিশেষণ, সংখ্যা, বাক্য গঠন প্রণালী এবং ছন্দ বিশ্লেষণ বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। হ্যালহেডের বইটি হুগলী শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়। হ্যালহেড কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ', কাশীদাসী 'মহাভারত' এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে চিরকাল বিবেচিত হবে। হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণে বাংলা শিক্ষার জন্য সংস্কৃতের গুরুত্ব যে অসীম তা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি তার ভূমিকায় বলেছেন যে বাংলা চলিত বুলির মধ্যে অথবা যাকে বলা যায় আঞ্চলিক ভাষা যেগুলির মধ্যে অনেক ব্যাকরণগত অসংগতি আছে সে জন্য আঞ্চলিক ভাষার গতি প্রকৃতির সাহায্যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা সম্ভবপর নয়। তিনি আরো লিখেছেন যে এতদঅঞ্চলের মুসলমানগণ তাদের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে, পারিবারিক অঙ্গনের ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে আরবী ফার্সী ব্যবহার করেছিলেন। তবে হ্যালহেড এ সমস্ত শব্দ ব্যবহারে পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বাংলা ব্যকরণকে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতার সাহায্যে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। হ্যালহেডের মৃত্যু হয় লণ্ডনে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে।

হেনরী পিট্স ফরস্টারের জন্ম হয়েছিল ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে এবং তিনি ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর চাকরিতে যোগদান করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি টিকারার কালেক্টর পদে উন্নীত হন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি চব্বিশ পরগণার দেওয়ানী আদালতের নিবন্ধক নিযুক্ত হন। ১৮০৩-৪ সালে তিনি কোলকাতার টাকশালে বদলি হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রধান নিযুক্ত হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ফরস্টারের প্রধান কীর্তি বাংলা-ইংরেজী শব্দকোষ। এটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৯-১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থের নাম ছিল "Vocabulary"। তিনি আরও একটি বই লিখেছিলেন তার নাম 'Essay on the Principles of Sanscrit Grammar'। এটি প্রকাশিত হয় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে। একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে পরবর্তীতে উইলিয়াম কেরী যখন বাংলা অভিযান রচনা করেন তখন তিনি ফরস্টারের গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এ. আপজন (A Upjohn) তাঁর 'ইংরাজী ও বাংগালি ভোকাবুলারি' প্রকাশ করেন। ফরস্টারের অভিধানটি দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। প্রধানত হ্যালহেড এবং ফরস্টারের চেষ্টায় এবং পরবর্তীতে কেরীর সমর্থনে এবং বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুদের সমর্থনে বাংলা ভাষা বেঙ্গল প্রেসিডিন্সির সরকারী ভাষায় পরিণত হয়। যে বছর ফরস্টারের অভিধান প্রকাশিত হয় সেই একই বছরে একদল ইংরেজ যাজক বা খ্রীস্টান মিশনারী জাহাজ থেকে গঙ্গা তীরে অবতরণ করেন এবং শ্রীরামপুরে একটি মিশন স্থাপন করেন। তারও এক বছর পর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্দেশ্য ছিল তরুণ ইংরেজ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত করানো। এভাবেই ক্রমশ ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক পরিচর্যা চলতে থাকে। মিশনারীগণও ছিলেন, তাছাড়াও ছিলেন দুজন ইংরেজ কর্মকর্তা। তাদের নাম হল জে, এফ, এলারটন এবং স্যার গ্রেভিস হটন। শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যাদের নাম যুক্ত ছিল তাদের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড একক প্রচেষ্টায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে যেভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন তারই পরিণত রূপ দেখতে পাই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠায়। কোম্পানীর কর্মচারীরা সেদিন দেখেছিলেন যে, এদেশকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে হলে এ দেশের কিছুটা ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য। সে কারণে ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীদেরকে বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। শ্রীরামপুর মিশনের কর্মযোগী পুরুষ উইলিয়াম কেরীকে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কেরীর অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামনাথ বাচস্পতি নামে দুজন পণ্ডিত এবং শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়,কাশীনাথ (তর্কালঙ্কার?), পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু নামক ছজন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বাংলা বিভাগের ভার হাতে নিয়েই কেরী বাংলা পাঠ্য পুস্তকের তীব্র অভাব বোধ করেন। এ অভাব দূর করবার জন্যে তিনি নিজেও যেমন পাঠ্য পুস্তক লেখেন, তাঁর অধীন পণ্ডিতদেরও পাঠ্যপুস্তক লিখতে তেমনি উৎসাহিত করেন। এ সূত্রে কেরীর নামে দুটি পুস্তক প্রচলিত দেখি। একটি 'কথোপকথন'-১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় এবং অন্যটি 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়। কথোপকথনের ইংরেজী নাম দেওয়া হয়েছিল 'Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali language'। বইটির নাম থেকে বোঝা যায় ইংরেজদের বাংলা শিক্ষার উপযোগী করে মৌখিক ভাষায় এটি রচিত হয়েছিল। আর 'ইতিহাসমালা'য় বাংলাদেশে প্রচলিত কতকগুলো গল্প স্থান পেয়েছে। এ গল্পগুলোর কয়েকজন নায়ক-যেমন প্রতাপাদিত্য, রূপ ও সনাতন এবং আকবর ও বীরবল প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অনেকে মনে করেন 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' কেরীর নিজস্ব রচনা নয়, তাঁর নামে প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচনা। একালে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে জানা যায় বাংলায় কেরীর রীতিমতো দখল ছিল এবং এই বইগুলো তাঁর নিজস্ব রচনাই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে রচনাভঙ্গীর দিক দিয়ে উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। লেখক হিসেবে উইলিয়াম কেরীর কৃতিত্ব যত না, তারও চেয়ে বেশি বাংলা গদ্য সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সৈনাপত্য গ্রহণে। পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়েই বাংলা ভাষার অপূর্ব প্রাণশক্তির এবং সম্ভাবনার ইঙ্গিত তিনিই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এবং তিনি

www.icsbook.info

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করেছিলেন। তবে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে উনবিংশ শতাব্দীতে আরবী-ফারসী শব্দ বর্জন করে যেভাবে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে সংস্কৃতানুসারী হয়ে ওঠে উইলিয়াম কেরীই তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কেরী যে সব পণ্ডিতের সাহায্যে ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক লিখিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন রামরাম বসু। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে রামরাম বসুর মৃত্যু হয়। তাঁর দুখানি বই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, তার একটি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং অন্যটি 'লিপিমালা' (১৮০২)। রামরাম বসু ভালো ফারসী জানতেন। ফারসীতে যশোররাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল তার সাহায্য নিয়েই তিনি 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন। ফারসী থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও বাংলা গদ্যে মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস এ বইটি। রামরাম বসুর রচনারীতি সাধুভাষা ঘেঁষা হলেও সংস্কৃতানুসারী ছিল না। তিনি প্রয়োজনবোধে প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে গোলকনাথ শর্মার অনুবাদ গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০২), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫) এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫)-এর নাম করা যেতে পারে। 'তোতা ইতিহাস' ফারসী 'তুতিনামার' এবং 'পুরুষ পরীক্ষা' মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষার' অনুবাদ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই ছিলেন অধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর জন্মস্থান ছিল মেদিনীপুর। সেকালে মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার প্রত্যন্ত জেলা হিসেবে ধরা হতো বলে মৃত্যুঞ্জয়কে অনেকেই উড়িয়া মনে করেন। মৃত্যুঞ্জয় লেখাপড়া করেন- বিশেষ করে সংস্কৃত শেখেন নাটোরে। কেরীর অধীনে মৃত্যুঞ্জয়ই ছিলেন বাংলার প্রধান পণ্ডিত। ১৮০১ থেকে ১৮১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলেজের চাকুরিতে বহাল ছিলেন। এর পরে তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার ফ্রান্সিস ম্যাকনটনের অধীনে জজ-পণ্ডিতের কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সনের ১৯শে জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা কালেই তিনি পাঁচটি বাংলা বই লেখেন, বইগুলো যথাক্রমে, ১. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০, ২. হিতোপদেশ (১৮০৮), পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৩, ৩. রাজাবলী (১৮০৩), পৃষ্ঠা ৮৯৫, ৪. বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮১৭), পৃষ্ঠা ২১৩-রও বেশী, ৫. প্রবোধ চন্দ্রিকা (রচনা ১৮১৩, প্রকাশ ১৮৩৩), পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৩০০।

বত্রিশ সিংহাসন এবং বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প বহুকাল থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত। সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে রচিত একাধিক বত্রিশ সিংহাসন এখনও দেখা যায়। মহাকবি কালিদাসের নামে একটি বত্রিশ সিংহাসন প্রচলিত আছে। মৃত্যুঞ্জয় এগুলোরই কোনোও একটিকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে বত্রিশ সিংহাসন অনুবাদ করে থাকবেন। 'বত্রিশ সিংহাসনে' তিনি সংস্কৃতানুসারী এবং চলিত ঘেঁষা দুই রীতিই প্রয়োগ করেছেন;

www.icsbook.info

এখানে তাঁর সতেজ প্রকাশভঙ্গী এবং সরল শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করবার মতো। 'হিতোপদেশ'-এর ভাষা খুব সংস্কৃতঘেঁষা। 'রাজাবলী'-তে চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্র বীর্য থেকে বাংলাদেশে কোম্পানী শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস আছে। মুসলমান শাসনের বৃত্তান্ত কোনো ফারসী বই থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলে অনুমিত হয়, সে কারণে এ অংশে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার কিছু বেশি। সে যা হোক 'রাজাবলীর' ভাষা প্রাঞ্জল এবং সেগুণেই এটিও মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু বিভিন্ন কলেজের পাঠ্য থাকার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছিল। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। রাজা রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'-এর জবাবে মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রচনা করেছিলেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দুরূহ বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে যথারীতি শাস্ত্রীয় বিচারও যে বাংলা ভাষায় করা যায়, রাজা রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের এ বইগুলো থেকে সেকালের বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা তার একটা পরিচয় পেয়েছিল।

বাংলা গদ্যের সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি, তদ্ভব শব্দপ্রধান সহজ সরলরীতি এবং তৎসম তদ্ভব শব্দের মিলনজনিত রীতি, এ তিন রীতির যে চল বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রচিত সাহিত্যে এ তিন রীতিরই প্রয়োগ পরীক্ষা করেছিলেন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভঙ্গীর নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরই হাতে বাংলা গদ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং রচনা পদ্ধতিতে মোটামুটি একটু সুষমরূপ পেয়েছিল। তিনি বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী না হলেও প্রথম সক্ষম শিল্পী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে বাংলা গদ্যের প্রয়োগ করলেও, দুরূহ জটিল বিষয়ের আলোচনাও তাঁরাই করেছিলেন। বহু কিছুর চর্চায় এবং কর্ষণে তাঁদেরই হাতে বাংলা গদ্যের পথ যেমন অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিল, তেমনি ভাষার বিকাশপথে বাংলা সাহিত্যের পথও যে সুগম হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭৪-১৮৩৩)

বাংলা গদ্যের বিকাশের পথে রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব কম নয়। তিনিই উনিবংশ শতাব্দীর শুরুতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রচলন করেন। ইংরেজ-বিজয়ের ফলে সেকালের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়। পলাশীর রণক্ষেত্রে সামরিক জয়লাভ করার পর এ দেশে স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করার জন্যে ইংরেজরা মিশনারিদের সহায়তায় এ দেশের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে তাদের সামাজিক ভেদবুদ্ধি-জনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। পরকালের মুক্তির জন্য না হলেও ইহকালের আর্থিক ও রাজনৈতিক মোহকর প্রলোভনে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই অনেক হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এ সময়ে এদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইংরেজদের এ প্রলুব্ধকর আবেদন নানা কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। বাঙালী তথা ভারতীয় হিন্দুর জীবনে এ ধর্মান্তরিতকরণ রীতিমতো

www.icsbook.info

একটা সংকটের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু ধর্মে, সংস্কৃতিতে এবং জাতীয় জীবনধারায় নানাপ্রকার সংস্কার সাধনের জন্য সেদিন রামমোহন যে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় হিন্দু সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার জন্য লাভবান হয়েছে। রাজা রামমোহনের সময় বাংলাদেশে হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম ও কৃষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। জাতিভেদ-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থার চাপ থেকে আপাত মোহনীয় খ্রীষ্টধর্মের আকর্ষণে সাধারণ হিন্দু যে মুগ্ধ হবে তা স্বাভাবিক। জাতীয় জীবনের এ পীড়া যথাযথ উপলব্ধি করেই হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সার সংকলন করে রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সতীদাহ প্রভৃতি নানা কুসংস্কার থেকে হিন্দু সমাজকে বাঁচানোর প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর প্রতি কর্মেই মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ছাপ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সংস্কারক রাজা রামমোহনকে রক্ষণশীল ভারতীয় হিন্দু সমাজ সহ্য করতে পারুক বা না পারুক উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি যে চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন তার কল্যাণময় ফল আজও সমাজদেহে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এ চিন্তাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্যেই রামমোহনকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বাংলা পুস্তক 'বেদান্ত গ্রন্থ', তার পর 'বেদান্ত সার'। অনুবাদাত্মক এ দুটো গ্রন্থই ১৮১৫ সনে মুদ্রিত হয়। রামমোহনের এ গ্রন্থ দুটো প্রকাশিত হলে রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁর উপর খড়গহস্ত হয়। রামমোহনের প্রবর্তিত বেদান্ত চর্চা ও ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রণয়ন করেন। রামমোহন এর জবাব দেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামক পুস্তিকায়। এর পর তিনি ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার অযৌক্তিকতা ও অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করে দুখানা বই লেখেন- 'প্রবর্তক ও নিবর্তের সম্বাদ' এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার।' এই বইগুলোর জন্য রামমোহনকে কটাক্ষ করে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাশ 'পাষণ্ড পীড়ন' রচনা করেন। রামমোহন এর সমুচিত উত্তর দেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩) রচনা করে। রামমোহন ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে 'মীরাতুল আখবার' নামে ফারসী ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া রামমোহন বাংলায় একটি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ও রচনা করেছিলেন।

রামমোহনের বাংলা গদ্যে কিছু কিছু প্রাচীনত্বের এবং পণ্ডিতী রীতির ছাপ আছে সন্দেহ নেই; এবং বাংলা গদ্যের প্রবহমানতার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক ছন্দ আছে তার আবিষ্কারে রামমোহন প্রচুর দাঁড়ি কমা প্রভৃতি ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার করেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন নি তাও সত্য, তবু তাঁর সমগ্র বিদ্রোহী জীবনের একটি গভীর বাণী তাঁর সকল যুক্তিতর্ক এবং শাস্ত্র বিচারের পশ্চাতে গ্রন্থগুলোর পটভূমিকা হিসাবে তাঁর রচনাকে একটি অভাবনীয় মহিমা দান করেছে। রামমোহনের গদ্য-রচনাভঙ্গীর ভিতরে আত্মশক্তিতে এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ প্রশান্ত গভীর একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। রামমোহনে এসেই আমরা দেখতে পাই বাংলা গদ্য একটা বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ধারণক্ষম-বাহন হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ গ্রন্থ এবং প্রচার পুস্তিকা মিলে রামমোহন রচিত বাংলা ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ। একমাত্র 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থগুলি ধর্মব্যাখ্যা, তর্ক-বিতর্ক, উপদেশ এবং ধর্ম উপাসনা বিষয়ক। যেহেতু ধর্মবিষয়ক তর্কে তাঁকে অবতীর্ণ হতে

www.icsbook.info

হয়েছিলো সে-কারণে সাধারণ লোকের যাতে বোধগম্য হয় সে ধরনের গদ্য রচনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শাস্ত্রবিচার করতে গিয়ে তাঁকে নানাবিধ যুক্তির সাহায্য নিতে হয়েছিলো সেকারণে তাঁর গদ্য আবেগ-রহিত কিন্তু যুক্তিসমৃদ্ধ। যুক্তির সাহায্যে ভাষায় বাক্যগত একটি সমীকরণ সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিলো। তাঁর গদ্যে মননশীলতা এসেছে-অর্থের সুস্পষ্টতার প্রয়োজনে বিবেচনা এবং বিচার এসেছে এবং ভাষা ঋজু এবং বলিষ্ঠ হয়েছে। তিনি তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে বাক্যরীতি অধ্যায়ে গদ্যের অন্বয় সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে ভাষায় বিবিধ রীতি-প্রয়োগ বিষয়ে তিনি সর্বতোভাবে অবহিত ছিলেন।

রামমোহন আরবী-ফার্সী এবং ইংরেজীতেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' (১৮০৩-৪) ফার্সীতে রচিত কিন্তু এর ভূমিকাটি আরবীতে। অন্য একটি গ্রন্থের উল্লেখ 'তুহ্‌ফাৎ'-এর শেষে করেছেন "মনাজিরবৎ-উলআদিয়ান' বা নানা ধর্মের বিচার নামে। এ গ্রন্থের কোনও সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ গারসিঁ দ্য তেসি (Garcin de Tassy)-র Appendicaux Rudimens de la Langue Hindustani (Paris 1833) গ্রন্থের পরিশেষে তাঁর কাছে লেখা রামমোহনের পত্রের উদ্ধৃতি আছে।

রামমোহন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে যান এবং প্রচুর সম্মান লাভ করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শেষের দিকে প্যারিসে যান এবং ফ্রান্সের রাজা লুই-ফিলিপ কর্তৃক সম্মানের সঙ্গে রাজদরবারে অভ্যর্থিত হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামক বাংলাভাষার একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটাকেই বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল প্রথম ব্যাকরণ বলা যেতে পারে। রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি প্রচলন নিয়ে আলোচনা না করে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি প্রকরণ নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ভাষা কি রকম হওয়া উচিত সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে ভাষাকে যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন তার একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা এই ব্যাকরণে আছে। তিনি গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির হাতে সমর্পণ করেন এবং বুক সোসাইটি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ব্যাকরণটিতে কয়েকটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায় বাংলা অক্ষরের প্রয়োগ বিধি এবং প্রকরণ নিয়ে আলোচনা আছে। এর মধ্যে উচ্চারণ শুদ্ধি এবং লিপি শুদ্ধি প্রকরণ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ্য, বিশেষণ, নামরূপ বচন, লিঙ্গ এগুলি নিয়ে আলোচনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস আছে, বিশেষণ আছে। এভাবে করে মোট দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। সর্বশেষ পরিচ্ছেদে ছন্দ নিয়ে আলোচনা আছে। প্রথমত রাজা রামমোহন রায় ইউরোপীয়গণকে বাংলাভাষা শিক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষায় বাংলার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তা মুদ্রিত হয়। তার বাংলা ব্যাকরণটি ইংরেজী ব্যাকরণের আদর্শেই রচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে রামকমল সেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামকমলের সময় ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৮৪৪। তিনি ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির দপ্তরে কেরানীগিরি আরম্ভ করেন। এবং ক্রমশ উন্নতি লাভ করে এর সচিব পদে উন্নীত হন। তিনি কলকাতা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা এবং

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন। এবং ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটির জন্য "হিতোপদেশ" নামে একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকলেও ধর্ম বিশ্বাসে এবং আচরণে হিন্দু সনাতনপন্থী ছিলেন। তিনি ডিরোজিও পন্থীদের বিরোধী ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। এবং তাঁরই চেষ্টায় হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে অপসারণ করা হয়। রামকমলের সমসাময়িক ছিলেন রাধাকান্তদেব। তার সময় ছিল ১৭৮৪ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত। তিনি জানুয়ারী ১৮১৭ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এই কলেজের পরিচালনা কমিটির ডিরেক্টর হয়েছিলেন। সেকালে হিন্দু কলেজে ইয়ং বেঙ্গল নামে যে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদেরকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এতে সফলকাম হয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু চেরিটেবল ইন্সটিটিউশন কলকাতায় গঠিত হয়। তিনি এ কাজে ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা পেয়েছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন রাধাকান্ত তার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাধাকান্ত স্কুল বুক সোসাইটিরও একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। রাধাকান্ত সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি কয়েকটি খণ্ডে "শব্দ কল্পদ্রুম" নামে একটি বিরাট অভিধান সংকলন করেন। এ অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে এবং শেষ ও সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে। রাধাকান্ত কোন সাহিত্যকর্ম করেননি, তবে স্কুলের ছাত্রদের জন্য কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অনুরোধে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে "নীতিকথা" নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ৩১টি গল্প সংকলিত হয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। রাধাকান্তের অন্য একটি গ্রন্থের নাম "বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ"। এটি ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালা এবং ব্যাকরণের কিছু পরিচয় আছে, কিছুটা ইতিহাস আছে, ভূগোল এবং গণিতও আছে। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। রামমোহনের সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সময় ১৭৮৭ থেকে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ধর্ম বিচারের দিক থেকে এবং তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ও ফার্সীও পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকরি করেছেন এবং সেকালে কলকাতার ট্যাক্স অফিসে দেওয়ান হয়েছিলেন। তিনি ইংলিশ ম্যান নামে একটি ইংরেজী পত্রিকার ম্যানেজারও ছিলেন। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কলুটোলার তাঁরাচাদ দত্তের সহযোগিতায় ভবানীচরণ "সংবাদ কৌমূদী" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার প্রথম ১৩টি সংখ্যা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। পরে মতবিরোধের কারণে এ পত্রিকার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দু সমাজের জন্য তার সমাচার চন্দ্রিকার প্রেস থেকে ভাগবতগীতা, মনুসংহিতা প্রকাশ করেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের বিবরণ সম্বলিত

www.icsbook.info

দুটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থ দুটির নাম "শ্রী শ্রী গয়াতীর্থ বিস্তার" (১৮৩১) এবং "পুরুষত্তোম চন্দ্রিকা" অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্র ধামের বিবরণ (১৮৪৪)। তিনি "আশ্চর্য উপাখ্যান" (১৮৩৫) নামে একটি কাব্য গ্রন্থে নড়াইলের এক জমিদারের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেন। ভবানীচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে "কলিকাতা কমলালয়" নামক গ্রন্থটি। এটি প্রকাশিত হয় ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কলকাতা শহরের নগর জীবনের মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। কলকাতা শহরের গ্রামাঞ্চল থেকে যে সমস্ত মানুষ প্রথমবারের মতো আসে তাদেরকে নগরের আচার ব্যাবহার এবং বাগবিধি শেখাবার জন্য এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা কৌতুকাবহ ঃ

"পল্লি গ্রামনিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক কৌশলাদি অবগত হইয়া আশু অসমর্থ হয়েন। তৎপ্রযুক্ত শব্দাযুক্ত হইয়া এতন্নগর বাসি লোকের দিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্য ন্যায় বসিয়া থাকেন। কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রামবাসী ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়েরা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন, তুমি পল্লিগ্রামনিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ, অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ, এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথার প্রয়োজন নাঞি। এ উত্তরের নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন। অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্ চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অধিকন্তু কলিকাতা কমলালয় হইতে বৃত্তান্তরূপ অনেক রত্নলাভ হইতে পারিবেন। ইহাতে এক সন্দেহ আছে যে দোষদর্শী মূর্খরূপ কুম্ভীর নিন্দকরূপী সর্প ইহারা এ কমলালয় হইতে রত্নলাভের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাব দ্বারা অনেক। যত্ন পাইবেক, অর্থাৎ এতদ্গ্রন্থ গ্রহণে বা পাঠে অনেক বাধা জন্মাইবেক, তাহাতে বুঝি বিজ্ঞেরা এতদ্গ্রন্থ গ্রহণ না করেন। কিন্তু এই স্থির করিয়াছি যে বিজ্ঞেরদিগের বিজ্ঞতারূপ ঔষধি দ্বারা তাহারা ভর্ৎসিত ও তাড়িত হইয়া অবশ্যই নিবারিত হইবেক। অতএব কলিকাতা কমলালয় সমাদৃত হইয়া সতেরদিগের সর্ব্বদা বৃত্তান্ত ও কাক্ কৌশলাদি রূপ রত্ন প্রদান করিবেন।"

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবু বিলাস' এবং 'নববিধি বিলাস' নামক দুটি ব্যাঙ্গাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম গ্রন্থটিতে তৎকালীন কলকাতা শহরে আধুনিক যে যুবক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তাদের আচরণ, কর্মকাণ্ড উমেদারী এবং মোসাহেবির বিবরণ আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে জনৈক নব্য ধনী কেশবচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত আমরা পাই। কেশবচন্দ্র ছিল তোতারাম দত্তের অশিক্ষিত সন্তান। এই গ্রন্থটিকে বলা যেতে পারে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একটি বিদ্রূপ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না।" পরবর্তীকালে টেকচাঁদ এবং হুতম যে ধরনের ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তারই সূত্রপাত আমরা ভবানীচন্দ্রের রচনায় দেখি। তাঁর অপর গ্রন্থ 'নববিবি বিলাস' পূর্বের গ্রন্থের মতো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

www.icsbook.info

এ গ্রন্থটি বিশেষ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। একজন ভদ্রগৃহের স্ত্রী যদি কুলটা হয় তার যে দুর্গতি হতে পারে সে অবস্থাটির বর্ণনা এ গ্রন্থে করা হয়েছে। ভবানীচরণের সর্বশেষ গ্রন্থের নাম "দূতী বিলাস"। এটি একটি কাব্য গ্রন্থ। এখানে কবিতা বলতে কিছুই নেই তবে অশ্লীলতা যথেষ্ট আছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের (১৭৯৯-১৮৫৮) জন্ম হয়েছিল সিলেটের পাঁচ গাঁও গ্রামে। তিনি ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আসেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সংবাদ ভাস্কর' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। গৌরীশঙ্কর "সংবাদ রসরাজ" নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। গৌরীশঙ্করের মূল সাহিত্যকর্ম ছিল 'ভাগবতগীতা' এবং 'মার্কণ্ডেও চণ্ডি'র বাংলা অনুবাদ। প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ এবং দ্বিতীয়টা ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি "ভূগোল সার" নামক একটি ছাত্রপাঠ্য ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। "পাক রাজেশ্বর" নামক রন্ধন বিষয়ে একটি গ্রন্থ ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেন। এটাই সম্ভবত বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রন্ধন বিষয়ক গ্রন্থ। 'জ্ঞানপ্রদীপ' বলে দুখণ্ডে বালকদিগের শিক্ষার্থে বিবিধ নীতিবিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সম্বলিত একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো বাসগৃহে তত্ত্ব রঞ্জনি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'তত্ত্ব-বোধিনী' সভা রাখা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমূদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার।' ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভাকে রামমোহনের ব্রাহ্ম সভার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং নামকরণ করেন ব্রাহ্ম সমাজ। 'তত্ত্ববোধিনী' সভার কার্যক্রম তিনটি উপায়ে পরিচালিত হতে থাকে। এর একটি হচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন; দ্বিতীয়টি হচ্ছে তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি সংকলন এবং প্রচার। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান এবং মিশনারীদের প্রভাব থেকে হিন্দু বালকদিগকে রক্ষা করা। তবে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এই পাঠশালা উঠে যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার করা। মূলত বৈদিক চিন্তাধারার প্রচার সাধনই এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। যারা এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা মনে করতেন যে, বেদই হচ্ছে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎস। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে, "বেদ-বেদান্ত ও পরম ব্রহ্ম উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এ পত্রিকা হওয়াতেই সুসিদ্ধ হল।" এতে দেখা যায় যে, ধর্মীয় প্রচার ছিল এ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বলে এই উদ্দেশ্যের মধ্যে পত্রিকা নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা থাকত, যেমন, সাহিত্য, দর্শন, প্রাচ্যবিদ্যা প্রত্নতত্ত্ব, সামাজিক এবং কখনও কখনও রাজনৈতিক সংস্কার। এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যে সমস্ত লেখা আসত সেগুলো পরীক্ষা করার জন্য একটি

www.icsbook.info

উপসংঘ ছিল। উক্ত উপসংঘে তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন যেমন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রাজনারায়ণ বসু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদিক সাহিত্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, বঙ্গভূমিতে বেদের বিশেষ কোন চর্চা নেই। সুতরাং তিনি চারজন ব্রাহ্মণকে বারাণসিতে বেদ অধ্যায়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে বারাণসিতে বেদ চর্চার অবস্থা জানবার জন্য গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সময়ের প্রধান প্রধান জনকল্যাণ বিষয়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন- হেয়ার মেমোরিয়ার কমিটি, বেথুন সোসাইটি, হেয়ার প্রাইজফাণ্ড। তিনি "সমাজ উন্নতি বিধায়িনী 'সুহৃদ সমিতির' সভাপতি ছিলেন। এই সুহৃদ সমিতির মূল দায়িত্ব ছিল হিন্দু সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন নামক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে "ইন্ডিয়ান মিরর" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্ম সমাজকে কেশবচন্দ্রসেনের সহযোগিতায় তিনি অনেক উন্নত করেন। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞান ও অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মহর্ষি উপাধি প্রদান করেন। এই ব্রাহ্ম সমাজ পরে অবশ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়- একটির নাম হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ, অন্যটির নাম হয় আদি ব্রাহ্ম সমাজ। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে সাধনার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে এই আশ্রমকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনা রূপ লাভ করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজ বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। একটি গ্রন্থের নাম "ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রন্থ"। এটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে আর দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে। অন্য একটি গ্রন্থের নাম "ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান।" এটিও দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ এবং ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে বেদের বাণী হচ্ছে ঐশ্বরিক। অর্থাৎ বেদ মনুষ্য রচিত নয়। মাধ্যমে তা বুঝতে হবে। অবশ্য এ বিশ্বাসটি নতুন কিছু নয়। বহুপূর্বে মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো তার "মাজমাউল বাহ্রাইন" গ্রন্থে পরিস্কারভাবে বলেছিলেন যে, 'বেদ ঐশ্বরিক বাণী' এবং তিনি বেদের সঙ্গে কোরআন শরীফের অনেক মিল খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তার আত্মজীবনী। গ্রন্থটি তাঁর নির্দেশক্রমে তার মৃত্যুর পর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের নাম ছিল "পূজ্যপাদ, শ্রীমহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত।" এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার বিবরণ আছে, তার সাধনার বিবরণ আছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই গ্রন্থের মধ্যে ফার্সী কবি হাফিজের কাব্য পাঠের অনুভূতি তিনি বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা মান্য করতেন না। তিনি পুরোপুরিভাবে মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি এক ঈশ্বরেই বিশ্বাসী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যেভাবে একত্ববাদের পোষকতা করতেন ঠিক একইভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। উভয়ের চিন্তার মধ্যে ঈশ্বরের একত্ববোধের এই ধারণাটি এসেছিল ইসলাম ধর্মের একত্ববাদ থেকে, এ ব্যাপারে কোন

www.icsbook.info

সংশয় নেই। রাজা রামমোহন রায়ের যে গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন সেই গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন কিন্তু আরবীতে– "তুহ্ফাতুল মুয়াহ্হিদিন" এর অর্থ হচ্ছে একত্ববাদীদের প্রতি উপহার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইসলাম ধর্ম চর্চা করেছিলেন কিনা তার কোন লিখিত প্রমাণ আমরা পাইনি কিন্তু তার আত্মজীবনীতে কবি হাফিজের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনিও ইসলামী মরমীবাদ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন এবং তার প্রতি আসক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তার বিশিষ্টতা দুটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমটি হল একদল ব্রহ্ম উপাসক সৃষ্টি যারা পৌত্তলিকতা পরিহার করবেন এবং এক ঈশ্বরের উপাসনা করবেন। এদের উপাসনা পদ্ধতি কি রকম হবে তা একটি "প্রতিজ্ঞাপত্রে" লিখিত হয়। দ্বিতীয়ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম উপাসকদের মনে এ বিশ্বাসটি সুদৃঢ় করেন যে, "আত্ম প্রত্যয়ই" হচ্ছে সকল সাধনার মূল লক্ষ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন যুক্তিবাদী পুরুষ। তিনি ব্রহ্ম উপাসনার ক্ষেত্রে বেদান্তকে গুরুত্ব দিতেন। কেননা তাঁর বিশ্বাস মতে বেদান্ত হচ্ছে একত্ববাদের উৎস।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার
(১৮১৫-১৮৫৮)

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয় নদিয়ায়। তাঁর পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলকাতা সংস্কৃত কলেজের একজন অনুলিপিকার ছিলেন। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভাষার বিভিন্ন দিকের চর্চা তাঁকে করতে হয়েছিল। এ কলেজে থাকাকালীন সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করেছিলেন। সবশেষে তিনি আবার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে। ঈশ্বরচন্দ্রের সহযোগিতায় তিনি 'সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর গ্রন্থাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি 'রসতরঙ্গিনী' নামে একটি রতি-কাব্য সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে সুবন্ধুর বাসবদত্তা থেকে অনেকগুলো অনুবাদ ছিল। কিন্তু মদনমোহন মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর শিশুশিক্ষা গ্রন্থের জন্য। এ গ্রন্থটি ১৮৬৪ এবং ১৮৬৫ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বেথুন সাহেবের অনুরোধক্রমে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বর্তমানে এ গ্রন্থের কথা আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু এক সময় এ গ্রন্থটি বাংলাদেশে খুবই পরিচিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই দেখি বাংলাভাষাদরদী বহু মনীষীই বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাধনা করেছেন। তাঁদের কয়েকজন সম্বন্ধে এর আগেই আমরা আলোচনা করেছি। ব্যক্তি বিশেষের প্রয়াস ছাড়াও বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকাও নানাভাবে সহায়তা করেছে। সে কাল

www.icsbook.info

থেকে আমাদের এ কাল পর্যন্ত প্রধানত বাংলা সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে—একথা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামক একজন বৈদিক পণ্ডিতের উপদেশে দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬ই অক্টোবর ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে জোড়াসাঁকোয় আপন বাসগৃহে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিলো শাস্ত্রসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং কর্মসম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনটি দায়িত্ব নির্ধারণ করেন, প্রথমত 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন, দ্বিতীয়ত, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ তৃতীয়ত, শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি সংকলন এবং প্রচার। পাঠশালার দায়িত্ব ছিলো সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষা প্রদান।"

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী' নামে একটি পত্রিকার প্রবর্তন হয়। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকগণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত লিখে বাংলা সাহিত্যে একটা যুগের সৃষ্টি করেন। দীর্ঘ বারো বছর অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। এ পত্রিকায় জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার লেখক ও পৃষ্ঠপোষক সকলেই ছিলেন সংস্কারপন্থী, তাঁদের চিন্তা ও কর্মের বাহন হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সেদিনের সাহিত্য সাধনা দেশ ও বাঙালী হিন্দু জাতির জন্য অশেষ কল্যাণকর হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে সব লেখা বের হয়েছিল তার কিছু অংশ সাহিত্যিক গুণ-বিশিষ্ট। সেগুলো আজও সাহিত্য হিসাবে টিকে আছে এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও থাকবে।

অক্ষয়কুমার দত্ত
(১৮২০-৮৬)

সে যুগের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বেদ, বেদান্ত ও পরব্রহ্ম উপাসনা' প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখায় একটা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন ও অপূর্ব শ্রমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে (অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ) শিক্ষাপ্রাপ্ত ইয়ংবেঙ্গল দল নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোতে অনুকরণের মোহে ভেসে যায়। পুরাতন সংস্কার ও হিন্দু ঐতিহ্যকে ভাঙবার জন্য এরা যেভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তার নজীর বাংলাদেশের ইতিহাসে বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। এ যুগসন্ধিক্ষণে অক্ষয়কুমার ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র ও সুষ্ঠু সমাজজীবন গঠনে যেভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সে সাধনার পরিচয় বহন করছে তাঁর রচনাগুলো

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বই 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২) জর্জ কুম্ব রচিত Constitution of Man নামক বইটি অবলম্বনে লিখিত। এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে তিনি যথাক্রমে শরীর গঠন, মিতাচার, জীবনযাত্রার পদ্ধতি বিচার এবং ধর্ম ও সমাজ-জীবনের নিয়ম পালন এবং সুরাপানের পরিণাম সম্বন্ধে

www.icsbook.info

আলোচনা করেন। এ বইটি বিশেষ করে ইয়ংবেঙ্গল দলকে লক্ষ করে লেখা হয়েছিল। সে কালের ইয়ংবেঙ্গলদের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়নে এ বইটি বিশেষ সহায়তা করেছে।

তাঁর 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) নামক অপর বইটি 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের' পরিপূরক। এটিতে তিনি স্বাস্থ্যবিধান, বিবাহ, গৃহধর্ম, সন্তানপালন, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি নানা পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-তাঁর শ্রেষ্ঠ বই। এর প্রথম ভাগ ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দুভাগেরই উপক্রমণিকা অংশ সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় তিনি মূল আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য (ইন্দো-ইরানীয়) এবং ভারতবর্ষীয় আর্য (বৈদিক ও সংস্কৃত) ভাষায় Philological বা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক এবং পৌরাণিক ধর্ম ও দর্শন-সাহিত্যের নানা তথ্য উদঘাটন করছেন। এটি অক্ষয়কুমারের সমাজবিজ্ঞানমূলক বই। ভাষা এবং ধর্মীয় আবেগই যে প্রত্যেক জাতির সমাজবোধের মূল অবলম্বন, অক্ষয়কুমারের তত্ত্বানুসারী মনে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের এ বইটির মূলে ছিল হোরেস হেমান উইলসনের 'Essays and Lectures on the Religion of Hindus' নামীয় একটি ইংরেজী বই-এর প্রেরণা।

পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ (১৮৫২), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪) এবং তৃতীয় ভাগ (১৮৫৯) সবচেয়ে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর এ বইটি বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে নানাভাবে সহায়তা করে এসেছে।

অক্ষয়কুমারের হাতেই বাংলা গদ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য এবং পুরাতত্ত্বাদি বিষয় আলোচনার উপযোগী বাহন হয়ে ওঠে। তাঁর রচনায় চিন্তার পরিচ্ছন্নতা লক্ষ করি; বাক্য গঠনেও তদনুযায়ী Logical sequence বা যুক্তিযুক্ততা দেখা যায়। বাংলা গদ্যের জড়তা তার হাতেই কেটে যায় এবং ভাষা প্রকাশক্ষম ও প্রসাদগুণ সমন্বিত হয়। সংস্কৃত শব্দ-প্রধান হওয়া সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের রচনায় একটা স্বাভাবিক মসৃণতা লক্ষ করবার মতো।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

যদিও তারাশঙ্কর তর্করত্ন মৌলিক কোন কিছু রচনা করেননি, কিন্তু "কাদম্বরীর" অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাধু ভাষার এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর গদ্য রীতি সুমার্জিত, সুশৃঙ্খল, ব্যাকরণসঙ্গত, আবার সঙ্গে সঙ্গে সুপাঠ্য ছিল। বলা যেতে পারে যে, বাংলা গদ্যের একপ্রান্তে যদি তারাশঙ্করের গদ্যকে স্থাপন করি তাহলে অপর প্রান্তে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালের' গদ্যকে স্থাপন করতে হয়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনাটি সঠিক ছিল :

"বাঙলা গদ্যের এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল।" তারাশঙ্করের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। ডক্টর সুশীল কুমার দে ধারণা করেছেন যে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে সম্ভবত তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি

৫—

www.icsbook.info

কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমর্থনে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ "সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।" কাদম্বরী প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে। তারাশঙ্করের আরেকটি অনুবাদ গ্রন্থ হচ্ছে, স্যামুয়েল জনসনের 'রাসেলাস' নামক উপন্যাস। এ অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। সুশীলকুমার দে বলছেন যে, এ অনুবাদটি মূল ইংরেজী গ্রন্থ থেকে করা হয়। এ অনুবাদটি আসলে মহারাজা কালী কৃষ্ণদেব বাহাদুরের অনুবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত। তারাশঙ্কর লসনের পশ্বাবলী গ্রন্থের একটি সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির নির্দেশক্রমে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(১৮২০-৯১)

বঙ্কিম-পূর্ব যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক আর দেখা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল 'ইয়ংবেঙ্গল' দল এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রবীণদের মাঝখানে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়ে বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হন।

বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই প্রতি কাজে তাঁর অসাধারণ গোঁ ছিল। উপযুক্ত পিতামাতার হাতে লালিত পালিত হয়ে বিদ্যাসাগর একদিকে অপূর্ব করিতকর্মা পুরুষ এবং অন্যদিকে করুণা ও দয়ার সাগর রূপে গড়ে ওঠেন। সেকালের বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের বহুবিধ পীড়ার কারণ তিনি যেমন করে অনুধাবন করেছিলেন সে-যুগে এমন করে আর কেউ তা করেননি। সমাজের দিকে নজর দিয়ে তিনি দেখলেন সতীদাহ বা সহমরণ, কৌলিন্য বা বহু-বিবাহ প্রথা এবং বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন প্রভৃতি অনাচার হিন্দু সমাজ-জীবনকে পঙ্গু ও জরাগ্রস্থ করে রেখেছে। সমাজের যত কিছু বিশৃঙ্খলতা তার মূলে ঐ প্রথাগুলো। সহমরণ প্রথার অযৌক্তিকতা রামমোহন রায়ও ভালো করে বুঝেছিলেন, তিনি এর নিবারণকল্পে আমরণ সংগ্রাম করেছিলেন। এ প্রথার নিবৃত্তি ঘটে বিদ্যাসাগরের সময়ে, মূলত তাঁরই চেষ্টায়। বহু বিবাহ নিবর্তন এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনও বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি। দেশ ও জাতি গঠন করতে হলে জাতি গঠনের ভার যাদের হাতে সেই নারী সমাজের অধিকার ও আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি সেদিন যে সংগ্রাম করেছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলার নারী সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্ভ্রম ও স্বাধিকার বোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে একদিকে যেমন এসব কদাচার রোধ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে, এ চেতনা সে যুগে তাঁরই মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা যায়। কলকাতার একালের নারীশিক্ষামন্দির 'বেথুন কলেজ' বিদ্যাসাগরের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সমাজসেবা ও সংস্কারমূলক সকল কাজেই মানবতাবাদই ছিল তাঁর আদর্শ। তথাকথিত আচারক্লিষ্ট ধর্মের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান হয়েও আচার-পীড়িত এহেন ধর্মের প্রতি তিনি মনে মনে ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন।

www.icsbook.info

বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে এই যে বৈপ্লবিকতার সুর, এর বিশ্লেষণ করতে গেলেই বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। আচারনিষ্ঠ, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনে বিদ্রোহের এই বাণী কোথা থেকে পেলেন? তাঁর সকল ক্রিয়াকর্ম বিচার-প্রসঙ্গে মনের মধ্যে স্বতঃই এ প্রশ্নের উদ্রেক হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস কিংবা বিবেকানন্দের মতো 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' তিনি করেননি। সুস্থ সমাজ ও ব্যবহারিক জীবন গড়ে তুলবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য 'দলবটভধ্রব' বা মানবতাবাদের পূজারী ছিলেন। এ বিষয়ে ইউরোপের অগাস্ত কোঁতে এবং স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দার্শনিক তাঁর আদর্শ ছিলেন। কোঁতের ম্রর্ধধশধ্রব বা ধ্রুববাদ তাঁর চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল।

আবহমান কাল থেকে প্রচলিত প্রথার সংস্কার আন্দোলনে বিদ্যাসাগর যে অমিত তেজ, অজেয় পৌরুষ, অপরূপ মেধা ও বুদ্ধির এবং অসম্ভব শ্রমশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এ কালের ইতিহাসে তার নজীর মেলা ভার। এসব সংস্কার আন্দোলনে বিদ্যাসাগর অক্ষত থাকেননি। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে আর করেছে তাঁর প্রবল বিরোধিতা। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বজাধারী ব্যক্তি এবং শাস্ত্রকারদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে এ সূত্রে নানাভাবে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হতে হয়েছে। বিদ্যাসাগর রচিত বাংলা সাহিত্য তাঁর সংগ্রামময় জীবনের এ পরিচয়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বিদ্যাসাগর রচিত বাংলা গদ্য সাহিত্যকে মোটামুটি চারটি ভাগ করা যায়। (১) সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাদি। এ বিভাগে পড়ে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব)। দুটোরই রচনা ও মুদ্রণকাল ১৮৫৫। এবং 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১) ইত্যাদি প্রবন্ধ। (২) রম্য রচনা জাতীয় লেখা। বেনামীতে প্রকাশিত কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনা এবং স্বনামে লিখিত আত্মজীবনী এবং কয়েকটি সরস রচনা। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিবর্তন ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্রূপ করেন। তার জবাবে বিদ্যাসাগর বেনামে 'কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য' প্রণীত 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এ দুটো বই রচনা করেন। এ দুটো এবং অপর ব্যঙ্গ রচনা দুটি 'যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য ব্রজবিলাস' (১৮৮৫) আর 'রত্নপরীক্ষা' এ পর্যায়ে পড়ে। বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশু কন্যা প্রভাবতীর অকালমৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৪) এবং তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' (১৮৪৯) ও এ পর্যায়ভুক্ত। (৩) স্কুলপাঠ্য ও সাহিত্য সংক্রান্ত রচনা। 'বাংলার ইতিহাস'; (১৮৪৭-৪৮) 'বর্ণপরিচয়', বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যান মঞ্জরী' প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য বইগুলো এবং 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' এ পর্যায়ে পড়ে। (৪) তাঁর সাহিত্য কীর্তিরাজি। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অনুবাদ 'শকুন্তলা' (১৮৫৪)। ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম দুই অঙ্ক এবং বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) এবং মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগের কিয়দংশের অনুবাদ এ পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

www.icsbook.info

বিদ্যাসাগরের অন্যতম প্রধান কীর্তি বাংলা ভাষা। তাঁর হাতেই বাংলাভাষা সাহিত্যরসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টাই বাংলা গদ্যকে সাবলীল গতিভঙ্গি এবং অমেয় ব্যঞ্জনা দান করেছে। বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরিদের সাধনায় বাংলা গদ্য যে রূপ পেয়েছে, তার তুলনায় নানা প্রসাধনে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সচেতন শিল্পীমন এবং ঐকান্তিক প্রয়াসই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁর পথ সুগম করেছে। বাংলা গদ্যের রসমূর্তি উদঘাটনে বিদ্যাসাগরের দুটি দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দের আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়টি বাংলা প্রবাদ বা ইডিয়মের প্রথম সার্থক ব্যবহার। ভাবানুসারী শব্দের সমন্বয়ে বাংলা বাক্যের গদ্য কাঠামোতেও যে স্বাভাবিক ছন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, বিদ্যাসাগরই এ কথা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর কান ছিল অত্যন্ত সজাগ। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় শ্বাসপর্ব (breath pause) এবং সার্থপর্ব (sense pause) অনুসারে বাক্যের মধ্যে বিরাম চিহ্ন, কমা ও দাঁড়ি প্রভৃতির অজস্র অথচ পরিমিত ব্যবহার। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহনও বাংলা বাক্যের এ ছন্দ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি। বিদ্যাসাগরই বাক্যের মধ্যে শ্বাস ও সার্থ পর্ব অনুসারে কমা প্রভৃতি বিরাম চিহ্নের প্রচলন করে ওহফফটঠফণ-ভিত্তিক সমমাত্রার পর্ব নির্মাণ করেছিলেন। পাশাপাশি এ ধরনের দুটো গোণাগুণ্তির হিসেবে যতটা অক্ষরই (syllable) থাকে না কেন, পড়বার সময়ে দেখা যায় তিনি কালানুসারী equal measure) বা সমমাপের পর্ব ভাগ করেছিলেন। তাতে বাক্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনিব্যঞ্জনা নানাভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। বাক্যের মধ্যকার বাংলাধ্বনি কি কৌশলে পাঠকের চিত্তে শব্দার্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে বিদ্যাসাগর আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বাংলা বাগ্ধ্বনি (speech sound)-র সে অপরূপ মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রত্যেক ভাষাতেই idiom বা প্রবাদ সে ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন দু-একজন সুদক্ষ শিল্পীর আবির্ভাব হয় যাঁরা এ ধরনের প্রবাদ যথেচ্ছ ব্যবহার করে ভাষার ও সাহিত্যের পথ সুগম করেন। বেনামীতে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের সমাজবিষয়ক ব্যঙ্গ রচনাগুলোতেই এ ধরনের কিছু বাংলা প্রবাদ প্রথমবারের মত ব্যবহৃত হয়। বিদ্যাসাগরের হাতে এ প্রবাদগুলো সুপ্রযুক্ত হয়েছে। ফলে ব্যঙ্গও হয়েছে শাণিত।

সমাজ-বিষয়ক লেখাগুলোর মধ্যে বিদ্যাসাগরের অমিত তেজ এবং বলিষ্ঠ পৌরুষের ছাপ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এবং 'আত্মচরিতে' তাঁর লঘু স্বচ্ছ মনের এবং চটুল হাস্য পরিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনমনীয় কঠোর পৌরুষের অন্তরালে প্রবাহিত ছিল একটি করুণার স্রোতস্বিনী। সমাজ জীবনে সেটিকেই তিনি নিয়োজিত করেছিলেন এদেশে অগণিত নারীর মন্দভাগ্য পরিবর্তনে, আর সাহিত্যিক জীবনে অনুবাদের মাধ্যমে করুণার সে প্রস্রবণ ঢেলে দিয়েছিলেন জনম দুঃখিনী সীতা ও শকুন্তলার স্নেহকরুণ আলেখ্য নির্মাণে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস' অনুবাদ হলেও এ গ্রন্থ দুটিতে ক্ষেত্রপোযোগী জীবনাবেগ এবং ভাবাবহ সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর ভাষাতেও সেকারণে একটা রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয় যায়। এ স্টাইল বিদ্যাসাগরীয় সংস্কৃতানুসারী স্টাইল, তবু এর সাবলীল ছন্দোময় গতিভঙ্গি এবং মনোমুগ্ধকর ধ্বনি-ব্যঞ্জনা 'শকুন্তলা' ও 'সীতার

www.icsbook.info

বনবাসের' বাংলা গদ্যে যে একটা ক্লাসিক্যাল মহিমা এবং শ্রীময় গাম্ভীর্য লেপন করে রেখেছে–আজ তা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"

আমরা নিম্নে বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করছি। এ তালিকাটি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার তালিকা থেকে গৃহীত ঃ

(১) বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭ (হিন্দী পুস্তক অনুসারে রচিত) (২) বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ ১৮৪৮। (৩) জীবনচরিত, সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ (৪) বোধোদয় (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ) এপ্রিল ১৮৫১। (৫) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। নভেম্বর ১৮৫১। (৬) ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ নভেম্বর ১৮৫১ ২য় ভাগ; মার্চ ১৮৫২ ৩য় ভাগ; ডিসেম্বর ১৮৫১ (৭) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব। ১ মার্চ ১৮৫৩ (৮) ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ; ১৮৫৩ ২য় ভাগ; ১৮৫৩ ৩য় ভাগ; ১৮৫৪ ৪র্থ ভাগ ১৮৬২। (৯) শকুন্তলা। ডিসেম্বর ১৮৫৪ (১০) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। জানুয়ারি ১৮৫৫। (১১) বর্ণ পরিচয়, ১ম ভাগ; এপ্রিল ১৮৫৫ ২য় ভাগ; জুন ১৮৫৫। (১২) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। অক্টোবর ১৮৫৫। (১৩) কথামালা ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫। (১৪) চরিতাবলী। জুলাই, ১৮৫৬। (১৫) মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ)। জানুয়ারি, ১৮৬০। (১৬) সীতার বনবাস। এপ্রিল, ১৮৬০। (১৭) আখ্যানমঞ্জরী। নভেম্বর ১৮৬৩। (১৮) শব্দমঞ্জরী (বাঙ্গলা অভিধান); ১৮৬৪। (১৯) ভ্রান্তিবিলাস। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯। (সেক্সপীয়রের কমেডি অব এররস অবলম্বনে) (২০) বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। ১০ই আগস্ট; ১৮৭১। (২১) বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। ১ এপ্রিল, ১৮৭৩। (২২) নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস। এপ্রিল, ১৮৮৮। (২৩) পদ্যসংগ্রহ। প্রথম ভাগ; ১৮৮৮ (২ জুলাই)। দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯০। (২৪) সংস্কৃত রচনা। নভেম্বর ১৮৮৯ (২৫) শ্লোক মঞ্জরী (উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহ)। মে, ১৮৯০। (২৬) বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর, ১৮৯১। (২৭) ভূগোলখ গোলবর্ণনম্। এপ্রিল, ১৮৯২।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত বাংলা, হিন্দি এবং সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। তাঁর বিধবা-বিবাহ এবং বহু বিবাহ সংক্রান্ত প্রস্তাবনার বিপক্ষে যারা মত প্রকাশ করেছিলেন তাদের মতের প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর বেনামীতে পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলো হচ্ছে, অতি অল্প হইল (৫ই মে, ১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩), ব্রজবিলাস (৩ নভেম্বর, ১৮৮৪), বিধবা-বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা (১১ই নভেম্বর ১৮৮৪), রত্ন পরীক্ষা (১৯ আগস্ট ১৮৮৬)।

বিদ্যাসাগর সাধু গদ্যরীতির যে নিদর্শনগুলি রেখে গেছেন তা অত্যন্ত অলঙ্কৃত, তৎসম শব্দে শোভমান এবং সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত। তিনি সাধু ও চলিত দু'রীতিই ব্যবহার করে গেছেন। চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের চলিত রূপ তিনি রক্ষা করেননি। তাঁর চলিত রচনার মধ্যে পরিহাস রসিকতার প্রচুর নির্দশন আছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "গদ্যের পথগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা

www.icsbook.info

করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

প্যারীচাঁদ মিত্র

(১৮১৪-৮৩)

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত আমরা যাঁদের কথা আলোচনা করেছি তাঁদের সকলেই বাংলা গদ্যের সাধুভঙ্গি ও সংস্কৃতানুসারী রীতির সাধনা করেছেন। বিদ্যাসাগরে ক্রমে এ রীতি চরম বিকাশ ও স্থিতি লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য না হলেও ডিরোজিওর আদর্শস্নাত প্যারীচাঁদ স্বাধীন চিত্ত ও মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। বাংলা ভাষায় experiment বা প্রয়োগ-পরীক্ষা যুগে বিদ্যাসাগরের হাতে এসে বাংলা গদ্য যে পরিণতি লাভ করলো তাতে সাহিত্যের ছাত্র ও সাহিত্যসেবীদের তৃপ্তি সাধিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণের জন্য সে ভাষা অনুসরণের পথ সহজ নয়, কাজেই সুগম নয়। প্যারীচাঁদ মিত্র একথা ভালো বুঝেছিলেন। সেজন্যেই তিনি সাধারণের উপযোগী সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে সেকালের কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভাষা-সাধনার ইতিহাসে এ একরকম বিদ্রোহই বটে। রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তাঁর ভাষা-বিষয়ক আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। কথ্যভাষার রীতিতে কাব্য রচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ফারসী শব্দের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ—মাসিক পত্রিকার বাগ্‌ভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এ পত্রিকাতেই তাঁর বহুখ্যাত পুস্তক 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়; পরে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে এটি বই আকারে মুদ্রিত হয়। ভাষা সম্পর্কিত তাঁর আদর্শ রূপান্তরিত হয় তাঁর বহুখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। সেজন্যই প্যারীচাঁদের বাংলাকে আলালী বাংলাও বলা যেতে পারে।

আলালের ঘরের দুলালের বৈশিষ্ট্য একদিকে যেমন তার ভাষারীতির জন্য অন্যদিকে তেমনি প্রথম যুগের উপন্যাস হিসেবে। ইংরেজ মহিলা কুমারী হেনরী ক্যাথিরিন ম্যালেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয় 'আলালের ঘরের দুলালের'ও ছয় বছর পূর্বে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের সম্মান 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণের'ই প্রাপ্য। এ গ্রন্থের লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। এ ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা এবং এদেশের খ্রীস্টান মহিলাদের নীতি শিক্ষা দান। আসলে সার্থক উপন্যাস বলতে একটি দৃঢ়বদ্ধ প্লটে বিধৃত মানুষের অন্তর ও বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় যে কাহিনীর কথা আমাদের মনে আসে, প্রথম যুগের উপন্যাসধর্মী লেখাগুলি যেমন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১), কুমারী ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), এবং প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) কিংবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত রচনা 'সফল স্বপ্ন' (১৮৫৭) ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' (১৮৫৭), এগুলোর কোনটিই সে অর্থে উপন্যাস নয়, কতকগুলি স্কেচের সমষ্টি; উপন্যাসের খসড়া মাত্র।

রোমান্সধর্মী প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), এবং গ্রাম ও বাস্তব জীবন কেন্দ্রিক প্রথম সামাজিক উপন্যাস তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৩)।

www.icsbook.info

প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখায় কথ্য রীতি সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করেনি, সাধু ও কথ্যভঙ্গির নানা মিশ্রণ হয়েছে। তবু চলিত ভাষার আদলে যে লঘু ভঙ্গির আমদানি তিনি করেছিলেন সেকালের ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে তা ছিল অভিনব ঘটনা। ভাষা সৃষ্টি ও ব্যবহারে তাঁর দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাঁর মতামত ছিল তেমনি মৌলিক। ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী কিংবা ইংরেজির কোন অনুবাদ না করে সাহিত্য রচনার উপাদানের জন্য বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলেন। শত বছরের ইংরেজ শাসনে যে সব লেখক হঠাৎ পয়সা পেয়ে বড় লোক হয়ে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলো, ঐশ্বর্যের সমারোহে তাদের এবং সন্তান-সন্ততির সামাজিক জীবনে কিভাবে ফাটল ধরেছিল, শিথিল বিন্যস্ত এ উপন্যাসটিতে তার একটা নির্মম সমালোচনা আছে। প্যারীচাঁদ 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে সেকালের কলকাতা-জীবনের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এতে তাঁর অদ্ভুত সমাজ সচেতনতার এবং সমাজ-জীবনের সাহিত্য সৃষ্টিরই অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৩৫ সনে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষারূপে গৃহীত হলেও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী জনসাধারণ তখনও অজস্র ফারসী শব্দ ব্যবহার করতো, মুখের ভাষায় রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে' আরবী-ফারসী শব্দের ছড়াছড়ি থেকে তা সহজেই প্রমাণিত হয়। মুখের কথায় বাঙালী যে বরাবরই প্রবাদ ব্যবহার করতে পটু, তার আর একটা প্রমাণ মেলে 'আলালের ঘরের দুলালে' ব্যবহৃত বিভিন্ন চরিত্রের মুখের অগণিত প্রবাদ বাক্যে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য বই, 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ', 'গীতাঙ্কুর' (তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭০), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮), 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত', 'আধ্যাত্মিক' (১৮৮০) এবং 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(১৮৪০-৭০)

ভাষা ব্যবহারে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সে বিদ্রোহের কর্ণধার ছিলেন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রাধানাথ শিকদার এবং তাঁর সহকর্মী বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র। বিদ্যাসাগরকে তাঁর রচনারীতির জন্য ব্যঙ্গ করে মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখা হতো। একটি প্রবন্ধে 'xenophon' থেকে ভাঙা এই শব্দ যোজনা ছিল। বিদ্যাসাগর এসব দেখে শুনে এঁদের প্রতি ঠাকুরদাদার মতো প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে ধরতেন। ভাষা ব্যবহারে বিদ্রোহের পরিচয় দিতে গিয়ে প্যারীচাঁদ সাধু ও কথ্য উভয় বাক্যরীতির যে মিশ্র প্রয়োগ করেছেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ সেদিক থেকে বাংলা ভাষাকে আরও উন্নত ও মসৃণ করেছেন। কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মৌখিক ভাষার প্রথম সুষ্ঠু প্রয়োগ কালীপ্রসন্ন সিংহই করতে পেরেছেন। তাঁর ব্যবহৃত রীতিতে কথ্য ও সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ নেই। সেদিক থেকে কালীপ্রসন্নের ভাষা প্যারীচাঁদের ভাষায় চেয়ে মার্জিততর। কালীপ্রসন্ন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় এ ভাষা প্রয়োগ করেছেন। হুতোম তাঁর ছদ্মনাম। সেজন্য তাঁর ব্যবহৃত ভাষাকে হুতোমী বাংলা বলা হয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২) বইটির নাম থেকেই একটা সরল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আভাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; বস্তুত হয়েছেও তাই। কলকাতার সামাজিক উৎসবাদি

www.icsbook.info

বর্ণনা উপলক্ষে হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ধনীপুত্র—বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ণনা করাই হুতোম প্যাঁচার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার দিনের কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজ জীবনের এক চাঞ্চল্যকর রূপ এ বইটি থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়। তাছাড়া হুতোম প্যাঁচায় যথেষ্ট লোকজ্ঞান ও পরিহাস-রসিকতাও প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক জায়গায় তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাতও আছে।

খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী
(১৮০৮-১৮৭০)

খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ভাবলাভ' নামে তার একটি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। এসময় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলামানের সাহিত্যিক চূড়ামণি মীর মশাররফ হোসেনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ১২৭১ সন, মাঘ মাসে (এ হিসাব মতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এক পূর্বপুরুষ মুন্সী বশরাতুল্লাহ্ খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী কর্তৃক গদ্য পদ্য রচিত 'উচিত শ্রবণ' নামক একটি বই নকল করেন। খুব সম্ভব কোন মুদ্রিত পুস্তক থেকেই এটি নকল করা হয়েছে। 'উচিত শ্রবণ' (অর্থাৎ পরমার্থত ভাব') একটি ধর্ম পুস্তক। Blumhard's Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum থেকে জানা যায়, 'উচিত শ্রবণ' ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ছাপা হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৬। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ও গূঢ়তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় এ গ্রন্থের ভাষা জটিল ও আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। মশাররফ হোসেনের প্রথম বই 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে, তারও বহু আগে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে 'উচিত শ্রবণ' প্রকাশিত হয়েছিল। খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকীই যে প্রথম বাঙালী মুসলমান গদ্য লেখক এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। বাংলা গদ্যের বিকাশপথে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে আমরা যেখানে এসে পৌঁছি সেখানে অবশ্য খোন্দকার শামসুদ্দিনের কোন দান নেই। তবু প্রথম বাঙালী মুসলিম গদ্য লেখক হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান অবধারিত। তাঁর গদ্যের কিছু নমুনা :

"অহঙ্কারের দ্বিতীয় অবস্থা। প্রথম জাতি ও কুল। দ্বিতীয় বুদ্ধি ও বিদ্যা। প্রথম অবস্থার ব্যবস্থা এই যে আমি অমুক মুনি কিম্বা সাধুর সন্তান বলিয়া আপন আদর বাড়াইতে হয়। বিচার করিয়া দেখ ইহা বিনা মূল্যে পুরাতন অস্থি বিক্রয় করিয়া কেবল মান বাড়ান। ইহার জন্য আমাদের নবিজী রছুলুল্লাহ আপন কন্যা বিবি ফাতেমা জহরাকে নিষেধ করিয়াছেন যে হে মা ফাতেমা আপন মনে এমত অহংকার করিও না যে আমি রছুলের কন্যা ও হযরত আলির বণিতা এবং স্বর্গীয় বিবি। তিনি অহংকার করিলে করিতে পারেন। তাহাকে যখন নিষেধ করিয়াছেন, তখন আমার অহংকার করা কেবল বুদ্ধির ত্রুটি এবং পাপ।" (মধ্যভাগ থেকে উদ্ধৃত) "এই পুস্তক মানবে দেখা উচিত ও শ্রুত করা উচিত এবং পরমার্থিত ভাবে বুঝিতে উচিত। যিনি বুঝিবেন গোপন রাখা উচিত। ঐহিক ভাবে বুঝা অনুচিত। এই পথও উচিতে সমাপ্ত।" (শেষ অংশ)

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 'সাহিত্য পত্রিকা' ১৩৬৪ সালের বর্ষসংখ্যায় 'উনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে শামসুদ্দীন সিদ্দিকীর কবি-কর্মের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। শামসুদ্দীন গদ্যে-পদ্যে লিখিত 'উচিত শ্রবণ'ছাড়া 'ভাবলাভ' (১৮৫৩) ও 'গুরতজান' নামক দুখানা কাহিনী কাব্যও লিখেছিলেন। দুটি কাব্যই রূপকথা ভিত্তিক

www.icsbook.info

এবং মধ্যযুগ এবং তাঁর সাময়িককালের পশ্চিম বাংলার অন্যান্য কবি সৃষ্ট রসধারার অনুগামী।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী একাধারে প্রবন্ধকার ও কবি ছিলেন।

গোলাম হোসেন ও শেখ আজিমদ্দী

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের যুগে আরও দুজন মুসলিম লেখকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের একজন গোলাম হোসেন এবং আর একজন শেখ আজিমদ্দী (সম্ভবত আজিমউদ্দীন)। তাঁরা উভয়েই পশ্চিম বাংলার লোক।

গোলাম হোসেন 'হাড় জ্বালানী' নামক একটি নক্সা জাতীয় রচনা লেখেন। 'হাড় জ্বালানী'১৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। এটি ১২৭১ সালে অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা গড়নহাটা স্ট্রীটের ৯২ নং ভবনে এ্যাংলো ইন্ডিয়া ইউনিয়ন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। শ্বাশুড়ী বউয়ের ঝগড়া চিরন্তন। বুড়ো শ্বাশুড়ী কলির বউ-এর চক্ষুশূল। এ চিরন্তন বিষয় নিয়ে এ ক্ষুদ্র নক্সাটি রচিত। এতে লেখকের সমাজ চেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

শেখ আজিমদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'ও ১৬ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র প্রহসন। বইটি ১২৭৫ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা গড়নহাটা স্ট্রীটে ২৬৮নং ভবনে শ্রীকালিনাথ শীলের জ্ঞানদ্বীপক যন্ত্রে শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়।' সম্ভবত বছর খানিক পূর্বে এটি প্রথমবার মুদ্রিত হয়েছিল। 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৮) এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬)-র সমজাতীয় প্রহসন। এ প্রহসনগুলোর প্রত্যেকটিতে সমাজ সচেতনতার ছাপ রয়েছে।

আজিমদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' গদ্যে-পদ্যে রচিত হলেও পদ্যের তুলনায় গদ্যের ভাগ বেশি।'

গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী'র প্রকাশকাল ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ, আজিমদ্দীর 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'র প্রকাশকাল ১৮৬৮। শামসুদ্দীন সিদ্দিকীর 'উচিত শ্রবণ' প্রকাশিত হয় এগুলোর বহু পূর্বে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং খোন্দকার শামসুদ্দীনই প্রথম বাঙালী মুসলমান গদ্য লেখক। এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। গোলাম হোসেন আর আজিমদ্দীর বিষয়বস্তু সমাজ-কেন্দ্রিক আর শামসুদ্দীনের আলোচ্য বিষয় ধর্মমূলক। সেজন্যে গোলাম হোসেন এবং আজিমদ্দীর লেখায় সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের কারো লেখারই সাহিত্যিক কোন মূল্য নেই। কিন্তু সেই অন্ধকার যুগে বাঙালী মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে এরা আমাদের সাহিত্য সাধনার যে পথ তৈরী করে গেছেন -তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

মুন্সী নামদার

মুন্সী নামদার নামক একজন গদ্য লেখকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাঁর একটি ষোল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকার নাম 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প'। 'নারীদের একি দম্ভ'। প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খীস্টাব্দে।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের পরিণতি

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর, মীর মশররফ হোসেন,
আর্জুমন্দ আলী, গোলাম কিব্‌রিয়া এবং মোজাম্মেল হক প্রভৃতি।

মুহম্মদ আবদুল হাই
পুণর্লিখন ঃ সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বাংলাগদ্যের পরিণতি

বঙ্কিমচন্দ্র
(১৮৩৮-১৮৯৪)

পশ্চিম বাংলার নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। হুগলী মোহসিন কলেজে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি লেখাপড়া শেখেন। ১৮৫৮ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নব-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা সেদিন গ্রাজুয়েট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন বঙ্কিম ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৮৫৮ সনে বি. এ. পাস করেই তিনি সরকারী চাকুরি ডেপুটি কালেক্টরের পদে বহাল হন এবং অবসর গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত কৃতিত্ত্বের সঙ্গেই এ পদে কাজ করেন।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। ১৮৫৩ সনে তাঁর 'ললিতা' ও 'মানস' নামক কাব্য দুটি প্রকাশিত হয়। এর পরেই তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইংরেজিতে সাহিত্য সাধনা করার দুরাশা তাঁর সমসাময়িক কালের অনেকের মতো তাঁকেও পেয়ে বসেছিল। এ মোহেরই ফল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে লিখে যশস্বী হওয়া যাবে না একথা বুঝতে পেরেই বঙ্কিম বাংলা সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা এর পূর্বে বাংলা গদ্যে যা রচিত হয়েছে তা বিশেষত্বহীন এবং সাহিত্য হিসেবে প্রাণবন্ত নয়। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু সমাজ ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে বাংলায় উন্নত ও রুচিসম্মত সাহিত্যের পরিচয় না পেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবই পোষণ করে এসেছে। ইংরেজিতে রোমান্টিক ও কল্পনা-মনোহর সাহিত্য পড়ে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর চিত্তের যে পরিমাণে প্রসার ও মুক্তি ঘটেছে সে পরিমাণেই তার মনে জন্মেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবিশ্বাস। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙালী জীবনের পরিচিত পরিবেশ থেকে উপাদান অবলম্বনে লিখিত হলেও কল্পনার বাধাহীন প্রসার ও দীপ্তি তাতে ছিল না। ইংরেজি উপন্যাসের ধরনে লিখিত বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙালী মনের সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি করেছিল। 'মেঘনাবধ কাব্যে' মধুসূদন ইউরোপীয় ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে যেভাবে কল্পনা জগতে অবাধ বিহার করেছিলেন বাংলা গদ্যে বঙ্কিম তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাধ্যমে সে কাজই সম্পন্ন করলেন। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', সেকালে সাধারণ্যে গৃহীত হতে পারেনি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। গদ্যে রচিত উপন্যাস বলে জনসাধারণ 'দুর্গেশনন্দিনী'কে সাদরে গ্রহণ করেছিল। এ 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই সেকালের বাংলা সাহিত্যের দৈন্য নিবৃত্ত হয়েছিল, ভাষার জড়তা মুক্ত হয়েছিল এবং সাহিত্যিকদের কল্পনাজগতেও অসাধারণ

www.icsbook.info

প্রসার সম্ভব হয়েছিল। আজকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমালোচকদের আদর্শ মাপকাঠিতে বিচার করলে উপন্যাস হিসেবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নানা দোষত্রুটি লক্ষ করা যাবে কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে 'দুর্গেশনন্দিনীতে' এসেই বাংলা গদ্য মৌলিক সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং সুষমা লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী বাংলা এবং প্যারীচাঁদের আলালী ও কালীপ্রসন্নের হুতোমী বাংলাকে ভেঙ্গেচুরে বঙ্কিম বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুকারীরা বঙ্কিমের এ গুরুলঘুভার সমন্বিত, সুষমামন্ডিত বাংলা গদ্যকে বরদাশত করতে পারতেন না। তাঁরা বঙ্কিমী বাংলার ধরনকে 'শব পোড়া ও মড়া দাহ' বলে উপহাসও করেছেন। কিন্তু 'দুর্গেশন্দিনী' এবং তার অব্যবহিত পরের (১৮৬৬) 'কপালকুন্ডলা'য় বাংলা গদ্যের যে রূপ প্রবর্তিত হলো নানা পথঘাট ধরে এ সমৃদ্ধ রূপই বাংলা সাহিত্যের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এ বাংলার কিছু নমুনা দিই ঃ

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে গড় মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকান্ড প্রান্তর, কি জানি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল।" (দুর্গেশনন্দিনী)।

"ফিরিবামাত্র (নবকুমার) দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে, সৈকত-ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি! কেশভার-অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত-আগুল্ফ্ লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র শোভা পাইতেছে।" (কপালকুন্ডলা)।

বঙ্কিম যে যুগে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে এ ভাষা এবং ভাষা-অনুসৃত কল্পনার মুক্তভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশ্চর্য ফলপ্রসূ হয়েছিল।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পরেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সনে। এর পরে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশকে পটভূমি করে রচিত হয় 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)।

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা সর্বপ্রথম সূচিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী হিন্দুর শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ উপন্যাস রচনা করেন। এ-উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা খুবই সামান্য। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজে দুটি প্রধান সমস্যা ছিলো বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ। এ দুটি সমস্যাই 'বিষবৃক্ষে' আলোচিত হয়েছে। এতদিন বাংলা ভাষায় শুধু রোমান্সধর্মী কাহিনী ছিলো, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষের'র মাধ্যমে একটি জীবনধর্মী আখ্যান এনে দিলেন। 'ইন্দিরা' প্রথম একটি বড় গল্প হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে, পরে ১৮৯৩ সালে একটি নাতিবৃহৎ উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়। 'ইন্দিরা' একটি সহজ উপভোগ্য কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ১৮৭৪ সালে একটি গল্প রচনার পরীক্ষারূপে প্রকাশিত হয়। 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ঐতিহাসিক এবং অলৌকিক বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। 'রাধারাণী' (১৮৮৬) একটি বড় গল্প, নিছক

www.icsbook.info

কাহিনী উপভোগের জন্য রচনা। 'রজনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। বাংলাভাষায় মনস্তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষা হিসেবে 'রজনী' উল্লেখযোগ্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। এ-উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভাষাগত চাতুর্যে এ-উপন্যাসটি অতুলনীয় এবং এখানেই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারার পরিচয় ধরা পড়েছে। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। গ্রন্থটিতে রাজপুত-মুঘল সংঘর্ষের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুদের জাতীয় জীবন সংগঠনের জন্য গীতার ধর্মীয় আদর্শকে অবলম্বন করে যে-উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন তার নাম 'আনন্দমঠ'। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্ গানটি আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে বিষ্ণু বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করে স্বদেশ-প্রেমকে একটি গোত্রগত গন্ডীতে আবদ্ধ করেছেন। এ-উপন্যাসে মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধ পক্ষ। 'দেবী চৌধুরাণী'ও ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ও আদর্শ ভিত্তিক উপন্যাস। ধর্ম মানুষকে একটি উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করে এ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে অনুশীলনতত্ত্ব প্রচার করেন তারই একটি প্রকাশ এ-উপন্যাসে ঘটেছে। 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। এ-উপন্যাসটিও আদর্শভিত্তিক। রসপরিবেশন এ-উপন্যাসের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে গীতায় উক্ত কর্মযোগে দীক্ষিত করা।

এতগুলো উপন্যাস এবং প্রবন্ধগ্রন্থের তালিকা থেকেই বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার এবং সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিম সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সরকারী চাকুরিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য তাঁর জীবনের ব্রত ছিল।

বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী বঙ্কিম বাংলা ও বাংলার বাইরে যে ভাবে পঠিত হয়েছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিমের সমালোচনা আজও তেমন হয়নি। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-মনের প্রতিভূ হিসেবে বঙ্কিম বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অধিকাংশ হিন্দু সমালোচকই বঙ্কিমের মধ্যে দেখেছেন তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপায়ণ; নিরপেক্ষ মন নিয়ে সেজন্য তাঁদের অনেকেরই পক্ষে বঙ্কিম সমালোচনা সম্ভব হয়নি। সাহিত্যিক বঙ্কিম তাঁদের হাতে সেজেন্যই সহজেই ঋষি বঙ্কিমে পরিণত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আটটি উপন্যাসে ইতিহাসের মিশ্রণ আছে অথচ এর একটিও ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়নি। 'রাজসিংহ'কেই বঙ্কিম তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে করতেন; কিন্তু সে 'রাজসিংহ'ও আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাস থেকে চরিত্র এবং ঘটনা নিয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাদের নানাভাবে নির্মাণ করেছেন; উপন্যাস সৃজনে তাও অবশ্য ক্ষমা করা যায়। এ সম্বন্ধে তৃতীয় সংস্করণ 'আনন্দমঠে'র ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন, "এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না, কেননা উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নহে।" অবশ্য একথা ঠিক যে পাঠকেরা উপন্যাস পড়তে গেলে গাঢ়বদ্ধ উপন্যাসে মানুষের জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন এবং তাদের সুখ-দুঃখের নানা কাহিনীর রসেই মুগ্ধ হতে চায়, ইতিহাসের

www.icsbook.info

কন্টকাকীর্ণ ঘটনাবলীর বর্ণনা চায় না। ইতিহাসের খ্যাত-অখ্যাত চরিত্রগুলোর অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, আলাপ-প্রলাপ এবং হাহাকারময় মূর্ছা ও মূর্ছনার যে ছবি ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় না, সে-বীর ও স্নিগ্ধ করুণ রসের দিকেই থাকে ঔপন্যাসিকের লোভ। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের কাছে তাদের উপকরণের জন্য যে হাত পেতেছেন তা এ কারণেই। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাস-অংশের অপরূপ সমন্বয় (harmonious blending) সাধিত হয়নি। তাঁর রচিত উপন্যাসে ইতিহাস অংশ অবাস্তব। এমনকি যেটিকে তিনি নিজে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে করেছেন সে 'রাজসিংহে'ও ইতিহাস-অংশের চরিত্রগুলোর মধ্যে জীবন স্পন্দিত হয়নি। ইতিহাস থেকে যে কটি চরিত্র তিনি সেখানে রূপায়িত করতে গেছেন তাঁরা তাঁর বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক; ইতিহাসে তাঁদের এ পরিচয় পাওয়া যায় না। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এদের আমদানি করেছেন সেখানে এঁরা ছাড়া অন্য যে কেউই অনুরূপভাবে প্রকাশ পেতে পারতো। তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও মীরকাসিম ও দলনী বেগমের বৃত্তান্ত উপন্যাস অংশে নিতান্ত আলগা হয়ে রয়েছে।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রজনী' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভা সমে ফিরে এসেছে। তিনি ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লোক; তাঁর এ উপন্যাসগুলোতে তিনি সে যুগের এ সমাজেরই প্রতিনিধি হিসেবে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাড়ির চাকর চাকরাণী ছাড়া মধ্যবিত্ত কি নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কোন ছবি তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে দেখি না, সম্ভবত তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে হাশিম সেখ ও রামা কৈতর্বদের প্রতি দূর থেকে সৌখিন সহানুভূতি দেখানো ছাড়া এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোন সচেতনতা ছিল না। এ উপন্যাসগুলোতে নীতিবিদ এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মনের আদর্শের মুখপাত্র হিসেবেই তিনি যেন তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে তাঁরই সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলোতে। শৈবলিনী, রোহিণী, কুন্দ ও হীরা প্রভৃতি চরিত্র তাঁরই পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু তাঁর আদর্শের যূপকাষ্ঠে এরা হয়েছে উৎসর্গীকৃত। নারীর সমাজ-অস্বীকৃত প্রেম ও মানসিক দুর্বলতা বঙ্কিম কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। বৃদ্ধ চন্দ্রশেখরের যুবতী স্ত্রী শৈবলিনীকে তার বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপকে ভালোবাসার জন্য পাগল করে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছেড়েছেন; বাল্যবিধবা রোহিণীকে তার স্বাভাবিক প্রেম-প্রকাশের জন্য গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছে; নগেন্দ্রনাথকে বিয়ে করার জন্য বিধবা কুন্দনন্দিনীকে অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মপ্রচারক। সমাজ ও সংসার জীবনের বাইরে কৃচ্ছ্র সাধনরত 'দেবী চৌধুরাণী'ই তাঁর মতে আদর্শ হিন্দু স্ত্রী। 'রজনী'তে লবঙ্গলতা বঙ্কিমের আদর্শ স্ত্রীদের অন্যতম। এ উপন্যাসগুলোতে বঙ্কিমের দৃষ্টি একদেশদর্শী। জীবনের বহুবিধ জটিলতা এবং মানব সম্পর্কের সুদুর্গম প্রসার এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকাশ তিনি স্বীকার করেন নি। বিদ্যাসাগর নারীর কল্যাণকামনায় এবং নতুন করে হিন্দু সমাজ জীবন রচনায় যখন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিরোধ করবার জন্য সংগ্রামরত, সে সময়েই বঙ্কিম তাঁর সমাজে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রথাম সমর্থন করে প্রাচীন সংস্কারকেই বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

'আনন্দমঠ' 'মৃণালিনী' ও 'সীতারাম' এ তিনটি বঙ্কিমের রাজনৈতিক উপন্যাস। এখানে তিনি হিন্দু হিসেবে তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এর

www.icsbook.info

ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন হিন্দু পাঠক-পাঠিকার গ্রাহ্যতার জন্য-এসব উপন্যাসে জাতি হিসেবে মুসলমানকে হীনমন্য করে চিত্রিত করা হয়েছে। মুসলিম শাসনকেই হিন্দু তথা ভারতের যত দুঃখ ও অমঙ্গলের কারণ বলে তাঁর একটি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। 'আনন্দমঠে' 'বন্দে মাতরম'মন্ত্রে তিনি যে জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেছেন তা নিঃসন্দেহে হিন্দু সমাজকে উদ্দীপ্ত করার জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন এবং সেদিক থেকে বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক বিস্তারের মধ্যে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব; যদিও ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজ প্রায়শ তাঁর প্রতিপাদ্য হয়েছে-কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও এবং সেগুলোর আবর্তের মধ্যে থেকেও তিনি গতিময় উপভোগ্য কাহিনী নির্মাণে সফলকাম হয়েছেন। কুশলী ভাষা-শিল্পী হিসেবে বাংলা শব্দকে চরিত্র বিকাশে সবাক এবং তাৎপর্যময় তিনিই প্রথম করেছিলেন। জীবনের জিজ্ঞাসা এবং অনুচ্চারিত বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বাহন করে বাংলা ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক করলেন।

উপন্যাস ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমুদয় রচনাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা এবং পরিচালনাকে উপলক্ষ করে বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি এবং সমাজ সেবাই ছিলো বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। এ-পত্রিকায় সাহিত্য-বিকাশের নতুন নতুন ক্ষেত্র নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে, লঘু অথচ শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলেন। এ-পর্যায়ে তিনখানি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ রচনা-পুস্তক হিসেবে 'লোকরহস্য' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। সামাজিক বিভিন্ন দোষ নিয়ে এ-গ্রন্থে কৌতুক করা হয়েছে। 'কমলাকান্ত' পুস্তকটির তিনটি অংশ-কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র এবং কমলাকান্তের জোবানবন্দী। 'কমলাকান্তের দপ্তর' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। কমলাকান্ত সংক্রান্ত সকল রচনা একত্রিত হয়ে 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশ পায় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। অক্ষয় কুমার দত্ত কমলাকান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদায়িনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, ক্লেশের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?" মুচিরাম গুড়ের মতো মানুষ রয়েছে যারা অযোগ্য হয়েও সৌভাগ্য বলে অনুচিত সম্মান লাভ করে তাদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিলো। দ্বিতীয় ভাগে আমরা পাচ্ছি 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ' এবং 'সাম্য'। মানব সেবাকে উপলক্ষ করে সমাজের উন্নতিকল্পে এ-গ্রন্থগুলো তিনি রচনা করেন। 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সনে। 'বিবিধ-প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সনে। 'সাম্য' প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সনে। তৃতীয় ভাগে আমরা পাচ্ছি 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা', 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র এ-কয়টি রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রে বিশেষ করে গীতায় তিনি 'সম্পূর্ণ' হিন্দুধর্ম উপলব্ধি করেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর এবং ব্যাপক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৮৬ সনে, 'ধর্মতত্ত্ব' ১৮৮৮ সনে।

www.icsbook.info

'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' প্রকাশ পায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৯০২ সনে, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুসমাজ' গ্রন্থ হিসেবে কখনই প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সাম্প্রতিক কালে বঙ্গদর্শন থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থাবলীতে স্থান দিয়েছে। চতুর্থ ভাগে কয়েকটি সাহিত্য-সমালোচনাকে স্থান দিতে পারি। এগুলোর মধ্যে আছে 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা ' 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ-ভূমিকা' এবং 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী'। এ-তিনটি রচনাই বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা পদ্ধতির দিক-নির্দেশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রচনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেননি, বিষয় উপস্থাপনার পদ্ধতি এবং ভাষা ব্যবহার ও রচনাশৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। পঞ্চম ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যরচনাকে স্থান দিতে পারি, যেগুলোর মধ্যে স্কুল পাঠ্য পুস্তকও আছে।

তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি ব্যতিক্রম। 'কমলাকান্তের দপ্তর'ই তাঁর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এখানে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞান অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের নানা ভুলত্রুটি নিতান্ত স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে সংযত শুভ্র হাস্যরস রসিকতার সাহায্যে এ রসরচনায় তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। বঙ্কিমকে এখানে বেদনা-করুণ জীবনরসিক স্রষ্টা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র দত্ত
(১৮৪৮-১৯০৯)

"সিভিলিয়ান ও দক্ষ প্রশাসনবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছিলেন। কাব্য সাহিত্য, অর্থনীতি ও দর্শন সকল ক্ষেত্রে তাঁর অধিগম্যতা ছিলো। তিনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করেন এবং অন্য অনেক হিন্দু শাস্ত্রেরও অনুবাদ করেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় তৎকালীন অনেক হিন্দু পণ্ডিত হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে গবেষণাকর্মে লিপ্ত হন এবং উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে সত্যব্রত সামশ্রমী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কালীবর বেদান্তবাগীস, হেমচন্দ্র বেদান্তরত্ন, দামোদর বিদ্যানন্দ, আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষিকেশ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। এ-সমস্ত অনুবাদের সাহায্যে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রবল হয়, এবং ভাষার প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। রমেশচন্দ্র মোট ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রথম চারখানি ইতিহাস ভিত্তিক এবং ঐতিহাসিক, শেষের দুটি সামাজিক 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪)। 'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা। (১৮৭৯) ইতিহাস ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম দুটি ইতিহাস ভিত্তিক অর্থাৎ এ দুটিতে কল্পনার আধিক্য আছে, ইতিহাস শুধু পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় দুটিতে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার অধিক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দুটির নাম 'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪)। উভয় উপন্যাসেই পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের সুন্দর রসপূর্ণ এবং সহানুভূতিমূলক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।"

www.icsbook.info

দামোদর মুখোপাধ্যায়
(১৮৫৩-১৯০৭)

"বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যধারাকে যাঁরা প্রবাহিত রেখেছিলেন তাদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি 'মৃন্ময়ী' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার লিখে, এককালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুসরণে তিনি 'নবাব নন্দিনী' উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর দুটি অনুবাদ উপন্যাস বাঙালী পাঠকদের কাছে বহুকাল পর্যন্ত সমাদৃত ছিলো। একটি ওয়ালটার স্কটের 'ব্রাইড অব লাসের মূর' অবলম্বনে রচিত 'কমলকুমারী' (১৮৮৪) অন্যটি উইলকি কলিন্সের 'উম্যান ইন হোয়াইট' অবলম্বনে রচিত 'শুক্লবসনা সুন্দরী' (৩ খণ্ডে ১৮৮৫, ১৮৮৮, এবং ১৮৯০ সালে প্রকাশিত)। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের যে সমস্ত উপন্যাস বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছিল সেগুলো হচ্ছে 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪), 'শান্তি' (১৮৯৩), 'যোগেশ্বরী' (১৮৯৮), 'অন্নপূর্ণা' (১৯০২) 'অমরাবতী' (১৯০৫)। দামোদর বিদ্যানন্দ পরিচয়ে তিনি হিন্দুধর্ম বিষয়ক গবেষণায় রমেশচন্দ্র দত্তের সহযোগিতা করেছিলেন। 'প্রবাহ' নামক একটি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্রের তিনি সম্পাদকও ছিলেন।"

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
(১৮৪৩-১৮৯১)

"তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি স্বদেশ ও স্বসমাজ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। তারকনাথ তাঁর একটিমাত্র উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র সাহায্যে যশস্বী হয়েছিলেন এবং সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছিলেন। সেকালের কুসংস্কারাছন্ন সমাজের এমন বাস্তব জীবন চিত্র আর কেউ তাঁর মতো করে আঁকতে পারেনি। 'স্বর্ণলতা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশের পর 'ক্যালকাটা রিভিউ' এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল, 'স্বর্ণলতাই' বাংলার একমাত্র খাঁটি উপন্যাস; বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলো উপন্যাস নয়, কাব্য।"

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৩৮-৮৯)

"বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক ভ্রমণসাহিত্যের অগ্রদূত। তাঁর 'পালামৌ' নামক ভ্রমণকাহিনী পর্যবেক্ষণের অসাধারণ চাতুর্য বহন করে। তদুপরি নির্মল রসবোধ এবং সহানুভূতি তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট করেছে। ছোট নাগপুরের আদিম অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু এবং মানুষ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মাধুর্যমণ্ডিত ও জীবন্ত হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং 'দামিনী' এ গল্প দুটিতে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস বর্ণিত হয়েছে। 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭) এবং 'মাধবীলতা' (১৮৮৪) তার দুটি উপন্যাসের নাম। 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস কাহিনী।

www.icsbook.info

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(১৮৪২-১৯১৬)

"উনিশ শতকের সূত্রপাতে যখন বাঙালী পাঠকের তৃপ্তির জন্য হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, হাতেম তাঈ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কাদম্বরী ইত্যাদি কাহিনীর আবির্ভাব ঘটেছিলো তখনই বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য রীতির উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যাঁরা এ ধারার পোষকতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্যতম। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে বাংলা ভাষায় তিনি রহস্য গল্পের আমদানী করেছিলেন। জি. এম. রেনল্ড-এর ইংরেজি রহস্য গ্রন্থ অবলম্বন করে তিনি 'হরিদাসের গুপ্তকথা' রচনা করেন। এককালে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ভুবনচন্দ্র চলিত ভাষাকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এ-গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য রহস্য গ্রন্থের নাম, 'মার্কিন 'পুলিশ কমিশনার', ঠাকুর বাড়ির দপ্তর', 'সন্তপ্ত শয়তান', 'লন্ডন রহস্য'। এগুলো সবই বিদেশী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
(১৮৪৭-১৯১৯)

রূপকথার যথার্থ স্বরূপটি অর্থাৎ তার সরল বিশ্বস্ত ভাবটুকু অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় যিনি সর্বপ্রথম অসম্ভবের রাজ্যের মনোরম চিত্রপট উন্মোচন করেন তার নাম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অসাধারণ কল্পনা শক্তির সঙ্গে যথাযথ মাত্রাজ্ঞান এবং সরলতা মিশ্রিত হয়ে তাঁর রচনাকে অনবদ্য করেছে। তাঁর 'কঙ্কাবতী' (বাং ১২৯৯) বাংলা সাহিত্যের জন্য এমন একটি দিক উন্মোচন করেছে, যেদিকে কারোই লক্ষ্য ছিলোনা। তার অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'ফোকলা দিগম্বর' (বাং ১৩০৭), 'মুক্তামালা' (১৯০১), 'ডমরু চরিত' (লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। ত্রৈলোক্যনাথের রচনারীতি তাঁর নিজস্ব রসসৃষ্টির জন্য কথ্য ভাষাকে তিনি লেখ্য ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

সমসাময়িক অন্যান্য লেখক

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে এবং অব্যবহিত পরে যে সমস্ত লেখক তাঁদের বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর সাহায্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়। তাঁদের মধ্যে যে কয়েকজন নানাদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন পর্যবেক্ষণ ধর্মী সামাজিক উপন্যাস রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), যাঁর 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'যুগান্তর' (১৮৯৫) এবং 'নয়নতারা' (১৮৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; বাংলা পল্লী প্রকৃতির সহৃদয় রূপায়ণকারী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) যাঁর 'ফুলজানি' (১৮৯৪) দৈনন্দিন জীবনের মমতাময় আলেখ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য; প্রহসন রচয়িতা ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) যাঁর 'কল্পতরু' বাংলা ভাষার প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস; বিদ্বান ও বিচক্ষণ চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) যিনি তাঁর সকালে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (বাং ১২৮৮) এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি (বাং ১৩০৬) রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

www.icsbook.info

মীর মশাররফ হোসেন
(১৮৪৭-১৯১২)

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের দিকে বাংলা সাহিত্যের পরিণত যুগেই এ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম মীর মশাররফ হোসেন আসরে প্রবেশ করেন। তিনি ১৮৪৭ সনে নদীয়া জেলার গৌরী নদীর তীরবর্তী লাহিড়ীপাড়া গ্রামে এক সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মচরিত 'আমার জীবনী' পাঠে জানা যায় তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথ মশাররফ হোসেনের সাহিত্যগুরু ছিলেন। হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্তা' এবং ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা দুটিতে লিখেই মীর মশাররফ হোসেন হাত পাকান।

মশাররফ হোসেনের পূর্বে বাংলা গদ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মুসলমান সাহিত্যসেবী দেখি না। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য আলোকস্নাত হিন্দু সাহিত্যিকরা উন্নত রস ও রুচিসম্মত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে। বাঙালী মুসলমান তখনও বাস্তবকে স্বীকার করতে পারেনি, তখনও তারা দোভাষী পুঁথি সাহিত্য সৃজনেই ব্যস্ত। এমন সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়েই পরিণত-প্রতিভাসম্পন্ন মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সহিত্যের আসরে নামলেন। তাঁর সমসাময়িক লেখক একমাত্র বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার মিল দেখা যায়।

মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক জীবনে আশ্চর্য নির্লিপ্ততা লক্ষ করা যায়। এ নির্লিপ্ততার অর্থ শিল্পী-জীবনের নিঃসঙ্গতা, সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা নয়। তাঁর সমাজ-সচেতনতা যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর 'জমিদার দর্পণ', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এবং 'বাজিমাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সাহিত্য-গুরু কাঙাল হরিনাথের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল এবং মুসলিম সাহিত্য ও জাতিগতপ্রাণ নবাব আব্দুল লতিফের (১৮২৮-৯৩) নামে তিনি তাঁর 'বসন্ত কুমারী' নাটকও উৎসর্গ করেছিলেন। নওয়াব আবদুল লতিফের উদ্যোগে এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীর সহায়তায় মুসলমানদের কৃষ্টি-সচেতন করে তোলার জন্যে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের দিকে কলকাতায় Mohamedan Literary Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ১৯১১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়। জমিদার কাচারীর ম্যানেজারী উপলক্ষে তাঁকে কলকাতা, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার, ফরিদপুরের পদমদী এবং তাঁর জন্মভূমি কুষ্টিয়াতে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে হয়। সংসার জীবনে কর্মসূত্রে তিনি যখন যেখানেই গেছেন, কাজকর্মের ফাঁকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। জীবনের হৈ চৈ কি মানুষের সঙ্গে দহরম মহরম তিনি খুব পছন্দ করতেন না। তাঁর স্ত্রী বিবি কুলসুমের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা তাঁকে গৃহাশ্রয়ী করে তুলেছিল, এবং কুলসুম বিবিও তাঁর সাহিত্যিক জীবনে নানা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। মীর সাহেবের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে কাঙাল হরিনাথের প্রভাব যেমন সক্রিয় হয়েছিল, পরিণত জীবনে তাঁর স্ত্রীর স্নেহময় প্রভাব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পথ তেমনি সুগম করে দিয়েছে। তাঁর বর্হির্জীবনের নিঃসঙ্গতা অন্তর্জীবনের এ সহধর্মিনীর সাহচর্যে সুধায় ভরে উঠেছিল। তাঁর 'গাজী মিয়ার বস্তানী' 'বিবি কুলসুম' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই সে সংবাদ বিশেষভাবে অবহিত হওয়া যায়।

www.icsbook.info

ইংরেজ রাজসরকারের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের অসহযোগজনিত ওহাবী আন্দোলন যখন প্রশমিত হতে যাচ্ছিল, তাঁর জন্ম সেকালেই এবং উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের দিকে ওহাবীরা যখন শেষবারের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মশাররফ হোসেনের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ তখনই। তিনি মারা যান ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সমসাময়িক কালে। বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হচ্ছে তাঁর জীবদ্দশাতেই। ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মুন্সী মেহেরুল্লা ও শেখ আব্দুর রহিম প্রমুখ মুসলমান সাহিত্যিকের ওপর যেমন পড়েছে এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির যে স্পষ্ট চেতনা দেখা গেছে মশাররফ হোসেনের মধ্যে তা দেখা যায়নি। বঙ্গভঙ্গ যেন রদ না হয় সে জন্যে সেকালের কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমানের মধ্যে একটা যে সচেতনতা ছিল, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনায় তার কিছু আভাসও পাওয়া যায়।

অথচ কি ওহাবী আন্দোলন, কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—এর কোনটিরই কোনও ইঙ্গিত মীর সাহেবের সাহিত্যে পাইনে। না পাওয়ার কারণ তাঁর নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগ। মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে মশাররফ জীবনের এই শৈল্পিক নিষ্ক্রিয়তাকেই আমি নির্লিপ্ততা আখ্যা দিতে চেয়েছি। এই নির্লিপ্ততার কারণ হয়ত-বা এমনও হতে পারে যে, তিনি ইচ্ছে করেই মুসলমানদের এসব জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন; এতে প্রবেশ করে এর অংশভাগী হতে চাননি। তিনি তাঁর সমকালবর্তী ও বয়োকনিষ্ঠ মুন্সী মেহেরুল্লা, কি শেখ আব্দুর রহিমের মতো ইসলাম প্রচারকের ভূমিকায় নেমে আসেননি; এমন কি তাঁদের মতো ইসলামী সাহিত্যও সৃষ্টি করেননি। ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য তাঁর শিল্প-মনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তারই বহির্বিকাশ আমরা দেখি তাঁর 'এসলামের জয়' ও 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থ দুটিতে। 'হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ', 'মদিনার গৌরব', 'মোস্লেম বীরত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থও এই একই মানসিকতাসম্পন্ন। তাঁর ভক্ত হৃদয়ের অনুরক্তি এবং অন্তর্জীবনের স্নিগ্ধকোমল অনুভূতি ইসলামের আদর্শে বিগলিত হয়ে রূপ পেয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রচারধর্মী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির সক্রিয় প্রয়াস নেই।

মশাররফ হোসেন নিম্নলিখিত বইগুলি রচনা করেন।

উপন্যাস :

১। রত্নবতী (২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯, পৃঃ ৬১) ২। বিষাদসিন্ধু (মহরম পর্ব ১৮৮৫, পৃঃ ১০৪; উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭, পৃঃ ১৯১; এজিদবধ পর্ব ১৮৯১, পৃঃ ৪৩) ৩। উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০, পৃঃ ১৯৮) ৪। গাজী মিয়ার বস্তানী (রসরচনা জাতীয়) (১৮৯৯ প্রথম অংশ পৃঃ ৪০০) ৫। এসলামের জয় (প্রবন্ধোপন্যাস) (১৯০৮) (পৃঃ ৩০২)।

নাটক :

১। বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩, পৃঃ ১২৭) ২। জমিদার দর্পণ (১৮৭৩, পৃঃ ৭২) ৩। বেহুলা গীতাভিনয় (যাত্রা ১৮৮৯, পৃঃ ১৩৮) ৪। টালা অভিনয় (যাত্রা ১৮৯৯)।

www.icsbook.info

প্রহসন ঃ

১। এর উপায় কি? (১৮৭৬) ২। ভাই ভাই এইতো চাই (১৮৯৯) ৩। ফাঁস কাগজ (১৮৯৯?) ৪। এ কি? (১৮৯৯?)।

কাব্য ঃ

১। গোরাই ব্রীজ অথবা গোরী সেতু (১৮৭৩, পৃঃ ১৮) ২। সংগীত লহরী (১ম খণ্ড ১৮৮৭) ৩। পঞ্চনারী পদ্য (১৮৯৯) ৪। প্রেম পারিজাত ৫। বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫ পৃঃ ১২৭) ৬। হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫, পৃঃ ৪২) ৭। হযরত হামজার ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫, পৃঃ ২২) ৮। হযরত বেলালের জীবনী (১৯০৫, পৃঃ ৪২) ৯। মদিনার গৌরব (১৯০৬, পৃঃ ১২০) ১০। মোস্লেম বীরত্ব (১৯০৭, পৃঃ ১৯৬) ১১। বাজীমাৎ (১৯০৮, পৃঃ ১৩১) ১২। মৌলুদশরীফ (গদ্যপদ্য পৃঃ ২০৮)।

প্রবন্ধ ঃ

১। গোজীবন (১৮৮৯) ২। আমার জীবনী (আত্মচরিত ১৯০৮-১০; পৃঃ ৩৩৯) ৩। হযরত ইউসোফ (১৯০৮) ৪। বিবি কুলসুম বা আমার জীবনী (১৯১০)।

এছাড়া তিনি 'আজীজন নেহার' নামক মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

মীর মোশার্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' মহরমের বিষাদময় ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত উপন্যাসের স্বাদ ও আবেগযুক্ত গদ্য উপাখ্যান।

'বিষাদসিন্ধু' খাঁটি ঐতিহাসিক নয়, জীবনচরিতও নয়, তেমনি আঁটঘাট বাঁধা বিধিবদ্ধ 'organic plot'-এর উপন্যাস নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগমাখানো এক শংকর সৃষ্টি। এতে উপন্যাসের লক্ষণ আছে প্রচুর, একটা মূল আবেগও আছে, শিথিল বিন্যস্ত প্লটকে একীকরণের চেষ্টা আছে, সংলাপ আছে এবং সমগ্র আখ্যানকে একটা পরিণতি দেবার সজ্ঞান প্রচেষ্টাও আছে। তবু 'বিষাদসিন্ধু' সমালোচনার মাপকাঠিতে কোন বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি নয়।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীর মশার্‌রফ হোসেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপন্যাস জাতীয় রস রচনা, সুলিখিত উপন্যাস নয়। একটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিত্রগুলো বিকশিত হয়নি। অসংখ্য নর-নারী এখানে ভীড় করেছে। কাহিনী অংশের কতকগুলো ক্ষীণ সূত্র ধরে চরিত্রগুলো তাদের ক্রিয়াকলাপ ঘোষণা করেছে। কাহিনীর সুসংবদ্ধতা, তার দৃঢ়-পিনদ্ধ বন্ধন দ্রুত বিস্তার Climax এবং স্বাভাবিক পরিণতি এতে নেই। একটা মূল কাহিনীকে ভিত্তি করে বিভিন্ন চরিত্র আসা যাওয়া করতে পারতো। কিন্তু মশার্‌রফ হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থির সংযমের অভাবই এ গ্রন্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাঁথুনির দিক থেকে 'আলালের ঘরের দুলালের' ঢঙ এর সামঞ্জস্য লক্ষযোগ্য, আর সামাজিক sketch বা নক্‌সা হিসেবে এ গ্রন্থটি 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭), 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' (১৮৬২-৬৩), এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) জাতীয় রচনা। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, কমলাকান্তের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং স্বচ্ছ হাস্যরসিকতা

www.icsbook.info

'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে নেই। 'হুতোম' তদানীন্তন কলকাতার একটি রসরচনামূলক বিচ্ছিন্ন আলেখ্য, 'আলাল' সমাজের রেখাচিত্র সমন্বিত জীবন সমালোচনাজাত অপূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রত্যেকটি দপ্তরই হাস্যরস ও জীবনের অনুধ্যান সঞ্জাত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছবি। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে এ তিনটি গুণই একত্রে দেখা যায়, এ ছাড়াও এর আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে; এর কাহিনী শ্লথবিন্যস্ত ও বিশ্লিষ্ট, ঘটনাংশ পরস্পর নির্ভরশীল নয় বরং বিক্ষিপ্ত; তবু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গাজী মিয়ার সমাজ সচেতন দৃষ্টি একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে ধীর মন্থর গতিতে উন্মিলিত হয়েছে। এতেই আলালের মতো একটি শিথিল বিন্যস্ত উপন্যাসের রস এখানেও পাওয়া যাচ্ছে।

বস্তানীতে বর্ণিত জীবন মশার্‌রফ হোসেনের কাছে শঠতায় ও প্রবঞ্চনায় ভরা বিভীষিকাময়। বাংলাদেশের এক কালের বেদনার্ত সমাজ-জীবনের ব্যথাজর্জররূপ সার্থক শিল্পীর তুলিকায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে তিনি এঁকেছেন। বস্তানীতে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের এক বিরাট ও ব্যাপক পরিধি তাঁর কল্পনার বিহার ক্ষেত্র। তার বর্ণিত জগতের এক একটি অংশ 'অরাজকপুর', 'নচ্ছারপুর', 'আল্লাদগঞ্জ', 'খামখেয়ালীগঞ্জ', 'জমাদ্দার গ্রাম', 'পাতল গ্রাম', 'নেংটি চোরা গ্রাম', 'কুলকুচ নগর'। আত্মীয়-বন্ধুতে সেখানে কলহ, বাসনাস্বার্থের পীড়ায় সে সমাজের মানুষগুলো অন্ধ-মোহজড়িত। ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ। বোনে বোনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। তার সমাজ উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ভঙ্গুর-সামন্ততন্ত্রের অপসৃয়মান ঐশ্বর্য-গৌরবের অহমিকা-মোহাচ্ছন্ন সমাজ। নারীর রূপ-যৌবন নিয়ে মানুষ সেখানে ছিনিমিনি খেলে, একেবারে অন্যকে সম্পদবঞ্চিত করার জন্য জালজুয়াচুরি ও মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হয়। আমলা, ফয়লা, হাকিম, উকিল ও অভিশপ্ত পুলিশ-বরকন্দাজদের দল সুযোগ বুঝেই সেখানে ছোঁ মারে। এই মোহলিপ্ত স্বার্থান্ধ মানুষ নামধারী এক একটি জীবকে মোশার্‌রফ হোসেন কলমের এক একটি খোঁচায় যে নামে ফুটিয়েছেন, তাদের নামই তাদের চরিত্রকে পাঠক সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট করে দেয়।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' 'আমার জীবনী' ও 'বিবি-কুলসুম'-এর মতই মোটামুটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। তবে 'বস্তানী' আত্মজীবনীমূলক রচনা হলেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা; পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর-মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর। দোষেগুণে 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এককালের মানুষেরই জীবনচিত্র। জীবন সমালোচনাই যদি সাহিত্যের নামান্তর হয় তবে সেদিক থেকে 'গাজী মিয়ার বস্তানী' সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি।

মীর মশার্‌রফ হোসেন রচিত 'এসলামের জয়' ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়—ইসলামের শৈশবেতিহাসের কতকগুলো ধারাবাহিক এবং বিচ্ছিন্ন কাহিনী নিয়ে রচিত আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগময়-সন্দর্ভ। 'এসলামের জয়' প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে।

বাংলা গদ্য নির্মাণ-পদ্ধিতেতে মীর মশার্‌রফ হোসেন একই সঙ্গে সমধর্মী কুশলতায় সাধু বাচনভঙ্গী এবং চলিত বাচনভঙ্গী প্রয়োগ করেছেন। একপ্রান্তে সাধুরীতির সুশৃঙ্খল বিন্যাসে প্রদীপ্ত 'বিষাদসিন্ধু', অন্যপ্রান্তে চলিত রীতির বিচক্ষণ সচলতায় 'গাজী মিয়ার বস্তানী'। উভয় রীতিতেই তিনি সমভাবে সফলকাম ছিলেন। 'বিষাদ সিন্ধু'তে নিরূপিত ও সুশৃঙ্খল অন্বয় বন্ধনে একটি আবেগময় ভাষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে চটুল কথকতায় সাধারণ জীবনের উজ্জীবন ঘটেছে।

www.icsbook.info

শেখ আবদুল লতিফ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী মুসলমানদের তরফ থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃজনের কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর মশার্‌রফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মেল হকের নাম চিরস্মরণীয়। এঁদের সমসাময়িক কালে অর্থাৎ মীর মশার্‌রফ হোসেনের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের কিছু পরে এবং শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মেল হকের পূর্বে শেখ আবদুল লতিফ নামক আর একজন প্রবন্ধলেখক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছেন। 'মানব সংস্কারক' বা 'সংসার ধর্ম' নামে তাঁর একটিমাত্র প্রবন্ধের বই পাওয়া গিয়েছে। এটি প্রকাশিত হয় মেদিনীপুর থেকে ১২৮৫ সাল অর্থাৎ ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি 'মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা', 'রাজত্ব ও জমিদারী', 'আদালত', 'সৈন্য', 'কৃষক', 'ধনী ও দরিদ্র', 'নারী জাতি' এবং 'মনুষ্যজীবন' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

একটা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন, মানুষের অশিক্ষার জন্য বিলাপ করেছেন; মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যে তিনি পীড়িত হয়েছেন। আমাদের জাতীয় অধঃপতন ও ভাগ্যহীনতার জন্য তিনি ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। একটি প্রবন্ধে তাঁকে উল্লেখ করতে দেখি—

'অনেকে মনে করে যে ধনী ও দরিদ্র হওয়া মানুষের অদৃষ্ট, সংসারের আবশ্যক, ঈশ্বরের অজ্ঞাতেই কেহ ধনী ও কেহ দরিদ্র হয়। —ঈশ্বরের নিকটেও কি একটি সম্মুখে, একটি পশ্চাতে, একটি প্রিয়, একটি অপ্রিয়—ধর্ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় বেতন গ্রহণ না করিলে, অন্যের অপহরণ না করিলে, অন্যকে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত না করিলে কখনই ধনী হওয়া যায় না?'

এ গ্রন্থটি প্রকাশের বছর তিন চারেক পূর্বে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এ কথাগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতের কিছুটা প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শেখ আবদুল লতিফই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'দেশের কর্ম বিদেশীয় ভাষায় সম্পাদন' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি একে 'এক বিচিত্র তামাশা' বলে অভিহিত করেন। তাঁর কথায়—

'দশ জনের জন্য এক লক্ষ লোক অন্য ভাষা শিক্ষা করে, দশ দশ বৎসর সময় নষ্ট করে, ইহা অপেক্ষা কঠিন পাপ, অধিক অপমানের বিষয় আর কি হতে পারে?'

বঙ্কিমচন্দ্র ও মীর মোশার্‌রফ হোসেনের সমকালীন লেখক হিসেবে শেখ আবদুল লতিফের মতামতের উদারতা, চিন্তার শৃঙ্খলা এবং ভাষার পরিচ্ছন্নতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়।

শেখ আবদুল লতিফের জীবন বা তাঁর অন্য কোনো রচনা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা

(১৮৫৮—১৯০৩)

ফয়জুন্নেসা ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম গাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ফয়জুন্নেসা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁর স্বামী মুহম্মদ গাজী চৌধুরীর তিনি দ্বিতীয় পক্ষের

www.icsbook.info

স্ত্রী ছিলেন। মুহম্মদ গাজী চৌধুরীর প্রথম স্ত্রী ও কন্যা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর আগ্রহ দেখে ফয়জুন্নেসার মা তাঁর সঙ্গে ফয়জুন্নেসার বিবাহ দিয়েছিলেন। ফয়জুন্নেসার দাম্পত্য জীবন এর ফলে বিষময় হয় এবং পরিশেষে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। ব্যাধি ও অন্তর্জীবনের অশান্তিই ফয়জুন্নেসার সাহিত্য-সাধনার অন্যতম কারণ।

তিনি পরোপকারী ও সমাজ-সেবিকা ছিলেন। সমাজের কল্যাণে সাধন তাঁর ব্রত ছিল। তাঁর গ্রাম পশ্চিম গাঁয়ে তিনি বিদ্যালয়, পথঘাট, মসজিদ ও মুসাফিরখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর কন্যা বদরুন্নেসা ও দৌহিত্রের সঙ্গে হজ করতে যান এবং পবিত্র মক্কা শরীফেও একটি মুসাফিরখানা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রিপুরা জেলার উন্নতিকল্পে তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি ব্যয়বহুল পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ফয়জুন্নেসা উক্ত পরিকল্পনার ব্যয়ভার নিজেই বহন করেন। সেজন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাঁকে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন। সারা বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি এ খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

ফয়জুন্নেসার একটি মাত্র সাহিত্যকীর্তি 'রূপজালাল' নামক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের পরিচয় পাই। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর অন্তর্দাহ প্রকাশ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি কবিতারও আশ্রয় নিয়েছেন। 'রূপজালালে' নওয়াব ফয়জুন্নেসার কবি-প্রতিভার পরিচয় বিধৃত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এ মহিলা কবি-সাহিত্যিক তাঁর এ-বইটি দিয়েই সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মর্যাদার আসন দাবী করতে পারেন।

আর্জমন্দ আলী চৌধুরী

সিলেট জেলার ভাদেশ্বর গ্রামে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের দিকে আর্জমন্দ আলী চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর সে সময়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি কবি ও সংগীতজ্ঞও ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে তিনি 'প্রেমদর্পণ' নামক একটি উপন্যাস লেখেন। 'প্রেমদর্পণে'র মুদ্রণকাল ১০ই এপ্রিল, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ; পত্র সংখ্যা ৭৯। এ উপন্যাসটিই বাঙালী মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য বিষয় একটি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে একটি মুসলমান যুবকের প্রেম। তাছাড়া গ্রন্থকারের নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী এবং তাঁর বেদনাময় জীবনের ইতিবৃত্তও 'প্রেমদর্পণে' রূপ পেয়েছে। এ উপন্যাসটির সাহিত্যিক মূল্য যেমনই হোক না কেন, ইতিহাসের দিক থেকে বাঙালী মুসলমান রচিত উপন্যাসের মধ্যে এরও একটি বিশেষ স্থান আছে। আর্জমন্দ আলী সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি বহু গান ও কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর 'হৃদয় সঙ্গীত' নামক কাব্যে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি মারা যান।

মুন্সী গোলাম কীবৃরিয়া

ইনি শেখ আবদুর রহিমের মামা। আবদুর রহিমের চেয়ে বয়সে ষোল বছরের বড়ো ছিলেন। গোলাম কীবৃরিয়ার জন্ম হয় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে।

www.icsbook.info

'উচিত কথা' নামে গদ্যপদ্যে রচিত তাঁর একটি বই পাওয়া যায়। 'উচিত কথা'র প্রকাশকাল ১৮৯০ সন। এটি রসরচনা জাতীয় বই, এতে বর্ণিত হয়েছে ভণ্ড ফকীরদের কাহিনী। প্রায় আড়াইশ পৃষ্ঠার এ বইটিতে চারটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে পেঁচা ও পেঁচীর মাতার বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফক্‌রে মতের কাণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে ফক্‌রে মতের কথা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে খ্রীস্টধর্মের বিবরণ রয়েছে। এ বইটিতে লেখকের এক অদ্ভুত অপরিচ্ছন্ন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দেখেছেন সংসারে নারী কুক্রিয়াসক্ত ও পুরুষ-প্রবঞ্চক; প্রতারণা-অভিলাষিণী আর কুমন্ত্রিণী ও ব্যভিচারিণী', "তাহারা ছলনা করিয়া পুরুষ লোকের বুদ্ধি হরণ করিয়া লয়।" পুরুষ এহেন নারীর মোহাবিষ্ট হয়ে কিভাবে সংসার ধর্ম পালন করে সে সব বৃত্তান্তই তিনি 'উচিত কথা' নাম দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি সুখপাঠ্য তো নয়ই, বরঞ্চ রুচিদুষ্ট। ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া এর সাহিত্যিক কোন মূল্য নেই।

মোজাম্মেল হক
(১৮৬০—১৯৩৩)

বাংলা গদ্যের পরিণত যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম লেখকদের অন্যতম ছিলেন মোজাম্মেল হক। তিনি ১৮৬০ সনে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বহুকাল সাহিত্য সাধনা করে ১৯৩৩ সনে পরলোক গমন করেন। তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে তিনি এক বছরের বড়ো ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের উন্মেষের সমসাময়িককালেই মোজাম্মেল হক বাংলা কাব্য সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসংগীত' এবং মোজাম্মেল হকের 'কুসুমাঞ্জলি' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। মোজাম্মেল হক গদ্য ও পদ্য রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেও, এবং মুসলিম-সমাজের জাগরণমূলক 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্য ও হযরত মহাম্মদের জীবনী অবলম্বনে 'হযরত মোহাম্মদ' শীর্ষক কাব্য রচনা করলেও তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটেছে গদ্যে। সে কারণে তিনি গদ্যলেখক হিসেবে যতটা খ্যাতিসম্পন্ন, কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ততটা সুবিস্তৃত নয়।

মোজাম্মেল হকের গদ্য রচনার পথ বিচিত্র। তিনি জীবনচরিত এবং উপন্যাস রচনা করেছিলেন এবং পারস্য সাহিত্য থেকে অনুবাদও করেছিলেন। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলো এখনও বাংলার নানা স্কুলে পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। মোজাম্মেল হক রচিত এ বইগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১. মহর্ষি মনসুর, (১ম সংস্করণ, ১৮৯৬) পৃঃ ৯০।)
২. ফেরদৌসী চরিত (১ম সংস্করণ, ১৮৯৮, পৃঃ ৮৮), ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১১ সনে। এ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২২।)
৩. তাপস কাহিনী (২য় সংস্করণ, ১৯১৪, পৃঃ ১১০।)
৪. খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (১৯১৮)।
৫. হাতেম তাঈ (১৯১৯)।
৬. টীপু সুলতান (১৯৩১)।
৭. বড়পীর চরিত।

www.icsbook.info

অনুবাদ ঃ

শাহনামা ১ম খণ্ড, ১৯০৯ (সং?) পৃঃ ৩৩৫।

উপন্যাস ঃ

১. দারফখাঁ গাজী (ধর্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৯১৯)।

গঙ্গাভক্ত হিন্দু নরনারীর পরমপ্রিয় 'দরাফখাঁর গঙ্গাস্তোত্রের' তথাকথিত রচয়িতা ত্রিবেণী-বিজয়ী ধর্মাত্মা জাফর খান গাজীর প্রকৃত জীবনী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

২. জোহরা (১৯১৭)।

৩. রঙ্গিলাবাঈ (অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত। 'জোহরা' উপন্যাসের ভূমিকায় এ বইটির সংবাদ আছে। মোজাম্মেল হক তাঁর বন্ধু দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপদেশে উপন্যাস লিখতে উৎসাহী হয়ে এ গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। কিন্তু 'নানা পারিবারিক দুর্ঘটনায়' এ উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

এ ছাড়া তিনি ১৩০৭ সালে (১৯০০) 'লহরী' নাম দিয়ে একটি কবিতার মাসিক পত্রিকা এবং ১৩২৭ সালের (১৯২০) বৈশাখ থেকে 'মোসলেম ভারত' নামক একটি মর্যাদাবান সাহিত্য পত্রিকা প্রচার করেছিলেন। তাঁর 'লহরী'র প্রধান লেখক ছিলেন ডি. এল. রায়, 'মোসলেম ভারতে'র ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই 'মোসলেম ভারতে'ই কবি হিসেবে নজরুলের প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'মোসলেম ভারত' ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত চলেছিল।

মোজাম্মেল হকের 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৬) এবং 'তাপস কাহিনী' (১৯০০)-র কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করছি। 'বড়পীর চরিত' সম্বন্ধে কিছু বলা না হলেও এটি উক্ত পর্যায়েরই রচনা। ইসলামের সুফী দরবেশদের অধ্যাত্ম্য জীবনের মাহাত্ম্য ঘোষণাই মোজাম্মেল হকের এ গ্রন্থগুলো রচনার উদ্দেশ্য ছিল। এঁদের নিছক বহির্জীবনের ঘটনা ব্যাখ্যা গ্রন্থকারের অনভিপ্রেত ছিল; সূফী দর্শনের সাধনায় মানুষের অন্তর্জীবনের কিভাবে শুভ্র সুন্দর বিকাশ সাধিত হয় মোজাম্মেল তারই ব্যাখ্যা করেছেন এ বইগুলোতে।

'ফেরদৌস চরিত' (১৮৯৮) এবং 'শাহনামা' (১৯০৯) দুটো ভিন্ন বই হলেও একই সঙ্গে পাঠ্য। ভারতের 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এবং গ্রীসের 'ইলিয়াড' 'ওডেসী'র মতো পারস্যের মহাকাব্য 'শাহনামা'। ফেরদৌসী তুসী এ গ্রন্থের রচয়িতা। এ জন্যে ফেরদৌসীকে The Homer of the East বলা হয়। শাহ্নামায় প্রাক্-ইসলামী যুগের পারস্য সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত কাব্যাকারে গ্রথিত হয়েছে। প্রাচীন পারস্যের জাতীয় জীবনের বিবিধ দিক এই কাব্যে ফেরদৌসীর অভাবনীয় কাব্যপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মোজাম্মেল হকের 'শাহনামা' ফেরদৌসীর মূল-কাব্যের প্রথমাংশের অনুবাদ। বাংলা সাহিত্যে মোজাম্মেল হকের এ অনুবাদ এক অমর কীর্তি। আর 'ফেরদৌসী চরিত' শাহ্নামা রচয়িতা ফেরদৌসী তুসীরই বিচিত্র কৌতুককর ঘটনাপূর্ণ জীবনচরিত।

'টীপু সুলতান' (১৯৩১) মহীশূর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে স্বাধীনতার একমাত্র জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টীপু সুলতানের জীবন কাহিনী। এ

www.icsbook.info

গ্রন্থে মোজাম্মেল হকের গবেষণা-প্রবণতা বা পাণ্ডিত্যাভিমান নেই, তবু তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে সত্য প্রকাশ করতে যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন। স্বাধীনতা সূর্যের শেষ রশ্মি অসীম সাহসী টীপুর ব্যর্থতার কাহিনীই অপূর্ব বেদনা দিয়ে মোজাম্মেল হক তাঁর এ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

'জোহরা' উপন্যাসে মুসলমান সমাজের এক বেদনাময় দিকের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। গ্রামাঞ্চলে কন্যাপক্ষের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা আজও মে৻ কিংবা মেয়ের মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে কৌশলে মেয়েকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং জোর জবরদস্তি করে অনেক সময়ে বিয়ে দিয়েও থাকে। এর পরিণাম বর কন্যা উভয়ের জীবনেই বড়ো ভয়াবহ। বর-কন্যার জীবনের মঙ্গলের দিকে এতে লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে নিজেদের জেদ এবং গোঁ বহাল রাখবার দিকে। সমাজের এ ক্লেদাক্ত পরিবেশে 'জোহ্‌রা'র মতো একটি নিরপরাধ ছোট মেয়ের জীবনে যে দুঃখ ঘনিয়ে এসেছিল, অসাধারণ মমতা দিয়ে মোজাম্মেল হক এ উপন্যাসে তা এঁকেছেন। চিরন্তন মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্দ্বে অমঙ্গলের পরাজয় এবং মঙ্গলের জয় যে অবশ্যম্ভাবী মোজাম্মেল হক তাও এখানে দেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। উপন্যাসে বনজঙ্গল, ডাকাতদের চটী, তাদের কীর্তিকলাপ এবং জোহরার বিপদ থেকে বিপদান্তরে পতিত হওয়া, বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলার' অনেক ঘটনা ও দৃশ্যাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'জোহরা' উপন্যাসটি এ ধরনের নানা রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত।

ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলিম মানসের সঙ্গে মোজাম্মেল হকের নাড়ির সংযোগ ছিল। আলোচ্য জীবনচরিতগুলোতে, 'শাহনামা'র অনুবাদে এবং উপন্যাসটিতেও তাঁর স্বীয় কৃষ্টিসচেতনতা পরিষ্কারভাবেই ধরা পড়েছে। ইসলামী সাহিত্য স্রষ্টা এবং ইসলাম প্রচারক 'সুধাকর দলের' সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তিনি তাঁদের কাছে আসা যাওয়াও করতেন কিন্তু তাঁদের মতো একজন হয়ে ইসলাম প্রচারের পথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি। মুসলিম কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপরে ভিত্তি করে কিভাবে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় এবং মুসলিম সমাজ-জীবন সুষ্ঠু সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় মোজাম্মেল হকের লক্ষ্য ছিল সেদিকেই। এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরি মীর মশার্‌রফ হোসেনের সঙ্গেই তাঁর মিল সমধিক।

বিষয়বস্তুর নির্বাচনে মোজাম্মেল হক যেমন ইসলামী ট্র্যাডিশন', মিথোলোজী বা পুরাণ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, ভাষা ব্যবহারেও তেমনি তাঁর মধ্যে অভিজাত মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর সমগ্র গদ্য রচনায় সুরুচির ছাপ আছে এবং বক্তব্যের মধ্যেও আছে পরিচ্ছন্নতা। সংস্কৃতানুসারী জমাট বাঁধা ক্লাসিক্যাল শব্দের রূপ ও ধ্বনিগাম্ভীর্যই তাঁর চিত্তকে মোহিত করেছে। তাঁর 'ফেরদৌসী চরিত' ও 'শাহ্‌নামার' যে ভাষা তার বাহ্য সৌষ্ঠব ও অপরূপ বলিষ্ঠতা যেমন বিস্ময়কর, ধ্বনিব্যঞ্জনাও তেমনি শ্রুতিসুখকর। তাঁর গদ্য ভঙ্গীতে কোথাও আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই, তা অত্যন্ত সাবলীল এবং প্রসাদগুণমণ্ডিত। আশ্চর্য হই এ কথা ভেবে যে, তিনি একই হাতে বিদ্যাসাগরী এবং বঙ্কিম গদ্যের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। মশার্‌রফ হোসেনের গদ্য অত্যন্ত বেগবান, কিন্তু ফেনানো। মোজাম্মেল হকের গদ্য জমাট বাঁধা তবু জড়তালেশহীন। ভাষা ব্যবহারে মনে হয় মোশার্‌রফ হোসেনের চেয়েও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বেশি। ভাষা ব্যবহারে তিনি সচেতন শিল্পী ছিলেন; তাই দেখি এ ভাষাই তাঁর হাতে উত্তরোত্তর

www.icsbook.info

সহজতর হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষের দিকে লেখা 'টীপু সুলতান'-এ ব্যবহৃত ভাষাই আমাদের এ উক্তির সাক্ষ্য বহন করছে।

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
(১৮৬২—১৯৩৩)

এ সময়ের আর দু'জন লেখক সম্বন্ধে অনেকেরই তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এঁদের একজন মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এবং আর একজন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহ্মদ মাশ্হাদী। এঁরা দু'জনই সুধাকর দলের সুধী-প্রধান শেখ আব্দুর রহিমের সহকর্মী। সেজন্যেই স্বতন্ত্রভাবে এঁদের দু'জনের সাহিত্যিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী আর রচিত সাহিত্যের মূল্যমান বিচার সব সময় সহজ নয়। সাহিত্যিক সহধর্মিতার জন্যে একের লেখা অন্যের বলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বস্তুত হয়েছেও তাই। নাজিরুল ইসলাম 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস'-এ রেয়াজুদ্দীন মাশ্হাদীর লেখা 'সমাজ ও সংস্কারক' ও 'অগ্নি কুক্কুট' বই দু'টিকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল শহরের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার রূপসা গ্রামের জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর স্নেহ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আই. এ, পাস করেন। তাঁর আর লেখাপড়া হয়নি। দ্বীন ইসলামের সেবা করার উদ্দেশ্যে এর পর তিনি ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা আসেন এবং একই উদ্দেশ্যের সাধক মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন এবং শেখ আবদুর রহিমের সঙ্গে মিলিত হন। কিছুকালের জন্য তিনি 'মুসলমান', 'নবসুধাকর' ও 'ছোলতান' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন এবং শেখ আবদুর রহিমের সঙ্গে 'এসলাম তত্ত্ব' বের করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা ইসলামী সাহিত্য শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের রচিত গ্রন্থাদি ঃ

১. তোহফাতুল মুসলেমীন।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তদানীন্তন আরবি ও পারসী ভাষার অধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন আহমদের সহযোগিতায় রেয়াজুদ্দীন আহমদ এ বইটি লিখেছিলেন।

২. গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৯, ১৯০৯। এটি কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নয়, বহুসংখ্যক ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা পুস্তক, সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদি অবলম্বনে সংকলিত। তুরস্কের সুলতান গাজী আবদুল হামিদ খানের শৌর্যবীর্যের কাহিনী এবং তুর্কীদের হাতে গ্রীকদের পরাজয় বার্তাই এই বই-এর উপজীব্য।

৩. কৃষক বন্ধু (কাব্য) ঃ গরীব শায়ের ছদ্মনামে গ্রন্থকারের পরিচয় ছিল এবং এ ছদ্মনামে বহু কবিতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাদেশের কৃষকদের দুর্গতির কথা সহানুভূতির সঙ্গে এ গ্রন্থে কবিতাকারে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৪. হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনচরিত (১৯২৭), (৪র্থ সং, ১৯৪৮ পৃঃ ৪১৬)।

www.icsbook.info

৫. হজরত ফাতেমা জোহরার জীবনচরিত।

৬. মোসলেম পাক প্রণালী (১ম ও ২য় খণ্ড)।

৭. আমার সংসার জীবন। তাঁর পিতার নাম ছিল মায়াজউদ্দীন আহ্মদ। এ গ্রন্থে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'এবনে মায়াজ'। গ্রন্থটি অনেকটা স্মৃতিকথার মতো।

৮. জঙ্গে রুম ও ইউনান। ছন্দে রচিত ইতিহাস গ্রন্থ।

৯. হকনছিহত।

১০. জোলেখা।

১১. বৃহৎ হীরকখানি।

১২. উপদেশ রত্নাবলী।

১৩. জোবেদা খাতুনের রোজনামচা।

১৪. বিলাতি মুসলমান।

১৫. আমিরজানের ঘরকন্না।

১৬. পাকপাঞ্জতন।

১৭. মুসলিম সাহিত্যের ইতিহাস।

এ গ্রন্থগুলোর নাম দৃষ্টেই বোঝা যায় তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক ও মুসলিম দরদী ছিলেন। বাঙালী মুসলিম বিশ্ব মুসলিমেরই একাংশ। মুসলিম জাহানের উন্নতি অবনতির সঙ্গে বাঙালী মুসলিমের ভাগ্যও জড়িত, এ বোধই সাহিত্যিক জীবনের প্রেরণা-স্বরূপ ছিল। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহ্মদ মাশ্হাদী

(১৮৫৯—১৯১৮)

মাশ্হাদী নিজের নাম লিখতেন এভাবে—'রেয়াজ-আল্-দিন আহমদ মাশ্হাদী'। তিনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী। তাঁর লেখা 'সুরিয়া বিজয়' নামে একটি ইতিহাস পাওয়া যায়। পণ্ডিত মাশ্হাদীর সহকর্মী শেখ আবদুর রহিম এ 'সুরিয়া বিজয়'-এর প্রকাশক। 'সুরিয়া বিজয়' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটিতে হযরত আবুবকর কর্তৃক সিরিয়া অভিযান ও বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশ্হাদীর অন্যান্য বই ঃ

১. সমাজ ও সংস্কারক (১৮৮৯)।

২. অগ্নিকুক্কুট (১৮৮৯)।

৩. প্রবন্ধ কৌমুদী (১৮৯১)।

পন্ডিত মাশ্হাদী মুসলিম জগতের বিপ্লবী পুরুষসিংহ জামালুদ্দীন আফগানীর জীবনী, তাঁর চিন্তাধারা ও মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থে। গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নিজস্ব উদার মতেরও প্রকাশ করেছেন। এটি পণ্ডিত মাশ্হাদীর শ্রেষ্ঠ রচনা। রচনাভঙ্গী গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী। তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন ১২৯৬ সালে অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। ৮০নং ওল্ড বৈঠকখানা রোড কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮। মুসলিম সমাজকে সংঘবদ্ধ করে তোলা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জামালুদ্দীন আফগানীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় দান এ

www.icsbook.info

গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এ অগ্নিগর্ভ গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে না হতে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

'অগ্নিকুক্কুট' তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। এর অর্থ 'আগুনের কুণ্ড'। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমান কর্তৃক গো-হত্যার বিরুদ্ধে হিন্দু বাংলায় আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। কলকাতা টাউন হলেও প্রতিবাদ সভা হয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার্থে এবং হিন্দু চিত্ত জয়ের অভিলাষেই মীর মশাররফ হোসেন এ সময়ে 'গো জীবন' নামক তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকটি রচনা করেন। প্রাচীন বৈদিক সমাজের হিন্দুরা 'গো মাংস ভক্ষণ করতো', শুধু তা-ই নয়, অতিথি সৎকার ও মুনি ঋষিদের আদর আপ্যায়নে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বেলে পাইকারীভাবে গোহত্যা করে মনের আনন্দে তারা গো মাংস আহার করতো; এর ওপরেও ছিল 'গোমেধ যজ্ঞ'। সুতরাং এ যুগের হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর অহেতুক খড়গহস্ত হবে কেন আর মশাররফ হোসেনের মতো মীর সাহেবরা তাদের রোষ নিবারণের জন্যে মুসলমানদের উপদেশ খয়রাত করতে যাবেন কেন, তারই ঝাঁঝালো আলোচনা রয়েছে 'অগ্নিকুক্কুট' বইটিতে। মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গে স্বজাতির মান-সম্মানের প্রশ্নে পণ্ডিত মাশ্‌হাদীর যে বাদানুবাদ হয়, তা শেষ পর্যন্ত মামলার রূপ নিয়ে কোর্ট-কাছারী পর্যন্ত পৌঁছে।

তার সহকর্মীদের মতো পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশ্‌হাদীও যে ইসলামী মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন তাঁর লেখা থেকেই তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এখানেই এঁদের প্রধান সহকর্মী শেখ আবদুর রহিমের 'প্রণয় যাত্রী' বইটির উল্লেখ করে এ পরিচ্ছেদ শেষ করি। 'প্রণয় যাত্রী' (২য় সং ১৩২৭ সন, ১৯২০ খ্রীঃ, পৃঃ ৯০) ওয়াশিংটন আরভিং-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'টেল্‌স্ অব আলহামরা'র 'পিল্ গ্রিম্‌জ্ অব্ লাভ' নামক গল্পটির অনুবাদ। এ সম্বন্ধে শেখ আব্দুর রহিম নিজেই বলেছেন—'ইহা বর্তমান সময়ের পাঠকগণের রুচিকর হইবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ। তবে জাতীয় সাহিত্যের অভ্যুদয় যুগের একটি আদর্শ যাহাতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, সেই জন্যই পুস্তকখানি পুনরায় প্রকাশ করিলাম।'

গ্রন্থকার যেমনই বিষয় প্রকাশ করুক না কেন, 'প্রণয়-যাত্রী' যে একটি সুখপাঠ্য বই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গল্পটিতে স্পেনের আলহামরা প্রাসাদের একটি রোমান্স সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্য

মুহম্মদ আবদুল হাই
পুণর্লিখন ঃ সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

ইসলামী সাহিত্য
(ক)
ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক রচনা

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা গেছে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে ইংরেজরা ফারাজী ও ওহাবী প্রভৃতি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করে। এর পরের বিশ থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিষ সংক্রমিত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের মধ্যেও তা অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু মুসলমান খ্রীস্টান হতে থাকে। অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগ করে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণে সেদিন মুসলমানদেরও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

হিন্দু সমাজকে শতাব্দীর শুরুতে এ ধরনের খ্রীস্টানধর্ম-মুখিতা থেকে বাঁচিয়েছিলেন রামমোহন। শতাব্দী শেষে মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন যশোর নিবাসী বাগ্মীপ্রবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তাঁরই হাতে দীক্ষিত ধর্মান্তর গ্রহণকারী মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। এঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় বক্তৃতা করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ আশাতীত ফল লাভ করেছিলেন।

বাঙালী মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দান অবশ্য অশেষ, কিন্তু তিনি কিংবা তাঁর অনুগামী জমিরুদ্দীন সংঘবদ্ধভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি সেদিন করতে পারেননি। এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ যুগের বাঙালী মুসলমানকে ইসলামমুখী করে তুলেছিল একটি বিশেষ দল। সে দলটিকে 'সুধাকর দল' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহম্মদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশ্‌হাদী, বসিরহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।

আর্থিক ও সাংসারিক প্রলোভনে পড়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানেরা যে সেদিন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা থেকে তাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল তাদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এতে সিদ্ধি লাভ করার জন্যে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা এবং সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ধর্ম ও কৃষ্টিমূলক বিষয়বস্তুর আলোচনা করে মুসলিম জনসাধারণের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রশস্ত পথ।

www.icsbook.info

উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ এ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কলকাতায় একটা দল বাঁধলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রথমত মুসলিম কৃষ্টি এবং ইসলামের তত্ত্ব-কথা সংক্রান্ত কতকগুলো বই-এর অনুবাদ করে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জালালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত 'নেচার এবং নেচারিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করে 'এসলাম তত্ত্ব' নাম দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। এর অল্পদিন পরেই মাওলানা আবদুল হক হাক্কানীকৃত 'তফসিরে হাক্কানী'র উপক্রমণিকাভাগ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বিষয়সমূহ অনুবাদ করে এঁরাই 'এসলাম তত্ত্ব' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন। 'এসলাম তত্ত্ব' (বা মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ) এর প্রথম খণ্ড ১২৯৪ সাল, আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫ সাল—১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'এসলাম তত্ত্ব' খণ্ডাকারে ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো বলে অনেকেই একে মাসিক পত্রিকা মনে করতেন। এসলাম তত্ত্ব খুব বেশি দিন চলেনি। তবু এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং বর্ধমানের কুসুমগ্রামের জমিদার মুন্সী মোহাম্মদ এবরাহিমের অর্থানুকূল্যে শেখ আবদুর রহিম এবং মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৯৬ সালের (১৮৮৯) আশ্বিন মাসে প্রথম সংখ্যা 'সুধাকর' প্রকাশিত হলো।

'সুধাকর' পত্রিকা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছিল। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। সেকালে বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম-বিরোধী লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব লেখা লিখতেন, 'সুধাকরে' তার প্রতিবাদ বের হতো।

'সুধাকর' দল সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি পথে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কেউ যে অগ্রসর হয় নি, তা নয়। এ দলের বহু আগে থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আগে শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে দেখা যায়। তাঁর 'ভাবলাভ' এবং 'উচিত শ্রবণ' ১৮৬৫ সালের আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় এঁরা যেমন করে মেতেছিলেন এবং প্রাণঢালা সাধনা করেছিলেন, এঁদের আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন জাতীয়তাবোধও তাঁদের আগের কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে এমনভাবে ফুটে ওঠেনি। এঁরা আরবি ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন, হযরত মহাম্মদের এবং অন্যান্য পীরপয়গম্বরের, খলিফাদের এবং তাঁর সাহাবীরা এবং ওলি আল্লাদের জীবনী লিখেছেন, ইসলাম ধর্মের গৌরবগাথা রচনা করেছেন, তার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহির্জীবনের প্রকাশে যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এঁদের এ বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে এঁরাই সে জাতিকে ঘরমুখো করেছিলেন এবং নিজেদের চিনতে সহায়তা করেছিলেন। এক কথায় এ 'সুধাকর' দলই যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। অন্য কথায় মুসলিম

www.icsbook.info

জাতি এবং এ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা এঁদেরই হাতে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 'সুধাকর' দলের ভূমিকা এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে হবে। পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের জন্যে এঁরা পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং সে কারণেই আমাদের জাতীয় জীবনেও নবীন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন এবং বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নব গৌরবের সূচনা করেছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান কাল পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাঁদের কৃতিত্ব বিচারের পর সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁদের প্রদর্শিত পথে যে সাহিত্য বাংলায় রচিত হয়েছে, এর পরে তার ধারাবাহিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মোটামুটিভাবে এ শাখার নাম ইসলামী সাহিত্য শাখা রাখা যেতে পারে। এ শাখায় মৌলিক গ্রন্থ, অনুবাদ, জীবনী সাহিত্য, দর্শন ও তত্ত্বালোচনা এবং হাদীস ও কোরআনের অনুবাদ, সংকলন ও আলোচনা পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে। একই উদ্দেশ্যের পরিপোষক বলে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত না করে 'ইসলামী সাহিত্য' শীর্ষক একই পরিচ্ছেদে এর সবটুকুরই আলোচনা করা যেতে পারে।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
(১৮৬১-১৯০৭)

এ শাখার শুরুতে পাচ্ছি, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে। তিনি যশোহর জেলার অধিবাসী ছিলেন। সংঘর্ষ মানুষের শক্তি বৃদ্ধির কারণ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন সাধারণ মোল্লা মানুষ। অথচ খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষের ফলেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়েছিল। পাদ্রী জমিরুদ্দীনের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তাঁর বাদানুবাদ হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব পত্রিকায়' জন জমিরুদ্দীন 'আসল কোরআন কোথায়?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত সালের ২০শে ও ২৭শে চৈত্র এবং পরবর্তী বৎসরের ২রা বৈশাখ ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩০০ সাল) 'সুধাকর' পত্রিকায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'ঈষায়ী বা খ্রীস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন' নামক একটি গবেষণামূলক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে মুন্সী মেহেরুল্লা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে জমিরুদ্দীন কর্তৃক উত্থাপিত ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দেন। ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে পরাজিত হয়ে জন জমিরুদ্দীন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মুন্সী জমিরুদ্দীন নাম নিয়ে ইসলাম প্রচার ও রক্ষায় তাঁর সহকর্মী হয়ে ওঠেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অন্যান্য বই ঃ

১. খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬)
২. মেহেরুল ইসলাম (১৮৯৭)
৩. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার (৩য় সং ১৯০০)
৪. পান্দেনামা (২য় সং ১৯০৮)
৫. হিন্দু ধর্ম-রহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৬)।
৬. খ্রীস্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ।
৭. রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫)।

www.icsbook.info

৮. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস্ ফ্রেঞ্চের 'এসলাম গ্রহণ' (সংগৃহীত)।

৯. শ্লোকমালা।

মুসলিম সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'মেহেরুল ইসলাম' বাংলা পুঁথির ধরনে লিখিত। এই পুস্তকের গোড়াতে হযরত রসূলে করিমের 'নাত' বা স্তুতি বন্দনা আছে। আজও বহু বক্তা বা ওয়ায়েজ দরুদশরীফের মতো এগুলো আবৃত্তি করে থাকে। উক্ত গজলের শুরুতে এবং শেষে এ রকমের ধুয়া আছে ঃ

গাওরে মোসলেমগণ, নবীগুণ গাওরে।
পরান ভরিয়া সবে সল্লেআলা গাওরে॥

'মেহেরুল ইসলাম' পুস্তকখানির একটা অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। এর ভাষা অত্যন্ত সরল এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য অথচ রচনায় লালিত্য ও মাধুর্যের অভাব নেই।

তাঁর বিখ্যাত 'রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' নামক পুস্তকটি খ্রীস্টান পাদ্রীগণের আক্রমণের পাল্টা জবাবস্বরূপ খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছিল। এ পুস্তকটিতে মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজ সেবা এবং খ্রীস্টান ধর্মের কবল থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের রক্ষা করাই ছিল তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল প্রেরণা।

মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন
(১৮৭০-১৯৩০)

মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ইসলাম ধর্ম প্রচারে মুন্সী মেহেরুল্লাহর সহচর ছিলেন। নদীয়ার মেহেরপুর মহকুমার গাঁড়োডোবা গ্রামে তিনি ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু সেকালের খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর সঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে আবার ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধর্ম প্রচার ও রক্ষা কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তাঁর 'রদ্দে খ্রীস্টান' সম্পর্কিত পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' (সংকলিত), পৃঃ ৫৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৭ (১৯০০ খৃঃ)। হিন্দু ও খ্রীস্টানেরা ইসলামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু লিখেছেন তার কিছু অংশ গ্রহণ করে তিনি পরধর্মাবিলম্বীদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবার জন্য এ বইটি বের করেছিলেন। এ বইটির চতুর্থ সংস্করণ ১৩২২ সালে এবং পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় নদীয়া গাঁড়াডোবা থেকে ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৩ সালে। তিনি এ বইটি উৎসর্গ করেছিলেন নদীয়া-চাঁপা-তলা নিবাসী ইসলামধর্মপ্রাণ মুন্সী মোহাম্মদ ফজলে করিম ওরফে মোহাম্মদ ফুলবাস সাহেবকে।

তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বই 'ইসলামী বক্তৃতা'। এটি অনুবাদ সংকলন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮। ১৩২২ সালে তৃতীয় সংস্করণ বের হয়।

www.icsbook.info

তৃতীয় বই 'শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। এটিই মুন্সী জমিরুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এ বইটিতে একদিকে হযরত মহাম্মদের জীবনী আলোচনা ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে তিনি খ্রীস্টান পাদ্রীরা কিভাবে মুসলমানদের ধোঁকায় ফেলে খ্রীস্টান করতো তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

তাঁর কবিতার বই 'শোকানল' (পৃঃ ২৪)-এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। এ ছাড়া 'আসল বাঙ্গালা গজল' নাম দিয়ে দরূদ শরিফ ও মোনাজাত (পৃঃ ৪৮, ১৩১৫ সাল) সংকলন করেন। 'বিশুদ্ধ খতনামা' (পৃঃ ৩৬) নামেও তাঁর একটি পুস্তিকা ছিল।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে জমিরুদ্দীন একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'মেহের চরিত' (১৯০৭ খ্রিঃ) নামক পুস্তিকায় এ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। এছাড়া তিনি ধর্মপ্রচারমূলক আরও কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর নামের শেষে 'বিদ্যাবিনোদ ও কাব্যনিধি' উপাধি ব্যবহার করা হতো।

শেখ আবদুর রহিম
(১৮৫৯-১৯৩১)

উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের আলো এবং সুধাকর দলের সুধী প্রধান ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ, নিষ্ঠা এবং সাধনা তাঁর মতো আর কারুর ছিল না। সাহিত্য সাধনা ছিল তার জীবনের মহান ব্রত। মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশা যে শুধু তাকে পেয়ে বসেছিল, তা নয়, বাঙালী মুসলমান যে এক বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এবং মানব সভ্যতায় ইসলাম যে সুমহান দান রেখে গেছে, সে সম্বন্ধে বাঙালী মুসলমানকে অবহিত করতে হলে তার নিজ মাতৃভাষায় তার নিজস্ব সাহিত্য তাকে রচনা করতে হবে এ সত্যও তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সেজন্যই জাতির সেবায় তিনি নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। 'Literature, in a word, was with him not so much an end in itself but as a means to a further end, which was national not individual.' আবদুর রহিমের পক্ষে এ কথা যে কত সত্য, সেকালের বাঙালী মুসলমান সমাজ ও বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই তার মর্মানুধাবন করতে পারেন।

শেখ আবদুর রহিম রচিত গ্রন্থাদি ঃ

১. হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি (ফাল্গুন ১২৯৪ সাল, ১৮৮৭ খ্রীঃ) পৃঃ ৯৫৮।

২৮ বছর বয়সে লিখিত শেখ আবদুর রহিমের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে।

প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী এ বৃহৎ গ্রন্থখানির নাম থেকেই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর এবং গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হযরতের জীবনী এবং ইসলামধর্মের মূলনীতি এ গ্রন্থে সুবিন্যস্ত এবং পুংখানুপুংখভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া স্থান ও

www.icsbook.info

কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তারও বিশ্লেষণ তিনি এ গ্রন্থে করেছেন। এটিই শেখ আবদুর রহিম রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

২. 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (History of the Moslem World)।

'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদিনের সময় হইতে মুসলমান ধর্ম ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিক ইতিহাস) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে। 'হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' এবং 'ইসলামের ইতিবৃত্ত' একত্রে মিলিয়ে শেখ আবদুর রহিম মুসলিম জগতের পূর্ণ ইতিহাস রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর কথায় 'হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' ইসলামের ইতিবৃত্তের প্রথম খণ্ডরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। তৎপর খলিফাগণের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডরূপে গৃহীত হইবে।' এ ইতিবৃত্ত খেলাফায়ে রাশেদীন থেকে আরম্ভ করে বনি ওম্মিয়া, বনি আব্বাসিয়া, বনি ফাতেমিয়া এবং স্পেনের বনি ওম্মিয়া প্রভৃতি প্রাচীন বংশের ইতিবৃত্ত এবং প্রত্যেক বংশের শাসনকালে তাদের রাজনীতি, সমাজ নীতি, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পবিজ্ঞান ও ধর্ম-বিস্তৃতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হবার কথা ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষ, চীন, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে ইসলাম বিস্তৃতি ও মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্তও ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হতো। এ সুবৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে প্রতি মাসে খণ্ডাকারে ইসলামের ইতিবৃত্ত বের করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৩১৭ সাল অর্থাৎ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বের হবার পর, আমাদের দুর্ভাগ্য যে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৩. ইসলাম-নীতি, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৫, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)। কোরআন ও হাদীসের উপদেশাবলী (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

৪. নামাজ তত্ত্ব বা নামাজ বিষয়ক যুক্তিমালা (পৃঃ ২০০) ১৩০৩ সাল, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ)।

৫. হজবিধি-১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০ (১৩১০ সাল, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ)।

৬. রোজাতত্ত্ব (পৃঃ ১৩০), (১৩৩৪ সাল, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ) ঃ এতে রোজার আবশ্যকতা, মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য ও উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় কোরআন ও হাদীস শরীফ থেকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং রোজার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ যুক্তি ও তর্ক দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে।

৭. খোৎবা (অর্থাৎ জুম্আ, ঈদুল ফেতর, ঈদুজ্জোহা ও বিবাহের খোৎবা) রচনা ১৩৩২ এর পূর্বে, প্রকাশ ১৩৩৯ সাল অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে (পৃঃ ৬৪)।

৯. এসলাম তত্ত্ব।

এছাড়া পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশ্হাদী রচিত 'সুরিয়া বিজয়' তিনি প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটি ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'সুরিয়া বিজয়' হয্রত আবুবকর সিদ্দিক কর্তৃক সিরিয়া বিজয়ের কাহিনী।

ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সম্পর্কে এ বইগুলো ছাড়াও তিনি 'ওয়াশিংটন আরভিং'-এর 'টেলস্ অব্ আল্ হামারা'র 'পিলগ্রিমজ্ অব লাভ্' নামক গল্পটির অনুবাদ করে 'প্রণয়-যাত্রী' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে এর আলোচনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

শেখ আবদুর রহিম কত বড়ো সাহিত্যব্রতী ছিলেন এসব পত্রপত্রিকার সম্পাদনা থেকে তার আরও সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

১. সুধাকর (সাপ্তাহিক)।
২. মিহির (মাসিক)।
৩. মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক)।
৪. হাফেজ (মাসিক)।
৫. মোসলেম প্রতিভা (মাসিক)।
৬. মোসলেম হিতৈষী (সাপ্তাহিক)।
৭. ইসলাম দর্শন (মাসিক)।

শেখ আবদুর রহিম ১৩৩৬ সালের (১৯২৯ খ্রীঃ) মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত পাঁচ সংখ্যায় বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধটিতে সেকালের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এবং সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ আলোচনার প্রয়াস তিনি পেয়েছেন।

শেখ আবদুর রহিমের সমগ্র সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য কীর্তির পথে তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে জাতির জন্যে ঐকান্তিক দরদ এবং বাংলা সাহিত্য সাধনায় বাঙালী মুসলমানের উদাসীনতার জন্য তীব্র বেদনাবোধ। এমন স্বজাতি স্বধর্ম ও স্বসাহিত্যপ্রাণ বাংলা সাহিত্যসেবী মুসলমান খুব কমই দেখা গেছে। তাঁর চিন্তায় পরিচ্ছন্নতা ছিল, সে জন্য তাঁর বলার ভঙ্গীও ছিল সুস্পষ্ট এবং জোরালো, তার ভাষার বাঁধন শিথিল নয়, গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী এবং ছন্দোময়, প্রকাশভঙ্গী সাবলীল এবং তীক্ষ্ম। বাংলা ভাষায় তাঁর যে অসাধারণ অধিকার ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী
(১৮৭৫-১৯৫০)

মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি রংপুর জেলার একটি সিনিয়ার মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত হন এবং কর্মবহুল জীবনযাপন করার পর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন। চট্টগ্রামের অপর নাম 'ইসলামাবাদ'। কর্মজীবনে তাই 'ইসলামাবাদী' খেতাব দিয়েই তিনি সমধিক পরিচিত।

তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ সেবক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বক্তা। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সভ্য হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণও করেছিলেন এবং কৃষক প্রজা আন্দোলনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে 'জমিওতে ওলামায়ে হিন্দের' বাংলা শাখার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

সমাজ সেবক মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীর শ্রেষ্ঠকীর্তি চট্টগ্রামের 'কদম মোবারক' মসজিদ-সংলগ্ন এতিমখানার স্থাপনা।

www.icsbook.info

মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রধানত ইতিহাসমূলক রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এ শাখায় তার স্থান দেওয়ার কারণ তার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনই তিনি ইসলাম ও বিশেষত তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তার রচিত বাংলা সাহিত্যে ইসলামমুখিতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর রচিত পুস্তকগুলির নাম ঃ

(১) ভারতে মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪) (২) নেজামুদ্দিন আউলিয়া (১৯১৬) (৩) তুরস্কের সুলতান (১৯১৮) (৪) ভারতে ইসলাম প্রচার (৫) মুসলমানের অভ্যুত্থান (৬) সমাজ সংস্কার (৭) খগোলশাস্ত্রে মুসলমান (৮) ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমান (৯) কনস্টানটিনোপোল (১০) আওরঙ্গজেব (১১) মোসলেম বীরাঙ্গনা (১২) কোরআনে স্বাধীনতার বাণী (১৯৩৯) (১৩) ইসলামের উপদেশ (১৪) ইসলামের পুণ্য কথা প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি বই বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল; স্বতন্ত্র বই আকারে এখনো প্রকাশিত হয় নি। তাঁর 'নেজামুদ্দিন আওলিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ 'শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান', 'মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার' প্রভৃতি। এছাড়া 'নিম্নশিক্ষা ও শিক্ষাকর' (প্রথম সংস্করণ ১৯৪০) প্রভৃতি পুস্তিকার ও অসংখ্য ভাষণ এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে।

'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। বইটির মোট অধ্যায় সংখ্যা দশ। মুসলমান শাসনকালে ভারতে কি কি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল মুনীরুজ্জামান তার যথাযথ উল্লেখ করেছেন এ বইটিতে। মুসলমান সভ্যতা ভারতকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। স্থাপত্য বিদ্যা, শাসন-ব্যবস্থা, বিদ্যাশিক্ষার বহুল বিস্তার এবং সাহিত্য সাধনার পথ সুগম করে মুসলমান রাজা-বাদশারা বিশ্বের দরবারে ভারতকে কিভাবে সমুন্নত করে তুলেছিলেন, গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী তার বিশ্লেষণ করেছেন।

'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের তিনি বড়ো আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয় নি। কবি গোলাম মোস্তফা পরিচালিত 'নও বাহার' পত্রিকায় গ্রন্থটির কয়েক অধ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। মুনীরুজ্জামানের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং রচনারীতিও বলিষ্ঠ। 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' গ্রন্থটি থেকে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা হল ঃ

"অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ও তাঁহাদের পদানুসরণকারী এতদ্দেশীয় লেখকগণ ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পরম শত্রু এবং তাদের প্রতি নিতান্ত অনুদার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন মুসলমান শাসনাধীন ভিন্ন জাতীয় প্রজা সাধারণের প্রতি মুসলামন নরপতিগণ কঠোর ব্যবহার করিতেন। তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতেন।"

"ইসলামধর্ম ও কার্যক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যবহার সম্পর্কে এ উক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানগণ ভিন্ন জাতীয় প্রজা সাধারণকে ধর্মে-কর্মে ও রাজ্যের ব্যাপারে যেরূপ স্বাধীনতা ও উচ্চাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।"

www.icsbook.info

উর্দু ভাষায় প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একমাত্র মৌলানা শিবলী নোমানীই ইসলামের ইতিহাস রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় ইসলামের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে মৌলানা শিবলী নোমানীই ছিলেন মুনীরুজ্জামানের আদর্শ।

T.W. Arnold-এর Preaching of Islam গ্রন্থের আদর্শে ও অনুসরণে মৌলানা মুনীরুজ্জামান তাঁর 'ভারতে ইসলাম প্রচার' গ্রন্থটি রচনা করেন। ভারতে ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত ব্যাপারে হিন্দুরা যেভাবে ইসলাম বিরোধী মনোভাব ও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা পেয়েছে, মৌলানা মুনীরুজ্জামান এই বইটিতে তা খণ্ডন করবার যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছেন।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য ও বিরোধ তার মূর্ত ও জীবন্তরূপ আমরা দেখি শিবাজী ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে। মুনীরুজ্জামান তাঁর 'আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক এবং আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিচার করেছেন।

হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমসাময়িককালে এবং তার পরেও মুসলিম বীরাঙ্গনাগণ কিভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন এবং পুরুষদের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়েছেন তার বর্ণনা করে বাঙালী মুসলিম মহিলারাও যাতে সেভাবে অনুপ্রাণিত হন, তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তাঁর 'মোসলেম বীরাঙ্গনা' বইটিতে। মুসলমানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কামনাই ছিল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের স্বপ্ন ও সাধ, কিন্তু তাদেরকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য বোধ হয় তাঁর ছিল না।

মৌলানা মুনীরুজ্জামান সুধাকর দলের মুখপাত্র মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন ও পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন মাশ্‌হাদীর স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনে এঁদের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। ১৯১১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র গঠন ব্যাপারে তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বাঙালী মুসলমানকে সচেতন করার জন্যে জীবনের ব্রত হিসেবে সাংবাদিকতা গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি প্রথমে সাপ্তাহিক 'সোলতান' এবং পরে দৈনিক 'সোলতান' সম্পাদনা করেন। প্রথমে 'মিহির ও সুধাকর'-এ লিখেই তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। পরে 'আল্-ইসলাম' (১৯১৫-২১) প্রভৃতি সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি দৈনিক 'আমীর' নামক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। মুনীরুজ্জামান ছিলেন প্যান ইসলামাবাদী। কি করলে মুসলিম জাতি আবার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্য কীর্তির মধ্যে তাঁর চিন্তার এ বলিষ্ঠ ধারা সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

দীন মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৫৩-১৯১৬)

দীন মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু। তাঁর নাম ছিল মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। এ কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান বরিশাল জেলার নথুল্লাবাদ গ্রামের বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত নোয়াগাঁও গ্রামের মৌলানা

www.icsbook.info

ফৈজদ্দিন লস্করের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সেই গ্রামে বহু বৎসর বাস করেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর মৌলভী দীন মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরিচিত হন। দীন ইসলাম সম্পর্কে তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন। পাবনা জেলার সুজানগর থানার অন্তর্গত তাড়াবাড়িয়া গ্রামে ১৯১৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'ক্রুসেড ও জেহাদ' (১ম খণ্ড) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি ১৩১৫ সাল অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা থেকে আবদুল লতিফ কর্তৃক সামযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'ক্রুসেড্ ও জেহাদ'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৮+এগার। এ বইটি ইতিহাসভিত্তিক রচনা।

শেখ আবদুল জব্বার
(১৮২৮-১৯১৮)

ইসলামী ইতিহাস ও তমদ্দুনমূলক রচনা শাখায় ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার অন্তর্গত বনগ্রামনিবাসী শেখ আবদুল জব্বারের নাম উল্লেখ করবার মতো। ছাত্র অবস্থাতেই শেখ আবদুল জব্বারের প্রবন্ধাদি 'মিহির ও সুধাকর' এ প্রকাশিত হতো। এ পর্যায়ে তাঁর লেখা—

১. 'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৩১৩ সাল-১৯০৬ খ্রীঃ) ২. 'ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র' (আশ্বিন, ১৩১৪ সাল-১৯০৭ খ্রীঃ) ৩. 'মদিনা শরীফের ইতিহাস' (১৩১৪ সাল) ৪. 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩১৫ সাল, ১৯০৮ খ্রীঃ) ৫. 'আদর্শ রমণী'-১ম ভাগ (১৩১৬ সাল, ১৯০৯ খ্রীঃ) ৬. 'জেরুজালেম বা বয়তুল মকাদ্দাসের ইতিহাস' (১৩১৭ সাল, ১৯১০ খ্রীঃ) ৭. 'আদর্শ রমণী'-দ্বিতীয় ভাগ (১৩১৯ সাল, ১৯১২ খ্রীঃ) ৮. 'হজরতের জীবনী' (১৩২০ সাল, ১৯১৩ খ্রীঃ) ৯. 'নূরজাহান বেগম' (১৯১৩ খ্রীঃ) ১০. 'দেবী রাবেয়া' (১৯১৩ খ্রীঃ) এবং ১১. 'গাজী' (১৩২৪ সাল, ১৯১৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি অনেক কয়টি পুস্তকের সাক্ষাৎ পাই।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন তাঁর 'বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা' ২য় খণ্ডে 'আদম-হাওয়া' ও 'স্বপ্ন বিচার' নামক আরও দুটি বইয়ের নাম করেছেন এবং তৎপ্রণীত 'হজরতের জীবনী' ও 'দেবী রাবেয়া'র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ শেখ আব্দুল জব্বার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি সাহিত্যের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি না বলিলেও তাঁহার অবদানরাজি চিরকাল ঘোষণা করিবে। আমাদের সমাজে তিনি একজন অদ্ভুত লোক ছিলেন।" (সাধনা, চট্টগ্রাম)

'দেবী রাবেয়া'র ভূমিকায় সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছেনঃ "বঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও সুলেখক মৌলভী শেখ আব্দুল জব্বার সাহেব মনোহারিণী ভাষায় সরস বর্ণনায় মহাতপস্বিনী রাবিয়া দেবীর মধুর জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।"

সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করা শেখ আবদুল জব্বারের ব্রত ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ও প্রকৃতি থেকে তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

www.icsbook.info

মুন্সী আবদুল লতিফ

মুন্সী আবদুল লতিফ বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অধীন জামতাপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উনিশ শতকের সাত কি আট দশকের দিকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৬ সালের ৩১শে জানুয়ারি। বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে তিনি একজন কংগ্রেসভক্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন। তা সত্ত্বেও সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানের সেবায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'জোলেখা' ১৯১০-১১ সালে প্রকাশিত হয়। কোরআনের সূত্র ধরে তিনি এ গ্রন্থে ইউসুফ-জোলেখার অমর প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কোরআনের উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ১৯১৬-১৭ সালে। আবদুল লতিফের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'ঐতিহাসিক চরিত্র জেব্‌ন-নেসা বেগম' বাংলা ১৩৩৫ সাল মোতাবেক ইংরেজি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু লেখক আওরঙ্গজেব-দুহিতা জেবুন্ নিসার চরিত্রে যে দোষারোপ করেন, আবদুল লতিফ ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তি তর্কের সাহায্যে তা খণ্ডন করেন। তাঁর এ বইটিতে গবেষকের শ্রমশীলতা ও নিষ্ঠার ছাপ রয়েছে। এছাড়া 'আল এসলাম' পত্রিকাতে তাঁর লেখা 'মোস্তফা চরিতালোচনা' বছর দেড়েক ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল লতিফের ভাষা ছিল মার্জিত সরল এবং সাবলীল।

কাজী আকরাম হোসেন

(১৮৯৬-১৯৬২)

বাংলা ভাষায় যাঁরা ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের সঙ্গে খুলনার কাজী আকরাম হোসেনের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত 'ইসলামের ইতিহাস' রচনারীতির দিক থেকে ক্লাসিকের মর্যাদা পাবার যোগ্য। আরব জগতে ইসলামের উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে স্পেন ও ভারতে কিভাবে ইসলামের বিস্তার সম্ভব হয়েছে কাজী আকরাম হোসেন ঐতিহাসিকের সততা এবং সাহিত্যিকের মন নিয়ে তার বিশদ এবং মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। 'ইসলামের ইতিহাস' তাঁর হাতে যথারীতি সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

এছাড়া 'যুগবাণী' নামক কাব্য গ্রন্থে তিনি ইকবালের কবিতার অনুবাদ করেন। মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর বিখ্যাত 'মসনবী' গ্রন্থের কিয়দংশের কাব্যানুবাদ (১৯৪৬) এবং শেখ সা'দীর 'করীমা' বা 'পাদনামা'র কাব্যানুবাদ (১৯৪৬) বাংলা ভাষায় কাজী আকরাম হোসেনের উল্লেখযোগ্য দান। তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে শিক্ষা বিভাগে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে খুলনা আর. কে. গার্লস কলেজে তিন বছর অধ্যক্ষের কাজ করেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে কাজী আকরাম হোসেন ঢাকায় হোসেনী দালান এলাকায় নিজ বাসভবনে ১৯৬২ সালে এন্তেকাল করেন।

www.icsbook.info

(খ)

ইসলামের মর্মব্যাখ্যা, তাসাও্ওফ
ইসলামী নীতি ও সমাজজীবন সংক্রান্ত রচনা

গিরিশচন্দ্র সেন

(১৮৩৪-১৯১০)

ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে নববিধানের প্রবর্তনকারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কয়েকজন অনুবর্তীকে বিভিন্ন আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সেন এবং গৌরগোবিন্দ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র ইসলামের সাধনা ও সংস্কৃতির আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঢাকা জেলার পাঁচদোনা গ্রামে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (১৮৮১-৮৬) এবং মিশ্‌কাত শরীফের প্রায় অর্ধাংশের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

গিরিশচন্দ্র ইসলামী বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর গুরু কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায়। এ বিষয়ে কেশব সেনও ব্রাহ্মধর্মের আদি প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু, খ্রীষ্ট ও' ইসলাম ধর্মের এক অপরূপ সমন্বয়। ভারতে এ ধর্ম সমন্বয়-সাধন-মানসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দূরদর্শী ও মুক্তবুদ্ধি রামমোহন প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছিলেন।

হিন্দু ও খ্রীষ্টান শাস্ত্র সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় যে-সব আলোচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই এখনও রক্ষিত আছে। কিন্তু তাঁর মুসলিম শাস্ত্রাদি সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের হস্তগত হয়নি। তবু তাঁর 'তোহ্‌ফাতুল মুয়াহ্‌হেদীন' গ্রন্থে এবং তাঁর রচনার নানাস্থানে ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উক্তি ও আভাস-ইংগিত থেকে তাঁর চিত্তের উপরে মুসলিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ অনেকখানি বুঝতে পারা যায়। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতীক উপাসনার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এবং খ্রীষ্টান সমাজের ত্রিত্ববাদের প্রতিও তার বিরূপতার মূলে কোরআনের শিক্ষাই সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।

ব্রাহ্মরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক এবং স্রষ্টায় বিশ্বাসী। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে মুসলমানদের সঙ্গেই ব্রাহ্মদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। মুসলমান ভক্ত সাধকদের চরিত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মরা তাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করতে এক সময়ে মোটেই কুণ্ঠিত ছিল না। মুসলমান ওলি-আল্লাদের তপোনিষ্ঠা, ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেমমত্ততা এবং আধ্যাত্মিক ভাব সাধনার তুলনা বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। এঁরা মুসলমানদের গৌরবের আশ্রয় হলেও মানুষ মাত্রেরই ভক্তিভাজন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র এঁদের জীবন-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন এবং পুণ্যব্রতে অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলমান তাপসদের জীবনী আলোচনা করেছেন।

www.icsbook.info

'শারহোল কল্‌ব', 'কল্‌ফোল আস্রার', 'মারফতোর রফস' এই তিনটি গ্রন্থে মুসলমান ওলি-আল্লা ও সুফী দরবেশদের জীবনচরিত বিবৃত হয়েছে। এ সব গ্রন্থের সার সংকলন করে মওলানা ফরিদুদ্দিন আত্তার'তাযকেরাতুল আওলিয়া' নামক ফারসী ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বন করে 'তাপসমালা' লেখেন। তাঁর তাপসমালা 'তাযকেরাতুল আওলিয়া'র আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও মূলত অনুবাদই। কোন কোন স্থানে ভাবানুবাদ এবং কোন কোন স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ। তাছাড়া বাহুল্য বোধে অনেক জায়গা তিনি বাদ দিয়েই অনুবাদ করেছেন।

'তাপসমালা'য় ছয় খণ্ডে ছিয়ানব্বই জন ওলি-আল্লার জীবনী আলোচিত হয়েছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের 'তাপসমালা'-রচনার কাজ শেষ হয়। প্রতি খণ্ডেরই পাঁচের অধিক সংস্করণ হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় 'তাপসমালা' জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা ভাষায় 'তাপসমালা' রচনা গিরিশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় দান। তিনি বাংলা সাহিত্যের সূফী দরবেশের জীবনী আলোচনা করে এ শাখার গোড়াপত্তন করেন। তাঁর পর বহু মুসলমান লেখকই মুসলিম পীর দরবেশ ও তাপসের কাহিনী রচনা করেছেন।

এছাড়া গিরিশচন্দ্র সেন দিওয়ান-ই-হাফিয্‌, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, মকতুবাত-ই-মখদুম শরফউদ্দিন মুনিরী, মস্‌নভী-ই-রুমী, মন্তিকুত্‌তয়র, কিমিয়া-ই সাদাত, গুলশন-ই আস্‌রার পুস্তকগুলোর আংশিক অনুবাদ করেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলো মৌলিকভাবে রচনা করেন 'মহা-পুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম', 'চারিজন ধর্মনেতা' (পৃঃ ৮৮), 'এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনী', 'মহাপুরুষ চরিত' (১ম ভাগ), 'মহাপুরুষ চরিত (২য় ভাগ) (হয্‌রতের জীবনী) এবং 'চারিটি সাধ্বী মুসলমান নারী।' ভাই গিরিশচন্দ্রের ইসলাম সম্পর্কিত অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ সংখ্যা মোট একুশটি।

'তত্ত্বরত্নমালা' (বা তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধীয় রচনাবলী) ভাই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পারস্য পুস্তক 'মন্তিকুত্‌তয়র' ও 'মসনবি মৌলবী রোম' থেকে সংকলিত। সবটা অনুবাদ নয়, অনেকস্থানে মূলের ভাবমাত্র অবলম্বন করে 'তত্ত্বরত্নমালা' লিখিত হয়েছে। ১৯১৪ সনে এ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট গল্পের আকারে এ গ্রন্থে নানা নীতিকথা ও শিক্ষণীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এতে নীরস তত্ত্ব ছাড়াও এমন অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে, যা চিত্তকেও প্রফুল্ল করে।

সুধাকর দলের সুধীবৃন্দ যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামী সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই তার উৎকৃষ্ট ফল ফলেছিল। কলকাতায় বসে এ গুণীগণ বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচার করবার এবং বাঙালী মুসলিম জনসাধারণকে হেদায়েত করে তাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছিলেন। ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'এসলাম তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতে এ লিটারারী সোসাইটির কার্যকলাপ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রসারিত করারও প্রয়াস হয়েছিল। এরই সমসূত্রে হজরত মখদুম শাহের আভাসভূমি রাজশাহীতে 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম' এবং 'নূর-অল-ঈমান' নামক সমাজ সংগঠনমূলক দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলামের' প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নূর-অল্‌-ঈমা' সমাজ। আরবের সেই বিখ্যাত 'এখওয়ানোস

www.icsbook.info

ছাফা' নামক সমাজের অনুকরণে এবং বিদ্যানুরাগী ইংরেজ রাজপুরুষদিগের স্থাপিত 'এসিয়াটিক সোসাইটি' সমাজের কিছু সাদৃশ্যে উত্তরবঙ্গে (রাজশাহীতে) 'নূর-অল-ঈমান' সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর পুত্র মীর্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী খুব সম্ভব 'নূর-অল্-ঈমান' সমাজের সম্পাদক ছিলেন। 'নূর-অল-ঈমান' মাসিক পত্রিকা 'নূর-অল-ঈমান' সমাজের ছিল মুখপত্র। বাংলা ১৩০৭ সালের আষাঢ় মাসে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) এ মাসিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মুসলমানদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে আসাই ছিল 'নূর-অল্-ঈমান' সমাজ এবং তার মুখপত্র 'নূর-অল্-ঈমান' পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি 'নূর-অল্-ঈমান' সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত এবং মীর্জা ইউসুফ আলী কর্তৃক 'শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জীকৃত' হয়।

এ সমাজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী রহ্মতুল্লাহ্র 'কিমিয়া সাআদাৎ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন মৌলভী মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী স্বয়ং। দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়া সাআদাৎ' পাঁচ খণ্ডে রচিত। বাংলায় প্রথমত পাঁচ খন্ডের অনুবাদ সাত ভাগে প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য সাত ভাগকে প্রত্যেক খণ্ডের অনুগামী করে পাঁচ খন্ড করা হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই এ অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছিল। অনুবাদক মীর্জা ইউসুফ আলী 'কিমিয়া সাআদাৎ'-এর উপযুক্ত বাংলা নাম দিয়েছেন 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'। পাঁচ খণ্ডের অনুবাদ দেড় হাজার পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। খণ্ডগুলোর নাম 'দর্শন পুস্তক', এবাদত পুস্তক', 'ব্যবহার পুস্তক', 'বিনাশন পুস্তক' ও 'পরিত্রাণ পুস্তক'।

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়-পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের এবং খোদার সঙ্গে একাত্ম হবার পথ বা ব্যবহার-বিধি। মানুষ জগতে কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। সংসার পথে ধীরে ধীরে চিত্ত শান্ত ও আত্মদমন করে মনুষ্যত্ব কিভাবে বিকশিত হতে পারে, মুসলমানের ধর্ম জীবনে ইসলামের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার-বিধিও মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কিভাবে সহায়ক হতে পারে,'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'তে তার সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ছোট থেকে বড়ো হয় কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে না; তার জন্য প্রয়োজন হয় সাধনার। ইসলাম প্রদর্শিত পথে সংযম, শালীনতা, চরিত্রোন্নতির পথ ধরে সোপানে সোপানে কিভাবে মানুষ তার চরম লক্ষ্য আল্লাহ্তে পৌঁছার 'সৌভাগ্য' লাভ করে, তারই অনুপম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'কিমিয়া সাআদাৎ' গ্রন্থে। মীর্জা ইউসুফ আলী সুন্দর ও সাবলীল বাংলা গদ্যে 'কিমিয়া সাআদতে'র অনুবাদ করে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' নাম দিয়েছেন। শুধু ইসলামী বিষয়বস্তু বলে নয়, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেও 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' এক মহত্তর অবদান। এছাড়া মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় তার ইঙ্গিত দিয়ে মীর্জা ইউসুফ আলী 'দুগ্ধ সরোবর' নামেও একখানি 'কওমী পুস্তিকা' প্রণয়ন ও প্রচার করেছিলেন। ১৩০৭ সালের (১৯০০ খৃঃ) 'নূর-অল্-ঈমান' পত্রিকায় এ বইটির সমালোচনা হয়েছিল।

এ সময়েই (১৯০৩) যশোরের খড়কী নিবাসী মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল করিম 'তাসাওয়াফ' সম্বন্ধে 'এরশাদে খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব' (পৃঃ ২৯৮) নামক একটি মৌলিক বই রচনা করেন। আবদুল করিম নিজের নক্শবন্দীয়া তরীকার একজন কামেল সূফী সাধক। মোহাম্মদ আবদুল করিমের 'খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বে'র মতো বাংলায় তাসাওয়াফ

www.icsbook.info

সম্পর্কিত সুলিখিত বই আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। মোহাম্মদ আবদুল করিম ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এন্তেকাল করেন-তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বের' চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এ ধারার অর্থাৎ 'মারিফাত' বা সুফী সাধনা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় লিখিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মুন্সী আজিমউদ্দিন রচিত 'খোলাছাতুল মারিফাত' (১৮৬৮)। মোহাম্মদ মল্লিক রচিত'আখবারুল মারিফাত' (১৮৭৬)। মওলানা শামসুল হক রচিত 'তালিমুদ্দীন' (৫ম সং ১৯৬৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) 'তাপস কাহিনী' (১৯০০ খ্রীঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৪) এবং 'মহর্ষি মনসুর' (১ম সংস্করণ, ১৮৯৮ পৃঃ ৯০) স্মরণীয়। মোজাম্মেল হক তাঁর 'তাপস কাহিনী'তে 'হযরত আবদুল কাদির', 'নিজাম উদ্দীন আউলিয়া. 'ইমাম জাফর সাদেক', 'ইব্রাহিম আদহাম বল্খী', 'তপস্বী ফাজিল আয়াজ', 'তপস্বী বশর হাফী' ও 'দরবেশ আবু হেফ্স্' প্রমুখ সাতজন মহাতপা আউলিয়ার জীবন কাহিনী তাঁদের ধ্যান-ধারণা, অলৌকিক তপোনিষ্ঠা ও খোদাপ্রেমের বিষয় আলোচনা করেছেন। 'মহর্ষি মনসুর', 'আনাল হক' বা 'অহম ব্রহ্মাস্মি' এ মহাবাণী প্রচারক মহাতাপস মনসুরের জীবন কাহিনী। অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মানুষ কতবড়ো সিদ্ধি লাভ করতে পারে, মহর্ষি মনসুরের জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর সম্বন্ধে যে সব অনৈতিহাসিক গল্প ও প্রবাদ প্রচলিত আছে সেগুলো এবং একখানি উর্দু পুস্তিকার মর্ম অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে এ গ্রন্থখানি তিনি রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। মনসুরের ধর্মোন্মত্ততা এবং উপলব্ধ সত্যের জন্যে অবিচলিত আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশত মোজাম্মেল হক তাঁকে সূক্ষ্মদর্শী মহামানবরূপে অঙ্কিত করছেন।

কেদারনাথ মিত্রের 'মুসলমান ভক্তচরিত' (মাঘ ১৩৩৫ ১৯২৮ খ্রীঃ) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি আবিস করণী, মহর্ষি ফাজিল আয়াজ, মহর্ষি আবু ওসমান হায়রী, মহর্ষি আবু হাফেজ, মহর্ষি ইব্রাহিম আদম, মহর্ষি হাসান বসোরী, মহর্ষি মালেক দিনার, মহর্ষি জুনিদ, মহর্ষি সররি সক্তী, মহর্ষি ইউসুফ হোসেন এবং তপস্বিনী রাবেয়া প্রমুখ এগারজন ওলি-আল্লার জীবনী 'মুসলমান ভক্তচরিতে' আলোচিত হয়েছে। কেদারনাথ মিত্র এঁদের সাধনায় ও চারিত্রিক আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ভক্তের মতো এঁদের জীবনী লিখেছেন। চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'রাবেয়া' গ্রন্থ গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার মুসলমানী অধ্যাত্মমূলক কিছু কবিতা অনুবাদ করেন।

মওলানা মনীরুজ্জমান ইসলামবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) লিখিত'নেজামুদ্দীন আওলিয়া' (১৯১৬) গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার জীবন এবং তাঁর সাধন-কাহিনী এ গ্রন্থে মুনীরুজ্জামান লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাংলা সহিত্যে বহু অনুবাদ এবং মৌলিক গ্রন্থই এ শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। শেখ ফজলুল করিম 'ছামীতত্ত্ব' (পৃঃ ২৭) নাম দিয়ে ১৯০৩ সালে 'আসবাত-উস্-ছামী'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। নীতিভূষণ শেখ ফজলুল করিম তাঁর সমসাময়িক কালের বাঙালী মাত্রেরই নৈতিক জীবনের উন্নতি বিধান ও চিত্তশুদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় ইসলামের আদর্শ সাধক ও সুফীদের জীবনী রচনা করেছিলেন। 'রাজর্ষি এবরাহিম', 'বিবি রহিমা' এবং 'পথ ও পাথেয়' প্রভৃতি অনেকগুলো বই তিনি এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

www.icsbook.info

হয়েই লিখিছেন। অকৃত্রিম আন্তরিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ তাঁর রচিত সাহিত্যকে ধর্মের পথে পরিচালিত করেছিল। একালের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের অন্যতম শেখ ফজলুল করিম সম্পর্কে অন্যত্র আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।

নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ঈদুল আজহা' (পৃঃ ১৭৪) প্রকাশ করেন। 'ঈদুল আজহা'র তত্ত্বকথাও তিনি এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর 'মৌলুদ শরীফ' (পৃঃ ১৭৯) প্রকাশ করেন। এতে হযরতের (সঃ) জন্ম থেকে দুগ্ধপান কাল পর্যন্ত বাল্য জীবনী বর্ণিত হয়েছে। পুস্তকটি সুলিখিত।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার ধনবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার ১৯০৬ সনে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনিও জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভারও সভ্য এবং লর্ড রেনোল্ডসের মন্ত্রিসভারও সদস্য নিযুক্ত হন।

মুসলমান সমাজের প্রতি নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর অকৃত্রিম দরদ ছিল। মুসলমানদের সাহিত্য ও জাতীয় সেবার সুবিধার জন্য জনৈক সাংবাদিককে তিনি একটি প্রেস কিনে দিয়েছিলেন। তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনের পার্শ্বে প্রেসটি স্থাপন করা হয়েছিল। এ প্রেস থেকেই 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

ছমিরুদ্দিন আহ্‌মদ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'মোহাম্মদীয় ধর্ম সোপান' ১ম খণ্ড (কাব্দেমা পৃঃ ১০০) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (নামায, পৃঃ ১৩২) প্রকাশ করেন।

অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সরকারী পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে সাহিত্যিক সৈয়দ এমদাদ আলীর (১৮৭৬-১৯৫৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর 'তাপসী রাবেয়া' (৩য় সংস্করণ, ১৯৩১, পৃঃ ১০৬) এ বিভাগের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এখানে এমদাদ আলী তাপসী রাবেয়ার শুধু বহির্জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেন নি। তাঁর জন্ম-মৃত্যু ও বহির্জীবনের ইতিহাস যৎসামান্য উল্লেখ করে অধিকাংশ স্থান জুড়েই তিনি তাঁর সাধনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। খোদাপ্রেমে মশগুল হলে মানুষ কি ভাবে তাঁর 'তনুমনধন জীবনযৌবন' খোদার রাহে লুটিয়ে দিতে পারে তাপসী রাবেয়ার অন্তর্জীবনের ধারাবাহিক উন্নতি বিচার প্রসঙ্গে এমদাদ আলী তার সুষ্ঠু নির্দেশ দিয়েছেন। এ বইটিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ৬৪ পৃষ্ঠায় তাপসী রাবেয়ার জীবন স্বপ্ন ও সাধনার কথা, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে সুফী মতবাদ এবং সুফী সাধনার তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত সাবলীল; চিন্তার স্বচ্ছতা থাকার জন্য দ্বিতীয় অংশে সুফী তত্ত্বের দুরূহ বিষয়বস্তুও বর্ণনায় সহজ গতি পেয়েছে। মুসলিম সমাজকে পটভূমি হিসেবে অবলম্বন করে তিনি ১৩৩৫ সালে (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে) 'হাফেজ' নামক একটি পত্রোপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদনা। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাঙালী মুসলিম সমাজকে নানাভাবে জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে মৌলবী আয্‌হার আলী প্রণীত এবং মোহাম্মদ কোরবান আলী সম্পাদিত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী'র জীবনী গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এবং অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

শেখ হাবিবুর রহমান (সাহিত্যরত্ন)-এর 'ইসলাম ধর্ম তত্ত্ব' (৯২ পৃঃ) ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'গুলিস্তান' (১৯৩৩), 'বোস্তান' এবং আওরঙ্গজেবের জীবনেতিহাস

www.icsbook.info

'আলমগীর' শেখ হাবিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তি। ইসলামী বিষয়বস্তু ছাড়াও তিনি 'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ' (পৃঃ ১৫২, ১৯৩৪ খ্রীঃ) এবং 'আমার সাহিত্য জীবন' শীর্ষক আত্মজীবনী রচনা করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম রসুল খোনকারের 'মাজেজাত' (পৃঃ ৫৯) লিখিত হয়। মাজেজাত অর্থ অলৌকিক ঘটনাবলী। প্রত্যেক নবীই কিছু কিছু মাজেজার অধিকারী ছিলেন। এ ধরনের কিছু, মাজেজার কথা এ ছোট্ট পুস্তিকাটিতে গোলাম রছুল উল্লেখ করেছেন।

এ শাখায় কতগুলো উল্লেখযোগ্য বই; গোলাম মোহাম্মদের 'ইসলাম সার সংগ্রহ' (পৃঃ ৭৬, অনুবাদ ১৯১৩), মধুসূদন ঘোষালের 'মোসলেম গৌরব' (পৃঃ ৫৬, ১৯১৪), দেওয়ান শাহ্ আবদুর রশীদ চিস্তীর 'জ্ঞান সিন্ধু বা গহে তাওহিদ' (পৃঃ ১৭৮, ১৯১৯) ছদরউদ্দীন আহমদের (?) 'এল্‌মে তাছাওয়াফ্' (পৃঃ ২৪০, ২য় সংস্করণ, ১৯২৪)। এল্‌মে তাছাওয়াফে'র লেখকের নাম নেই, ছদরউদ্দিন আহমদের নাম প্রকাশক হিসেবে স্থান পেয়েছে। মোহাম্মদ মোবারকের (প্রকাশক) 'হযরতের রচনাবলী (পৃঃ ৩২, ২য় সংস্করণ, ১৯২৪) গ্রন্থটি সম্ভবত খান বাহাদুর আহ্‌সানুল্লাহ্ রচিত। 'এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য' (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯২৪) গ্রন্থকারের নাম নেই; প্রকাশক মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা। বাংলার মুসলমানদের ধর্ম ও নৈতিক জীবনের কল্যাণ সাধনাই ছিল এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। কবি গোলাম মোস্তফাকৃত 'এখওয়ানুস সাফা'র অনুবাদ 'জয়-পরাজয়' এবং 'মোসাদ্দাস-ই-হালি'র ক্যাবানুবাদও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

'মোস্তফা চরিতে'র লেখক মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর লেখা 'সমস্যা ও সমাধান' (১৯২৬?) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো বই। তাঁর সমস্যা ও সমাধানে অবশ্য ইসলামের তত্ত্বকথার আলোচনা নেই, কিন্তু ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ইসলাম ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে সুদ, ব্যাঙ্কিং, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা সমস্যামূলক আলোচনা ও তার সুষ্ঠু সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দিতে পেরেছেন। এ কালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এদিক থেকে প্রবন্ধকার মৌলানা আকরাম খাঁর দান অবিস্মরণীয়।

এ পর্যায়ে বহু ভাষাবিদ সাধক ও পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি আজীবন ইসলাম ধর্মকে বুঝবার এবং তার সেবা করবার যথাযোগ্য প্রয়াস করে এসেছেন। সেই সাধনার বশবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তিনি বহু প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। তাঁর 'ইসলাম ও বিশ্বসেবা' 'ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার', 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ', 'ইসলামী সমাজের রূপ', 'ইসলাম-মানবতার মুক্তিদূত' প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে রচিত বিশটি প্রবন্ধের একটি মূল্যবান সংকলন 'ইসলাম প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩। রয়াল সাইজের ১২৬ পৃষ্ঠার বই। বাংলায় ইসলাম সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি উল্লেখযোগ্য এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বোখারী শরীফেরও তিনি অংশবিশেষ অনুবাদ করেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের (জন্ম ১৯০৬ সাল) 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' (পৃঃ ২৬০, ১৯৩৩) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' গবেষণামূলক গ্রন্থ।

www.icsbook.info

এতে সূফী মতবাদের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আছে। শরীয়তী ইসলাম এবং সূফী মতবাদের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে সূফী মতবাদ কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এখনও বাঙালী মুসলমানের জীবনে সূফী মতবাদ কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে আছে তার নির্দেশ এনামুল হক এ বইটিতে দিয়েছেন। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য এনামুল হকের 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' (পৃঃ ১৫০, ১৯৫৮) বইটি। এই বইটিতে তিনি বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে শুরু করে এদেশে মুসলিম রাজত্বের সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং বাংলাদেশে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান কেন হলো তারও একটি মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন।

ইসলামী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অন্যান্য বই ঃ আবদুল্লাহ্ সুহরওয়ার্দীর 'Sayings of Muhammad'-এর উপরে ভিত্তি করে রচিত মোহাম্মদ ইয়াছিনের 'ইসলামের বিশেষত্ব' (৫৬ পৃঃ ১৯৩০?) ও এ. এ. রহমানী রচিত 'সওগাতে মোসলেম' (৩৪ পৃঃ ১৯৩৫)। মোহাম্মদ ইয়াছিনের 'ইসলামের বিশেষত্ব' এক মৌলবী সাহেব এবং এক শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে লিখিত। মৌলবী সাহেব তাঁর শিষ্যকে ইসলামের বিশেষত্ব কোথায় তা শেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এ. এ. রহমানীর 'সওগাতে মোসলেম' আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচার পুস্তিকা। খুলাফা-ই-রাশেদীনের লেখক এ. জেড. নূর আহমদের 'মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ' (৩২ পৃঃ ১৯৩৭), ''বোখারী', 'নস্য়ি', 'আবু দাউদ', 'ইবনে মাজা,' 'মুসলিম ও তিরমিজি' প্রভৃতি হাদিস বেত্তাদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলন। এ প্রবন্ধটি ১৩৩৪ সনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুসলিম সমাজের মুখপাত্র 'শিখায়' প্রকাশিত হয় এবং পরে পুস্তকাকারে বের হয়। এ. জেড. নূর আহমদের অন্যান্য বই ঃ 'হযরতের কথামৃত' (নবী আকরামের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত খোতবার অনুবাদ), 'কুরআনের কথা,' 'নয়া যামানা' এবং 'রাষ্ট্রগুরু জামাল উদ্দীন আফগানী' ইত্যাদি।

মৌলানা রুমীর মস্নবীর গদ্যানুবাদ করেন মৌলবী আয্হার আলী বখ্তিয়ারী। এ অনুবাদ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৬। এর এগারটি সংস্করণ হয়েছিল।

খোন্দকার আমীনউদ্দিন আহমদের 'দাওয়াতে এসলাম' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (প্রথম সংস্করণ, ২৩৫ পৃঃ)। ১৯০৯ সনে কলকাতা টাউন হলে ভারত ধর্ম মহামণ্ডলী (Parliament of religions)-এর এক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ার ভার পড়ে খাজা কামালুদ্দীন, সালাহুদ্দীন খোদাবখ্শ, মীর্জা আবুল ফজল এবং খোন্দকার আমীনুদ্দনী আহমদের ওপর। খোন্দকার আমীনউদ্দিন আহমদ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে উক্ত অধিবেশনে যে প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ তাঁর 'দাওয়াতে এসলাম'। প্রাচীনকাল থেকে দুনিয়াতে যত ধর্ম প্রচারিত হয়েছে সেগুলোরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তিনি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের ব্যাখ্যা করেছেন। যে যুগে প্রাচীন ধর্মগুলো পৃথিবীতে এসেছিল, তার প্রত্যেকটি জন্ম নিয়েছিল যুগের প্রয়োজনে। কালক্রমে মানুষের হাতে পড়ে সে সব ধর্মের বিকৃতি ঘটে। ইসলাম কোনযুগের ধর্ম নয়, মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বার মুক্ত করে দিয়ে যুগাতীত কালের ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে আমীনউদ্দীন ইসলামের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিই অমুসলমানদের সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর 'দাওয়াতে এসলাম'-এ।

www.icsbook.info

ঢাকার আমিনাবাদ নিবাসী মোহাম্মদ মোজাফফ্‌র হোসেন একজন প্রবন্ধকার। তাঁর 'ইসলামের পার্থিব উন্নতি' (জানুয়ারী ১৯৪২), 'পর্দাতত্ত্ব' (২য় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৪২) এবং 'পরিবার নহে কারাগার' মূলত সমাজতত্ত্বমূলক রচনা।

আলহাজ কাজী মৌলানা মোঃ গোলাম রহমানের 'মক্‌ছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশ্‌তের কুঞ্জী'র (১ম ও ২য় খণ্ডের) চৌদ্দটি সংস্করণ হয়। এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২। কোরআন হাদীসের নানা উদ্ধৃতির সাহায্যে ইসলামের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস এবং ইসলামের 'আরাকান' সম্বন্ধে সাধারণের শিক্ষাপোযোগী আলোচনা আছে এ বইটিতে।

আয্‌হার আলী প্রণীত 'খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী'র সম্পাদক মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'উমদাতুল ইসলাম' (পৃঃ ৩৪৩)-এর চতুর্থ সংস্করণ বের হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ইসলামের ব্যবহার-বিধি, নামায, রোজা, হজ, যাকাত এবং ইসলামের নিয়মকানুন শিক্ষা দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে এ বইটি রচিত।

'কোরআনের আলো' প্রকাশের কিছুদিন পরে মুহম্মদ আয্‌হারুদ্দীন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'হাদীসের আলো' গ্রন্থ (পৃঃ ৩০৪) প্রকাশ করেন। 'হাদীসের আলো বা হাদীস শরীফের বঙ্গানুবাদ' সিয়া সেত্তাহ্‌, মিশ্‌কাতুল মাসাবিহ্‌, জামায়েস্‌ সাগীর প্রভৃতি হাদীসের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থগুলো থেকে মোট এক হাজার পঁচিশটি সহি হাদিসের সুন্দর ও সরল বঙ্গানুবাদ। মহাপুরুষের উদার বাণী মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। তাতে মানবমাত্রেরই সমান অধিকার। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আযহারুদ্দীন হযরতের সহস্রাধিক মূল্যবান বাণীকে আরবী থেকে বাংলায় নিয়ে এসে বাংলা ভাষাভাষীরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এছাড়া 'আরবের আলো' নামেও তাঁর আর একটা গ্রন্থ পাওয়া যায়। 'আরবের আলো' হযরতের জীবনী। 'কোরআনের আলো' 'হাদীসের আলো' ও 'আরবের আলো' গ্রন্থত্রয়ীর সাহায্যে মুহম্মদ আযহারুদ্দীন ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে চেয়েছেন, তা পরিস্কার বোঝা যায়।

এ পর্যায়ে সৈয়দ আবদুর রহমান নামক আর একজন লেখকের নাম পাওয়া যায়। তিনি জামালপুর জেলার জোকারপড়া গ্রামের অধিবাসী। এ পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি গ্রন্থের পরিচয় পাই-'এনায়েত রহমান' এবং 'উমদাতল মসায়েল'। এগুলো জনসাধারণকে ইসলামী শরা-শরীয়ত শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত। 'উমদাতল মসায়েল' প্রথম ভাগ কলকাতা ১৫৯নং কড়েয়া রোডস্থিত রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কর্তৃক ১৩১৯ সালে (১৯০৬ খ্রীঃ) মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১।/০+৩৬২।

www.icsbook.info

(গ)

পবিত্র কোরআনের অনুবাদ ও মর্মবাণী সংকলন

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশে কোনো মনীষীরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এ গুরুকর্তব্যভার বহন করার জন্যে সর্বপ্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন-ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ গিরিশচন্দ্রের কোরআনের অনুবাদের চতুর্থ সংস্করণের গোড়াতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।'

পবিত্র কোরআনের ও অন্যান্য ইসলামী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গিরিশচন্দ্রের ওপর ন্যস্ত করার সময় কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করেছিলেন-'তোমার জীবন মহাপুরুষ মোহাম্মদের স্পিরিটে মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত হউক।' তাঁর ধর্মজীবনের সব সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এ প্রার্থনাটি সার্থক হয়ে আছে।

১৮৮১-১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের কোরআনের সঠিক বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয় এবং সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ অনুবাদ গ্রন্থ মূল আরবী ছাড়া প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ ব্যাপারেই গিরিশচন্দ্র তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর অনূদিত কোরআনের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর বহু পরে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

কোরআন অনুবাদ করে বাংলায় চার কোটি মুসলমান জনসাধারণকে তাদের আল্লাহর রসূলের ও কোরআনের সঙ্গে পরিচিত করেছেন-সর্ব প্রথম ভাই গিরিশচন্দ্র সেনই। এ মহান পুণ্য ব্রত-সাধনায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত। পাদ্‌রী উইলিয়াম গোল্ডস্যাকও কোরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করেন।

গিরিশচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার বহু পরে কোরআনের আংশিক অনুবাদ করেন মৌলবী মুহম্মদ নঈমুদ্দীন। নঈমুদ্দীন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত করটিয়া সবুজগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। আরবী, ফারসী, বাংলা এবং উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁর দখল ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, জোনপুর, গাজীপুর দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করে সেখানকার আলেম ও মোহাদ্দেসের সংস্পর্শে এসে ইসলামী শরা-শরিয়াত ও শাস্ত্রাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। ভাই গিরিশচন্দ্রের পরে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই বোধহয় কোরআন শরীফের প্রথম সার্থক অনুবাদক। তিনি প্রথম থেকে তেইশ পারার অনুবাদ করার পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর এ অনুবাদ জলপাইগুড়ি জেলার খানবাহাদুর রহিম বক্‌স সাহেবের চেষ্টায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কোরআনের প্রথম তেইশ পারার অনুবাদের পূর্বেই তিনি আমপারার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কোরআনের অনুবাদ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও সুখপাঠ্য। জানা যায় তিনি বোখারী শরীফেরও অনুবাদ করেছিলেন।

'জব্দাতুল মসায়েল' রচনা মৌলবী নঈমুদ্দীনের অন্যতম মহৎ কীর্তি। 'জব্দাতুল মসায়েল' (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাস্থ বি.পি.এম. প্রেসে

www.icsbook.info

মুদ্রিত হয়। ময়মনসিংহ জেলার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলীর অর্থানুকূল্যে 'জব্দাতুল মসায়েল' গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়। 'জব্দাতুল মসায়েল' একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৭ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৫। এটির প্রথম খণ্ড দশম সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'জব্দাতুল মসায়েল' অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থাসমূহের সার সংগ্রহ প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে লিখিত। এটি নির্দিষ্ট কোনো একটি পুস্তকের অনুবাদ নয়, শরে বেকায়া, হেদায়া, কাজীখান, জামেয়র রমুজ, কামুজ ফতোয়াই আলমগীরী, দায়রোল মোখতার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সংকলন। বাংলা ভাষায় ইসলামী শরা-শরীয়ত তথা বিধিবিধান সম্পর্কিত এটি একটি অমূল্য পুস্তক।

'এনসাফ্' 'আদেল্লায় হানিফীয়া', 'কালেমাতুল কোফর', 'সেরাতুল মোস্তাকিম', 'এছবাতে আখেরজ্জোহর', 'রফা-এদায়েন', 'ফতোয়ায়ে আলমগীরী' (১ম-৪র্থ খণ্ড) প্রভৃতি গ্রন্থও মৌলবী নঈমুদ্দীন রচনা করেছিলেন।

হাফেজ মাহমুদ আলী তাঁকে করটিয়ার মাহমুদিয়া প্রেস নামে একটি প্রেস দান করেছিলেন। এ প্রেস থেকে তিনি আখবারে ইসলামিয়া নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করতেন। এটি ছিল 'শরীয়ত' বিষয়ক পত্রিকা। মীর মোশররফ্ হোসেনের 'গোজীবন'পুস্তিকাটির কঠোর সমালোচনা করে 'আখবারে ইসলামিয়া' পত্রিকায় ফতোয়া প্রকাশ হয়েছিল।

এরপরে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফের সঠিক অনুবাদ করেন জেলা চব্বিশ পরগণার অধিবাসী মৌলবী আব্বাস আলী।

মৌলবী আব্বাস আলীর কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হবার কিছু পরে 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' এবং 'সাহাবিয়া' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক রংপুরের খান বাহাদুর তস্‌লিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭ খ্রীঃ) প্রতি দশ পারা করে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদে মূল আরবী নেই। কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথায় সূরা, রুকু এবং আয়াতের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং অনুবাদেও আয়াতের সংখ্যা লেখা হয়েছে। খান বাহাদুর তস্‌লিমুদ্দীন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কোরআন শরীফের অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ করেন। তিনি কোরআন শরীফের একটি সূচীপত্র বা Concordance রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর প্রথম খণ্ড কোরআন-অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৩ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯২৫ সালে। তস্‌লিমুদ্দীন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে তিনি ওকালতী শুরু করেছিলেন।

টাঙ্গাইল নিবাসী মৌলবী আবুল ফজল আবদুল করিমও সম্পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন। আবদুল করিমের অনুবাদে মুল আরবীও আছে। ইনি প্রথমে হাই স্কুলের হেড মৌলবী ছিলেন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফারসী ছাপার প্রুফ রীডার হন।

১৯৩৮ সালে মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলী হাসান মিলিতভাবে কোরআন শরীফের মূল আরবীসহ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির বের করেন এটিই এ যাবৎ প্রকাশিত কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনুবাদের বিশুদ্ধতা ও মৌলিক সৌন্দর্য তফসীরের গবেষণা ও প্রাচুর্য এবং ভাষায় মূলানুসারী অপূর্ব ব্যঞ্জনার জন্য এ অনুবাদ সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়েছে। মূল কোরআনের

www.icsbook.info

আয়াতমালার পাশে নম্বরসহ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ এবং নিম্নে বিস্তৃত তফসীর রয়েছে। অনুবাদের সঙ্গে সেল, রড্ওয়েল, পামার, স্যার সৈয়দ আহমদ ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি আধুনিক অনুবাদক ও তফসীরকারের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাও আছে।

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর সমগ্র কোরআনের অনুবাদ মূল আরবীসহ প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অনুবাদের ভাষা সহজ ও সরল; স্থানে স্থানে টীকাও আছে।

উল্লিখিত পূর্ণ কিংবা প্রায়-পূর্ণ অনুবাদগুলো ছাড়া অনেকেই কোরআন শরীফের আংশিক অনুবাদ করেছেন এবং কেউ কেউ কোরআনের উৎকৃষ্ট আয়াত এবং অংশসমূহের বাংলা সংকলন বের করেছেন। এদের মধ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কিরণ গোপাল সিংহ কোরআনের সার সংকলন করে প্রকাশ করেন। এটি ধারাবাহিক অনুবাদ নয়, বিভিন্ন স্থান থেকে নীতিমূলক বিষয়বস্তুর সংকলন।

মৌলানা রহুল আমীন অনুবাদ করেন 'আমপারা'র এবং শুরু থেকে আরও তিন সিপারার।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'আমপারা' এবং শুরু থেকে সূরা আল্ এমরান পর্যন্ত কোরআনের অনুবাদ করেন। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১৯২২ সালে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'আমপারা'র অনুবাদ করেছিলেন। 'উম্মুল কেতাব' নাম দিয়ে মৌলানা সাহেব সূরা ফাতেহার অনুবাদও স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে মৌলানা সাহেব কোরআনের অনুবাদে লিপ্ত থেকে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

মৌলবী এয়ার আহমদও আমপারার অনুবাদ করেন।

ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা 'পবিত্র কোরআনের পূত কথা' (মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বাণীর বাংলা বিবরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) যথাক্রমে ১৯৪৫ এবং ১৯৪৭ সালে বের করেন। এ দুইভাগের পাঁচ সিপারা পর্যন্ত কোরআনের মহাবাণীর অন্তর্নিহিত মর্ম যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুঝবার প্রয়াস আছে।

কাজী নজরুল ইসলাম কবিতায় আমপারার অনুবাদ করেন।

বরিশালের মীর ফজলে আলী কোরআনের কতগুলো অংশ কবিতানুবাদ ক'রে 'কোরআন কণিকা' নাম দিয়ে ছেপে বের করেন। তাঁর কবিতানুবাদ সুন্দর হয়েছিল।

এ প্রসংগে মুহম্মদ আয্হারুদ্দীনের 'কোরআনের আলো'র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

'পয়গম্বর কাহিনী' এবং 'এসরাইল বংশীয় নবীগণ'-এর লেখক ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'কোরআনের সুবর্ণ কুঞ্জিকা'ও বিশেষ স্মরণীয়। এটি কোরআন শরীফের উৎকৃষ্ট অংশ বিশেষের একটি চয়নিকা।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও তফসীর এবং 'আলমতারা' পর্যন্ত অন্যান্য দশটি সুরার অনুবাদ 'মহাবাণী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। তিনি কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলো 'কোরআন প্রসঙ্গ' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া সিরাজুল ইসলামের 'হযরতের অমৃতবাণী' এবং মৌলবী নকীবুদ্দীনের 'কোরআন তত্ত্ব' (১-৫ খণ্ড) এ বিভাগের উল্লেখ করার মতো বই।

www.icsbook.info

মৌলবী মুহম্মদ তৈমুরেরও কোরআন শরীফের একটি সার সংকলন পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গবেষণা এবং চেষ্টায় কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এবং এ ধরনের অনুবাদ ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হতে থাকবে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে একটি প্রমাণিক এবং নির্ভরযোগ্য অনুবাদের অপেক্ষায় আমরা ছিলাম। পাকিস্তান আমলে বর্তমান ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ইসলামিক একাডেমী নামে পরিচিত ছিল। উক্ত ইসলামিক একাডেমী দেশের প্রখ্যাত উলামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে গঠিত এ একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ডের মাধ্যমে বাংলা ১৩৭৪ সালে কোরআন শরীফের বাংলা তরজমার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে এবং বর্তমানে এর সপ্তদশ মুদ্রণ বাজারে চলছে। এই অনুবাদটি কেন প্রকাশ করা হল সে সম্পর্কে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথায় বলা হযছে ঃ 'বাঙলা ভাষায় অনেক কয়েকটি তফসীর এবং তরজমা থাকা সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী আরেকখানি তরজমা প্রকাশের দায়িত্ব কেন গ্রহণ করিল, সে সম্পর্কে দুটি কথা শুরুতেই বলা প্রয়োজন। প্রথমত কুরআনুল করীমের ভাষায় যে গতি-স্বাচ্ছন্দ্য, ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে বাংলা তাফসীর ও তরজমাগুলিতে তাহা পাওয়া যায় না; মূলের ভাবোদ্দীপনা তরজামায় রক্ষিত না হওয়ায় কুরআনুল করীমের অন্যান্য মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের কোন ধারণাই জন্মে না। দ্বিতীয়ত মামুলী রচনারীতি তথা ভাষার দুর্বলতা ও আড়ষ্টতায় দরুন বহু ক্ষেত্রেই কুরআনুর করীমের আয়াতসমূহের নিগূঢ় তাৎপর্য ও অর্থ ঢাকা পড়িয়া গিয়েছে। তৃতীয়ত বাংলা ভাষায় এখনো মূলানুগ অথচ সুখপাঠ্য একখানি সার্থক তরজমার অভাব রহিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।' এই অনুবাদ ও সম্পাদনার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন শামসুল উলামা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, মুহাম্মদ মাহমুদ মুস্তফা শা'বান, শামসুল উলমা মুহম্মদ আমীন আব্বাসী, ডক্টর সিরাজুল হক, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, মাওলানা ফজলুল করীম, এ. এফ এম আবদুল হক ফরিদী, আহমদ হুসাইন, মাওলানা আলাউদ্দিন আল-আজহারী, অধ্যক্ষ এ এইচ, এম আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা মীর আবদুস সালাম, অধ্যাপক শাহেদ আলী, মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ্, হাফেজ মইনুল ইসলাম এবং আবুল হাশিম।"

আমি নিম্নে এই অনুবাদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। উদ্ধৃতিটি সূরা আল ইমরানের সপ্তম থেকে নবম আয়াত পর্যন্ত ঃ "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক; যাহাদের অন্তরে সত্য লঙ্ঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিত্না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না। আর যাহারা জানে সুগভীর তাহারা বলে আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত; এবং বোধশক্তি-সম্পন্ন ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না। হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শকের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লঙ্ঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, তুমিই মহাদাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন সমাবেশ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।"

www.icsbook.info

ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন শরীফের অনুবাদ গ্রন্থের নাম ঃ 'আল-কুরআনুল করীম'।

কুরআন শরীফের আর একটি সুন্দর বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন খান। এ অনুবাদটি লাহোরের বিশিষ্ট আলেম মুফ্‌তি মুহম্মদ শফীর উর্দু অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। কিন্তু উর্দু অনুবাদের বাংলা অনুবাদ হলেও এ অনুবাদটি অত্যন্ত সুন্দর এবং তাৎপর্যবহ হয়েছে। মাওলানা মুহিউদ্দিনের ভাষা সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল। সাধারণত আলেম সম্প্রদায়ের বাংলা রচনা যেমন দুর্বল হয়ে থাকে তেমন নয়। অনুবাদের সংগে কিছুটা তাফসীর এবং ব্যাখ্যাও আছে।

কুরআন শরীফের বিখ্যাত তাফসীর হচ্ছে 'তাফসীর ইবনে কাসীর।' এর একটি অনুবাদ বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ড. মুহম্মদ মুজিবর রহমান। এই অনুবাদটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে গৃহীত হবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্র ব্যক্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছেন তার মধ্যে হাফিজ ইমাদুদ্দিন, ইসমাঈল ইবনু কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদক মুজিবুর রহমানের বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল। এই গ্রন্থের জন্য একটি তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি রয়েছে। এ কমিটির সদস্যবর্গ নিজেদের উদ্যোগে এই তাফসীরটি প্রকাশ করে চলেছেন।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর কোরআন শরীফের বিখ্যাত তফসির 'তাফহীমুল কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন (১৯৮০)। মওলানা আবদুর রহীম সাধারণ তরজমার রীতি পরিত্যাগ করে স্বচ্ছন্দে অনুবাদের পথ বেছে নিয়েছেন যেহেতু শাব্দিক তরজমা দ্বারা কোরআনের মূল ভাবধারা অনুধাবনের ব্যাপার অনেক দিক থেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মূল তফসিরটি বিশ্ববিখ্যাত এবং আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে।

www.icsbook.info

(ঘ)
হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সাহাবী এবং অন্যান্য পীর পয়গম্বরদের জীবনী ও বাণী

উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে 'সুধাকর দল' বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ধারার সূত্রপাত করেন। এঁদের এবং এ ধারার অনুবর্তীদের প্রধান উপজীব্য ছিল ইসলাম ধর্ম, সূফীতত্ত্ব ও দর্শন এবং ইসলামী কাহিনী ইত্যাদি নিয়ে বই রচনা করা। এ বিষয়বস্তুর মধ্যে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনী ও বাণী (অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহ) হযরতের পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীর জীবনকাহিনী, তাদের সহিষ্ণুতা, ধর্মপ্রচার ব্রত, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরতের অন্যান্য সাহাবীর জীবনই প্রাধান্য লাভ করেছে। এসব জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের ধর্মাদর্শের ব্যাখ্যাও এঁদের জীবনীকাররা দিয়েছেন। এ বিভাগে সব চেয়ে বেশি রচিত হয়েছে হযরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবনী।

বাংলা ভাষায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনই হযরত মুহাম্মদের প্রথম জীবনী লেখক। তারপরই শেখ আবদুর রহিমের নাম পাওয়া যায়। এর পরেই সুধাকর দলের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ হযরতের জীবনী লেখেন। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ রচিত 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনচরিত' শীর্ষক গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে এ চমৎকার তথ্যটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বলে মনে করি ঃ

"আঁ হযরত (ছালঃ) এর 'ছওয়ানে-ওমরি' (জীবনচরিত) আরবী, পারশী ও উর্দু ভাষায় অনেক আছে; কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন কোটি বংগীয় মুসলমানের মধ্যে ৫০ বৎসর পূর্বেও তাঁহার পবিত্র জীবনী কোনও মুসলমান লেখক লেখেন নাই। সর্বপ্রথম কোরআনের বঙ্গানুবাদক, নববিধানী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত শিষ্য, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন আঁ হযরত (ছালঃ) এর একখানি জীবনচরিত বাংলা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। উহাতে তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম-বিশ্বাসের ছায়াপাত ছিল; পরে ১২৯১ কিংবা ৯২ সালে (প্রকৃতপক্ষে ১২৯৪) সাল অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতাস্থ ডভটন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের সুযোগ্য আরব্য এবং পারশ্যধ্যাপক, উৎসাহের জ্বলন্ত মূর্তি এবং স্বজাতিগতপ্রাণ, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহানুভব মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন আহমদ মরহুম মনসুরের সাহায্যে 'মিহির ও সুধাকর' এবং ''মোসলেম হিতৈষী' সম্পাদক ভ্রাতৃবর মুন্সী শেখ আবদুর রহিম সাহেব আঁ হযরতের একখানি জীবন-চরিত লিখিয়া মুদ্রিত করেন। পূর্বোক্ত মৌলবী সাহেব মরহুম আরবী ও পারশী ভাষার প্রামাণ্য ইতিহাসসমূহ হইতে ইহার মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই পুস্তকখানি উপাদেয় এবং মুসলমানদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। এই জীবনী খানিতে ইসলামধর্মনীতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।"

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় রামপ্রাণ গুপ্ত সম্ভবত হযরতের চতুর্থ জীবনীকার।

রামপ্রাণ গুপ্তের 'হযরত মোহাম্মদ' (পৃঃ ৫৫) লিখিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ পুস্তকটিতে রামপ্রাণ গুপ্ত সত্যধর্ম ইসলাম প্রচারে হযরতের সাধারণ কথা ব্যক্ত

www.icsbook.info

করেছেন। হযরতের জীবন যে একাধারে কর্মযোগ ও ধর্ম সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রামপ্রাণ গুপ্ত তাতেই মোহিত হয়েছেন এবং সে কথাই এখানে ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। রামপ্রাণ গুপ্তের ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বৃহত্তর গ্রন্থ 'ইসলাম কাহিনী' ইসলাম ধর্মকথা এবং ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংকলন।

'সঞ্জীবনী' সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রও 'মহম্মদ চরিত' নাম দিয়ে হযরতের জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর লিখিত হযরতের জীবনী প্রধানত হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজে গৃহীত হয়েছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আবুল হোসেন 'হযরত মোহাম্মদের জীবন' রচনা করেন। এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮।

এর কিছু পরের রচনা রংপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর তস্‌লিমুদ্দীন আহমদের (১৮৫২-১৯২৭) হযরত মুহাম্মদের জীবনী 'সম্রাট পয়গম্বর'। তার মৃত্যুর পর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদের জীবনী হিসেবে প্রামাণ্য এবং সুলিখিত। হযরতের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নিয়ে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তস্‌লিমুদ্দীন এ বইটি লিখেছেন। ইসলাম প্রচারক হযরতের জীবনাদর্শ বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তার সমসূত্রে বাঙালী মুসলমানের চরিত্র সুদৃঢ় হোক এ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তসলিমুদ্দীন লেখনী ধরেছিলেন। 'সম্রাট পয়গম্বর'-এ তাঁর আদর্শ অক্ষুণ্ন রয়েছে।

তাঁর অপর গ্রন্থ দুটি-'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' (প্রথম সংস্করণ, ১৯১৫) খ্রীঃ) এবং 'সাহাবিয়া' (ডিসেম্বর ১৯২৬ খ্রীঃ)। 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ' থেকে প্রায় শ' পাঁচেক হাদিসের অনুবাদ সৎশিক্ষা, শিষ্টাচার, সুব্যবহার ও সৎজীবন সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর ওপরে হযরতের বাণী থেকে তস্‌লিমুদ্দীন তাঁর 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' সংকলন করেছেন।

'সাহাবিয়া' (বা পয়গম্বর সহযোগিনী অষ্টবিংশতি মুসলিম মহিলা) গ্রন্থে তিনি হযরতের সহধর্মিণী, তাঁর কন্যা এবং আত্মীয়া সহযোগিনীদেরই জীবন কাহিনী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মহীয়সী মহিলাবৃন্দ কিরূপে হযরতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এ বইটিতে তার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হযরতের স্ত্রী, কন্যা ও সাহাবিয়ারা ছিলেন মুসলিম নারী সমাজের শিরোভূষণ; গৃহধর্মে, ইসলামের পরিচর্যায় ধর্মযুদ্ধে, হযরতের সেবায় এবং জ্ঞানানুসরণে এ মহীয়সী মহিলারা যে আদর্শ রেখে গেছেন তা সকল দেশের সকলকালের নারী সমাজের অনুকরণীয়।

এছাড়া তস্‌লিমুদ্দীন 'মৌলুদ নফিসা' এবং 'সুরিয়া বিজয়'ও রচনা করেছিলেন। 'মৌলুদ নফিসা' বা জন্মোৎসবের কোনো কবিতা পড়ে মনে হয়, যেন সেগুলো তাঁর সাধন মুহূর্তের।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' (১৯২১) হযরত মোহাম্মদের জীবন আলোচনামূলক ৭৭৫ পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ গ্রন্থ। মুহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' শুধু গতানুগতিক জীবনী নয়। হযরতের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য জীবনীকার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তিনি তা করেন নি। অন্যান্য জীবনীকার হযরতের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রধানত 'তব্‌রী', 'তবকাত', 'ইবনে হিশাম' ও

www.icsbook.info

'ওয়াকেদী'র উপরেই নির্ভর করেছেন, কোরআন হাদিসের মাপকাঠিতে তাঁদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন নি। মৌলানা সাহেব শুধু ইতিহাসকারদের বর্ণনার ওপরে নির্ভর না করে কোরআন হাদীসের তুলাদন্ডে তাঁদের বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার করেছেন। 'মোস্তফা চরিত'-এ অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস নেই। প্রত্যেকটি ঘটনাকে তিনি ঐতিহাসিকের মন নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচারসহ করে যাঁচাই করে দেখেছেন। তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ এবং যুক্তিবহ। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠতা হযরত মহাম্মদ সম্বন্ধে মুসলিম জগতের যেসব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে 'মোস্তফা চরিত'-এরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলা ভাষায় হযরতের জীবনী ও ধর্মালোচনা সংক্রান্ত গ্রন্থাদির মধ্যে 'মোস্তফা চরিত' অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ রচনা। এছাড়া মৌলানা সাহেবের 'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক একটি পুস্তিকাও পাওয়া যায়।

মৌলানা আকরম খাঁ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনার অন্তর্গত হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আকরম খাঁর পূর্ব পুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় আকরম খাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মাসিক 'মোহাম্মদী' ও 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদনার ভেতর দিয়ে মুসলিম বাংলার ইতিহাসে তিনি একটি Institution-এর স্রষ্টা।

গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' (১৯৪২) হযরত মোহাম্মদের জীবনী এবং ইসলামধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্পর্কে এ শতাব্দীতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। গোলাম মোস্তফা কবি। 'বিশ্বনবী'তে তার কবি মনের প্রকাশ সুস্পষ্ট এবং রচনাও আবেগপ্রণেদিত। 'বিশ্বনবী' রচনা গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ রচিত 'ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ বইটি লিখিত হয় ১৯২৪ সালের দিকে। আহসানুল্লাহ ভক্ত; সুতরাং ইসলাম-প্রচারক আদর্শ মহাপুরষ হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবনী লিখতে গিয়ে তার গ্রন্থে যে ভক্ত মনের পরিচয় তিনি দেবেন তা অবধারিত। এ বইটিতে প্রকৃতপক্ষে ঘটেছেও তাই। এ বইটিতে সূফী তত্ত্বের প্রভাব পড়েছে।

মৌলানা আবদুল খালেক রচিত 'ছাইয়েদুল মুরছালীন' (প্রথম খন্ড-মূল গ্রন্থ পৃঃ ৮৭১, ভূমিকা ইত্যাদি পূর্ব কথা ৯০-১।০; ২৪নং বখশীবাজার ঢাকা থেকে মওদুদুর রহমান, আবু আহমদ মোবাশ্শের কর্তৃক ১৩৫৭ সনে (১৯৫০ খ্রীঃ) প্রকাশিত) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অর্ধনা প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিরাট গ্রন্থটির রচনায় লেখকের শ্রমশীলতা এবং হযরতের প্রতি অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগ লক্ষ্য করবার মতো। তবে এ ভাষাতে ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে।

এ পর্যায়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামও স্মরণীয়। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনী ও বাণী সম্পর্কিত অনেক কয়টি বই তিনি লিখেছেন। 'শেষ নবীর সন্ধানে' (মার্চ ১৯৬১, ছোটদের রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আগস্ট ১৯৬২), 'অমর কাব্য' (অক্টোবর ১৯৬৩) নামক তিনটি বই এ ধারায় তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। 'বিশ্বের শেষ নবীর' (সঃ) জীবন বৃত্তান্তে কতকগুলি সমস্যা আছে। 'শেষ নবীর সন্ধানে' পুস্তকটিতে তিনি সে-সমস্যাগুলির সন্ধান ও সমাধান দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। 'রসূলুল্লাহ সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁকে জানা চাই। তাঁর আদর্শে জীবন গ'ড়ে তোলা চাই।

www.icsbook.info

বাল্যকালে মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তা স্থায়ী হয়। এ জন্য 'ছোটদের রসূলুল্লাহ' তিনি লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'অমর কাব্য' মুহম্মদ শরফুদ্দীন বিন্ স'ঈদ বিন্ হসন বুসীরী (রাঃ) রচিত 'কসীদতুল বর্দ; ও কার বিন্ যুহয়র (রাঃ) রচিত 'বানত-সু-আদ' কাব্য দুইটির সরল গদ্যানুবাদ। কসীদতুল বুর্দ ঃ কাব্য হিসেবেই কেবল বিখ্যাত নয়, পবিত্র ও পুণ্যজনক বলে হযতের (সঃ) ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য ওযীফা। ডক্টর শহীদুল্লাহ, এ কাব্যটি নির্ভুল গদ্যানুবাদ করে অশেষ পুণ্যার্জন করেছেন।

শহীদুল্লাহ সাহেবের ইক্‌বালকৃত 'শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ'র অনুবাদ (১ম সং ১৯৪২, ৩য় সং ১৯৬৪) এবং দীওয়ান-ই-হাফিজ (সঞ্চয়ন) অনুবাদও (১ম সং ১৯৩৮) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখিত হযরতের জীবন 'মরুভাস্কর' (১ম সং ১৯৪১, ২য় সং ১৯৪৭, পৃঃ ২০৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বুলবুল সম্পাদক হাবীবুল্লাহ বাহার 'উন্নত জীবন সিরিজ' নামক একটি সিরিজ সম্পাদনা করতে ব্রতী হয়েছিলেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরুভাস্কর' এ সিরিজেরই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিচারসহ মন, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার জন্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর খ্যাতি আছে। 'মরুভাস্কর'-এ হযরতের জীবনে যে দিকগুলো রূপায়িত হয়েছে তাতে ওয়াজেদ আলী তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছেন।

মাওলানা মুহিউদ্দিন খান আল্লামা শিবলী নোমানীর সীরাতুন্নবীর একটি সংক্ষেপিত বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এইটি শিবলী নোমানীর গ্রন্থে জীবনী অংশের উপর ভিত্তি করে রচিত। নোমানীর গ্রন্থটি বিশ্ব সাহিত্যের সর্ববৃহৎ জীবনীগ্রন্থগুলির অন্যতম। এ গ্রন্থটি দীর্ঘকাল যাবৎ সীরাত শাস্ত্রের একখানা আকর গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাঁর গ্রন্থটি উর্দুতে রচিত ছিল এবং ৬ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল। মাওলানা মুহিউদ্দিন একখণ্ডে সংক্ষেপিতভাবে বাংলা প্রকাশিত করেছেন। এ গ্রন্থটিও বাংলা ভাষায় রসূলের জীবনী গ্রন্থে একটি মূল্যবান সংযোজন।

সীরাত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে 'সীরাতে ইবনে হিশাম'। এর একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আকরমে ফারুক করেছেন। এটি মোজাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯৮৮। এ অনুবাদের ভাষা সুন্দর এবং মনোজ্ঞ।

বাংলা ভাষায় এই ধারা সর্বশেষ গ্রন্থ সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'মহানবী'। এই গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ ১৯৯৪। এবং এটি প্রকাশ করেছেন আহমদ পাবলিশিং হাউজ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে প্রকাশকের প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থিত করা হল ঃ

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসান একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আশ্চর্য অধিগম্যতা আছে। শিল্পকলা বিষয়েও তাঁর পরিণত বুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণ সকলকে মুগ্ধ করেছে। মানবতাবোধের সকল অঙ্গনকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

আবাল্য তিনি ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সকলকেই সূফী মতাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে আরবী ফারসী ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর দুটি ধর্মীয় গ্রন্থ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গ্রন্থ দুটির নাম 'হে প্রভু আমি উপস্থিত' এবং 'নাহ্‌জুল বালাঘা।'

www.icsbook.info

সম্প্রতি তিনি মহানবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ আমাদের উপঢৌকন দিয়েছেন। সাহিত্যের একটি বিস্ময় পরিচর্যা ঘটেছে। একটি মহান জীবন এবং প্রজ্ঞার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। যে জীবন মানুষকে অভিভূত করে। যে জীবন বিধাতার নিকট আত্মসমর্পণের একটি অলৌকিক পরিচয় বহন করে এবং যে জীবন সকল মানবের কল্যাণে সর্ব সময়ের জন্য নিয়োজিত সেই জীবনের একটি মনোজ্ঞ আলেখ্য 'মহানবী' গ্রন্থটি। আমরা এ গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে গর্ববোধ করছি।"

'প্রিয়তম নবী' বলে মহানবীর একটি জীবনী শিশির দাস নামে এক ভদ্রব্যক্তি লিখেছেন। বইটি প্রকাশ পায় ১৯৮৭ সালের কলকাতা থেকে। গ্রন্থটি ভক্তের দৃষ্টিতে লেখা। লেখক সমগ্র জীবনীটি কুরআন শরীফ এবং হাদীসের আলোকে উপস্থাপিত করেছেন। যতদূর মনে হয় শিশির দাস একজন একেশ্বরবাদী পুরুষ।

ড. ওসমান গনি 'মহানবী' বলে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে কলকাতা থেকে। তিনি ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস নয় খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। তার প্রথম খণ্ডটি হলো মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী।

এছাড়া হযরতের জীবনের কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে ছোটদের উপযোগী করে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনা করেন ছোটদের 'হযরত মোহাম্মদ' (১৯৪৮ খৃঃ)। এ বইটিতে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য আলো আর কালো তথা আলো আঁধারের মধকার পার্থক্যরূপে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিষয়বস্তুর নির্বাচন তত্ত্ব-গন্ধী হলেও সহজ বর্ণনার জন্যে ছোটদের বোধগম্য হয়ে উঠেছে। হযরতকে বলা হয়েছে অন্ধকার যুগের আলো, নাম দেওয়া হয়েছে 'আলোক শিশু'।

এ পর্যায়ে সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২?) নামক আর একজন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর 'ফাতেমা জোহরা', 'হযরত আলী' 'হযরত বড় পীর সাহেবের জীবনী' 'মজলিস' প্রভৃতি গ্রন্থ এ পর্যায়ে রচনা হিসেবে উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি (মোহাম্মদী বুক এজেন্সী) 'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ', পুণ্য কাহিনী, শিশুর 'সৈয়দ সাহেব', 'কনৌজ কুমারী' 'প্রতাপনন্দিনী' এবং 'দুইটি ভগ্নী' প্রভৃতি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর শিশুদের জন্য লেখা বইগুলো সহজ ভাষায় রচিত হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসগুলো গ্রাম্যতাদোষ মুক্ত নয়।

এয়াকুব আলী চৌধুরী

(১৮৮৭-১৯৩৮)

ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রামের এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৩৮) ইসলাম ধর্ম, ইসলাম দর্শন, তাসাওওয়াফ এবং তমদ্দুনের ভিত্তিতে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম 'মানব মুকুট', 'নূরনবী', 'শান্তিধারা' এবং 'ধর্মের কাহিনী'। ইসলাম বিষয়বস্তুর ওপরে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বইগুলো অত্যন্ত সুলিখিত বলে এদেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই অকুণ্ঠ প্রীতি ও প্রশংসা অর্জন করেছে। ফলে প্রত্যেকটি বইয়ের বহু সংস্করণ হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে 'মানব মুকুট'-এর (পৃঃ ৭৮) পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। 'নূরনবী'র (পৃঃ ১১৪) তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৯৫০ সালে, ১৯৪৮ সালে হয় 'শান্তিধারা'র ষষ্ঠ সংস্করণ।

www.icsbook.info

'ধর্মের কাহিনী' (পৃঃ ৫৬) ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও তার পঞ্চম সংস্করণ প্রকশিত হয় ১৯৫২ সালে।

'মানব মুকুট' ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদের জীবন ও শিক্ষাকে ভিত্তি করে রচিত। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে মহানবীর জীবন ও শিক্ষাদর্শের আলোচনা করেছেন। মহানবীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এ গ্রন্থে তিনি অপরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন; তারই ফলে লাভ করেছেন তিনি হযরতের প্রচারিত সার্বজনীন আদর্শের সন্ধান।

তাঁর 'শান্তিধারা' গ্রন্থে ছ'টি প্রবন্ধ রয়েছে ঃ -'শান্তিধারা', 'ইসলামের স্বরূপ;', 'ইসলামের ধারা,' 'রমজান', 'আজান', 'উপাসনা'। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শান্তি।' ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রবন্ধগুলোকে তাই একত্রে গ্রথিত করে 'শান্তিধারা' নাম দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও এগুলো সমসূত্রে গ্রথিত এবং ইসলামের আদর্শ, সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বই এ প্রবন্ধগুলোর অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব।

আর ধর্মের নামে সংসারে মানুষকে প্রতিনিয়ত অধর্ম করতে দেখে তাঁর প্রাণে যে বেদনা ধ্বনিত হয়েছে তা থেকেই স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে তাঁর 'ধর্মের কাহিনী।' ধর্মের কাহিনীতে, 'পুর্বাভাস,' 'খোদাভক্তি,' 'নামায,' 'সত্য', 'স্বার্থ', 'দয়া,' 'দান', 'অতিথি সেবা', 'সুদ' প্রভৃতি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

ছোটদের জন্য হযরত মুহাম্মদের জীবনী কম লেখা হয়নি। শিশু পাঠ্য হিসেবে হযরতের জীবন এখনও কম লেখা হচ্ছে না, কিন্তু এদিকেও এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূরনবী' অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ রচনা। হযরত চরিত্রের কোমল মধুর দিকগুলো ততধিক কোমল সুন্দর করে এয়াকুব আলী তাঁর নূরনবীতে অঙ্কিত করেছেন। এ বই-এর ভাষা শিশুদের জন্য শুধু সহজবোধ্য নয় মধুর বলেই আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথও এ গ্রন্থ-খানা সম্পর্কে বলেছিলেন, "ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর এবং রচনা প্রণালী শিশু পাঠকের পক্ষে মনোরম। এরূপ সহজ বাংলা লেখা কঠিন কাজ।" পাঁচ সাত বছর বয়স্ক শিশুপাঠ্য বই মঈনুদ্দীনের 'আমাদের নবী'র কথা বাদ দিলে হযরতের জীবনী সম্পর্কিত এধরনের শিশুদের উপযোগী বই ইদানীং আর লেখা হয়নি। এয়াকুব আলী চৌধুরী যে একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন এও তার আর এক বিস্ময়কর পরিচয়।

এয়াকুব আলীর মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিক বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে খুব কমই জন্মেছে। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল এবং দার্শনিক। তাঁর চিন্তাশীলতা 'মানব মুকুট'-এর মধ্যে স্ফূর্তি পেয়েছে। সে জন্যে হযরতের জীবনী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর ভাষাও হয়ে উঠেছে অপূর্ব ধ্বনিব্যঞ্জনাময়-গতিশীল। 'মানব মুকুট' ও 'শান্তিধারা' একই বিষয়ের এপিঠ ও ওপিঠ। এয়াকুব আলী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন; তাঁর আবেগ প্রবণতা তাঁর যুক্তিবাদিতাকে ক্ষুণ্ন করেনি। ইসলামী বিষয়বস্তুও যে উন্নততর সাহিত্যের উপাদান হতে পারে এয়াকুব আলীর সাহিত্য সাধনাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সমগ্র বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে এয়াকুব আলীর মধুর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট গদ্য-বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.icsbook.info

কাব্যে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবনী লেখেন কবি মোজাম্মেল হক (শান্তিপুরের) এবং কাজী নজরুল ইসলাম। মোজাম্মেল হকের বই-এর নাম 'হযরত মোহাম্মদ'। নজরুলের 'মরুভাস্কর' হযরতের অসম্পূর্ণ জীবনী।

কোরবান আলী লিখিত 'শান্তিকর্তা হযরত মোহাম্মদ' (সঃ) এবং আবদুল জব্বার সিদ্দিকীর 'মানুষের নবী' (১৯৫৩) ও এ-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো বই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবনী ছাড়াও অন্যান্য নবীর জীবনী ও কাহিনী বাংলা সাহিত্যে কম লেখা হয়নি। খ্যাত ও অখ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক এদিকে লেখনি চালনা করেছিলেন। এ বিভাগের মুসলিম সমাজচিত্রমূলক উপন্যাস 'আবদুল্লাহ'র লেখক খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হকের 'নবী কাহিনী' অত্যন্ত সুলিখিত বই। 'নবী কাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের দিকে। এই বইটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'নবী কাহিনী'তে 'হযরত আদম', 'হযরত নূহ,' 'শাদ্দাতের বেহেশ্‌ত', 'আদ ও সমুদ', 'হযরত ইব্‌রাহিম্‌', 'হযরত ইউসুফ', 'হযরত মুসা', হযরত আইয়ুব', 'হযরত দাউদ,' 'হযরত সোলায়মান', 'হযরত ইউনুস' এবং 'হযরত ঈসা' প্রমুখ বারজন নবীর কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে বর্ণনা করা হয়েছে। নবীকাহিনী মূলত শিশুদের জন্য রচিত; কিন্তু শিশু ও শিশুদের পিতামাতা নবীদের সুখ-দুঃখের এবং ত্যাগ সাধনার কাহিনী একই সঙ্গে উপভোগ করতে পারে। নিছক শিশুপাঠ্য বই হিসেবেও এটি এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূরনবী'র সমপর্যায়ের রচনা।

আলাউদ্দীন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫) মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর মুদ্রিত পুস্তকের নাম 'ওমর চরিত'। পুস্তকটি ১৩১০ সাল অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হযরত ওমরের চরিত্র ও আদর্শ রক্ষা করাই এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়া তিনি 'ইসলাম প্রচারক'-এ ধারাবাহিকভাবে 'তফসীরে হাক্কানী'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এবং 'হযরত বড় পীর সাহেবের জীবন চরিত'ও রচনা করেন। পারস্যের শেখ সাদী, জালালুদ্দীন রুমী প্রমুখ বিভিন্ন কবির জীবনীও তিনি 'ইসলাম প্রচারক'-এ প্রকাশ করেছিলেন। আলাউদ্দীন আহমদ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার চৌহালী নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

সেকালের সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সম্পাদক নাজির আহম্মদ চৌধুরীর লেখা বই 'ফারুক চরিত' ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'ফারুক চরিত' হযরত ওমরের আদর্শোজ্জ্বল জীবনের কাহিনী। সৈয়দ আবদুর রউফের 'হযরত ওমর' (১৯২৭) ও এ প্রসঙ্গ স্মরণীয়।

আবু আহমদ আবুদল ওয়াহেদ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হযরত মুসার জীবনী লেখেন।

মীর্জা সুলতান আহমদ রচিত 'হযরত এব্‌রাহিম' ১৯২৭ এর প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বই। একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের 'খলিল গুলজার' নামক হযরত ইব্রাহীমের জীবনী ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

এস্‌ ওয়াজেদ আলী রচিত 'পীর পয়গম্বরের কথা' বিভিন্ন পয়গম্বর ও ওলি আল্লাদের বাণী-সংকলন। আম্বিয়াদের অনেক কাহিনী বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে, যেমন আমির নামক জনৈক অনুবাদকের মূল ফারসী থেকে অনূদিত 'কেছাছুল আম্বিয়া' (১৮৬৮), আবুল হোসেনের 'হাকিকাতুল আম্বিয়া' (১৮৭৬), মোহাম্মদ তাজউদ্দীন ও

www.icsbook.info

মোহম্মিদ খাতিরের 'কোলাছাতুল আম্বিয়া' (১৮৮১), কাজী মোহাম্মদ গোলাম রহমানের 'তাজকেরাতুল আম্বিয়া' (১৯৫৯) আবদুস সোবহানের 'নবী কাহিনী' (১৯৬০) এবং গাজী শামছুর রহমানের 'নবীদের কথা' (১৯৬৮)।

আবযজোহা নূর আহমদের 'খুলাফা-ই-রাশেদীন' (১৯৫৩) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'পয়গম্বর-কাহিনী' এবং 'এসরাইল বংশীয় নবীগণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিয়তা ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'মেশকাত শরীফ'। এটি মেশকাতুল মাসাবিহর বাছা বাছা হাদিসের অনুবাদ; সাত'শ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রকশিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে ফজলুরর রহিমের মেশকাতের এ সুবৃহৎ অনুবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বোখারী শরীফের ও (১৯২৮) আংশিক অনুবাদ করেছিলেন।

কোরআনের অনুবাদক এবং 'ইসলাম পরিচিতি'র লেখক খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর (১৮৮৯-১৯৬৪) 'শেষ নবী' (১৯৪৯) পুস্তকটি হযরত মোহাম্মদের জীবন বৃত্তান্ত। হযরতের জীবন এবং কোরআনের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে তিনি তাঁর এ বইটিতে দেখিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর 'মেশ্‌কাতুল মাসাবিহ্‌'র অনুবাদও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিন খণ্ডের তিনি 'মেশকাত শরীফে'র পূর্ণ অনুবাদ করেন। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। প্রথম খণ্ডে তিনি একটা মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত করেছেন। তাঁর 'সহীহ বুখারী তজরীদ' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। বাংলা সাহিত্যের পবিত্র কোরআন হাদীসের অনুবাদ ইসলামের মর্মব্যাখ্যার জন্য আবদুর রহমান খানের নামও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মওলানা ফজলুল করিম-এর নামও বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি 'আদর্শ মানব' বা হযরতের আদর্শ জীবনী ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। চার খণ্ডে প্রকাশিত 'মেশকাত শরীফ'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।

এছাড়া এ বিভাগে আবুল মনসুর আহমদের 'মুসলমানী কথা' ,হাবীবুল্লাহ বাহার লিখিত 'ওমর ফারুক', বেগম শামসুন্নাহার লিখিত 'পুণ্যময়ী', তোরাব আলীর 'ছোটদের মোস্তফা,' 'ছোটদের ফারুক চরিত' প্রভৃতি বইগুলোর নাম করা যেতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল হযরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবনী লেখার। তার সেই স্বপ্নের ফল 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৭৩ বাংলা সাল মোতাবেক ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। হযরতের মানস ও চরিত্র সম্বন্ধে এ গ্রন্থে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার ভিত্তিভূমি হচ্ছে 'কোরআন ও হাদীস।' কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন ঢাকার মুসলিম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মুসলিম সাহিত্য সমাজ সেদিন বাঙালী মুসলমানের জীবনে মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তা স্বাধীনতার সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। হযরতের চরিত্রের বিশালতা, ইসলাম ধর্মপ্রচারে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি তাঁর মহত্ত্ব ও ঔদার্য প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীকে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর এ গ্রন্থেই বুঝবার প্রয়াস পেয়েছেন অন্ধ বিশ্বাসে নয়, মুক্ত মন দিয়ে বিচারসহ করে। পরধর্মাবলম্বী পাঠকও আবদুল ওদুদ সাহেবের এ গ্রন্থ পাঠ করে হযরত মহাম্মদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবে। এদিকে থেকে কাজী আবদুল ওদুদের 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' হযরতের জীবন চরিতগুলোর মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

www.icsbook.info

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ফুলবাড়ী গ্রামের ডক্টর গোলাম মকসুদ হিলালী রচিত 'হযরতের জীবনী প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে। তার কথায় আল্লামা শিবলী নু'মানী সাহেবের 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থের শেষভাগে প্রদত্ত পয়গম্বর সাহেবের আচার ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধী অংশই এ পুস্তকের ভিত্তি।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবন কাহিনীর সঙ্গে ইসলামের শিষ্টাচারী খলিফা চতুষ্টয়-'খুলাফা-ই-রাশেদীনে'র জীবন কথা না জানলে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হয় না। পৃথকভাবে এই খলিফা চতুষ্টয়ের জীবনী অনেকে লিখলেও তাদের জীবনকথার যথার্থ ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে ছিল না বললেই চলে। বাংলা ভাষায় আমাদের ইসলামী সাহিত্যের এ অভাব দূর করবার জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ইসলামে 'খুলাফা-ই-রাশেদীন' তথা 'শিষ্টচারী খলিফা চতুষ্টয়ে'র জীবনী লেখানোর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কবি গোলাম মোস্তফার 'হযরত আবু বকর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে আবদুল মওদুদের (১৯০৮-১৯৭১) 'হযরত ওমর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, মুহম্মদ বরকতুল্লাহর 'হযরত ওসমান' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে এবং আবুল ফজলের 'হযরত আলী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে।

হযরত আবুবকর সিদ্দিকের অনেকগুলো জীবনী বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শামসুর রহমান আলজামালীর 'প্রতিষ্ঠা বা হযরত আবুবকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৯২২), হেদায়েত হোসেন মোরশেদের 'খলিফা আবুবকর' (১৯৬৩), ফজলুর রহমানের 'হযরত আবুবকর' (১৯৬৪), আবদুল হক মাশরেকীর'হযরত আবুবকর' (১৯৬৬)-এর গোলাম রব্বানীর 'হযরত আবুবকর সিদ্দিক' (১৯৬৫)।

(ঙ)

কারবালা সংক্রান্ত সাহিত্য

মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামের ইতিহাসের কাহিনী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে বহু সাহিত্যিকই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বিশেষত কারবালার ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে বহু কবিই কাব্য রচনা করেছেন। মুসলিম ইতিহাসের এ মর্মস্পর্শী কাহিনী গদ্য সাহিত্যিকদেরও যে উপজীব্য হয়নি, তা নয়। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'ই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সমগ্র বাংলা গদ্য সাহিত্যে 'বিষাদসিন্ধু'র মতো সৃষ্টি খুব কম পাওয়া যায়। ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'মহরম চিত্র' (১৯১৭) এবং কাব্যে কায়কোবাদের 'মহরম শরীফ' (১৯১৩) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

www.icsbook.info

মুসলমানদের জীবনে কারবালার ঘটনা একটি মর্মবিদারক ঐতিহাসিক সংঘটন। এ ঘটনাকে অবলম্বন করে বহু কাব্য কাহিনী অতীতে রচিত হয়েছে, তবে আধুনিকালে গদ্য রচয়িতারাও এ ঘটনাকে অবলম্বন করে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৮৮৫ থেকে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের একটি অসাধারণ গদ্যরচনা। আবুল মালী মোহাম্মদ হামিদ আলীর 'কাসেম বধ কাব্য' এবং 'জয়নাল উদ্ধার' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯০৬ এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে মোহাম্মদউদ্দীন আহমদের 'মোহররম কাণ্ড' (১৯১২), মোহাম্মদ আবদুল বারীর (১৮৭২-১৯৪৪), 'কারবালা' (১৯১৩), ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'মহরম চিত্র' (১৯১৭), খয়রাতুল্লার (১৯২৪-১৯৩৬) 'কারবালা' (১৯০৬) আমির হোসেন আলকাদেরীর 'কারবালার যুদ্ধ' (১৯৩৬), খান বাহাদুর আবেদ আলীর 'মহরম পর্ব' আবদুল গফুর সিদ্দীকির 'বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি,' ডক্টর গোলাম সাকলায়েনের 'কারবালার কাহিনী', মুহম্মদ বরকত উল্লাহর 'কারবালার যুদ্ধ ও নবী বংশের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৭) এবং 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫)।

www.icsbook.info

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি
রবীন্দ্রযুগ

মুহম্মদ আবদুল হাই
পুনর্লিখন ঃ সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি
(রবীন্দ্রযুগ)

রবীন্দ্রনাথ
(১৮৬১-১৯৪১)

আধুনিক বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অশেষ। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার শব্দ-সম্ভার বৃদ্ধি করেছেন, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে নতুন অর্থ আরোপ করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে কবিতাকে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে কবির কৌতূহল, অনুভূতি এবং বিবেচনার ফলশ্রুতি করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, শুধুমাত্র কাব্যক্ষেত্রে নয় বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ব্যবহার আমরা পাই, যেমন উপন্যাস ও ছোটগল্পে গদ্যের ব্যবহার, ধর্মমূলক নিবন্ধে গদ্যের ব্যবহার এবং সাহিত্য-সমালোচনায় গদ্যের ব্যবহার। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গদ্যের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ অশেষ দক্ষতা এবং কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যকে সর্বপ্রথম বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করলো। অর্থাৎ সে সময় সাহিত্যের প্রথম ধাপে গদ্য পা রাখল। রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাকে প্রাথমিক রূপ দিয়েছিলেন অর্থাৎ জন্মের পর শিশুকে যেভাবে সর্বক্ষণ পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, রামমোহন এবং মৃত্যুঞ্জয় সেভাবে বাংলা গদ্যকে বাঁচিয়ে রাখলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাই। তিনি মমতা ও সেবার দ্বারা বাংলা গদ্যকে জীবনময় করলেন। এরপর এলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালিপ্রসন্ন সিংহ। এঁদের হাতেই বাংলা গদ্যের প্রথম যৌবন উন্মেষ ঘটল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বাংলা গদ্য সজীবতাকে পেল এবং প্রাণরসে অভিষিক্ত হল।

এক সময় বাংলা কবিতা রচনার সূত্রপাতে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে অনুসরণ করেছিলেন, বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে, অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে তিনি এর প্রভাব অতিক্রম করতে সফলকাম হয়েছিলেন এবং নিজের জন্য একটি নিজস্ব বাগ-বৈদগ্ধ্য নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম দিককার উপন্যাসে যেমন 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। ঘটনা এবং প্রকৃতি বর্ণনার দীর্ঘ-সূত্রিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব খুবই স্পষ্ট এব সাধুরীতির ব্যবহারেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পরিদৃশ্যমান। তবে যখন তিনি এর প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন তখন আশ্চর্য সজীবতায় একটি নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হলেন। বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে একটি নিজস্ব কথ্য-বাচনভঙ্গী নির্মাণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার প্রবাহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে, একটি সচলতা আছে যা অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং বিচিত্র বিন্যাসে প্রকাশিত হয়ে

www.icsbook.info

অবশেষে একটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। 'ভারতী' ও 'সাধনা'র যুগ থেকে 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সাধু রীতিরই আবর্তন মাত্র, কিন্তু 'সবুজ পত্র'কে অবলম্বন করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রীতিধারার যেমন পরিবর্তন হতে থাকে তেমনি তাঁর গদ্যরীতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ সময় যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় স্পষ্ট তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে। কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলেই মুখে শুধু কালি পড়ে"-এ উক্তির সত্যতা যেমন প্রমথ চৌধুরী তাঁর সমস্ত গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রে'র পর থেকে তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের হাতে কথ্য ভাষা শালীন ভাষার মর্যাদা পেয়েছে এবং তাঁর সর্বপ্রকার গদ্য রচনা কথ্য ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে।

উপন্যাস, সমালোচনা, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বিভিন্ন ধর্মমূলক প্রার্থনা সব কিছুই তিনি কথ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় কথ্য ভাষা লাবণ্যময় হয়েছে, শ্রী ও মাধুর্য মণ্ডিত হয়েছে এবং অবিশ্বাস্য গভীরতা অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রমাণ করলেন যে গদ্যে দ্বিধা-বিভক্ত রীতি সমর্থনযোগ্য নয় এবং কথ্য রীতি মানুষের সর্বপ্রকার অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম। রাজনীতি হোক, দর্শন হোক, সাহিত্য সমালোচনা হোক, ব্যাকরণ হোক ভাষাতত্ত্ব হোক, সকল জটিল ও দুরূহ বিষয় কথ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায়।

বিষয়ানুসারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়- যেমন সাহিত্য-সমালোচনা ও বিশ্লেষণ, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী ও আত্মকথা এবং চিঠিপত্র। কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রকারের প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ রচনার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনা। প্রবন্ধটি বক্তব্যের দিক থেকে বর্তমানে সমর্থনযোগ্য নয় এটা সত্য, কিন্তু বালক রবীন্দ্রনাথ ঐ অল্প বয়সে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে একটি কাব্যের সমালোচনায় যে অগ্রসর হয়েছিলেন এটাই বড় কথা। এভাবে আমরা দেখব যে অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় আরো অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'। দেখা যাবে, সাহিত্যের প্রতি অদম্য আগ্রহ এবং সাহিত্যের রসকে শোষণ করার জন্য অপরিমিত কৌতূহল রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্র ধরনের গদ্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রধানত এই কটি। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'শব্দতত্ত্ব।' এই ভাষা বিষয়ের আরো কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন হচ্ছে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ। এক সময় 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকা দুটিতে ইংরেজী থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন। শেষ জীবনে 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থ রচনা করে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম্য চিন্তার পরিচয় 'শান্তিনিকেতন' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে

www.icsbook.info

পাওয়া যায়। এখানকার প্রবন্ধগুলি ধর্ম বিষয়ক অথবা বলা যায় বোধ এবং উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সেই প্রেরণালব্ধ সাহিত্যকে 'শান্তিনিকেতনে'র বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। রাজনীতি বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভারতবর্ষ' ও 'কালান্তর'। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়রী', 'যাভা যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানে পারস্যে', 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ', 'জাপান যাত্রী' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধেরও সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'শিক্ষা', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে অতুল গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"তাঁর সকল রচনায় সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ। সর্বত্র মহাকবির বাগবৈভব। বিচার যুক্তির মধ্যে হঠাৎ এল উপমা। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো করে দিল। প্রতিপক্ষের মনে হ'ল এ অন্যায়। লড়াই চলছিল লাঠিতে লাঠিতে, তার মধ্যে তলোয়ারের ধার ও দীপ্তি আনা।....বিষয় ভেদে সে দোল মন প্রকাশ্যে উপভোগ করছে, বিষয় ভেদে সে দোল মৃদুর চেয়েও মৃদু। বুদ্ধিভাবে যা কিছু আয়োজন তাকে চলার পথে দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু অজ্ঞাতে পায়ে লেগেছে ছন্দের দোল। মহাকবির গদ্য, সুতরাং ভুলেও কোথাও পদ্যগন্ধী নয়। ভাষা প্রয়োগের কলা-কৌশল রয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে এমন গদ্যে যা গদ্য লেখকের অসাধ্য। এ রকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ, যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব। আর তার চেয়েও দুর্লভ মহাকবির প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা।.... পাগল ছাড়া এর অনুকরণের কথা কোন লেখক কল্পনা করে না।"

জগদীশচন্দ্র বসু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্র-যুগের আর দুজন খ্যাতনামা লেখকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়, যাঁদের বৈজ্ঞানিক বিষয়-সংক্রান্ত গদ্য রচনাও সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এঁদের একজন রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭); আর একজন বয়োকনিষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসু 'Response of the Living and the Non-living' নামক বই লিখে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জড় ও চেতন জগৎ সম্বন্ধে তাঁর সাধনা ও প্রাপ্তি তিনি বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন-এটিরই প্রতিরূপ দেখা যায় তাঁর 'অব্যক্ত' নামক বাংলা গ্রন্থটিতে। জড় জগতের মধ্যে যে চেতন সত্তার আবিষ্কার তিনি করেছেন, অসাধারণ মমতা দিয়ে তাকেই তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন। বলার ভঙ্গীতে একটা কবি-দৃষ্টি এবং বিস্ময়-বিমুগ্ধতা এ বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁর সর্বজ্ঞানরসিক অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। জ্ঞানের আলো যেখানে পড়ে, সেখান থেকে কিরণ যেমন শতমুখে ঠিকরে আসে তেমনি বেদবিদ্যা ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন থেকে আরম্ভ করে মহাভারত ও মহাজন চরিত-কথার মধ্য দিয়ে বাংলার মেয়েলি ছড়া পর্যন্ত সবকিছুই রামেন্দ্রসুন্দরের দীপ্ত মনীষা ও সুহাস রসিকতার স্পর্শ পেয়ে শতধারায় নানা রশ্মি বিকীরণ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'কর্মকথা' (১৯১৩),

www.icsbook.info

'চরিতকথা' (১৯১৩), 'শব্দ-কথা' (১৯১৭), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯১৪), 'যন্ত্র কথা' (১৯২০) ও 'জগৎ কথা' (১৯২৬) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ এমনি ধরনের গভীর জ্ঞান ও চিন্তায় দীপ্তিমান। আশ্চর্য হতে হয় এর প্রকাশভঙ্গী দেখে, ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করছে। তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি, জ্ঞানীর বিমুক্ত মনের পরিচয় এ ভাষার প্রতি পদে পদে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনায় আরও একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩)। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'প্রকৃতি পরিচয়', 'গ্রহনক্ষত্র', 'পোকা-মাকড়', 'আলো', 'গাছ-পালা', 'মাছ ব্যাঙ সাপ' এবং 'বাংলার পাখি'। নামকরণ থেকে স্পষ্ট হয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী
(১৮৬৮-১৯৪৪)

রবীন্দ্রযুগের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের একটি স্বতন্ত্র যুগ প্রতিষ্ঠার দাবীদার হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৪) নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় কথ্যরীতি সাহিত্যিক স্বীকৃতি এবং মর্যাদা লাভ করে তাঁরই হাতে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবি বিলাস' প্রভৃতি ব্যঙ্গরসাত্মক গ্রন্থের লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা গদ্যের এ রীতির উদ্ভব, আলাল ও হুতোমে এ রীতির বিকাশ; প্রমথ চৌধুরীর হাতে এর সাহিত্যিক পরিণতি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা ক্রিয়াপদের গতি সঙ্কুচিত করেই কথ্যরীতির প্রবর্তনে তাঁর কাজ শেষ করেন নি। মুখের ভাষার অনন্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েই তা থেকে শতধারায় রস নিষ্কাষিত করেছেন। ১৯১৪ সালের দিকে তাঁর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করেই এ কথ্য গদ্যরীতির তিনি পূর্ণতম প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা', 'রায়তের কথা', প্রভৃতি বইএ প্রমথ চৌধুরীর বাকভঙ্গীর চটুলতা অপরূপভাবে ধরা পড়েছে। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে সে সব শুকনো নীরস বিষয়বস্তুর মধ্যে বলার ভঙ্গীতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করেছেন। বলার ভঙ্গী বলার বিষয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। সাধু বনাম চলিত ভাষার তর্কে প্রমথ চৌধুরীর জয়ের চিহ্ন যেমন আজ বাংলা গদ্যের সর্বত্র বর্তমান, তেমনি তাঁর রচনা-রীতির প্রভাবও বাংলা সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনা রীতিতে তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা তাঁর বড় দান বলে স্বীকৃত হবে। ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে তিনি যা লিখেছেন, তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। তাঁর সকল রচনাতে জড়িয়ে আছে অস্কার ওয়াইল্ডীয় দীপ্তিমান রসিকতার তীক্ষ্ণ সরসতা। তিনি মনে করেন, তাঁর বাকভঙ্গীর এ তীক্ষ্ণ দীপ্তি কৃষ্ণনাগরিক হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতচন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া। বাংলা গদ্যের কথ্যরীতির উৎকর্ষ সাধনে এ অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রমথ চৌধুরী ওরফে 'বীরবলে'র প্রভাব রবীন্দ্রনাথেও পড়েছিল। রবীন্দ্র-যুগে জন্মে, যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করা প্রমথ চৌধুরীর জীবনে কম গৌরবের কারণ নয়, তাঁর এ গৌরব যতটা ব্যক্তিগত তার চেয়েও বেশি বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের গতি

www.icsbook.info

নির্ধারক হিসেবে। কারণ প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনের দানেই বাংলা গদ্যে কথ্যরীতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। এ রীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে, আর রবীন্দ্রনাথ তাতে দান করেছেন সুষমা-অসাধারণ গতি এবং কাব্যিক কমনীয়তা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৭১-১৯৫১)

বাংলা গদ্যের কথ্যরীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথ্যরীতি যে কত সহজ ও কত মিষ্টি হতে পারে তার অপূর্ব নজীর তাঁর 'ঘরোয়া' এবং 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'। 'ঘরোয়া'তে তিনি মন খুলে ঠাকুর-বাড়ীর অতীত কাহিনী আর তাঁদের ছেলেবেলার কথা আলাপ করেছেন আর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'তে শিল্পের দুরূহ সাধনা এবং সৌন্দর্য তত্ত্বের কথা আশ্চর্য সহজ লিপিকুশলতায় এবং অসাধারণ মাধুর্যে ব্যক্ত করেছেন। স্রষ্টার সহজ দৃষ্টি আর মুগ্ধ বিস্ময় তাঁর প্রতি রচনার গায়ে গায়ে জড়ানো রয়েছে, সুদক্ষ শিল্পীর মতো অতিপরিচিত, বহু ব্যবহৃত অতি সাধারণ কথার হার গেঁথে শিল্প জগতের দুরূহ তত্ত্ব ও তথ্য তিনি পাঠক সাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন। ভাষায় এ আশ্চর্য নগ্নলাবণ্য পাঠককে মুগ্ধ করে যত না, তার চেয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় করে বেশি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে নিষ্কৃতিদান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন; তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।" একাধারে চিত্রকলা ও সাহিত্য-প্রতিভার একটি পরিপূর্ণ সমন্বয় অবনীন্দ্রনাথে আমরা লক্ষ্য করি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাকে বলতেন- 'ছবি লিখিয়ে অবন ঠাকুর'।

অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'বুড়ো আংলা', 'নালক' প্রভৃতি গ্রন্থে বিচিত কথাচিত্রের সমারোহ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর লেখার ভাষা মূলত মুখে মুখে গল্প বলার ভাষা।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ
(১৮৪৩-১৯১০)

বিশুদ্ধতা এবং সৌহার্দ্যকে সাহিত্য সাধনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে কালীপ্রসন্ন ঘোষ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। তিনি ঢাকা জেলার অধিবাসী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর আদর্শে তিনি 'বান্ধব' নামক একটি মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছিলেন। 'বান্ধব' একটি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র ছিলো এবং এটি কালীপ্রসন্নের অতুলনীয় কীর্তি হিসেবে চিরদিন গণ্য হবে। কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাদির নাম-'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯), 'সমাজ শোধনী' (১৮৭২), 'প্রভাত চিন্তা' (১৮৭৭), 'ভ্রান্তিবিনোদ' (১৮৮১), 'নিভৃত চিন্তা' (১৮৮৩), 'প্রমোদলহরী' (১৮৯৫), 'ভক্তির জয়' (১৮৯৫), 'নিশীথ চিন্তা;' (১৮৯৬), 'মা না মহাশক্তি' (১৯০৫), 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' (১৯০৫), 'ছায়াদর্শন' (১৯১০)। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'প্রভাত চিন্তা', 'নিভৃত-

www.icsbook.info

চিন্তা' এবং 'নিশীথ-চিন্তা' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে এককালে বিবেচিত হত। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় কালীপ্রসন্নের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়।

বিবিধ প্রকৃতির গদ্য

'রবীন্দ্রযুগের সূত্রপাতে যে সকল নেতৃবৃন্দ হিন্দু সমাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন ধর্মনেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) এবং শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)। কেশবচন্দ্র সেন সরল ভাষায় ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'ব্রহ্মোৎসব' (১৮৬৮), 'আচার্যের উপদেশ' এবং 'দৈনিক প্রার্থনা' গ্রন্থে। বিবেকানন্দের কিছু জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনা বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রচারিত হচ্ছে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'ধর্মজীবন' (১৯০১), 'মাঘোৎসবের উপদেশ' রচনা করেন। কিন্তু যে গ্রন্থ দুটির জন্য তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন তা হচ্ছে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (বাং ১৩০৪) এবং 'আত্মচরিত (বাং ১৩২৫)। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'গীতাপাঠের ভূমিকা' একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গদ্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'চিন্তামণি', 'নানাচিন্তা', 'প্রবন্ধমালা', 'সারসত্যের আলোচনা'। পন্ডিত ও গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫২-১৯৩১) যদিও চর্যাগীতি আবিষ্কারের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কিন্তু প্রবন্ধ রচনা এবং উপন্যাসের জন্যও তাঁর নাম উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর 'ভারতমহিলা', 'বাল্মীকির জয়', এবং 'মেঘদূত' এককালে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি বাংলাদেশের বৌদ্ধ যুগের শেষ পর্বের একটি অপূর্ব আলেখ্য। বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ হিসেবে রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাত খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বাংলা ভাষায় একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী
(১৮৬৪-১৯২৪)

রবীন্দ্র-যুগে নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী নামক একজন শক্তিশালী মুসলিম লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি আনুমানিক ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার আটিয়া পরগণার অন্তর্গত চারাণ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর 'শৈশব কুসুম', 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি', 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান' প্রভৃতি বই পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান' (প্রথম প্রকাশ ১৮৯১, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তকটি নানাবিধ চিন্তা গবেষণায় পরিপূর্ণ। স্বজাতির হৃত গৌরবের জন্য এক্ষণে মুসলমান সম্প্রদায়ের কি করা উচিত, ইনি এ গ্রন্থে সে পথ নির্দেশ করে গিয়েছেন। ১৩১০ সালের (১৯০৩ খ্রীঃ) আশ্বিনে, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 'নবনূর' পত্রিকায় নওশের আলী খান ইউসুফজয়ীর 'বঙ্গীয় মুসলমান' সম্পর্কে এ ধরনের

www.icsbook.info

সমালোচনা দেখি, 'আমরাও লেখকের সহিত একমত হইয়া বলি " বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি মুসলমান নরনারী বাস করিতেছে কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের চেতনা বা অস্তিত্ব আছে কিনা, সন্দেহের বিষয়।'

বাঙালী মুসলমান সমাজের দুঃখ দুর্দশায় অভিভূত হয়ে নওশের আলী খান এ পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। স্বীয় সমাজ ও জাতি সম্পর্কে চিন্তা ও বেদনার ছাপ পড়েছে তাঁর এ বইটিতে।

নওশের আলী খান 'মিহির ও সুধাকার', 'ইসলাম প্রচারক' এবং 'নবনূর' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর যাবতীয় লেখায় সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
(১৯৬৯-১৯৫৩)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান সংগ্রাহক এবং একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে আবদুল করিমের নাম সর্বাগ্রগণ্য।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল করিম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত নিয়ে এন্ট্রান্স ও এফ এ. পাশ করে সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হন। স্বনামখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর লেখায় প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ফৌজদারী আদালতে তাঁকে কেরানির চাকরি দেন। অল্পদিন তিনি এ পদে কাজ করার পর এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিভাগীয় স্কুল ইনস্‌পেক্টরের অফিসে দ্বিতীয় কেরানির পদ লাভ করেন। এ চাকরির কষ্টার্জিত অর্থের সুখ-সুবিধা থেকে আবদুল করিম নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনদের বঞ্চিত রেখে বছরের পর বছর সারাজীবন পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এগুলোর মধ্যে এক হাজারেরও বেশি পুঁথি বাংলার মুসলমানদের দ্বারা রচিত। প্রাচীন বাংলার মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য সাধনার প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ এত বড় সংগ্রহ আজ পর্যন্ত অন্য কোনো লোক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব হয় নি। আবদুল করিমের জীবনের এই-ই এক অমর কীর্তি।

তাঁর নিজের সংগ্রহ ঘেটে শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ বিজয়', রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', আলীরাজার 'জ্ঞান সাগর' প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করে গেছেন ও আরাকান রাজসভার আলাওল, দৌলত কাজী ও মাগন ঠাকুর প্রমুখ কবি সম্পর্কেও অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগিতায় 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' রচনা করেন। এ বইটিতে আবদুল করিমের উপাদান সংগ্রহ এবং এনামুল হকের বিষয়-বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আবদুল করিম রচিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'ও প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার এক অমূল্য উপাদান।

তিনি মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 'প্রায় ছয়শত মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন'।

আবদুল করিম-রচিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে'র ভূমিকায় ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছিলেন, "শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিমের অদম্য উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহের ফলে আজ সহস্রাধিক প্রাচীন পুঁথি আসিয়া জমিয়াছে।

www.icsbook.info

তিনি মুসলমান, কোনো হিন্দুর আঙিনায় তাঁর প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুঁথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মতো তাহার দ্বারে গিয়া পুঁথি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুঁথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়, অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি মিনতিতে নরম হইয়া নিজে পুঁথি খুলিয়া পাতা উলটাইয়া দেখাইয়াছেন, মুন্সী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্তস্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া নোট করিয়া সেই সকল পুঁথির বিবরণ লিখিয়া আনিয়াছেন। এত অধ্যবসায়ে, এত আগ্রহে এমন করিয়া কোন হিন্দু অন্তত তাঁহার নিজের ঘরের পুঁথিগুলির বিবরণ লিখিতে বা অন্য কোন কার্যে হাত দিয়াছেন কিনা, জানি না। মুন্সী সাহেবের নিকট বাংলা সাহিত্য সমাজের কৃতজ্ঞতার পরিণাম যে কত বেশি, তাহা হইতেই অনুমান করা যায়।"

তাঁর সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টগ্রামের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' এই নদীয়ার পণ্ডিত মণ্ডলী 'সাহিত্য সাগর' উপাধি দান করেছিলেন।

"তিনি ১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর সংগৃহীত পুঁথির অধিকাংশই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি যেসব পুঁথি দান করে যান সেগুলোর বিবরণ সম্বলিত 'পুঁথি পরিচিতি' (রয়াল সাইজ পৃঃ ৭০৪) নামে একটি সুবৃহৎ পুস্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যবিশারদ নিজেই এই বিবরণ সংকলন করে যান। প্রকাশকালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক আহমদ শরীফ 'পুঁথি পরিচিতি'র সম্পাদনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'পুঁথি পরিচিতি'র একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(১৮৭৩-১৯৩২)

"বাংলা সাহিত্যে কাহিনী নির্মাণ এবং বর্ণনার প্রসাদগুণে উপভোগ্য গল্প ও উপন্যাস রচনা করে এককালে প্রভাতকুমার অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মানব চিত্তের গভীরে প্রবেশ করে মনস্তাত্ত্বিক প্রকল্প তিনি উদ্ধার করেননি কিন্তু প্রতিদিনের দৃষ্টিতে পতিত মানুষের বিচিত্র আচরণকে তিনি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। কৌতূহলের সঙ্গে মিশেছিলো তাঁর রহস্যপ্রিয়তা-এগুলোকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর সমকালীন নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজের জীবন নিয়ে অফুরন্ত রসের ভান্ডার খুলে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও তাঁর রচনার একটি নিজস্ব সচলরীতি আছে। লেখক আপনাকে অপ্রকাশ রেখে, আবেগের ব্যাখ্যা থেকে বিরত থেকে এক প্রকার নিশ্চিন্ত সরলতায় এবং কখনও কখনও লঘু চাপল্যে যে সমস্ত গল্প উপন্যাস লিখেছেন কাহিনীর ঘটনাক্রমের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতায় বাংলা সাহিত্যে তা স্থায়ী আসন পেয়েছে। 'নবকথা' (১৯০০) তাঁর প্রথম গল্পের বই। প্রথম গ্রন্থটিতেই অনুভব করা যায়, গল্প বলার অধিকার তাঁর ছিলো। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী' (১৯০১) হাস্যরসাত্মক এবং চটুল। কিন্তু গল্প লেখক হিসেবে তাঁর যথার্থ নিপুণতা ফুটে উঠেছে 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯) গ্রন্থে।

www.icsbook.info

প্রভাতকুমারের উপন্যাস অনেকগুলো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুটি 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২) এবং 'রত্নদীপ' (১৯১৫)। উভয় উপন্যাসেই বিচিত্র চরিত্রের চলাচল লক্ষ্য করা যায়। ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো কাহিনীর গতিধারায় কৌতূহল সৃষ্টি করে তিনি পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করেছেন। এ-দুটি উপন্যাসেই প্লট বা কাহিনীর একটি বৃত্তগত সম্পূর্ণতা আছে। এরই মধ্যে চতুর এবং কুশলী মানুষগুলো চলাফেরা করছে।

প্রভাতকুমারের ভাষা সাধুরীতির হলেও চলিত ভঙ্গীর স্বাদ উপস্থিত করে। অত্যন্ত সহজ নির্লিপ্ততায় তিনি তাঁর শব্দ সাজিয়েছেন। কোথাও বিশিষ্টার্থক নির্মাণ-পদ্ধতির কৌশল নেই কিন্তু নিশ্চিন্ত গতির আনন্দ আছে।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৭৬-১৯৩৮)

রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা বাঙালীর চিত্ত বিশেষভাবে জয় করেছেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তাঁর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারেই শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নিজ গ্রামে লালু চ্যাটার্জি নামেই পরিচিত ছিলেন। দারিদ্র্যবশত স্কুল কলেজের লেখাপড়া শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে বিশেষ জোটেনি, এ ছাড়া অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। উপযুক্ত অভিভাবকদের অভাবে এবং পেটের দায়ে অল্প বয়সেই তিনি ভবঘুরে হন এবং চাকরি উপলক্ষে জীবনের বহুকাল বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে বাস করেন। ভবঘুরে জীবনে বাংলার বাপে-খেদানো, মায়ে-তাড়ানো ছেলেদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; চাকুরে বাকুরেদের মেসে জীবনের বহু সময় তাঁর অতিবাহিত হয়; সাধু সন্ন্যাসীদের আড্ডায় এবং আশ্রমেও তিনি জীবনের কিছু সময় কাটান। তাঁর সাহিত্যে যে সব বখাটে ছোকরা, ঠাকুর, চাকর, ঝি এবং পতিত পতিতাদের সমাজ বহির্ভূত জীবনের রূপ প্রতিফলিত হতে দেখি, তাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই নরনারী জীবনের বিচিত্র রূপ তাঁর সাহিত্যে দল পাপড়ি মেলেছে।

কর্মক্ষেত্রে এবং বাংলা ও বাংলার বাহিরে ঘোরাফেরা করাতে বহু গল্প তাঁর জীবনে সঞ্চিত হয়েছিল। সাহিত্যিক জীবনের পটভূমি হিসেবে তাঁর জীবনে কোনো সতর্ক সাধনা দেখি না; জীবনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত এ গল্পগুলো নিয়েই পাকা জহুরীর মতো তিনি বাংলার উপন্যাস জগতে প্রবেশ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান যে কত বড়ো, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বাংলার খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায়। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু বাংলার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ও জমিদারকুলের প্রতিনিধি হিসেবে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও দর্শনের পটভূমিতে সমাজ জীবনের রূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর রক্ষণশীল মনের ও মতবাদের যূপকাষ্ঠে তাঁর কালের নরনারীরা বলি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি জীবনের রূপকার ঔপন্যাসিক ছিলেন না, ছিলেন জীবনকে অবলম্বন করে ধর্ম ও আদর্শের ব্যাখ্যাকার। শরৎচন্দ্রের উপনাসে সেই বাংলাদেশের মানুষেরই দেখি এক ভিন্নতর রূপ। শরৎচন্দ্র কোনো আদর্শের ব্যাখ্যাকার হিসেবে কলম ধরেন নি। জীবনে নরনারীর যে ব্যথা ও যে সুখ তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন, তাদের জীবনের সেই স্বাভাবিক সুখ-দুঃখকে অপরিসীম সহানুভূতি ও দরদে

www.icsbook.info

রাঙিয়ে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন সমাজের মানদন্ডে যে সব নরনারী চরিত্রহীন, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যেও আদর্শোজ্জ্বল মনুষ্যত্বের অভাব নেই। পাপকে তিনি ঘৃণা করেছেন, কিন্তু পাপীকে নয়। সমাজেরই অন্যায় অত্যাচারে যে মানুষের হঠাৎ পদস্খলন হয়, সে কি চিরকালের জন্য মানুষের সমাজ-বহির্ভূত হয়ে যাবে? শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে এ নিতান্ত অন্যায়। মানুষের মনুষ্যত্বকেই শরৎচন্দ্র বড়ো করে দেখেছেন। বেদনালাঞ্ছিত মানবতার রূপ শরৎচন্দ্র যেমন করে তুলে ধরেছেন, বাংলার অন্য ঔপন্যাসিক এমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তাই সমাজ অস্বীকৃত জীবন যাপন করা সত্ত্বেও তাঁর সতীশ, সুরেশ, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী এবং অন্নদা দিদিরা মহিমময় ও মহিমাময়ী নরনারী। মানবতার এ আদর্শ রূপায়ণেই তিনি সাহিত্যিক।

সুনীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন না তুলে মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তির দাবী স্বীকার করে নিয়ে এককালে রবীন্দ্রনাথই তার 'নষ্ট নীড়' গল্পে চারু ও অমলের সমাজ-বহির্ভূত প্রেমের দৌরাত্ম্য নিয়ে লীলা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-পরিত্যক্ত রাগিণীতে সুর যোজনা করলেন নারী মনের অতল গহনে প্রবেশ করে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের প্রতি মহিমের স্ত্রী অচলার আসক্তি শরৎচন্দ্র ডুবুরির মতো তার মনোগহনে প্রবেশ করে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম এমন অবস্থায় 'রোহিণী'কে গুলি করে মেরেছিলেন, তিনি তা করেন নি। তার স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে শিল্পীর মতো তাদের সংসার জীবনের জ্বালা ও পরিণতির চিত্র রচনা করেছেন।

মানুষের জীবনের জটিলতাকে স্বীকার করে নিয়ে শরৎচন্দ্র যেভাবে এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাবেগকে তুলে ধরেছিলেন, তার জন্য বাংলার হিন্দু সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনও কম হয় নি। তাঁর সমস্ত খ্যাতি ও অখ্যাতি মানব মনের ভাবনা, কামনা ও বাসনার স্বীকৃতিদান ও রূপায়ণের জন্য। রক্ষণশীল সমাজ এ কারণেই তাঁকে যত বিদ্রূপ করেছে, বাংলার সংস্কারমুক্ত যুব সমাজ ততই তাঁর দৃষ্টিতে গর্ব ও আনন্দবোধ করেছে।

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সফলকাম পুরুষ। তাঁর সময়কালে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসার জীবনের পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে যে মমতা, প্রেম, ঈর্ষা ও বিরোধের ঘূর্ণাবর্ত তাকে তিনি অসাধারণ সরল ও গ্রহণযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তার ভাষার সহজ সুনিশ্চয় গতি, আবেগ ও করুণার বিস্তৃত বিবরণ এবং স্পর্শকাতরতা তাঁকে সাধারণ পাঠকের কাছে এক সময় প্রবলভাবে জনপ্রিয় করেছিলো। প্রধানত গ্রামীণ জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র কোলাহল, আকাঙক্ষা, দুর্বলতা, লালসা, স্বার্থ এবং আকুতিকে তিনি এমন এক আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করছেন যে মনে হয় তিনি প্রতিটি ঘটনার অংশভাগী। এর ফলে উপন্যাস এবং গল্পে চরিত্র চিত্রণের জন্য লেখকের যে বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন, শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষায় এক প্রকার তরল অনায়াস-সিদ্ধতা আছে এবং আন্তরিকতাও আছে। প্রথম দিকে কৈশোর ও যৌবনে যে সমস্ত গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন যেমন 'বড় দিদি', 'মেজ দিদি', 'অরক্ষণীয়া', 'স্বামী', 'দত্তা', 'পরিণীতা' এগুলো, সবই বাঙালী পরিবারের স্বভাবজাত সেন্টিমেন্ট এবং পরিবারভুক্ত মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে রচিত। এগুলো এক সময় বাঙ্গালী গৃহের কর্মক্লান্ত রমণীদের অবসরকালের পাঠ্যগ্রন্থ ছিলো। গল্পগুলোতে কোনও প্রকার মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নেই। চারিত্রিক সংঘাত এবং

www.icsbook.info

দ্বন্দ্বের উপলক্ষ্য নেই, এমন কি শিল্পগত কোনও উপসংহারও নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উপন্যাসের যে শিল্পগত সিদ্ধি আমরা লক্ষ্য করি, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তার একান্ত অভাব। তিনি বাঙ্গালী চরিত্রের গৃহগত দুর্বলতাকে জানতেন এবং সে দুর্বলতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে তার গল্পগুলোর মধ্যে একটি অসাধারণ তাৎক্ষণিক আকর্ষণীয়তা এনেছিলেন। তরল ভাবালুতা এবং সাধারণ পাঠকের জন্য একটি আনন্দময় পরিণতি নির্মাণ করে তিনি গল্পগুলোকে গ্রহণযোগ্য করেছিলেন। সাধারণ পাঠক যে স্বভাবের উপসংহার ত্যাগ করে সে ধরনের উপসংহারই তিনি নির্মাণ করতেন। বাঙ্গালী হিন্দু গৃহের সাংসারিক এবং সামাজিক দুঃখ বেদনাকে অবলম্বন করে ব্যাকুলতা এবং হৃদয়াবেগের সহায়তায় তিনি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এ-সব কাহিনীর মধ্যে দুর্বল এবং নিপীড়িতদের জন্য অনুকম্পা আছে। একটি অনুপম কুশলী ভাষায় তিনি এ অনুকম্পাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেই এক সময় বলেছিলেন "প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলো চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটা জিনিস আছে তাতে প্লট নেই। আমার জিনিস কতকগুলি চরিত্র তাকে ফোটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়। সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।"

"শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে একটি সফলকাম কাহিনীবৃত্ত আছে। সূচনা এবং সমাপ্তিকে জীবন-অনুভবের দুপ্রান্ত হিসেবে নির্দেশ করলে এর মধ্যে আবর্তিত বিভিন্ন ঘটনা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত, সমর্থন-প্রতিরোধ এবং আকাঙক্ষা-নিবৃত্তির ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে একটি পরিসমাপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের শেষ অংশে মহিমের চিত্তের অন্তর্লীন জিজ্ঞাসা- সে অচলাকে গ্রহণ করবে কি করবে না, উপন্যাসটিকে অর্থবহ করেছে। টমাস হার্ডির 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজ' (A Pair of Blue Eyes) উপন্যাসের সঙ্গে গৃহদাহের সমান্তরলতা আছে। উভয় উপন্যাসেই একই রমণীর প্রণয়াসক্ত দুজন পুরুষকে নিয়ে প্রণয় সংঘাতের একটি ত্রিভুজ নির্মিত হয়েছে। ইংরেজী গ্রন্থের সমাপ্তিতে রমণীর মৃত্যুতে দুবন্ধুর মধ্যবর্তীর সংশয় ও সংঘর্ষের অবসান ঘটে কিন্তু বাংলা উপন্যাসে সুরেশের মৃত্যুতে মহিমের চিন্তা ও বিবেচনায় চিত্তদাহের নতুন উপকরণ উপস্থিত হয়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিও সুখপাঠ্য উপন্যাস কিন্তু কিছুটা বিশৃঙ্খল। আনেকগুলো কাহিনী অসংলগ্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

"শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি আঙ্গিকের দিক দিয়ে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার প্রক্রিয়ায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়স পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজের একজন বাঙ্গালী পুরুষের অনুভূতি ও উপলব্ধির বিচিত্র উৎপ্রেক্ষা আমরা এ গ্রন্থের মধ্যে আবিষ্কার করি। এ উৎপ্রেক্ষাগুলো কখনও প্রকৃতি নিয়ে, কখনও প্রেম নিয়ে, কখনও অলস বিশ্রাম নিয়ে, কখনও সংসার-যাত্রা নির্বাহ নিয়ে। সকল অবস্থাকেই লেখক একটি অনন্যসাধারণ আন্তরিক শব্দপ্রবাহের মধ্যে বহমান করেছেন। এ গ্রন্থের মধ্যে আমরা রমণীকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আবিষ্কার করি। শরৎচন্দ্রের বিবেচনায় সমাজের নানাবিধ ব্যবস্থাপনা এবং

www.icsbook.info

বিচারের কারণে রমণী-স্বভাবের এবং আচরণের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আচরণের পরিবর্তন ঘটলেও রমণী সর্বদাই মমতাময়ী এবং এ-মমতার কারণেই সে নিষ্কলুষ।

শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি, কালানুক্রমিকভাবে এখানে উল্লেখ করছি- 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'বৈকুন্ঠের উইল' (১৯১৬), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ'(১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), গৃহদাহ' (১৯২০) 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' -(১৯২৬), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব ১৯১৭, ২য় ১৯১৮, ৩য় ১৯২৭ এবং ৪র্থ ১৯৩৩), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)।"

১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
(১৮৭৮-১৯৪০)

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশা থানার মগুরাডাঙ্গী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই। তিনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১৮৯৮ খ্রীঃ) পাংশা থেকে 'কোহিনূর পত্রিকা' প্রকাশ করেছিলেন। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্য এ পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জনের সময়ে বঙ্গদেশ বিভক্ত হলে বিশেষত হিন্দু বাংলার তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এ 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে' রওশন আলী চৌধুরীও যোগ দিয়েছিলেন। এ সময়ে 'কোহিনূর' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এয়াকুব আলী চৌধুরীর সহযোগিতায় পত্রিকাটি ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হলেও বছর দুই চলার পর পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

রওশন আলী চৌধুরী 'হাব্‌লুল মতীন' নামক পত্রিকার বাংলা সংস্করণের সম্পাদনা করেন। সাপ্তাহিক কাগজ নবপর্যায় 'সোলতান' এবং 'মোহাম্মদী'ও কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রীতি, মুসলমানদের সেবা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোতে তাঁর লেখা প্রবন্ধাদি ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তাঁর লেখা কোনো পুস্তকের নাম পাওয়া যায় না।

বেগম রোকেয়া
(১৮৮০-১৯৩২)

রবীন্দ্র-যুগে যে কয়জন মুসলিম মহিলা বাংলা সাহিত্য সাধনা করে যশ অর্জন করেন, বেগম রোকেয়া তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। তিনি মিসেস আর. এস. হোসেন নামে সমধিক পরিচিতা। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মানুষ হন। তাঁর পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চা তো দূরের কথা, অপরিচিতা মেয়েদের সামনেও বাড়ীর মেয়েদের পর্দা করানো হতো। খোদার দেওয়া আলো বাতাস থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করে এমনিভাবে অসূর্যম্পশ্যা করে তোলা

www.icsbook.info

হতো। পর্দার নামে মেয়েদের ব্যক্তিত্বের অবমাননা ছেলেবেলা থেকেই বেগম রোকেয়ার মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। মেয়েদের প্রতি সমাজে নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তাঁর মনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তুলেছিল।

বিয়ের পর স্নেহশীল ও মুক্তমনের অধিকারী স্বামীর সংস্পর্শে এসে তিনি লেখাপড়া করার ও চিত্ত বিকাশের সুযোগ পান। দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ সুখভোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। বিয়ের অল্পকাল পরেই তাঁর স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেন এন্তেকাল করেন। এর পরেই তিনি সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-গঠনমূলক কাজে নিজেকে সঁপে দেন। তাঁর স্বামীর নাম অনুসারে কলকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল তাঁরই সৃষ্টি। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃত না হলে তাদের মনের প্রসার কিছুতেই সম্ভব হবে না এবং মুসলিম সমাজও কিছুতেই গড়ে উঠবে না, বেগম রোকেয়া মর্মে মর্মে একথা বুঝেছিলেন। সেজন্যে নিজেই মেয়েদের স্কুল গড়ে একদিকে যেমন সার্থকভাবে সে স্কুলের পরিচালনা করেছিলেন, অন্যদিকে মুসলিম সমাজ-মনের জড়তা ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে তেমনি কলম ধরেছিলেন। বেগম রোকেয়ার সমস্ত লেখাই বেদনা-প্রসূত।

'মতিচূর' 'সুলতানার স্বপ্ন', 'পদ্মরাগ' ও 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি বেগম রোকেয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

'মতিচূরে' নানা ধাঁচের দশটি রচনা আছে। দশটি রচনার মধ্যে 'নূর ইসলাম' ও 'ডেলিশিয়ার হত্যা' ইংরেজী থেকে অনূদিত। 'সুলতানার স্বপ্ন'ও ইংরেজীর অনুবাদ, কিন্তু সে ইংরেজীর লেখিকা বেগম রোকেয়া নিজেই। 'সুলতানার স্বপ্নে' গ্রন্থকর্ত্রী একটি কৌতুকাবহ অভিনব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। যে নারী আবহমানকাল পুরুষের মুখাপেক্ষী, সে নারীই উপযুক্ত হলে, সমাজ কি রাজ্য পরিচালনা করা তার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। এখানেও নারীর মুক্তি ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সংবাদ আছে।

'অবরোধবাসিনী'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৩৩৫ সালের (১৯২৮) কার্তিক মাসে এ বইটি প্রকাশিত হয়। খান্দানী জমিদার ঘরে, কি সাধারণ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরে অবরোধের নামে নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা বহুকাল থেকে এ দেশে প্রচলিত আছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও গল্পের সাহায্যে এমন অনেক মুসলিম মহিলার পর্দা রক্ষার কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে, যা পড়তে গেলে অবিশ্বাস্য মনে হয় ও অতিরঞ্জিত ঠেকে। বেগম রোকেয়া এমন অনেক করুণ চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'অবরোধবাসিনী'তে। পর্দার নামে অবরোধের এ বাড়াবাড়ির জন্য শুধু যে পুরুষ সমাজই দায়ী, তা নয়; মেয়েদের মেদমজ্জায় এমনভাবেই অবরোধের এ সংস্কার অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে যে তাদেরকে সে পরিবেশ থেকে বের হয়ে এসে খোদার দেওয়া আলো-বাতাসের অধিকার ভাল করে ভোগ করতে বললেও সে সুযোগ তারা কিছুতেই নেবে না। সমাজের এ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়া সাহিত্যের মাধ্যমে জেহাদ করে গেছেন। তাঁর সমস্ত লেখাই সমাজ কল্যাণমূলক। তাঁর ভাষায় ও বলার ভঙ্গিতে তীব্র ব্যঙ্গ ও দীপ্ত রসিকতার সুর সহজেই চোখে পড়ে।

সাহিত্য, সমাজ ও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নাম অনুসারে মেয়েদের একটি আবাসিক হলের নামকরণ করেছে 'বেগম রোকেয়া হল'।

www.icsbook.info

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
(১৮৮০-১৯৩১)

এ পর্যন্ত যে আলোচনা আমরা করেছি তা থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা এ যাবৎ দুটো বিশিষ্ট পথ ধরেই চলছিল। একটিতে দেখি ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি প্রয়াস। সুধাকর দল এর উদ্যোক্তা এবং অনুসারী। আর একটি নিছক সাহিত্যধর্মী দল। মুসলিম ঐতিহ্যকে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করাই ছিল পরবর্তীদলের বিশেষ লক্ষ্য। এঁদের আদর্শ ছিলো তদানীন্তনকালের হিন্দু লেখকেরা। এঁরা বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন মুসলিম জাতীয় জীবন রচনা করার জন্য ততটা নয়, যতটা সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য। এ দলে ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ এবং মোজাম্মেল হক। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে একটা সমন্বয়ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করছিলেন যে হিন্দু মুসলমানের পথ, রাজনীতিতেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এক নয়। এ দেশে মুসলমানকে বাঁচতে হলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ শতকের প্রথম দশকে (১৯০৬) যেমন বাংলাদেশেই ঢাকা নগরীতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যেও তেমনি এ সময় থেকেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে।

বাংলা সাহিত্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মধ্যেই প্রথম বারের জন্য এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবলতর আত্মকেন্দ্রিক প্রকাশ দেখতে পাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে দু বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়। কারাবাস কালেই তাঁর মতামত সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এরপরে তাঁর বক্তৃতায় কথায় কাজে ও সাহিত্যে ও মুসলমানদের মনের ওপর থেকে হিন্দু প্রভাবজনিত দুর্বলতা অপসারিত করে তার আত্মসংবিৎ ও আত্মবিশ্বাস ফেরানোর এবং superiority complex জাগানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর দান কম নয়।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রত্যক্ষভাবে ওহাবী ছিলেন না, তবু ভাবে-চিন্তায়-কর্মে ওহাবীদের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল দেখা যায়। ভারতীয় মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করতে হলে তাদের অতীত শৌর্যবীর্য আবার ফিরিয়ে আনতে হবে— এ revivalist চিন্তা পদ্ধতিও তাঁর মধ্যে মূর্ত হতে দেখা যায়। একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনবাদ, অন্যদিকে তেমনি নিখিল বিশ্ব মুসলিমের সংঘবদ্ধতাজনিত 'প্যান ইসলামী' দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের গতিপথ নির্ধারিত করেছে। এদিক থেকে মুসলমান ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশদত্ত হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রেরই সমধর্মী, মুসলিম জাতীয়তার পরিকল্পনায় তিনি আল্লামা শিব্‌লী নোমানী ও ইকবাল প্রমুখ মনীষীরই ভাবাদর্শবাহী এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে ইসলামী জীবনদর্শনের ব্যাখ্যাকার। এদিক থেকে সাহিত্যে ও জীবনে সুধাকর দলেরই তিনি অনুবর্তী। অন্য কথায় শেখ আবদুর রহিম মুন্সী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশ্‌হাদী এবং মৌলবী মেয়রাজুদ্দীনেরই তিনি উত্তরসাধক। এঁদের সঙ্গে

www.icsbook.info

সিরাজীর পার্থক্য এই যে, এক শেখ আব্দুর রহিম ব্যতিরেকে তাঁর পূর্ববর্তীদের কারুরই সাহিত্যিক জীবন তাঁর মতো এত বিস্তৃত নয়। তবে, এ কথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর রচিত সাহিত্যে হৃদয়ের উষ্ণতা আছে যতটা, সেই পরিমাণে তা তেমন সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠেনি।

মুসলমানের ঘুম ভাঙানো ছিল তাঁর জন্মগত সাধনা। নিপীড়িত মুসলমান জ্ঞানে কর্মে, শিল্পে সভ্যতায় সমুন্নত হোক, তাঁর জীবনের এই-ই ছিল ব্রত। এ মানসিকতাই সিরাজীর 'তুরস্ক ভ্রমণ' প্রবন্ধপত্রে (১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯১৩ পৃঃ ১৪২) 'আদব কায়দা শিক্ষা' (১ম সং ১৯১৪, পৃঃ ১৩০), 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' (১ম সং, ১৯১৬, পৃঃ ৮৯) 'সুচিন্তা', 'স্বজাতি প্রেম' (১৯০৯), 'তুর্কী নারী জীবন' এবং 'স্ত্রীশিক্ষা' 'কারাকাহিনী' (অপ্রকাশিত) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে এবং 'রায়নন্দিনী' (২য় সং, ১৯২৮, ২২৯), 'ফিরোজা বেগম' (২য় সং ১৯২৭, পৃঃ ১২১), 'তারাবাঈ' (পৃঃ ৯৫) এবং 'নূরউদ্দীন' (২য় সং, ১৯২৮, পৃঃ ১০৯) প্রভৃতি উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর প্রবন্ধগুলোতে যে ভাবাদর্শ ও মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তাঁর উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণেও সেই একই মানসাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কোনো উপন্যাসেই চরিত্র যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি, আদর্শের ভারবাহীরূপে তাঁর মতবাদের ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে।

সিরাজী স্বপ্নাতুর কবি ছিলেন। 'প্রেমাঞ্জলি' ও 'অনলপ্রবাহ' প্রভৃতি কাব্য তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। উপন্যাসগুলোতেও তাঁর স্বপ্নাবিষ্ট মনের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসে যশোরাধিপতি প্রতাপ রায়ের কন্যা অরুণাবতী এবং তার প্রেমিকপ্রবর মাহ্তাব খাঁর নদীপথে পলায়ন ও গোপন অরণ্যবাসের মধ্যে একটা রোমান্টিক আবেশের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বিপদ ও অন্যদিকে মানুষের লোকালয় থেকে দূরে বনভূমির মধ্যে প্রেমনীড় রচনা–এ উপন্যাসে সিরাজ এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করে যে romance প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাতেই বেড়েছে এ উপন্যাসের সৌন্দর্য। তাঁর 'ফিরোজা বেগম' ও 'তারাবাঈ' উপন্যাসেও এ ধরনের দৃশ্য দেখা যায় কিন্তু তাঁর কবিমন মাহতাব খাঁ ও অরুণাবতীকে নিয়ে 'রায়-নন্দিনী'তে এবং নূরউদ্দীন ও রকিসনী বাঈকে নিয়ে 'নূরউদ্দীন' উপন্যাসে রোমান্সের কল্পলোকে যে-ভাবে মুক্ত বিহার করেছে অন্যগুলোতে তা ততটা সার্থক হয় নি। রায়নন্দিনীর কোনো কোনো দৃশ্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' 'চন্দ্রশেখর' এর কোনো কোনো দৃশ্যের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। 'রায়নন্দিনী'ই তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সিরাজীর উপন্যাসগুলোতে বর্ণিত উপমা অলঙ্কারাদি ক্লাসিকাল সংস্কৃত রীতির। তাঁর ভাষাও বিশুদ্ধ সংস্কৃত সমাসবদ্ধ। তাঁর ভাষার কাঠামো ছিল ঐশ্বর্যময়, তবু গতি ছিল স্বচ্ছন্দ; সে ভাষা ছিল অনলবর্ষী অথচ অমৃতময়। তাঁর ভাষা পড়তে গিয়ে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র ভাষার কথা মনে হয়। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের শুরুতেই দেখি প্রায় তিনপৃষ্ঠাব্যাপী একটি বাক্যের পরিসর; শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চায় না। তিনি একজন বড়ো বাগ্মীও ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা উপন্যাসেও ঝরে পড়েছে।

ইসমাইল হোসেন পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী হিসেবেই তাঁর নামের শেষে তিনি সিরাজী খেতাব ব্যবহার করতেন। ১৯৩১ সনের ১৭ই জুলাই তিনি এন্তেকাল করেন।

www.icsbook.info

কাজী ইমদাদুল হক
(১৮৮২-১৯২৬)

শরৎচন্দ্রের মতো পরিচ্ছন্ন চিন্তা তাঁর সমকালবর্তী দুজন মুসলমান সাহিত্যিকের ভেতরে ফুটেছে। তাঁদের একজন খুলনার কাজী ইমদাদুল হক এবং অন্যজন যশোরের লুৎফুর রহমান। শরৎচন্দ্র যেমন হিন্দু সমাজের একটি জটিল ক্ষতের ওপর অস্ত্রোপচার করেছিলেন, কাজী ইমদাদুল হক এবং লুৎফুর রহমানও তেমনি বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম সমাজের নানা দোষত্রুটি সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কিত করেছেন। তবে, এঁদের দু'জনের ত্রুটি এই যে 'এঁরা শরৎচন্দ্রের মতো দেশের আমদরবারে আসন করে কথা বলতে পারেননি, কিংবা বলবার চেষ্টাও করেননি'।

ইমদাদুল হকের মধ্যে ছিল ঔপন্যাসিকের অদ্ভুত শক্তি এবং জীবনকে দেখবার মতো তন্ময় অনুধ্যান। তাঁর 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস শুধু শ্রেষ্ঠ মুসলিম সামাজিক উপন্যাসই নয়, বাংলার উপন্যাস সাহিত্যেও তার বিশেষ স্থান আছে। সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজে'র সঙ্গে 'আবদুল্লাহ'র একই আসন নির্ধারিত হবে। এ উপন্যাসে ইমদাদুল হক বাঙালী মুসলিম সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দা-সমস্যা, অন্ধ পীরভক্তি ও গুরুপূজা এবং ধর্মের নামে সংস্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা দোষত্রুটির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন এবং কতকগুলো ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করে মুসলমান সমাজের প্রাচীন রোগ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে মুসলমান সমাজেও এগুলো অতীত ইতিহাসের বিষয় হয়ে যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে কিংবা প্রাচীন-পন্থীদের মধ্যে এখনও যেটুকু বাকী আছে, আশা করা যায় অনতিদূর ভবিষ্যতে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু ইমদাদুল হক যেকালে তাঁর এ উপন্যাস রচনা করেছিলেন, সেকালে বাংলার মুসলিম সমাজের এ সমস্যাগুলো প্রবলভাবে না হলেও বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে সমাজ-জীবনের এ ত্রুটিবিচ্যুতির সংস্কার পরিপন্থী নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বে নবীনের জয় এবং প্রাচীনের পরাজয়ের শুভ সূচনা করে গেছেন ইমদাদুল হক। আবদুল্লাহ, আবদুল কাদের ও হালিমা এ নবীন দলের মুখপাত্র এবং আবদুল্লাহ এ দলের মূর্তিমান নায়ক। আর আব্দুল্লাহর শ্বশুর সৈয়দ সাহেব অতীত আচার-আচরণ এবং প্রাচীন-পন্থীদের শক্তিশালী প্রতিনিধি। সৈয়দ সাহেব এবং তার কন্যা সালেহা প্রমুখ প্রাচীনপন্থীদের চিত্রিতকরণ কিংবা তাদের ধর্ম ও সমাজমনের রূপায়ণে ইমদাদুল হক কোথাও তাদের বিদ্রূপ করেন নি, আশ্চর্য কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন সমাজ পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে তাদের বিশ্বাসানুসারী চালচলনের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সংক্রান্ত যে দু-একটি চিত্র তিনি এ উপন্যাসে ফুটিয়েছেন সেখানেও তাঁর পরিমিত কাণ্ডজ্ঞান এবং উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আব্দুল্লাহ'র মতো আমাদের এককালের সমাজের এমন নিখুঁত চিত্র এযাবৎ আর সৃষ্টি হয়নি। এ উপন্যাসে ইমদাদুল হকের রুচি মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন, ভাষাও তেমনি ঝরঝরে এবং সুন্দর।

৩১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী 'আব্দুল্লাহ্'র ৪১ পরিচ্ছেদের ৩০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে ইমদাদুল হক ইন্তেকাল করেন। বাকী অংশের জন্য তিনি একটা খসড়া রেখে গিয়েছিলেন। এ অংশটুকু রচনা করার ভার পড়েছিল 'আমাদের দুঃখ'-প্রণেতা সাহিত্যিক আনোয়ারুল কাদিরের ওপর। ৩১ পরিচ্ছেদ থেকে ৪১ পরিচ্ছেদের ভাষা আনোয়ারুল কাদিরের

www.icsbook.info

বলেই মনে হয়। এ পরিচ্ছেদগুলোতে ইমদাদুল হকের রচনার সঙ্গে তুলনায় এবং দৃষ্টিভঙ্গতেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ইমদাদুল হক প্রধানত সমাজ চিত্রকর, আর আনোয়ারুল কাদির ইমদাদুল হকের আদর্শ প্রচারক মানুষগুলোর মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। আবদুল্লাহ্ প্রথম বের হয় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় এবং প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সনের দিকে।

ইমদাদুল হকের 'প্রবন্ধমালা'য় (পৃঃ ১৪০) এ প্রবন্ধগুলো দেখা যায়"

'আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার', 'আবদুর রহমানের কীর্তি', 'ফ্রান্সে মোসলেম অধিকার,' 'আলহামরা', 'পাগলা খলিফা', 'মোসলেম বিজ্ঞান চর্চা।' প্রবন্ধগুলোতে তাঁর পাণ্ডিত্যের ও সরসপ্রাণের পরিচয় আছে। ইমদাদুল হকের 'নবীকাহিনী' এ যুগের শিশু সাহিত্যে অমর অবদান।

লুৎফুর রহমান
(১৮৮৯-১৯৩৬)

সমাজ হিতৈষী, মানবদরদী এবং সমাজকর্মী লুৎফুর রহমান আদর্শবাদী এবং উপদেশাত্মক রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সত্য এবং ন্যায় ছিল তাঁর সাহিত্যের আদর্শ। আদর্শভিত্তিক বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের মধ্যেও তিনি সত্য এবং ন্যায়কে চিত্রায়িত করবার আগ্রহ দেখিয়েছেন। বর্তমান মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ারী গ্রামে লুৎফুর রহমানের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। ব্যবহারিক জীবনে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির নাম-'প্রকাশ' (১৯১৫), একটি কাব্য গ্রন্থ; 'সরলা' (বাং ১৩২৫), উপন্যাস; 'উন্নতজীবন' (১৯২৬), আদর্শবাদী জীবনযাপনের নির্দেশাবলী; 'রায়হান' (১৯১৯), সামাজিক উপন্যাস; 'পথহারা' (১৯১৯) উপন্যাস; 'উচ্চ জীবন' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত, ১৯৬২), আদর্শবাদী রচনা; 'মহৎ জীবন' (১৯২৬), আদর্শবাদী রচনা; 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭), উপন্যাস; 'ছেলেদের মহত্ত্ব কথা' (১৯২৮), শিশু সাহিত্য; 'রাণী হেলেন' (১৯৩৪), শিশু সাহিত্য; 'বাসর উপহার' (১৯৩৬), উপন্যাস। 'সত্য জীবন' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত, ১৯৪০), আদর্শবাদী রচনা।

লুৎফুর রহমানের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধগুলোতে। জ্ঞান ও হৃদয়বৃত্তির পরিচর্যামূলক 'rational' প্রবন্ধ লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন স্থায়ী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর 'বাসর উপহার' ও 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস আকারে লিখিত প্রবন্ধ। এ দুটোর একটি আর একটির পরিপূরক। 'প্রীতি উপহারে' ভাবী ও ননদের কথোপকথন আর 'বাসর উপহারে' দুই বন্ধুর কথোপকথনচ্ছলে সংসার-জীবনের বিচিত্র পথ পরিক্রমণ করার উপদেশ আছে। স্ত্রীপুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের কার প্রতি কি কর্তব্য তার বিহিত বিধান আছে এ বই দুটোতে। 'রায়হান' উদ্দেশ্য ও আদর্শমূলক উপন্যাস। সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠিতে 'রায়হান' যথার্থ উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত নয়। সুতরাং 'রায়হান'কেও উপন্যাস বলা যায় না। চরিত্রগুলোর ব্যাখ্যার কিংবা লেখকের বক্তব্যে আর্ত ও দুস্থদের সেবা, নারী শিক্ষা এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সংক্রান্ত নানা সমস্যাই বর্ণিত হয়েছে; কেন্দ্রীয় কোনো ঘটনা এবং চরিত্র নেই এ উপন্যাসে।

www.icsbook.info

একমাত্র 'সরলা'তেই কিছু উপন্যাসের লক্ষণ আছে। এখানেও ধর্ম ও দেবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত সরলা, নারীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে মা বাবার স্নেহাশ্রয় পরিত্যাগ করে পথে বেরিয়ে দেখেছে জীবন তার দুর্বিষহ। আহমদ নামে এক আদর্শবাদী তরুণ মুসলিমের সংস্পর্শে এসে জীবনের স্বাদ সে উপলব্ধি করেছে নতুন করে। সে বন্ধনও তার জীবনে টেকেনি। শেষটায় নানা দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখে আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ সে পেয়েছে। এ উপন্যাসটিতেও চরিত্র চিত্রণ নেই, আছে শুধু আদর্শ ব্যাখ্যানোপযোগী ঘটনার বর্ণনা।

তরীকুল আলম
(১৮৮৯–১৯৩২)

খান বাহাদুর তসলিম উদ্দিন আহমদের কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন তরীকুল আলম। তিনি ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াত-ই-ওমর খইয়াম প্রকাশিত হলে তিনি 'সওগাতে' তার একটি সমালোচনা করেন। সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ গুণীজনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র', 'ভারতবর্ষ', 'সওগাত' ও 'সহচর' প্রভৃতি পত্রিকায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর 'ঈদ' এবং 'জীবনের মূল্য' নামক রচনা সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'জাতি কল' নামক তাঁর একটি গল্প ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়।

'বেগম' নামক তাঁর একটি উপন্যাস ছিল। তরীকুল আলম তাঁর এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ ও কান্তিচন্দ্র ঘোষকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন। তরীকুল আলমের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র ছিল স্বদেশপ্রীতি।

নূরন্নেসা খাতুন
(১৮৯৪–১৯৭৪)

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শুধু মুসলমানের মধ্যেই নয়, হিন্দুদের মধ্যেও মহিলা সাহিত্যিক খুব বেশি ছিলেন না। সেদিক থেকে আলোচ্য যুগে যে দুজন মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকের পরিচয় আমরা পাই, তাঁদের নিয়ে আমাদের যথেষ্ট গর্বের কারণ রয়েছে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের সাহিত্য সাধনার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। নূরন্নেসা খাতুন এ কালেরই আর একজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক। এঁর জন্ম ১৮৯৪ সনে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার গ্রামের প্রসিদ্ধ খোন্দকার পরিবারে সূফী শাহ তাহের সাহেবের বংশে। বেগম রোকেয়ার পরিবারের মতো নূরন্নেসার পরিবারেও সেকালে পর্দাপ্রথার আড়ম্বর কোনো অংশে কম ছিল না। ফলে বাইরের স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ তাঁর জীবনেও সম্ভব হয়নি। যৎসামান্য গৃহশিক্ষাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ছিল।

কাজী গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে বিয়ের পর পর্দার বেড়া ভেঙে বাহির বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হবার তাঁর অপূর্ব সুযোগ লাভ হয়। স্বামীর কর্মব্যপদেশে এবং ভ্রমণসূত্রে তদানীন্তন ভারতের বহু ঐতিহাসিক স্থান এবং স্বাস্থ্যনিবাস তিনি স্বচক্ষে দেখে আসেন।

www.icsbook.info

এ সূত্রেই পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগতের ছবি তাঁর মনোজগতে প্রতিফলিত হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি প্রখর। সংসার ও সমাজ-জীবনে কিংবা পথ চলতে চোখ দিয়ে তিনি যা দেখেছেন, সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে সে-ছবি এবং সে অভিজ্ঞতা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাঁর মনে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। সাহিত্য রচনা কালে স্মৃতিদেশ আলোড়িত করে তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ আপনা থেকে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে আপনাকে বিকশিত ক'রে তুলেছে।

সমাজের ক্ষতমূল স্পর্শ করার ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। গভীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে তিনি সমাজকে জর্জরিত করে তাকে যেমন সচকিত করে তুলেছেন নূরন্নেসা খাতুনের দৃষ্টিতে সে গভীরতা, প্রাণময়তা এবং ব্যাপ্তি নেই। অভিজ্ঞতালব্ধ গার্হস্থ্য জীবনের ছবি, জ্ঞানলব্ধ তথ্য এবং ভূয়োদর্শনজাত অনুভূতির অভিব্যক্তিই তাঁর সাহিত্যকে রঞ্জিত করেছে।

তাঁর প্রথম পারিবারিক উপন্যাস 'স্বপ্নদ্রষ্টা' (১ম সং ১৯২৩, পৃঃ ১৮৮)। এ উপন্যাসে তিনি আদর্শ বন্ধুত্বের মাহাত্ম্য বন্দনা করেছেন।

'জানকী বাঈ বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব' (ঐতিহাসিক উপন্যাস) (১ম সং, ১৯২৪, পৃঃ ১৪০) আলাউদ্দিন খিলজি কর্তৃক ভারতে মোসলেম রাজ্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনাকে কেন্দ্র করে তাঁর সেনাপতি আলেফ খাঁ ওরফে ইউসুফ খাঁ ও রাজা রামদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী জানকী বাঈ-এর প্রণয় কাহিনী। এ উপন্যাসের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয় রোমান্টিক।

'আত্মদান' (সত্য ঘটনা, গার্হস্থ্য কথন, ১ম সং ১৯২৫, পৃঃ ১২৪) লেখিকার মায়ের জীবন সাধনার কাহিনী। স্বামীর অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কিভাবে জেরিনার জীবনে বিষাদ কালিমা ঘনিয়ে এসেছিল তারই বিষাদ করুণ বর্ণনা তিনি এখানে দিয়েছেন।

'ভাগ্যচক্র' (মিলনান্ত) 'বিধিলিপি' (মিলনান্ত) এবং 'নিয়তি' (বিরহান্ত) উপন্যাসধর্মী এ তিনটি ছোট লেখাতেও লেখিকার রোমান্স প্রীতি লক্ষ করা যায়।

'মোসলেম বিক্রম ও বাংলায় মুসলমান রাজত্ব' (১ম সং ১৯২৬, পৃঃ ৩৯১) নূরন্নেসার সাহিত্যিক সাধনার শেষ ফল। এটিতে হযরত আবু বকরের সময় থেকে আরম্ভ করে বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজুদ্দৌলার পতন পর্যন্ত মোসলেম বীরত্ব ও কীর্তিগাথার ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন।

তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 'বিদ্যাবিনোদিনী' এবং 'সাহিত্যস্বরস্বতী' উপাধিতে ভূষিতা হন। বহুদিন ধরে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সংঘের সভানেত্রীও ছিলেন।

নূরন্নেসার ভাষা অনাড়ম্বর এবং সরল। তাঁর লেখার মধ্যে নারীপ্রাণের সরসতা এবং লঘু স্বচ্ছ প্রবাহ সর্বত্রই লক্ষযোগ্য। হাসি-পরিহাস ও সরল ব্যঙ্গপ্রিয়তার অভাব তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে নেই। পাহাড়ীদের উপভাষা, মাদ্রাজীদের কথোপকথন এবং ঢাকাই পরিভাষা আশ্চর্য নিপূণতার সঙ্গেই তিনি পরিবেশন করেছেন।

খয়েরুন্নেসা খাতুন

খয়েরুন্নেসা খাতুন নাম্নী এক লেখিকার 'সতীর পতিভক্তি' নামক একটি বইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খয়েরুন্নেসার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনি

www.icsbook.info

সিরাজগঞ্জের অধিবাসিনী ছিলেন। মনে হয় তিনি বর্তমান শতাব্দীর কোনো এক সময়ে সাহিত্য সাধনা করে থাকবেন। তিনি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। 'সতীর তিনি তাঁর বইয়ে নিজেকে বিদ্যাবুদ্ধিহীন এক মুসলিম মহিলা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গৃহধর্ম প্রতিপালন সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে প্রদত্ত নিম্নলিখিত ফিরিস্তি থেকে তাঁর বুদ্ধির এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

১. স্ত্রীলোকের হীনাবস্থাই সমাজের অধঃপতনের মূল। ২. যে পরিবারের স্ত্রীলোকেরা দুঃখ পায় সেই পরিবার ত্বরায় উৎসন্নে যায়। ৩. স্ত্রীলোক কেবল সন্তানের প্রসূতি নহেন, সকল সৎকার্যের প্রসূতি। ৪. যে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট সে পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত। ৫. স্বামীকে গৌরবজনক বিবিধ মহৎকার্যে অনুপ্রাণিত করাতে মর্যাদাবতী স্ত্রীদের গৌরব প্রকাশ পায়।

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা
(১৮৮০–১৯৪৬)

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার জন্ম ১৮৮০ সনে চব্বিশ পররগণা জেলার বারাসাত থানার অন্তর্গত কাজীপাড়া গ্রামে। তিনি দীর্ঘকাল টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়্যারম্যান ছিলেন। 'প্রদীপ ও চেরাগ' (গল্পগ্রন্থ), 'নেকনজর' (উপন্যাস) এবং 'তাজিয়া' (উপন্যাস) লিখে তিনি যশস্বী হয়েছেন। ৬৬ বৎসর বয়সে ১৯৪৬ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। "কাহিনী নির্মাণ করবার দক্ষতা তাঁর ছিলো। তাঁর রচিত সবকটি কাহিনীই বাঙালী মুসলমানের সমাজ ও গৃহজীবন নিয়ে। তাঁর রচনায় ন্যায়-নীতি এবং ধর্মবোধের সমর্থন আছে।"

এস. ওয়াজেদ আলি
(১৮৯০-১৯৫১)

বাংলা সাহিত্যে এস. ওয়াজেদ আলির আবির্ভাব এমন এক সময় যখন আমাদের জীবনে এক প্রকার অস্থিরতা এবং উদ্দেশ্যহীনতা প্রবেশ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যখন বিপন্ন বোধ করছে সে সময় ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাস ও জীবনবোধের জন্ম দেয়। তার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ "জীবনের শিল্প" ১৯৪১ সালে যখন প্রকাশিত হয় তখন মুসলমান শিক্ষিত সমাজে প্রচুর আলোড়ন জাগে। তিনি বাংলাদেশের মুসলমানকে এটা বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, ইসলামের সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নেই। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা, গবেষণা এবং আলোচনার পথ ইসলাম যেমন পরিষ্কার এবং প্রশস্ত করে দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম মত তেমন করেছে বলে মনে হয় না। তাঁর এ গ্রন্থের মধ্যে মূলত বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর মধ্যে মুসলমান এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা আছে, গণসেবায় ইসলাম বিষয়ে প্রবন্ধ আছে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য নিয়েও কথা আছে। তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "কেবল অভিধান এবং

www.icsbook.info

ব্যাকরণের সাহায্যে ধর্ম বোঝা যায় না, অন্তরের সাহায্যেরও দরকার। যার মন যত বড়, সেই ধর্মকে তত বড়ভাবে বোঝে। আর যার মন ছোট সে পণ্ডিত হলেও ধর্মকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে।" ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এ গ্রন্থে বিষয়গত কোন ঐক্য নেই। দেশী এবং বিদেশী বিভিন্ন বিষয়ের লেখা এ গ্রন্থে আছে বলেই এই গ্রন্থের নাম 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'। একই সময়ে প্রকাশিত তাঁর 'ভবিষ্যতের বাঙালী' গ্রন্থটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এস. ওয়াজেদ আলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং সেই জাতীয়তাবাদে মুসলমানদের একটি বিশেষ স্থান থাকবে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিতভাবে একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ নির্মাণ করবে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির নাম হচ্ছে : ভবিষ্যতের বাঙালী, সাহিত্য, প্রেমের ধর্ম এবং জাতীয় জাগরণ। এই গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনে এক জাতি গড়ে তোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এস. ওয়াজেদ আলির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে একটি গল্প গ্রন্থ। গ্রন্থটির নাম 'গুলদাস্তার'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। তাঁর দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ "মাশুকের দরবার" প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে, "দরবেশের দোয়া" নামক গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। 'গ্রানাডার শেষ বীর' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। এস. ওয়াজেদ আলি 'গুলিস্তাঁ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেছিলেন। গল্প লেখক হিসাবে এস. ওয়াজেদ আলির বর্তমানে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। সুন্দর কাহিনী নির্মাণ এবং রোমান্টিক আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তাঁর গল্পগুলোকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছিলেন। তাঁর গল্পের ভাষা সহজ এবং সাবলীল। লক্ষ করা যায় যে, তাঁর গল্পগ্রন্থে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছে, নীতিজ্ঞানের সমর্থন আছে এবং ধর্মবোধ ও প্রেমে শাশ্বত শক্তির উদ্বোধন ঘটেছে। সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা এস. ওয়াজেদ আলির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর নিজের যে জীবনানুভূতি এবং ভাবাদর্শ ছিল তাই তার গল্পের আবহ নির্মাণ করেছে।

তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :

১.	গল্পের মজলিস	(গল্প)	১৯৪৪
২.	ভাঙা বাঁশী	"	প্রকাশের তারিখ নেই।
৩.	দরবেশের দোয়া	"	১৯৩১
৪.	গুলদাস্তা	"	১৯২৭
৫.	মাসুকের দরবার	"	১৯৩০
৬.	ভবিষ্যতের বাঙালী	(প্রবন্ধ গ্রন্থ)	১৯৪৩
৭.	জীবনের শিল্প	"	১৯৪১
৮.	আকবরের রাষ্ট্র সাধনা	(ইতিহাস)	১৯৪৯
৯.	গ্রানাডার শেষ বীর	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৯৪০
১০.	একবালের পয়গাম	(আলোচনা)	প্রকাশকাল নেই।

www.icsbook.info

নিখিল আসাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের (১৩৫১) মূল সভাপতি হিসেবে এস. ওয়াজেদ আলী সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর লক্ষ্যের কথা বলেছেন,—"সাহিত্যের লক্ষ্য কি? সাহিত্যিকেরই বা আদর্শ কি? প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা রসের সৃষ্টিকেই সাহিত্যের লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। সাহিত্যিকের কাজ সে হিসেবে ছিল রসের সৃষ্টি ও তাঁর পরিবেশন। তবে রস বিভিন্ন রকমের হয়। আর বিভিন্ন রসের পরিবেশনে বিভিন্ন ফল সমাজে দেখা দেয়। যে রসের ফল অনিষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে রকম রসের পরিবেশন আমরা সমর্থন করিতে পারি না; পক্ষান্তরে যে রস থেকে আসে বিমল আনন্দ, উচ্চ আদর্শের প্রেরণা, কল্যাণপ্রসূ চিন্তাধারা, সেই রসের পরিবেশনই হল সাহিত্যিকের প্রকৃত কাজ। এ-কাজ সার্থকভাবে করতে হলে উপকরণের দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। যুগে যুগে সাহিত্যিকের ব্যবহার্য উপকরণ অবশ্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে।"

"এস. ওয়াজেদ আলীর 'মাসুকের দরবার' গল্পগ্রন্থটি এক কালে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলো। সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এগুলোকে টুর্গেনিভের Prose-poems-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর রচনা সহজ সরল এবং গতিময়। লেখক হিসেবে হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে তিনি সমভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন।"

শাহাদাৎ হোসেন
(১৮৯৩-১৯৫৩)

কবি শাহাদাৎ হোসেনের জন্ম ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণার বারাসাত মহকুমার পণ্ডিতপোল গ্রামে। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যা খ্যাতি তার সবটাই কবিত্বের; তবু তাঁর কবি জীবনের ফাঁকে ফাঁকে চৌদ্দটি উপন্যাস তাঁকে রচনা করতে দেখি—'মরুর কুসুম', 'হিরণ রেখা', 'পারের পথে', 'স্বামীর ভুল', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'খেয়াতরী', 'সোনার কাঁকন', 'রিক্তা', 'যুগের আলো', 'পথের দেখা', 'কাটাফুল', 'শিরি ফরহাদ', 'লাইলী মজনু', 'ইউসুফ জুলায়খা'। তাঁর নাটক—'সরফরাজ খাঁ', 'আনার কলি', 'মসনদের মোহ' এবং শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—'মোহন ভোগ', 'ছেলেদের গল্প' ও 'বালিকা জীবন'।

কবি হিসেবে শাহাদৎ হোসেন ছিলেন রোমান্টিক। তাঁর উপন্যাসগুলোতে অতীতের প্রতি মায়াঘন আকর্ষণ এবং স্বপ্নাতুর মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। রোমান্টিক কবিরা অতীতের হারানো দিনের কথা স্মরণ করে তাদের না পাওয়ার বেদনায় where are the snows of yester-years' বলে যেমন দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু ফেলেন, শাহাদাৎ হোসেনকেও দেখি ভারতীয় ইতিহাসের পাতা থেকে গৌরবময় মুসলিম জীবনের সুন্দর দিনগুলোকে বর্তমানের পটভূমিতে তুলে ধরবার জন্য তিনি হয়েছেন দরদী শিল্পী। তাঁর 'মরুর কুসুম' প্রভৃতি উপন্যাসে শাহাদাৎ হোসেনের সে প্রয়াস সার্থক হয়েছে। কাব্যে শাহাদাৎ হোসেনের ভাষায় যে আভিজাত্য লক্ষ করা যায়, উপন্যাসগুলোতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

"যুগের আলো উপন্যাসের ভূমিকায় শাহাদাৎ হোসেন লিখেছেন, 'অভাব অশান্তি ও আশাভঙ্গজনিত মানসিক পীড়ায় যখন মানুষ ভেঙ্গে পড়ে, তখন সে মনে করে, তাঁর জীবন একটা শূন্য ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংসারের বুকের উপর একটা বিরাট

www.icsbook.info

অপ্রয়োজন স্বরূপে সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে জানে না যে, অনেক সময় তার সেই ব্যক্তিগত ব্যর্থতা দেশের সার্থকতার মূলীভূত কারণ হয়ে দাঁড়ায়;—তাকে ব্যর্থ করে তার সমাজ, জাতি বা দেশ অভিনব সাফল্যে মণ্ডিত হয়ে গড়ে উঠে। মানুষ নিজের মধ্যে নিজে শূন্য হলেও বাইরের পূর্ণতা তাকে আশ্রয় করে ফুটে বেরুতে পারে। এই কথাটাই বইখানাতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।"

শাহাদৎ হোসেন পরলোকবাসী হন ১৯৫৩ সনের ৩০ শে ডিসেম্বর।

ইব্‌রাহিম খাঁ
(১৮৯৪-১৯৭৮)

ইব্‌রাহিম খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৯৪ সনে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার শাহবাজনগর গ্রামে। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি তাঁর 'সোনার শিকল', 'ইসলামের মর্মকথা', 'পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে', 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও গল্পগ্রন্থে এবং 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' প্রভৃতি নাটক দিয়ে। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্য বিরামহীন প্রয়াস ইব্‌রাহিম খাঁর জীবনের বড়ো বৈশিষ্ট্য। ময়মনসিংহের করটিয়া কলেজ তাঁর নিজের সৃষ্টি। করটিয়ার সমাজ হিতৈষী জমিদার মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সহায়তায় তিনি এ-কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ-কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং এ-অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর দরদী প্রাণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর রচিত সাহিত্যে ও বাংলার গ্রাম্য জীবনের আলেখ্য নির্মাণে সে-প্রাণ স্নেহ দরদে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর গল্পগুলোতে অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষক পরিবারের এক একজনের চরিত্রের খণ্ড-ক্ষুদ্র অংশের যে পরিচয় পাই তাতেই নিজের মাটির সঙ্গে ইব্‌রাহিম খাঁর জীবনের যোগ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চরিত্র অঙ্কনে এ আন্তরিকতা এবং দরদ সাহিত্যিক জীবনের বড় সম্পদ। ইব্‌রাহিম খাঁ উক্ত সম্পদের অধিকারী।

তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩০ খানি। ছোটদের জন্য তাঁর লেখা বইও আছে প্রায় ডজন খানিক। তাঁর অনূদিত বইয়ের সংখ্যাও কম নয়।

আকবর উদ্দীন
(১৮৯৬—১৯৭৮)

আকবর উদ্দীনের জন্ম ১৮৯৬ সনে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে। বাংলাদেশে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'আল এসলাম', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানের স্বতন্ত্র কৃষ্টি নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যাঁরা সক্রিয় চেষ্টা করেছিলেন আকবর উদ্দীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ক্ষমতাবান সাহিত্যিক। ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি অনেক প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস এবং নাটক রচনা করেছিলেন। মুসলিম ইতিহাসের অতীত গৌরব গাথার আবিষ্কারই ছিল তাঁর 'সিন্ধু বিজয়', 'সুলতান মাহমুদ' ও 'আজান' নাটকের উপজীব্য; আর মুসলিম সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ উদ্‌ঘাটিতকরণের মধ্যেই ছিল তাঁর গল্প উপন্যাসের সার্থকতা।

www.icsbook.info

তাঁর 'বেড়াজাল' ও 'অভিনেতা' নামক উপন্যাস দুটো যথাক্রমে 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'মাটির মানুষ'ই তাঁর পুস্তকাকারে প্রকাশিত একমাত্র উপন্যাস। ১৯৩০ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

তাঁর রচিত 'নাদির শাহ্' তিন অঙ্কের একটি ঐতিহাসিক নাটক। প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩; পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ ১৪৬। এ নাটকে নাদির শাহই কেন্দ্রীয় চরিত্র। দস্যু নাদির শাহ কিভাবে শাহানশাহ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে দেশের পরিবর্তন ঘটালেন এ নাটকে ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

'মুজাহিদ' নামে তাঁর আর একটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট নাটক (কার্তিক ১৩৭০, ১৯৬৩, পৃঃ ৮৮) প্রকাশিত হয়েছে। সন্দ্বীপের অন্যতম জমিদার তোরাব চৌধুরীর সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'লড়াই হয়েছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য'। পলাশীর যুদ্ধের পর এ আদর্শবাদী জমিদার দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও উদ্ধার করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোম্পানীর লোকদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমাদের দেশের ছোটখাটো জমিদারদেরও কেউ কেউ যে স্বাধীনতা রক্ষায় আদর্শবাদিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এ নাটকটি তার পরিচয় বহন করছে।

শেখ ফজলুল করিম
(১৮৮২-১৯৩৬)

'পরিত্রাণ কাব্য' রচয়িতা শেখ ফজলুল করিম বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী সাহিত্যিক। ১৮৮২ সালের ৯ই এপ্রিল রংপুর জেলার কাকিনায় শেখ ফজলুল করিমের জন্ম হয় এবং ৫৪ বৎসর বয়সে ১৯৩৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ন্যাস রোগে তিনি এন্তেকাল করেন। তাঁর পিতার নাম আমির উল্লা সরদার, মাতার নাম কোকিলা বিবি।

তিনি সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ এবং কাব্যরত্নকার খেতাব পেয়েছিলেন।

সাহিত্য সাধনায় ফজলুল করিমের অবিচল নিষ্ঠা ছিল। সাহিত্যকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির পথে সেজন্যই তিনি সমগ্রভাবে নিজেকে সঁপে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে একটা অকুণ্ঠ সাহিত্যিক প্রাণের পরিচয় সুস্পষ্ট।

ফজলুল করিম জীবনে নীতিবাদী এবং আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁর এ আদর্শবাদ ও নীতিবোধ অনেকটা ধর্মবুদ্ধিজাত এবং তার উৎসমূল ইসলাম। তাঁর সাহিত্যে ধর্মমূলক জীবনবোধই আন্তরিকতায় সিক্ত হয়ে করুণ মধুর রসের সৃষ্টি করেছে।

মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পাতা থেকে কিংবা মুসলিম ওলি-আল্লাদের জীবনী থেকে যেখানেই নীতিমূলক ধর্মাখ্যান পেয়েছেন, তা দিয়েই তাঁর সাহিত্যের ইমারত তিনি গড়ে তুলেছেন। 'লায়লী মজনু', 'রাজর্ষি এব্রাহিম' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি মানবীয় প্রেমের কাহিনীও রচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও শ্লীলতা, ধর্মবোধ ও নীতিজ্ঞান লংঘন করেননি।

ফজলুল করিমের এ বইগুলো প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় :

১. সরল পদ্য বিকাশ (শিশুপাঠ্য কবিতার বই; তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সে সময়ে এটি রচনা করেন)। ২. তৃষ্ণা (কাব্য) ১৯০০, পৃঃ ৫+১৯; ৩. মানসিংহ

www.icsbook.info

(ঐতিহাসিক চিত্র) ১৯০৩, পৃঃ ১৪+২৪; ৪. ছামৌতত্ত্ব (গদ্য) ১৯০৩; ৫. লাইলী মজনু (গদ্য) ১৯০৩, ৮ম সং ১৯৩১, পৃঃ ১৫৭+১৫; ৬. পরিত্রাণ কাব্য ১৯০৩, পৃঃ ১৪৩+৯; ৭. হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (গদ্য) ১৯০৪; ৮. হযরত এমাম রাব্বানী সাহেবের জীবনী (গদ্য) ১৯০৫; ৯. আফগানিস্তানের ইতিহাস (গদ্য) ১৯০৯; ১০. পথ ও পাথেয় (গদ্য) ১৯১৩, ৩য় সং ১৯৫৪, পৃঃ ১৬২+৮; ১১. চিন্তার চাষ (গদ্য) ১৯১৬; ১২. বিবি রহিমা (গদ্য) ১৯১৮, ৪র্থ সং, ১৯৫২, পৃঃ ১৯১+৪; ১৩. বিবি ফাতেমা (গদ্য) ১৯২১, ২য় সং ১৯৪০, পৃঃ ১৫০; ১৪. রাজর্ষি এব্রাহিম (গদ্য) ১৯২৪, ৩য় সং ১৯৫৫, পৃঃ ১৬৮; ১৫. বিবি খাদিজা (গদ্য) ১৯২৭, পৃঃ ১২০+৮; ১৬. হারুণ-অল-রশীদের গল্প (গদ্য); ১৭. সোনার বাতী (গদ্য); ১৮. গাথা (পদ্য); ১৯. ওমর খৈয়ামের অনুবাদ (পদ্য); ২০. মাথার মণি (জম্‌জম পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) (গদ্য); ২১. হাতেমতাঈ-এর গল্প (গদ্য); ২২. বেহেস্তের ফুল (গদ্য); ২৩. বাগ ও বাহার (উপন্যাস); ২৪. মুন্সী মেহেরুল্লা (শোকগাথা—নবনূরে প্রকাশিত); ২৫. ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (পদ্য); ২৬. রাজা মহিমারঞ্জন (গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত শোকগাথা)। এ ছাড়া তাঁর নিম্নলিখিত অপ্রকাশিত রচনাগুলোরও খোঁজ পাওয়া গেছে। ২৭. আলহারুণ (ইতিহাস); ২৮. ভগ্নবীণা (পদ্য); ২৯. পৌত্তলিকের পরিণাম (গদ্য) (মুন্সী মেহেরুল্লার অনুরোধে লিখিত); ৩০. একেশ্বরবাদ (গদ্য); ৩১. ত্রিস্রোতা (উপন্যাস); ৩২. প্রেমের স্মৃতি (নাট্যকাব্য); ৩৩. বিবি আয়েশা (গদ্য); ৩৪. জোয়ারভাটা (উপন্যাস); ৩৫. পরশমণি (হযরতের জীবনী অবলম্বনে গদ্য রচনা); ৩৬. রাজা মহিমারঞ্জনের পশ্চিম ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী); ৩৭. হযরত পয়গম্বরগণের জীবনী।

এছাড়া ফজলুল করিম 'কান্তনামা' নামে একটি পুঁথিও সম্পাদনা করেছিলেন।

তিনি এ পত্রিকাগুলোও নিয়মিত সম্পাদনা করেন :

১. বাসনা; ২. জম্‌জম; ৩. কল্লোলিনী (এক ফর্মা ছাপা হয়); ৪. রত্নপ্রদীপ (হাতে লেখা পত্রিকা)।

আলোচ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'পথ ও পাথেয়'তে তিনি ছোট ছোট গল্পের আকারে নানা নীতিকথা শুনিয়েছেন। 'চিন্তার চাষ' তাঁর অত্যন্ত ছোট বই। সা'দীর গুলিস্তাঁ, বোস্তা এবং রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র উপদেশাবলীর মতো নানা উপদেশ-কণিকায় পূর্ণ।

বাংলা ভাষায় শেখ ফজলুল করিমের অসাধারণ অধিকার ছিল। বিষয় অনুসারে তিনি বাংলা গদ্যে মিঠে ও কড়া সুর সংযোজন করতে পারতেন। অত্যন্ত সহজ সাধু কিংবা কথ্য ভাষা থেকে গুরুগম্ভীর ধ্বনি সমন্বিত দীর্ঘ বাক্যে বাংলা গদ্যের স্রোত-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতেন। সাধু এবং কথ্য বাংলা গদ্যের দুটি রীতিই তার হাতে মধুরতা লাভ করেছে।

১৯০৩ সনে প্রকাশিত 'লাইলী মজনু' তাঁর সতেরো বছর বয়সের রচনা। ১৯৩১ সনে এই বইটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পারস্যের নিজামী প্রমুখ অমর কবির বর্ণিত 'লায়লী-মজনু'র বিশ্ববিশ্রুত প্রেমকাহিনীকে ভিত্তি করে বাংলা সাধু ভাষায় শেখ ফজলুল করিম তাঁর 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন। উপন্যাসের ভঙ্গিতে লেখা হলেও বিষয়বস্তুর করুণ মধুর আবেদন স্রোতঃশীল ও স্নিগ্ধ বাংলা গদ্যে সমর্পিত হয়ে সম্পূর্ণ বইটিকে গীতিকাব্যের মাধুর্য দান করেছে।

www.icsbook.info

তাঁর 'রাজর্ষি এব্রাহিম' সম্পর্কেও এ-কথা বলা যায়। বল্খের রাজকন্যার প্রতি তাপস আদহামের দুর্বার প্রেমাবেগ বর্ণনা একটা দুর্দম-বন্যাবেগের মতোই প্রবাহিত হয়ে গেছে। তাপসপ্রবর আদহামের উচ্ছ্বসিত স্বর্গীয় প্রেমাবেগ তাঁর দেহমনে যে-অবারিত স্রোতধারার সৃষ্টি করেছে, তার বর্ণনায় লেখকের সমগ্র সত্তা যেন সাড়া দিয়েছে। লেখার সঙ্গে লেখকের এমন অনুভূতি এবং আন্তরিকতাই ফজলুল করিমের সাহিত্যকে স্থায়িত্বের পথে এগিয়ে দেবে।

কাজী আবদুল ওদুদ
(১৮৯৪—১৯৭০)

বাঙালী মুসলমানের প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে কাজী আবদুল ওদুদের নাম স্মরণযোগ্য। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সত্যকে পরীক্ষা করে গ্রহণ করবার প্রবণতা তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, সাহিত্য সমালোচনা লিখেছেন, হিন্দু মুসলমানের সমস্যা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে মানবিক বিপর্যস্ততা দূর করবার চেষ্টা করেছেন। আবার পাশ্চাত্যের মণীষীদের একটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতি বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়কে একজন আদর্শ পুরুষ বলে মনে করতেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের উপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ তিনি লিখে গেছেন। সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক অঙ্গনে তার খ্যাতি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের সূচনায় "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ ছিল বুদ্ধির মুক্তি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসাবে 'শিখা' নামক একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য এবং সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রভাষক রূপে। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন টেক্সস্ট বুক কমিটির সম্পাদক হয়ে। এটাই তাঁর সর্বশেষ কর্ম ছিল। ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর 'মীর পরিবার' একটি গল্পের সংকলন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনে। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। 'নব পর্যায়' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। নব পর্যায়ের অনেকগুলি প্রবন্ধে শিক্ষিত মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ আলোচনা করেন। এ আলোচনার ফলে তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন, বিশেষত মওলানা আকরাম খাঁর। 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৪ সালে। এ গ্রন্থে কবির মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ করে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। তাঁর 'সমাজ ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে। 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' গ্রন্থটি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালে। তিনি বিশ্বভারতীতে 'নিজাম বক্তৃতা হিসাবে' হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নিয়ে যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন এ গ্রন্থটি তারই সংকলন। 'পথ ও বিপথ' নামক একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪৬ সালে, 'আজকার কথা' নামক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪৮ সনে। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কবিগুরু গ্যেটে' দু'খণ্ডে প্রকাশিত

www.icsbook.info

হয় বাংলা ১৩৫৩ সনে। এ গ্রন্থটি গ্যেটের চরিত কথা এবং সাহিত্যের পরিচয়। শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কেন, সম্ভবত ভারতীয় সাহিত্যেও এ ধরনের আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই। তিনি 'তরুণ' নামক একটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেন বাংলা ১৩৫৫ সনে এবং 'আজাদ' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন ইংরেজি ১৯৪৮ সনে। তার 'নজরুল প্রতিভা' প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯৪৯ সনে। ইংরেজি ১৯৫১ সনে প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা দিনের উপহার' নামক প্রবন্ধ পুস্তক। তাঁর পূর্ব প্রকাশিত এবং পনেরটি নতুন প্রবন্ধের সংকলন নিয়ে 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫৮ সালে। 'বাংলার জাগরণ' বলে তার একটি প্রবন্ধ পুস্তকও আছে। এটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৬৩ সনে। 'শরৎচন্দ্র ও তারপর' প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯৬১ সনে। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটি দুখণ্ডে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৬৯ এবং ১৩৭৬ সনে। কাজী আবদুল ওদুদের সর্বশেষ দুটি গ্রন্থ হচ্ছে 'হযরত মুহম্মদ ও ইসলাম' (১৩৭৩) এবং 'পবিত্র কোরআন' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রকাশকাল ১৩৭৩ এবং ১৩৭৪।

আবুল মনসুর আহমদ
(১৮৯৮—১৯৭৮)

ব্যঙ্গ রচনাও যে উঁচুদরের সাহিত্য হয়ে উঠে, তার নিদর্শন আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' আর কাজী দীন মোহাম্মদের 'গোলকচন্দ্রের আত্মকথা'। উৎকৃষ্ট 'satire' লেখক হিসেবে সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এঁদের দান অবিসংবাদী। ব্যঙ্গ রচনায় আবুল মনসুরের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর, ভাষা শাণিত এবং তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত দীপ্ত। হিন্দু ও মুসলিম জীবনের অহংকার ও মানাভিমানের ফলে অতীতে এদেশের যত ক্ষতি হয়েছে সাধারণ মানুষের কুসংস্কারই তার জন্যে দায়ী। তাঁর 'গো দেওতা কা দেশ' প্রভৃতি গল্পে তাদের এ অন্ধ মানসিকতার প্রতি পড়েছে আবুল মনসুরের প্রসন্ন দৃষ্টি। মানুষের এসব দোষ-ত্রুটি নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। সে-ব্যঙ্গের ভেতর দিয়ে দেশের দুর্দশার জন্য আবুল মনসুরের অন্তর কম কান্নামুখর হয়ে উঠেনি। 'আয়না'র ভূমিকা স্বরূপ নজরুল 'আয়নার ফ্রেম' বাঁধতে গিয়ে আবুল মনসুরের ব্যঙ্গ রচনা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে 'তাঁর ব্যঙ্গের হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে-কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই।' তাঁর 'আয়না' এবং 'ফুডকনফারেন্স' একালের বাংলা সাহিত্যের দুটো উল্লেখযোগ্য বই। বিভাগের কালে প্রকাশিত তাঁর 'জীবন ক্ষুধা' বৃহৎ পরিসরে ব্যাপ্ত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশ বিভাগের পটভূমিতে উপন্যাসটি রচিত। তাঁর এ-যুগে লিখিত আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'সত্য-মিথ্যা' বিদেশী গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে রচিত। 'আয়না'র সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ সালে এবং 'ফুড কনফারেন্সে'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮০ সালে।

আবুল মনসুর ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে সাংবাদিক হিসেবেও আবুল মনসুরের খ্যাতি ঘটেছিল তাঁর স্বাধীন এবং সুস্পষ্ট মতাদর্শ প্রকাশের জন্য। তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন।

www.icsbook.info

কাজী দীন মোহাম্মদ

আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের বাহন হলো গল্প, কিন্তু কাজী দীন মোহাম্মদ ১৯৩৯ সনে প্রকাশিত তাঁর 'গোলকচন্দ্রের আত্মকথা' বইটিতে দেশের শিক্ষানীতি, সাহিত্য, বানান, রাজনীতি ও সমাজ-জীবন প্রভৃতি বহু বিষয়েরই দোষ-ত্রুটি শুধরানোর জন্যে গল্পচ্ছলে লিখেছেন প্রবন্ধ। 'গোলকচন্দ্রের আত্মকথা'. বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং পরশুরামের 'গড্ডালিকা' জাতীয় বই। লঘু কৌতুক ও অপরূপ সহজ পরিহাসের সুর এ বইটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে গিয়ে লেখকের মনের সজীব ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। এখানে ব্যবহৃত ভাষায় আশ্চর্য সহজরূপই কাজী দীন মোহাম্মদের ব্যঙ্গকে আরও সহজ গতি দিয়েছে।

ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গোলাপগঞ্জে ১৯০৯ সনে কাজী দীন মোহাম্মদের জন্ম। স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত তাঁর 'জাঁদরেল উকিলের জীবনালেখ্য' প্রভৃতি গল্পেও এ-ব্যঙ্গের ধারা অক্ষুণ্ন ছিল। ছেলেদের জন্য লিখিত 'কেনাই ডাকু' (১ম সং ১৯৪১) নামে তাঁর আর একটি বই আছে।

মাহবুব-উল-আলম
(১৮৯৮—১৯৮১)

মাহবুব-উল-আলমের জন্ম ১৮৯৮ সনের ১লা মে তারিখে চট্টগ্রাম জেলা ফতেয়াবাদ গ্রামে। 'মোমেনের জবানবন্দী', 'পল্টন জীবনের স্মৃতি', 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' এবং 'মফিজন' প্রভৃতি রচনাই তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির কারণ।

"মাহবুব-উল-আলম গল্প বলেছেন অসাধারণ তৃপ্তিতে এবং সহজ নিরাভরণ তীক্ষ্ণতায়। গল্পে তিনি একটি নির্মল বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন—তিনি জানতেন কতটা বলতে হবে এবং কখন থামতে হবে। তিনি ব্যাখ্যাকার নন। রচনারীতির চাতুর্যে তিনি সময়ক্ষেপণ করেননি অর্থাৎ কৌশলগত অতিস্বর বা overtone তাঁর কোনও রচনায় নেই। কিন্তু তাঁর রচনা পরিচ্ছন্ন জীবনময় এবং উপভোগ্য।

'মোমেনের জবানবন্দী' মাহবুব-উল-আলমের আত্মজীবনী। জীবনের কর্মপ্রবাহ নয় কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র কল্লোল গ্রন্থটিকে মহার্ঘ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বভাবের জাগরণ এবং চৈতন্যোদয়ের রোজনামচা এ-বইটি। একজন মানুষের বিশ্বাসের স্বরূপ কি? কোন তাৎপর্যে বিমণ্ডিত মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা? জীবন-কথার স্মৃতিমন্থনে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভেসে উঠেছে। মাহবুব-উল-আলমের লেখা মুখে মুখে গল্প বলার মতো। তাঁর সকল গল্পেই মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। অতি সাধারণ মানুষগুলো তাঁর গল্পের মধ্যে আনাগোনা করে।

তাঁর 'মফিজন' গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন গল্পটিকে নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। অনেকেই গল্পটিকে অশ্লীল ও যৌনতাবহ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে লেখক একজন গ্রাম্য রমণীর দেহগত পরিপুষ্টি এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা আমাদের সাহিত্যে নতুন। রমণীর শরীর এবং মনের সার্থকতা ও সফলতাকে তিনি সুন্দর এবং সুস্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'ইংরেজিতে যাকে বলে introspection অর্থাৎ মর্মমূলে

www.icsbook.info

প্রবেশ করার ক্ষমতা, মাহবুব-উল-আলমের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। তিনি বাইরের অবয়বকে স্পর্শ করেন না, হৃদয়কে নাড়া দেন। (বই, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১)"।

'তাজিয়া' ও 'পঞ্চ অন্ন' তাঁর গল্প সংগ্রহ। তাঁর 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' সুখপাঠ্য ও সুলিখিত রচনা। 'গোঁফ সন্দেশ' কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনার সংকলন। 'সংকট কেটে যাচ্ছে' নামক একটি পুস্তিকায় তিনি আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯—১৯৭৬)

বাঙালী মুসলমানদের গদ্য-সাহিত্য সাধনায় এর পরে নাম করতে হয় কাব্যে ও সংগীতে যুগপ্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলামের।

"নজরুল ইসলামের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' তৎকালীন মাসিক 'মুসলিম ভারত' পত্রিকায় বাংলা ১৩২৭ বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আটটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩১, ইংরেজি ১৯২৭ সালে। এই উপন্যাসটির রচনাভঙ্গি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষত্বপূর্ণ। এর মধ্যে প্রেমের আবেগ প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'নওরোজ' পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৮, ইংরেজি ১৯৩১ সালে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৬, ইংরেজি ১৯৩০ সালে। নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯২২ সালে। 'রিক্তের বেদন' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩২ সালে। নজরুল তার উপন্যাস তিনটিতে অর্থাৎ 'বাঁধনহারা', 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'য় বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাষায় প্রবল উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ একটা তীব্র গতিবেগ আছে। গল্পগ্রন্থগুলোতে প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রেম এবং মূলত প্রেমের বঞ্চনা এবং হতাশা। এ সমস্ত গ্রন্থ পাঠে অনুভব করা যায় যে নজরুল ইসলাম গদ্য রচনায় অগ্রসর হলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কাহিনীর একটি বৃত্ত প্রয়োজন, যাকে আমরা বলতে পারি জীবনমণ্ডল; তা তাঁর সবকটি উপন্যাসেই আছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে কাহিনী-নির্মাণে তাঁর একটি দক্ষতা ছিল। এই দক্ষতাকে তিনি পূর্ণভাবে ব্যবহার করেননি। তার কারণ তিনি ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি মূলত কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী। সুতরাং গদ্যরচনায় দীর্ঘকালীন সময়ক্ষেপণকে অস্বীকার করে তিনি কাব্য রচনায় পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করলেন।"

নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী' (১৯২২ খ্রীঃ) সান্ধ্য দৈনিক নবযুগে প্রকাশিত কতিপয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সংকলন। ২য় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, ৩য় মুদ্রণ ১৩৬৪। নজরুল 'ধূমকেতু'তে যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন তার কতকগুলি সংগ্রহ করে ৫৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রকাশ করেন। এটির প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। বঙ্গীয় সরকার নজরুলের এ গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট। 'রুদ্রমঙ্গল' ৭৮ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা। নজরুল নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। ঢাকার

www.icsbook.info

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড-এ (মে, ১৯৬৬) সংযোজন বিভাগে 'তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা', 'জননীদের প্রতি', 'পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব', 'জীবন বিজ্ঞান' এবং 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ১৩২৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখের 'ধূমকেতু', ১৩২৯ মাঘের প্রবর্তক, ১৩২৯ ফাল্গুনের 'উপাসনা' এবং ফাল্গুনের 'সহচর' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকা সংক্রান্ত মামলায় এই 'জবানবন্দী' নজরুল আদালতে দাখিল করেন। পুস্তিকাকারে এর দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

নজরুলের উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি সমগ্র গদ্যরচনাতেই ভাষার lyric সুর তাদের উপরে কাব্যের মায়াঞ্জন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। গল্প ও চরিত্র চিত্রণের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গিতে যাদুকরী স্পর্শের জন্য পাঠকের মন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে ওঠে। সেজন্যেই বাংলা সাহিত্যে নজরুল রচিত এ বইগুলোর একটি বিশেষ স্থান আছে।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান
(১৮৭৮—১৯২৩)

জনপ্রিয়তা দিয়ে যদি কোন বইয়ের বিচার করতে হয় তা হলে মোহাম্মদ নজিবর রহমান রচিত 'আনোয়ারা'র দাবীই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। ১৯১১ থেকে ১৪ সনের মধ্যে এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নর্মাল স্কুলের শিক্ষকতা উপলক্ষে রাজশাহীতে অবস্থানকালে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করেন। ১৯৪৯ সনে এ বইটির ত্রয়োবিংশতি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং এ যাবৎ 'আনোয়ারা'র দেড় লক্ষ কপি নিঃশেষিত হয়েছে। এর কারণ গ্রামের অল্পশিক্ষিত মুসলমানরাই এর খরিদ্দার ও সমঝদার। 'সমাজে শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন, বহু বিবাহের কুফল, স্ত্রৈণতার দোষ, স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা, স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সমঝোতা, কুলগর্বের অন্তঃসারশূন্যতা, চাকুরি জীবনের বিড়ম্বনা, স্বাধীন ব্যবসায়ের সুখ, গ্রাম্য দলাদলি, স্বার্থান্ধের হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা, গুণ্ডা বদমাইশের সুখ, গ্রাম্য দলাদলি, স্বার্থান্ধের হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা, গুণ্ডা বদমাইশের ষড়যন্ত্র, প্রকৃত সতীত্বের গৌরব আর ধর্ম জীবনের মাহাত্ম্য প্রভৃতি সস্তা ভাবালুতা' গ্রন্থকার সেকালের সাধু ভাষায় যে-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন সাধারণ মুসলমানের কাছে তার আবেদন আকর্ষণীয়। আনোয়ারা ও নুরুল ইসলাম মুসলিম গ্রামীণ সমাজে type চরিত্র। এ সমাজের নরনারীর এমন typical চরিত্র নজিবর রহমানের মতো আজও কেউ চিত্রিত করতে পারেননি। একারণেই সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক লোক এত আগ্রহের সঙ্গে এ বইটির রসোপলব্ধি করে আসছে। নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ বইটি উপন্যাস হিসেবে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা এর জনপ্রিয়তা থেকেই বোঝা যায়।

"বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'আনোয়ারা' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এই উপন্যাসটি মুসলমান জনসাধারণ কর্তৃক পূর্ণভাবে সম্মানিত এবং গৃহীত হয়েছিল। এখনও এর আবেদন নিশ্চিহ্ন হয়নি। কাহিনীর আবেদন তো আছেই, তাছাড়া মুসলমান পরিবারে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এ গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত ধর্মপ্রাণ

www.icsbook.info

মুসলমান গৃহের আচার-আচরণ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, অহমিকা ও আকাঙ্ক্ষা এবং ত্যাগ বিনয় এ গ্রন্থটিতে অসাধারণ সফলতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। একটি মূল প্রণয় কাহিনীর মধ্যে আনুষঙ্গিক আরো অনেক কাহিনী এসে যুক্ত হয়েছে কিন্তু লেখক সুশৃঙ্খলভাবে শাখা কাহিনীগুলোকে মূল কাহিনীর সঙ্গে এমনভাবে সংলগ্ন করেছেন যে মুহূর্তের জন্যও অনুভব করা যায় না যে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। একটি মুসলমান গৃহে সংসারবৃত্তির সগে ধর্মের আচরণ কি করে সম্মিলিত হয়ে একটি জীবনবোধ নির্মাণ করে তার পরিচয় এই গ্রন্থটিতে আমরা পাই। মুসলমানগণ আরও অনেক সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন যেমন মোজাম্মেল হকের 'জোহরা' অথবা কাজী আব্দুল ওদুদের 'মীর পরিবার' অথবা কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ'; কিন্তু এগুলোর কোনটাই 'আনোয়ারা'র মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। অবশ্য 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি একটি সার্থক সৃষ্টি। নজিবর রহমান 'আনোয়ারা' ছাড়া আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন, যেমন 'প্রেমের সমাধি', 'পরিণাম', 'হাসান গঙ্গা বাহমানি', 'দুনিয়া আর চাই না' এবং 'গরীবের মেয়ে'। দুর্ভাগ্যক্রমে এগুলোর কোনটাই জনপ্রিয় হয়নি। তিনি একটি উপন্যাসের মধ্যেই বিচিত্র শাখা-কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং এর ফলেই সম্ভবত ভিন্নতরো কাহিনী রচনার মানসিক প্রস্তুতি তাঁর আর ছিল না।"

মোহাম্মদ নজিবর রহমান ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে পাবনা জেলায় শাহাজাদপুরের নিকটবর্তী বেলতৈল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজ-সচেতন শিল্পী। মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ-সমন্বিত পুস্তকাদি লেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করতেন, তাঁর এ গ্রন্থগুলো থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মোহাম্মদ কোরবান আলী ও শেখ ইদরিস আলী

এ প্রসঙ্গেই ১৯২৫ সনে প্রকাশিত মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'মনোয়ারা' উপন্যাসের এবং এরই সমসাময়িককালে প্রকাশিত শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর 'শেখ সংসার', 'দরবেশ কাহিনী', 'নতুন বৌ', 'প্রেমের পথে', 'আদর্শ গৃহিণী', 'বঙ্কিম দুহিতা', 'রূপের মোহ' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করতে হয়। কোরবান আলীর 'মনোয়ারা', নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা'র অনুকরণে এবং ইদরিস আলীর 'প্রেমের পথে'ও তাঁর 'প্রেমের সমাধি'র অনুকরণে রচিত হয়েছিল। এ উপন্যাসগুলোতে সস্তা পতিভক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। 'বঙ্কিম দুহিতা'য় শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী বঙ্কিমের 'রাজসিংহের' প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেব দুহিতা 'জেবুন্নেসা'র চরিত্রে যে কালিমা লেপন করেছেন, তিনি তারই প্রতিশোধ নিয়েছেন বঙ্কিমের 'দুহিতা'র চরিত্র অনুরূপভাবে চিত্রিত করে। 'বঙ্কিম দুহিতা' বিদ্বেষাত্মক রচনা, সাহিত্য নয়।

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া জেলার শিবপুরে এক অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁর 'আমার প্রিয়া', 'পীযুষ প্লাবনী', 'মর্মবাণী' এবং 'মুক্তিবীণা' নামে কয়েকটি কাব্য ছিল। তিনি ১৯৪৫ সালে মারা যান।

www.icsbook.info

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
(১৮৯৮—১৯৭৬)

১৯২৪ সালে 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর আবির্ভাব। উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সনের মধ্যে লিখিত ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে পারস্য দেশের কবি ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনামূলক কোন পুস্তক বাংলা সাহিত্যে ছিল না। পারস্য প্রতিভায় কবি ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী, হাফিজ, জালাল উদ্দিন রুমি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, নিজামী এবং জামীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এ আলোচনাগুলো ছাড়াও পারস্য সাহিত্যের দিক নির্দেশক কয়েকটি প্রবন্ধও ছিল, যেমন—পারস্য সাহিত্য, পারস্যের উর্বর যুগ, সূফিমত ও বেদাও এবং সূফিমত ও নিউ প্লেটোনিজম। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বরকতুল্লাহ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তিনি সরকারের প্রশাসনিক কর্ম ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সর্বশেষ চাকরি ছিল ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারির পদ। ১৯৩৪ সালে মোহম্মদ বরকতুল্লার 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মানুষের ধর্ম গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল, সেগুলির নাম : মানুষের ধর্ম, ধ্রুব কোথায়, জড়বাদ, চৈতন্য, বস্তুরূপ, জীবনপ্রবাহ, অনন্ত তৃষা, আদিম প্রেরণা, জীবন ও নীতি। লেখক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন : "গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলো দর্শনমূলক হইলেও দুরূহ দার্শনিকতার অবতারণা ইহাতে করা হয় নাই। সাধারণত আমাদের মনে জীবন ও জগৎ, ইহলোক ও পরলোক, আত্মা ও পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে সময় সময় যে সব প্রশ্ন জাগে সেইগুলির উপর দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা করা হইয়াছে।" লেখকের জীবিতকালে এই গ্রন্থের চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবাসী পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলা হয়েছিল : "এমন সুবোধ্য ভাষায় ও সরল ভঙ্গিতে বিষয়গুলো বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২)।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
(১৮৯৬—১৯৫৪)

'মরুভাস্কর' গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান সমাজে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এক সময় শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষার প্রসাদ গুণের প্রশংসা করেছিলেন। অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক 'বুলবুল' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিয়ে 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য ক্ষোভ এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্যবধানের জন্য দায়ী করেছিলেন মুসলমান সমাজকে। অনবদ্য ওজস্বী ভাষায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রবীন্দ্রনাথও কিছু করেননি এ ধরনের মন্তব্য করেন। এর উত্তর দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র ওয়াজেদ আলীর অপূর্ব গদ্যভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন এবং

www.icsbook.info

বলেছিলেন যে, ওয়াজেদ আলী রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করেছেন বটে, কিন্তু যে ভাষায় করেছেন সে ভাষাও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রথম কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। তারপরে 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। 'দৈনিক সেবক' নামক একটি পত্রিকায়ও কিছুকাল কাজ করেছিলেন। ১৯২২ সালে খেলাফত আন্দোলনে মওলানা আকরম খাঁ কারারুদ্ধ হলে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সম্পাদনার দায়িত্ব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর উপর এসে পড়ে। আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে তিনি সাংবাদিকতায় নিয়ে আসেন। তিনি 'খাদেম' পত্রিকাও কিছুকাল সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ আছে। যেমন—স্যার সৈয়দ আহমদ হাজী মহসীন এবং নবাব আবদুল লতিফ। খালেদা এদিব হানুমের একটি উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ তিনি করেছিলেন—নাম 'স্মার্ণা নন্দিনী।'

মম্ লুকুল ফাতেমা খানম
(১৮৮৪—১৯৫৭)

মম্ লুকুল ফাতেমা খানমের জন্ম ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তসবিডাঙ্গা গ্রামে। পিতা রইস উদ্দীন আহমদ রেলপুলিশে চাকরি করতেন। ফাতেমা খানম উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাননি। তাঁর পিতার স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর মন বিকশিত হয় এবং লেখার অভ্যাস জন্মে। ঢাকার পোস্তা বালিকা বিদ্যালয় এক রকম তাঁরই অবদান। কলকাতার রোকেয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলেও বেগম রোকেয়ার সহকর্মিণী হিসেবে তিনি শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন।

ফাতেমা খানমের সাহিত্য সাধনার উল্লেখযোগ্য সময় ১৯২১ থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। এ দশ বছরে তাঁর সমপর্যায়ের মুসলমান গল্প লেখিকা আর কেউ ছিলেন না। সে যুগের সকল কথাশিল্পীর মধ্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে। সেলিনা চৌধুরীর সম্পাদনায় তাঁর 'সপ্তর্ষি' নামে সাতটি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪)। সংকলিত গল্পগুলো মানসী ও মর্মবাণী, যুগের আলো, মাতৃমন্দির এবং সওগাত প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্প কয়টির নাম ডোর, চামেলী, দর্পচূর্ণ, মাতৃহারা, সাগর সংযোগ, আশ্রয়, শেষ অনুরোধ।

গল্পগুলির মধ্যে একটি সুস্থ জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গল্প তাঁরই চেনা মানুষের নক্সা, হয়তো জানা ঘটনারই গল্পায়ন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠী

এ-যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান ও স্থান নির্ণয়ে সৈয়দ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং কাজী মোতাহার হোসেন এ-তিন জনের নাম একই সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের সাহিত্যিক জীবনের উদ্ভব এবং বিকাশ হয় এ শতকের তৃতীয় দশকের রাজনৈতিক অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিতে। ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাবার পর ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলিম জীবনের স্বতন্ত্রধারা ও বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচার করতে থাকেন। মুসলমানের মানসিক দৌর্বল্য ঘুচিয়ে খ্রীস্ট এবং হিন্দু প্রভাব

www.icsbook.info

থেকে তাকে মুক্ত করে জাতি হিসেবে সে যে অনেক বড়ো মুসলমানদের মধ্যে এ বোধ জাগরিত করার জন্যে সিরাজীর দান অবিস্মরণীয়। মুসলিম জীবনাদর্শ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এ সময়ের মুসলিম সাহিত্যিকেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তারও চেয়ে বেশি করেছেন তাঁদের রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনের পথ নির্ধারণের প্রচেষ্টা। এ পটভূমিতেই কংগ্রেসের খেলাফত এবং বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। খেলাফত আন্দোলনের মূল বাণী ছিল এ দেশে হিন্দু মুসলিমের মিলন। বাংলাদেশে এ আন্দোলনের মর্মবাণীর সঙ্গে বহু সাহিত্যিকই ঐক্যমত খুঁজে পেয়েছেন। হিন্দু-মুসলিমের মিলনজনিত বাংলার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়ে উঠবে এ মতও মুসলমানদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিকই সে যুগে পোষণ করেছেন। সৈয়দ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের সাহিত্যিক জীবনের রূপায়ণে যেমন করে এ রাজনৈতিক আন্দোলন সক্রিয় হয়েছে, এক নজরুল ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সাহিত্যিক সম্পর্কে এ কথা তেমন প্রযোজ্য নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সাহিত্যিকত্রয়ী আলোচ্য সময়ে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নাম দিয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। এ সমাজের মুখপত্র ছিলে 'শিখা' নামে একটি পত্রিকা। মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্ত মনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা, জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করা এবং অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলমানকে মুক্ত করে তদানীন্তনকালের বাস্তবকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, এই র‍্যাশনালিস্ট ও হিউম্যানিস্ট-সাধনাই ছিল তাঁদের আদর্শ। প্রায় বছর দশেক মুসলিম সাহিত্য-সমাজ চালু ছিল। স্বল্পকাল স্থায়ী এ সাহিত্য সমাজ সেকালের বাঙালী মুসলিমের সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে রীতিমতো আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আবুল হুসেন সমাজসমস্যামূলক বই লেখেন–'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', 'বাঙলার বড়শী' (বাংলার কৃষক সম্পর্কিত), 'হিন্দু-মুসলিম' (পঞ্চাঙ্ক নাটক) এবং 'মুসলিম কালচার' (মার্মাডিউক পিকথলের 'মুসলিম কালচার' নামক বইটির বাংলা অনুবাদ); এছাড়া তিনি 'আদর্শের নিগ্রহ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা' এবং 'শতকরা পয়তাল্লিশ' নামে তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'নবপর্যায়' গ্রন্থে 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক একটি ঝাঁঝালো প্রবন্ধ লেখেন এবং কাজী মোতাহার হোসেনও 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ', 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান' এবং 'বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধে মুক্তমন এবং আশ্চর্য চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন। আর এঁদেরই বিরোধিতা করতে নামেন মৌলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী'কে কেন্দ্র করে। আবদুল ওদুদের 'নবপর্যায়' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করে তিনি ধারাবাহিক ভাবে 'নবপর্যয় না নব পর্যায়?' নাম দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ঢাকার বুকে বসে সেদিন এই শিখা গোষ্ঠী এবং এদের সহসংগঠন 'পর্দাবিরোধী সংঘে'র সদস্যরা বাঙালী মুসলমান সমাজকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তীব্র আঘাত করেছিলেন বলে নানাভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন। সৈয়দ আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদকে শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল।

এ সাহিত্যিকত্রয়ীর মধ্যে সৈয়দ আবুল হুসেন বহুদিন হয় পরলোকগত হয়েছেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং কাজী মোতাহার হোসেনও পরলোকগত। ১৯৩৭ সনে প্রকাশিত 'সঞ্চরণ' শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেনের বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং মুক্তমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

www.icsbook.info

আকবর আলী

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র সাহিত্যসাধনার মতো আকবর আলীর সাহিত্যসাধনারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বরকতুল্লাহ্‌র 'পারস্য প্রতিভা' এবং 'মানুষের ধর্ম' তথ্য ও তত্ত্বভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও লেখন ভঙ্গিমায় তা হয়েছে সাহিত্য। তাঁর বর্ণিত বিষয়ের আবেদন শুধু বুদ্ধিকেই নাড়া দেয় না, হৃদয়কেও স্পর্শ করে। আকবর আলীর জগৎ স্বতন্ত্র। নানা গ্রন্থ ঘেঁটে, নানা তথ্য উদ্ধার করে 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' সম্বন্ধে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার নজীর এ যুগের বাংলা সাহিত্যে বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগের অক্ষয় দত্তের সাধনার সঙ্গেই আকবর আলীর সাধনার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। আকবর আলী রসসাহিত্য সৃষ্টি করেননি, কিন্তু বাংলা ভাষায় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সাধনা যে অশ্রান্ত পরিশ্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন, এ সাহিত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা বিভাগ তাতেই হয়েছে সমৃদ্ধ।

আবুল ফজল
(১৯০৫—১৯৮১)

১৯৩০-৩৫ সালের দিকে কথা সাহিত্যিক হিসেবে বাঙালী মুসলমান সমাজে আবুল ফজলের আবির্ভাব। সে সময় মুসলমান সমাজে স্বাধীন চিন্তা এবং জিজ্ঞাসার খুব অভাব ছিল। আবুল ফজল তাঁর গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে খুব বলিষ্ঠভাবে একটি স্বাধীন মনোভঙ্গির পরিচয় দেন। যুবক-যুবতীর প্রেম, খোলামেলা আচরণ এবং কর্ম জীবনে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হওয়ার কথা আবুল ফজলই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠভাবে বলেছিলেন। তাঁর 'জীবন পথের যাত্রী' উপন্যাসটি এক সময় হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই গ্রন্থটি প্রথমে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দিলীপকুমার রায় এই ধারাবাহিক রচনাটি পাঠ করে একটি দীর্ঘ পত্রে আবুল ফজলেরে প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'চৌচির'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। এ গ্রন্থের সব কটি গল্পই মুসলমান সমাজের সামাজিক ও সাংসারিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লিখিত। এতে মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গ আছে। 'সাহসিকা' নামক গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। এখানকার গল্পগুলোতে তরুণ মনের চাঞ্চল্য এবং আবেগের পরিচয় আছে এবং কিছুটা কৌতুকও আছে। 'জীবন পথের যাত্রী' (১৯৪৮) উপন্যাসটিতে তিনি সর্বপ্রথম কলকাতা শহরের মুসলমান সমাজের কিছু তরুণ আদর্শবান মানুষের চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যেই তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক কর্ম পদ্ধতি নিয়ে চরিত্রগুলোর মধ্যে আলোচনা আছে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে যুবক এবং যুবতীদের পারস্পরিক সাহচর্যের কথাও এ উপন্যাসে আছে। তাঁর 'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। অনেকে এ গ্রন্থটিকে আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে থাকেন। এ গ্রন্থে তিনি কর্ণফুলীর স্নেহ লালিত জনপদের সদস্য নায়ক কামালের জীবন সংগ্রামের চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর নায়কের মধ্য দিয়ে জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উপন্যাসটি কাহিনী নির্মাণের দিক থেকে খুব একটা গতি পায়নি। এ উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে আদর্শ জীবনের ব্যাখ্যা এসেছে। তার ফলে গ্রন্থটি শিল্পগত সিদ্ধি লাভ করেনি। লেখক নিজের

www.icsbook.info

বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে নায়ক চরিত্রে আরোপ করে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত দেবার চেষ্টা করেছেন।

আবুল ফজল মূলত কথা-সাহিত্যিক এবং কথা সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর মূল্যায়ন করতে হবে। তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন এবং এক শ্রেণীর লোকের কাছে জাতির বিবেক হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তিনি বাংলাদেশ-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি হন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি সোভিয়েটপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তাঁর মনোনিবেশের পরিচয় 'শুভ বুদ্ধি' (১৯৭৪) 'সমকালীন চিন্তা' (১৯৭৪) এবং 'সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (১৯৭৪) গ্রন্থ তিনটিতে ধরা পড়েছে। আবুল ফজল এক সময় বাংলাতে হাদীসের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন এবং পাকিস্তান আমলে 'কায়েদে আজম' নামে একটি নাটিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এসব অদ্ভুত ধরনের ব্যতিক্রম তাঁর মধ্যে থাকলেও আবুল ফজলকে আমরা কথা সাহিত্যিক হিসেবেই মর্যাদা দেব।

হুমায়ুন কবির
(১৯০৬-১৯৬৯)

সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধারে এ-যুগে আর যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হুমায়ুন কবির অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। তাঁর 'বাঙ্গালার কাব্য' (১৯৪২) ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সংক্রান্ত একটি মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থ। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যবিচার এবং সিদ্ধান্তে পৌছানোর ধারা চমকপ্রদ এবং অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর ইংরেজিতে 'শরৎচন্দ্র' এবং বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি বর্তমান।

"'নদী ও নারী' নামে তাঁর একটি উপন্যাস আছে। 'ইমানুয়েল কান্ট' (১৯৩৯) গ্রন্থে কান্টের দর্শনের ব্যাখ্যা আছে। রাজনীতি বিষয়ক দুটি গ্রন্থ আছে- 'মোসলেম রাজনীতি' (১৯৪৩) এবং 'মার্কসবাদ' (১৯৫১)। তিনি কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর কাব্য গ্রন্থের নাম 'সাথী' (১৯৩০), 'স্বপ্নসাধ' (১৯২৭) এবং 'অষ্টাদশী' (১৯৩৮)"

মুহম্মদ এনামুল হক
(১৯০৬-১৯৮২)

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বখ্‌তপুর গ্রামে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্য ভেদ' (১৯৪৩) ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' রচনা করেন। এ গ্রন্থে বাংলার বাইরে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আলাওল, দৌলত কাজী ও মাগন ঠাকুরের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সংবাদ আছে যত না, সে পরিমাণে সাহিত্যিক মূল্যবিচার নেই। এনামুল হকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১ম মুদ্রণ ১৯৫৭) রচনা। তুর্কী আমল থেকে পাকিস্তান যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হলেও এটি মধ্যযুগের বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার একটি

www.icsbook.info

সমালোচনামূলক ইতিহাস। 'মনীষা মঞ্জুষা' (১ম খণ্ড ১৯৭৪, ২য় খণ্ড ১৯৭৬) নামে মুহম্মদ এনামুল হকের একটি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ' নামক একটি ভ্রমণকাহিনীও মুদ্রিত হয়েছে।

একরামুদ্দীন
(১৮৮০-১৯৩৫)

একরামুদ্দীন বর্ধমান জেলার কুমিল্লা গ্রামে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এমন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে লিপ্ত থেকেও নীরবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বীকৃতিই তাঁর প্রথম সমালোচনা গ্রন্থ। এটি লিখিত হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু 'রবীন্দ্র প্রতিভা' নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে। এ গ্রন্থে তিনি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমালোচকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় সমালোচনা গ্রন্থ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশিত হয়। সে যুগে বাংলা সাহিত্যের সমালোচক হিসেবে একরামুদ্দীন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া গল্প-উপন্যাস রচনায়ও তাঁর বেশ হাত ছিল। 'কাচ ও মণি' এবং 'নতুন মা' তাঁর দুটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উপন্যাস রচনায় একরামুদ্দীন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব শিষ্য ছিলেন। তাঁর 'কাচ ও মণি' নীতি ও আদর্শ প্রচারমূলক উপন্যাস। এ-বই দুটি বাঙালী পাঠক সমাজে সেকালে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। 'সওগাত' পত্রিকায় 'জীবন-পণ' নামক তাঁর আর একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এসব উপন্যাসে চিত্রিত জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কোনও বাস্তবভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'চাঁদ মিয়ার খাতা' নামক রম্য-রচনা ও 'অনধিকার প্রবেশ' নামক একটি ছোট ব্যঙ্গনাট্য তিনি রচনা করেছিলেন।

"একরামুদ্দীনের 'কাচ ও মণি' মাসিক সওগাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। সেদিক থেকে সওগাতের ইতিহাসে এই উপন্যাসটির গুরুত্ব যথেষ্ট। তৎকালীন সওগাতে এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আমরা একজন লেখকের নিকট উপস্থিত হইব যাহার লেখায় আমরা একটা প্রতিভার–একটা শক্তির-একটা নতুনত্বের-একটা মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। ইনি 'রবীন্দ্র প্রতিভা'র প্রতিভাশালী লেখক একরামুদ্দীন। তিনি 'কাচ ও মণি' নামক একখানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। সওগাতে তাহা মাসে প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইহা সমাপ্ত হয় নাই। কাজেই এখনও উহার সমালোচনার সময় আসে নাই। কিন্তু তথাপি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে আমরা প্রথম হইতেই একটা নতুন শক্তির পরিচয় পাইয়া পুলকিত ও আশান্বিত হইয়াছি।' একরামুদ্দীন 'মেঘনাদ ও বৃত্রসংহার' নামে সওগাতে বাংলা ১৯২৬ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি সেই সময় সমালোচনার যে দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন তা যথার্থই প্রশংসনীয়। তাঁর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য, "মাইকেলকে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করিয়া কে বড়ো কে ছোট যাহারা মীমাংসা করিতে চাহেন তাহারা ভ্রান্ত, উভয়ের প্রকৃতি, অধিকার ও কর্তব্য বিভিন্ন এবং উভয়েই আত্ম অধিকারে সম্রাট।"

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.icsbook.info

শেখ হাবিবর রহমান

শেখ হাবিবর রহমানের নানা কবিতা ও গদ্য গ্রন্থের মধ্যে 'আমার সাহিত্য জীবন' (১৯২৭), 'কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা' (১৯৩৪) এবং 'আলমগীর' (১৯৪৮) এ তিনটিই উল্লেখযোগ্য। শেখ হাবিবর রহমানের সাহিত্য সাধনার মূলে তাঁর সমাজ দরদী প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আমার সহিত্য জীবনে' তিনি যে-ভাবে মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের ছবি এঁকেছেন তাতে তাঁর প্রাণের দরদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুন্‌শী মেহেরুল্লা বাংলার মুসলিম সমাজের নব রূপায়ণের কি পালা অভিনয় করে গেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে 'কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা'য়। ৫৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী 'আলমগীর' বইটির 'হিন্দু শাস্ত্রে ইসলামের প্রমাণ' 'নিরাকার উপাসনার যুক্তি' এবং 'মানব-ই-খুদা' শীর্ষক পরিচ্ছেদগুলোতে 'আলমগীর' রচনার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থটিকে Defence of Alamgir বলা যেতে পারে। এটি না ইতিহাস, না উপন্যাস, না ঐতিহাসিক উপন্যাস। এটিকে এক ধরনের 'Chronicle' বলা যায়।

সৈয়দ আবুল হোসেন

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন (মুসলিম সাহিত্য-সমাজ দলের সৈয়দ আবুল হুসেন নন) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে 'জ্ঞানভাণ্ডার' নামক শ পাঁচেক পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ সমালোচনার বই লেখেন। বঙ্কিমের সবকটি উপন্যাসেরই ব্যঙ্গচিত্র এতে আছে। তাঁর এ-বিদ্বেষপ্রসূত আলোচনা কোনো সাহিত্যিক রুচির পরিচয় বহন করে না। শেখ ইদরিস আলীর 'বঙ্কিম দুহিতা' যে মনোবৃত্তি থেকে লেখা আবুল হোসেনের 'জ্ঞানভাণ্ডার'ও সেই একই মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অন্তত একটা দল সাহিত্যিক শক্তিহীনতা সত্ত্বেও কিভাবে বঙ্কিমের এবং হিন্দু-মানসের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তাঁর পরিচয় দেওয়ার জন্যেই এ বইগুলোর উল্লেখ করা গেল।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন
(১৮৭৩-১৯৬৪)

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তরিখে ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন। প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। সেকালের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের সাহিত্যিক জীবনের এটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য' ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন 'Sultana's Dream' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গোলাম হোসেনের 'বঙ্গবীরাঙ্গনা' কাব্যটি বেগম রোকেয়ার 'এক স্বপ্নদৃষ্ট নারীস্থানের' বর্ণনার অনুসরণে রচিত। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'কাব্যযুথিকা' (প্রথম ভাগ) ১৯৬০

www.icsbook.info

সালে যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত পুস্তক। এতে ১৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ কাব্য গ্রন্থটি বৃদ্ধ কবির স্মৃতি রোমন্থনজাত রচনা।

তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় প্রকাশিত পুস্তক) 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' ১৩১৭ সালে (১৯১০ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির ভূমিকা এবং উপসংহারের শেষাংশ ইংরেজিতে রচিত। তৎকালীন বঙ্গবিভাগ এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের গোলযোগের পটভূমিতে গোলাম হোসেন এ গ্রন্থটি রচনা করেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও তাদের মিলন 'সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়', তিনি এ মতবাদ পোষণ করতেন।

১৩১৯ সনের (১৯১২ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠের কোহিনুর পত্রিকায় 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' পুস্তকটি সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ

"গ্রন্থ প্রণয়নে লেখকের কৃতিত্ব সুপ্রচুর। হিন্দু-মুসলমানদের বিবাদ সম্পর্কীয় বহু ব্যাপারে বিশদ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা এই গ্রন্থে আছে।.... লেখকের ভাষা মনোহারিণী। ... স্থানে স্থানে গ্রন্থের রচনা এতো মধুর হইয়াছে যে, বঙ্গ সাহিত্যে তাহার তুলনা অধিক মেলে না। ....."

মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ (তৃতীয় প্রকাশিত পুস্তক) 'দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ'। দিল্লী আগ্রার মুসলিম স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক কীর্তিরাজি দেখে তিনি স্বপ্নাবিষ্ট হয়েছেন। এ গ্রন্থে তাঁর রোমান্টিক মনের বেদনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এ গ্রন্থটির শেষের দিকে ৮টি খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে।

গোলাম হোসেন কবি হিসেবে ছিলেন ক্লাসিকরীতি প্রিয়-মধুসূদন, হে, নবীন ও কায়কোবাদের উত্তর সাধক, কিন্তু তাঁর গদ্যরীতি ছিল অনাড়ম্বর ও প্রাঞ্জল।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী
(১৯০৩-১৯৫৬)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে নোয়াখালীর কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তাঁর অভিভাবকেরা সপরিবারে কুমিল্লার অধিবাসী হন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে কুমিল্লায়। তিনি ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বাংলায় এম.এ.পাশ করেন। পরে বিভিন্ন সরকারী কলেজে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন কালে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠীর সংসর্গে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। সেজন্যে তাঁর প্রবন্ধগুলোতে যুক্তিনিষ্ঠা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এর সঙ্গে ক্লাইভ বেল ও বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রভাবও তাঁর জীবনে পড়েছিল। ক্লাইভ বেলের 'সিভিলিজেশন' বইটির তিনি অনুবাদ করেছিলেন। আর রাসেলকে রসিয়ে রসিয়ে পড়ে আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথম জীবনে পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের এবং পরবর্তী জীবনে এ-দুই মনীষীর চিন্তাধারার ভাব তাঁর সাহিত্য ও মনোজীবন গঠনে সহায়তা করেছে।

মোতাহের হোসেন সাধারণ্যে তেমন পরিচিত ছিলেন না। তার কারণ একে তিনি ছিলেন প্রবন্ধকার, তদুপরি তিনি লিখেছেন কম। তাঁর কোনো লেখা তাঁর জীবদ্দশায়

www.icsbook.info

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কথা' (প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৬৫)তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুদের দ্বারা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সংখ্যায় কম লিখলেও সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর একটি বাণী ছিল তা বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ক্লাইভ বেল, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকের প্রভাবসিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব; তা হচ্ছে সুন্দরভাবে বাঁচবার জন্যে সংস্কৃতি, সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞানের কর্ষণ। আসলে তিনি যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও জীবনরসের রসিক ছিলেন। তার গদ্যরচনা বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন এবং স্মিতরসে স্নিগ্ধ।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
(১৯০৩-১৯৮৭)

"মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন আজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের যে লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও আলাপ আলোচনা করে আসছেন তা উভয় বাংলার গুণীজনের সাধুবাদ অর্জন করেছে। এ বিষয়ে তাঁর একনিষ্ঠতা অনন্যসাধারণ। দেশ বিভাগের পূর্বে যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই লোকসংগীত সংগ্রহে তিনি আত্মনিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁর লোকসাহিত্যের সঞ্চয়নকে 'হারামণি' নামে অভিহিত করেছেন। 'হারামণি' ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'হারামণি'র একটি বৈশিষ্ট্য ইহা শুধু লোকসাহিত্যের নহে, বাঙলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে বঙ্গভাষী জনগণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির একটি রত্নভাণ্ডার।' মনসুর উদ্দীন তাঁর 'হারামণি'র অষ্টম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমার পল্লীগান সংগ্রহ শুরু হয় ১৯২০ কি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে, আমি তখন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী।' প্রথম খণ্ডের আশীর্বচনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৩৪ সালে লিখেছেন, 'বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন মহাশয় বাউল সংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করছেন আমি তাকে অভিনন্দিত করি, সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করে নয়, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব চিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করার এই আশা করে।"

মনসুর উদ্দীন '১লা জুলাই' নামক একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেখানে পাবনার একটি কৃষক পরিবারের 'অনাড়ম্বর' জীবন কথা আছে। 'শিরণী' নামক পাবনার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত তাঁর একটি অনবদ্য গল্প আছে। 'ইরানের কবি' নামক ফার্সী সাহিত্যের একটি বিস্তৃত পরিচিতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৭৫ সালে।"

মনসুরউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি দুইখণ্ডে বাঙালী মুসলিম সাহিত্য সাধকদের সম্পর্কে ইতিহাস রচনা। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' ১ম খণ্ড (১ম সং ১৯৬০) এবং ২য় খণ্ড (১ম সং ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭১, ১৯৬৪) যথাক্রমে মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা। প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ড

www.icsbook.info

অনেক বেশি সুশৃঙ্খল এবং তথ্যপূর্ণ, তবু সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক আলোচনা নয়। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মনসুরউদ্দীনের দ্বিতীয় খণ্ড 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' বৃটিশ আমলের মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান
(১৯০৬-১৯৮২)

"দেশ বিভাগের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পূর্বে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান গল্প লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি শুধু লেখক ছিলেন না, একটি সমৃদ্ধমান মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। পত্রিকাটির নাম 'ছায়াবীথি'। এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল তরুণ মুসলমান সাহিত্যব্রতীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। এই পত্রিকায় প্রথম মোহাম্মদ এনামুল হকের 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকার অফপ্রিন্টগুলো একত্রিত করে পুস্তকাকারে গ্রথিত করা হয়। এনামুল হকের গবেষণা-কর্মের সূত্রপাতে নাজিরুল ইসলামের এই সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে সময় মুসলমানদের গবেষণালব্ধ কর্মের সংখ্যাও ছিল নগণ্য এবং গবেষণাকর্মের প্রকাশের কোনও ক্ষেত্রও ছিল না। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস হচ্ছে দুটি-'জীবনের জয়যাত্রা' ও 'দুর্বিপাক' এবং গল্পগ্রন্থ তিনটি- 'সোনালী স্বপ্ন', 'পয়সা' ও 'স্বর্গীয় পলিটিক্স'। ১৯৫০ সালে তিনি 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' নামে একটি সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশ করেন। সম্ভবত এটাই মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। সুতরাং মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার গৌরব নাজিরুল ইসলামেরই প্রাপ্য। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে নাজিরুল ইসলাম চর্যাগীতিকার ভাষাতাত্ত্বিক কিছু বিবেচনা উপস্থিত করেছিলেন যা পণ্ডিত সমাজে তখন গৃহীত হয়নি। তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে চর্যাগীতিকার ভাষার উৎসমূলে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ভাষার ছাপ আছে। তাঁর এই মন্তব্য প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। দুঃখের বিষয় তাকে তখন এই গ্রন্থের জন্য আক্রমণ করা হয়েছে এবং উপহাসাস্পদ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ৪৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি বিপুলায়তনের ইতিহাস। লেখকের ভাষা সাবলীল এবং সুন্দর। সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বিবেচনাপ্রসূত।"

আবদুল কাদির
(১৯০৬-১৯৮৫)

আবদুল কাদিরের 'কাব্যমালঞ্চের' ভূমিকায় মধ্যযুগ থেকে এ কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যের বিবর্তন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান ধারাবাহিক আলোচনা আছে। এ ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে, তিনি যে-সব আলোচনা করেছেন, তাতে

তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত বোধ-বুদ্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আবদুল কাদিরের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবদুল কাদির কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত আড়াইসিদ্ধ গ্রামে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড, মে ১৯৬৬, ২য় খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৬৭) ও সিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৬৭) প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকেও কিছু গ্রন্থ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

শামসুন নাহার মাহমুদ
(১৯০৯–১৯৬৪)

বেগম রোকেয়া (১৮৮০–১৯৩২) বাঙালী মুসলমান নারীদের মধ্যে যে নবজাগরণের মন্ত্র নিয়ে আসেন, তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য, সমাজকর্ম এবং রাজনীতিতেও তার প্রচণ্ড অভিঘাত লক্ষ করা গেছে।

শামসুন নাহার মাহমুদ এই নারী জাগরণের অন্যতম কর্মী ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে নোয়াখালীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন চট্টগ্রামে, অতঃপর বিলম্বিতভাবে কলকাতা লেডি ব্রেবোর্নে। অতি শৈশবেই শামসুন নাহারের সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ হয়। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পদিত তৎকালীন কিশোর পত্র 'আঙুরে' তাঁর প্রথম রচনা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' (শ্রীগোপাল সান্যাল সম্পাদিত) ও 'নওরোজ' (আফজালুল হক সম্পাদিত) সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শামসুন নাহারের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'পুণ্যময়ী' (১৩৩১) রাবেয়া, ফাতেমা, আয়েশা প্রমুখ প্রাচীন সতী সাধ্বী আটজন মুসলমান রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনের কাহিনী। এ-গ্রন্থে প্রথমে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র একটি প্রশস্তি ও নজরুল ইসলামের একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। রচনাটি লেখিকার অপরিণত বয়সের সৃষ্টি হলেও বেশ সুখপাঠ্য এবং কিশোরীদের উপযোগী। দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩৩৯) নামপত্রে 'ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত' বলে জানানো হয়েছে। অধুনা দুষ্প্রাপ্য কিশোর গ্রন্থ 'ফুল বাগিচা' সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় রচনা। এটি বিভিন্ন মুসলমান দেশের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ও উপদেশাবলীর সংকলন, 'ছেলেমেয়েদের প্রাইজের উপযুক্ত' বলে বিজ্ঞাপিত।

তাঁর অগ্রজ হাবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে কলকাতা থেকে 'বুলবুল' (১৯৩৪–৩৯) সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করার সময় শামসুন নাহার যথার্থ খ্যাতি লাভ করেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। 'বুলবুল' সমসাময়িককালে যথেষ্ট আদৃত ছিল। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে শামসুন নাহারের শ্রেষ্ঠ রচনা 'রোকেয়া জীবনী' প্রকাশিত হলে জীবনীকার এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'রোকেয়া জীবনী' প্রথমে বুলবুলে ধারাবাহিকভাবে বের হতো। তখন থেকেই এটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোকেয়ার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা, তাঁর শিক্ষা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যকর্মের পরিচয় ছাড়াও মুসলিম বাংলার নারী আন্দোলনে রোকেয়ার ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। জীবন-চিত্রণ ত বটেই, উপরন্তু অনুদার সমাজ ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনাও এতে লক্ষ করা যাবে। রোকেয়া যে সব সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন,

www.icsbook.info

লেখিকার নিজের অংশে 'অবরোধের কুলিশ কঠোর মারণ যন্ত্রই' তার উচ্চ শিক্ষার প্রধান বাঁধা ছিল বলে জানিয়েছেন। 'রোকেয়া জীবনী'র গদ্যভঙ্গি সাবলীল, বেগবান এবং শ্রুতিসুখকর।

পরবর্তী রচনা 'বেগম মহল' (১৯৩৮) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের আটজন প্রখ্যাত পাঠান ও মুগল রমণীর জীবন পরিচয়। শিশু শিক্ষামূলক গ্রন্থ 'শিশুর শিক্ষা'য় (১৯৩৯) শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং মাতা—লেখিকার এ তিনটি পরিচয় আমরা পাই। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'আমার দেখা তুরস্ক' (১৯৯৫), ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তান শুভেচ্ছা মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের ফল। সর্বশেষ রচনা 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' (১৯৫৮) কবির সঙ্গে লেখিকার আবাল্য পরিচয় এবং সাহিত্য রচনায় কবির উৎসাহ প্রদানের স্মৃতিকথা। এতদ্‌ব্যতীত 'মহিলা মহল' নামে অন্য একটি প্রবন্ধ সংগ্রহ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে শামসুন নাহার বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মে লিপ্ত ছিলেন। স্বদেশে এবং বিদেশে একাধিকবার তিনি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর জীবন ছিল সমাজকর্মের ও নারী আন্দোলনের। তিনি ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রখ্যাত তুর্কী সাহিত্যিক ও রাজনীতিক খালিদা এদিব হানুমের সংস্পর্শে আসেন। মৃত্যুকালে শামসুন নাহার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্যা ছিলেন।

শামসুন নাহারের রচনাবলীর প্রধান উপজীব্য হচ্ছে শিশু ও নারী। শামসুন নাহারের সাহিত্যস্পৃহার পশ্চাতে একটি সামাজিক দায়িত্ববোধ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। সেটি নারী জাগরণের; শিশুকল্যাণও তার অনুষঙ্গ।

তিনি ১৯৬৪ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের ধারা দ্বিধাবিভক্ত হলো। রাজনৈতিক কারণে সাহিত্যের রূপান্তর ইতিহাসে কোনও নতুন ঘটনা নয়। ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোনও সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই সংশ্লিষ্ট জীবন রূপান্তর লাভ করেছে এবং তার অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি হিসেবে সাহিত্যে এসেছে পরিবর্তন। বলা বাহুল্য যে-সাহিত্য সমাজ-মানসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তার আয়ু সীমিত হতে বাধ্য।

দেশ বিভাগের পর কেবল যে সাহিত্যের ধারাই দ্বিধা-বিভক্ত হলো তা নয়; সাহিত্যের চারিত্র্যেও নতুন লক্ষণ প্রকাশিত হলো। আজাদী লাভের অব্যহিত পরে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে যে সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত হতে হলো তার মধ্যে মোহাজের সমস্যা, অর্থনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং সামগ্রিক অস্থিরতা অন্যতম। জীবনের বহুল আচরিত বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় নতুন করে রঙ দিতে হবে, নতুন চোখে জীবন ও জগতকে দেখতে হবে ; এই নতুনত্ব ও জীবনসঙ্কট উভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ যেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি সংশয়িত হয়েছে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি—জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষ্যকার।

www.icsbook.info

১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধে এবং এর চরম বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই ঘটনার উৎসমুখ সন্ধান করলে আগামীকালের ঐতিহাসিক বিস্মিত হবেন। কেননা কটি ছাত্র আর সাধারণ মানুষের আত্মদানের অমোঘ মন্ত্রে পূর্ব বাংলার সমগ্র অঞ্চলে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষিত হলো। প্রতিটি ছাত্র শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী একযোগে যেন উপলব্ধি করলেন, ভাষার মৃত্যু নেই। এবং মৃত্যু নেই বলেই তার ধ্বংসকে রুখতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে।

সন্দেহ নেই যে রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে জাতীয়তার মন্ত্রে পরিপুষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা কেবল সাহিত্য কর্মের পর্যায়ে থাকে না— জীবন-বেদের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সেজন্যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে অভিনব প্রয়াস সহজেই লক্ষণীয়। দেশীয় জীবনের সমস্যা, দেশজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় যে রসবোধ ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলার সাহিত্যধারার বিভিন্ন শাখায় তার প্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা শিল্পীমানসকে সংশয়িত করেছে, ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে আমরা তার শুধু বিলয়ই দেখি না- দেখি এক নতুন সম্ভাবনা ও স্বপ্নের জগতে বাঙালী সাহিত্যিকদের সগৌরব অভিযাত্রা।

www.icsbook.info

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলকাতা-কেন্দ্রিক নতুন সাহিত্য-জীবন

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়
মধুসূদন দত্ত

সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(১৮১২-১৮৫৯)

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা করে এবং আঠারো শতকে এ শহর অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে ভারতের রাজধানী হবার মর্যাদা পায়। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে কলকাতা সরকারী রাজস্ব বিভাগের কেন্দ্র হয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাকে আমরা সম্পূর্ণ আধুনিক শহররূপে পাই। কলকাতা তখন দেশের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়েছে; সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনেরও উৎসমূল হয়েছে।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা কলকাতাকে দেশের প্রধান শিক্ষা কেন্দ্ররূপে মর্যাদা দিল। উনিশ শতকের সর্বপ্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং সাহিত্য আন্দোলনের কেন্দ্র হল কলকাতা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গ্রাম্য পরিবেশে প্রধানত গ্রাম্য কবিদেরই রচনা। যে সময় এ সাহিত্য রাজ আনুকূল্যে সমৃদ্ধমান হচ্ছিলো তখনও এর মৌলিক গ্রাম্য দেশজভাব নষ্ট হয়নি। কিন্তু উনিশ শতকের নতুন সাহিত্য নাগরিকজনের জন্য লেখা। সাহিত্যিক এবং কবিরাও নাগরিক সংস্কৃতি পুষ্ট ছিলেন। নাগরিক সংস্কৃতি পুষ্ট বলেই উদার এবং প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। পরিমার্জিত রুচি-সঙ্গত সহজ ভাষায় তাঁরা নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন।

নতুন সাহিত্য গড়ে উঠতে লাগলো সমাজ এবং মানবজীবনকে কেন্দ্র করে। পূর্বেকার সাহিত্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের কাহিনী পেয়েছি। নতুন সাহিত্য প্রধানত জীবনমূলক হল কিন্তু ধর্মও যে তার প্রতিপাদ্য রইলোনা তা নয়, কিন্তু তা মনসা-চণ্ডীর সাহিত্য হল, না। গ্রাম থেকে শহরে এলো সাহিত্য এবং এ-কারণে সাহিত্যের কিছুটা সরলতা এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট হল। তবে এর পরিবর্তে সাহিত্যে এল নতুন স্বাদ এবং নতুন কৌতূহল। নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠলো গ্রাম্য জীবনের পূর্বতন সমৃদ্ধিকে ভেঙ্গে দিয়ে, গ্রামের কুটিরশিল্প ভেঙ্গে পড়লো দেশের সমস্ত পুঁজিই জমা হল শহরে।

গ্রামের সামন্ত প্রথা এবং উন্নত কৃষি-জীবনের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ব্যবসায়, চাকুরিজীবী এবং নতুন শ্রেণীর বিত্তশালী মহাজনদের সৃষ্টি হল। নগরে নগরে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলো। বলদৃপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজ আপনাদের 'ভদ্র' নামে আখ্যাত করলো এবং নতুন মধ্যবিত্ত সভ্যতার গোড়াপত্তন করলো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকীরণ -কেন্দ্র কলকাতায় এ-সমাজের প্রতিপত্তি ছিলো যথেষ্ট। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে প্রতীচী আদর্শ দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে এদেশে প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং কিছু পরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। যাই হোক,

www.icsbook.info

১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিককে আমরা পাচ্ছি, তাদের অধিকাংশই ছিলো প্রতিপত্তিসম্পন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত।

মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রত্যক্ষ জাগরণ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে আমরা পাই না। এই সালে নবাব আবদুল লতিফ কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (Mohamedan Literary Society) নামে একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ-সম্পর্কে আমরা বিস্তৃতভাবে পরে আলোচনা করবো।

নতুন আদর্শের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আদর্শের পোষকতা যে না চলছিলো তা নয়। কিন্তু তা প্রাণময় হতে পারেনি, তার কারণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতক্ষেত্র থেকে অবলম্বন করবার মতো কিছু এ-পথের যাত্রীদের ছিলো না। প্রাচীন সাহিত্য আর জাগ্রত ছিলো না, কবি গানের মধ্যেই তার বিমর্ষ পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এ-সময়কার একটি বিশেষ ঘটনা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। তা হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ। শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিলো। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এর সম্পাদক ছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁর সহকারী ছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' এর দ্বারাই বাংলা সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর পূর্বে অবশ্য ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙ্গাল গেজেট' নামক একটি ক্ষণস্থায়ী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো। খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায় হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজের বিরূপ সমালোচনা ছাপা হতো। এর প্রতিবিধানের জন্য রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের চেষ্টায় ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন হালদারের সম্পাদনায় যথাক্রমে 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়।

কলকাতায় নতুন সাহিত্য-জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'সংবাদ প্রভাকর' এর দান যথেষ্ট। একদিন 'প্রভাকর' বাংলা সাহিত্যের দিক-নির্দেশ এবং নীতি নির্ধারণ করতো। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজনৈতিক এবং সমাাজিক ঘটনাকে অবলম্বন করে 'প্রভাকর' এ নতুন নতুন রসপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এ ছাড়া প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং সে সঙ্গে তাদের জীবনী 'প্রভাকর' এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'প্রভাকর' এর অন্য এক কীর্তি হচ্ছে নতুন লেখক সৃষ্টি। বাংলা দেশের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 'প্রভাকর' এ শিক্ষানবীশ ছিলেন। রঙ্গলাল, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রভাকর' এর নিকট বিশেষ ঋণী।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। তিনি তাঁর পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর জন্ম হয় ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২১৮ সালে) কলকাতার নিকটস্থ কাঁচরাপাড়া গ্রামে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁর মাতামহের বাসগৃহে বসতি স্থাপন করেন। সুতরাং শৈশব, কৈশোর এবং ক্রমান্বয়ে জীবনের সমস্ত কাল তিনি কাটিয়েছিলেন কলকাতায় এবং তার আশেপাশে। ঈশ্বরচন্দ্র নাগরিক

www.icsbook.info

সভ্যতায় লালিত-পালিত। নাগরিক জীবনে উল্লাস যেমন থাকে, বিকারও থাকে তেমনি। বরঞ্চ অধিকাংশ সময় বিকারই অধিকতর দৃশ্যমান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন নাগরিক সভ্যতার এ-বিকারকে ব্যঙ্গ করেছেন।

স্কুল কলেজে নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যাচর্চা ঈশ্বরচন্দ্র করেননি; অমনোযোগী এবং অনাবিষ্ট বালক ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বপুরুষদের সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। এ ক্ষমতাকে সম্বল করে বাংলার কাব্য-ক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার তুলনা নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, 'বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই; ইংরেজী শিক্ষা ত হইলই না, বাঙ্গলাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালমধ্যে বাঙ্গালার সুকবি ও সুলেখকরূপে পরিচিত হইলেন।'

ঈশ্বর গুপ্তের কর্মজীবনের পরিচয়সূত্রে আমরা জানতে পারি যে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে তিনি ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১ সালে (১২ই মাঘ, ১২৩৭) 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ২৫ শে মে ১৮৩২ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়। ১৮৩৬ সালে পত্রিকাটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৩৯ সালে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ-প্রসাদ মল্লিকের সাপ্তাহিক 'সংবাদ রত্নাবলী'র সম্পাদকও তিনি ছিলেন। 'রত্নাবলী' প্রকাশের তারিখ ১৮৩২ সালের ২৪শে জুলাই। ১৮৪৬ সালে 'প্রভাকর' প্রেস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রকাশ করেন। 'পাষণ্ড পীড়ন' অল্পকাল পরেই বন্ধ হয় এবং তার স্থান অধিকার করে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'।

সাময়িক ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গ রসাশ্রিত যথেষ্ট চটুল কবিতা তিনি লিখেছেন। তাছাড়া নৈতিকতা, দেশপ্রেম, সমাজ-সেবা ইত্যাদি বিষয়ের তাঁর অনেক কবিতা আছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। 'কিন্তু এ সমস্ত কবিতা সাংবাদিকতার উর্ধ্বে ওঠেনি। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাংবাদিক, কার্যক্ষেত্রে ও তাই। অনুপ্রাস, যমকালংকার ইত্যাদির প্রয়োগে তাঁর আদর্শ ছিলো ভারতচন্দ্র, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো সুচারু শিল্পী তিনি ছিলেন না। গ্রাম্য পাঁচালী এবং শহুরে কবিগান থেকে প্রধানত ঈশ্বর গুপ্ত আপন বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পরিহাস রসিকতা গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা, যুবা বয়সে তিনি 'খেউড়' ও 'হাফ আখড়াইতে' যোগ দিতেন।

বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে সমাজ-সচেতনতায়, প্রতিদিনকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা সমৃদ্ধি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশের মধ্যে, শব্দ ব্যবহারের বিচিত্র কৌশলের মধ্যে এবং মাতৃভূমি প্রীতিতে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে এ সমস্ত কিছুই অল্প বিস্তর আমরা পাই।

কবিতায় কথ্যবাচনভঙ্গির প্রয়োগ এবং প্রতিদিনের বাক্যালাপকে কবিতায় গ্রহণ করবার প্রথম সার্থক চেষ্টা আমরা ভারতচন্দ্রের রচনায় দেখি। ভারতচন্দ্র প্রবাদ বাক্য, সুভাষণ, কুশলী বাক্ চাতুর্য—নাগরিক জীবনের সকল সময়ের সংলাপ থেকে এ সমস্ত আহরণ করেছিলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে কবিতায় প্রয়োগ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে কৌশলের প্রথম সূত্রপাত, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে তারই বিস্তারিত পরীক্ষা আমরা

www.icsbook.info

লক্ষ করি। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার এ-ভাষা অসাধারণ ক্ষমতায় সবল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ভাষার শব্দে অর্থ আছে আবার ধ্বনি আছে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রাকৃত বাংলা শব্দের ধ্বনি নিয়ে শিল্প রচনা করেছেন, যার ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণের সহজ ভাষায় তার সমস্ত বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য লক্ষযোগ্যঃ

"ব্যঙ্গ কবিতায় এ-ভাষার জোর কত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলছেন—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিঙ বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভূষি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।"

ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাসের বিষয় ছিলো সাধারণত সমসাময়িক সমাজ। বিশেষ করে সমাজে যে নতুন রীতিনীতির আমদানি হত তাকে তিনি নির্বিচারে ব্যঙ্গ করেছেন। পাশ্চাত্য আদর্শের বিকৃত অনুসরণকে তিনি এদেশের জন্য গ্লানিকর মনে করেছেন। এ আদর্শকে তিনি পরিহাস করেছেন সত্য, কিন্তু সে পরিহাস অনেকটা উচ্চহাস্যের মতো। এর পশ্চাতে অস্বীকার করবার প্রবণতা ছিলো না। তিনি যুগের গতিধারার বিরুদ্ধতা করেননি, কিন্তু নির্বিকার ঔদাসীন্যেও তাকে গ্রহণ করেননি। তাঁর পরিহাসে এটাই স্পষ্ট হয় যে, এ নতুন সংস্কৃতি তাঁর রুচিসম্মত নয়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ যে এটাকে অবলম্বন করবেই তাও তিনি জানতেন। এ-কারণেই তাঁর পরিহাসে বিদ্বেষ নেই, কারো প্রতি কোনো প্রকার অনিষ্ট কামনা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এসে বলেছেন 'ঘোর ইয়ারকি'। এ-পরিহাস নিছক রঙ্গ-কৌতুক এবং আনন্দ। গভর্ণর জেনারেল, লেফটেনেন্ট, গভর্ণর কাউন্সিলের মেম্বার থেকে মুটে, মাঝি উড়ে বেহারা সবাইকে তিনি ঠাট্টা করেছেন। এ-ধরনের ব্যঙ্গ-পরিহাসের দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তকে উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইংরেজী 'নববর্ষ' কবিতায় আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করে বলছেন যে, অর্থসংগতি নেই অথচ সাহেব সাজবার চেষ্টা আছে পুরোপুরি। এ সাহেব সাজা যে কতটা ন্যক্কারজনক ও হাস্যকর, কবি তা নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছেন—

'যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টপে, চ্যাপেলেতে যাব।।
বাঁকা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা।
পাতরে খাবনা ভাত গোটুহেল কাল।
হোটেলে টোটেলে নানা সে বরণ ভাল।
পুরিবে সকল আশা ভেবনারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিবনা ক্ষোভ।

www.icsbook.info

অন্য এক কবিতায় বলেছেন হুজুগে পড়ে বাইরে এরা সাহেব সাজছেন আবার রাতের বেলা আপন দীনতার কথা ভেবে গোপনে ক্রন্দন করছেনঃ

'এদিকে দুঃখের দায়ে মনে ঝোলে ফাঁসি।
বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি।
ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাথা।
তাই পরে বাবু হন খালি করে মাথা।
ভাঙা এক টেবিলেতে ডিস্ সাজাইয়া।
ইশু ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া।
মনে মনে খেদ বড় কান্না হয় রেতে।
পরামান্ন পিঠাপুলি নাহি পান খেতে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্তুতি করে যারা আপন জীবনকে চরিতার্থ করতে চায় তাদের তিনি বিদ্রূপ করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃভূমি-প্রীতির পরিচয় 'স্বদেশ' কবিতাটিতে পাওয়া যায়-

'জাননা কি জীব তুমি জননী জনমভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমিতে করিয়া বাস ঘুমেতে পুরাও আশ
জাগিলেনা দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহরি॥
যা'র বলে বলিতেছ যা'র বলে চলিতেছ,
যা'র বলে চালিতেছ দেহ।
যা'র বলে তুমি বলী তা'র বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥

ঈশ্বর গুপ্ত একই সঙ্গে গদ্যে এবং কবিতায় তিনটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'প্রবোধ প্রভাকর' প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালে, 'হিত-প্রভাকর' ১৮৬০ সালে এবং 'বোধেন্দুবিকাশ' ১৮৯৩ সালে। শেষের দুটি গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থে পিতা-পুত্রের সংলাপের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে আনন্দলাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির কৌশল বর্ণিত হয়েছে। 'হিত-প্রভাকর' গ্রন্থ সংস্কৃত 'হিতোপদেশে'র অনুসরণে। 'বোধেন্দুবিকাশ' ছয় অঙ্কে সমাপ্ত একটি তত্ত্বমূলক নাটক। নাটকটি কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুকরণ মাত্র। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মানুষের যে সংগ্রাম তাই এ-নাটকের বিষয়বস্তু। নিম্নে 'বোধেন্দুবিকাশে'র পদ্যাংশ থেকে একটি নমুনা দেওয়া হল

'হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরেনি'?
এত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনও এদের ঘরে-যম এসে ধরেনি'?

www.icsbook.info

এই সব জামাজোড়া, এই সব গাড়ীঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া–চোরে কেন হরেনি'?
আরে ওরে ভাগ্যবান, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান–লক্ষ্মী আজো সরেনি'?
মর এটা যেন হাতি, দশহাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি–জ্বরে কেন জ্বরেনি'?
হ্যাদে মাগী কালামুখী, ঠিক যেন কচি খুকী
পতিসুখে বড় সুখী–ঠেকি কেন পারেনি'?
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ি, পরেছে সোনার চুড়ী,
বেঁকে চলে মেরে তুরি–কুল তবু ঝরেনি।
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে
এখনো এদের ভিটে–ঘুঘু কেন চরেনি।'

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সংযোগ ক্ষেত্রে। মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের প্রথম প্রধান প্রতিনিধি মাইকেল মধুসূদন—এ উভয়ের মাঝখানে আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে পাই। কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি তিনি, আবার আধুনিকতাও তাঁর মধ্যে নেই এমন কথা বলা চলে না। সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিলো, কেননা তিনি সংবাদপত্রসেবী ছিলেন।

তাঁর স্বদেশপ্রীতি বিষয়ক কবিতা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন। পরবর্তীকালে অনেক কবির মনে তা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। যে সময় বাঙালী যুবা-সম্প্রদায় দেশজ সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে, আপন ভিত্তিমূল হারিয়ে ফেলেছিলো, ঠিক সে সময়েই ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাদেরকে সচকিত করেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ভাবালুতা মাত্র ছিল বললে অন্যায় হবে।

যে সমস্ত তরুণ লেখক ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে 'সংবাদ প্রভাকর' এবং মাসিক 'প্রভাকর' অবলম্বনে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় তাঁদেরই একজন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮২৭-১৮৮৭)

রঙ্গলাল ইংরেজী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের রসে বাংলা কাব্যকে সঞ্জীবিত করবার প্রয়াস তিনি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু চিন্তা এবং ভাবকল্পনায় তিনি ছিলেন সম্পূণরূপে অনাধুনিক। উনিশ শতকের নতুন শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিলো না। তার পরিবর্তে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন। অবশ্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য কিভাবে সম্ভবপর সে বিচার তিনি করেননি। ঈশ্বর গুপ্ত যুগ স্রোতের বিরুদ্ধে যাননি, স্রোতে প্রবহমান থেকেই পরিহাস রসিকতার মধ্য দিয়ে তার স্বরূপকে উদঘাটন করতে চেয়েছেন। রঙ্গলাল এর বিপরীত। তিনি প্রাচীন ভারতকে অবলম্বন করতে চাইলেন প্রত্যক্ষে যার স্বরূপের কোনো নিদর্শন ছিলো না।

www.icsbook.info

'কর্মদেবী'র প্রথম সর্গে তিনি বলেছেন–

'হায় কোথা সেই দিন ভেবে হয় তনু ক্ষীণ
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ-শূন্য কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ-জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণধনে ঘোর অভিমানী॥"

এ উক্তিতে রঙ্গলালের মনোভাবের পরিচয় খুবই স্পষ্ট। জীবনে কয়েকটি বিশিষ্ট আদর্শকে তিনি কাম্য মনে করেছেন; যেমন-সত্যবোধ, পৌরুষ, পাপপূণ্যের ভেদজ্ঞান এবং সরলতা। সমাজে ক্রমান্বয়ে যে পরিবর্তন দেখা গেল মানুষের বেশভূষায়, বিদেশী ভাষা শিক্ষায়, ধর্মকে যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করবার চেষ্টা এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির আনন্দে, রঙ্গলাল তাকে ভেবেছেন প্রাচীন আদর্শকে অস্বীকার করবার প্রবণতা। এ উক্তিতে আমরা আরও লক্ষ করি যে রঙ্গলাল আদর্শবাদী কবি। আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছে।

রঙ্গলাল ইংরেজ কবি টমাস মুর ও স্যার ওয়াল্টার স্কটের অনুকরণে দেশাত্মবোধসূচক কাব্য রচনা করেন। দেশাত্মবোধ তাঁর কাব্যের বিষয় বা উপাদান মাত্র; এর পশ্চাতে কোনো সত্যিকার বেদনাবোধ বা গভীর উপলব্ধির পরিচয় নেই। তার প্রমাণ এই যে, রঙ্গলালের কাব্যে ইংরেজ শাসকদের প্রতি প্রশস্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের প্রতি বিরূপতার পরিচয় আছে। তিনি মুসলমানকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সংগ্রামের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এভাবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে আপন ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিন্দুরা প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে। রঙ্গলালের কল্পনায় হিন্দু জাতীয়তার উন্মেষ হচ্ছে মুসলমানদের প্রতি বিরূপতা এবং বিরুদ্ধতার মধ্যে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে রঙ্গলালের জাতীয়তা গোত্রপ্রীতির নামান্তর মাত্র। যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রঙ্গলালের জাতীয়তার আদর্শ বহন করে তার সমাপ্তি হয়েছে ইংরেজ প্রশস্তিতে–

'ভারতের ভাগ্যজোর দুঃখ বিভাবরী ঘোর
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার।'

এ প্রশস্তি 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়'- এ উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। এভাবে উনিশ শতকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ দেখছি।

www.icsbook.info

রঙ্গলাল টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত রাজপুতনার অলীক ঘটনা, কিংবদন্তি ও কিছুটা সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত উপাখ্যান অবলম্বনে 'পদ্মিনী, 'কর্মদেবী' ও 'সুরসুন্দরী'-এ-তিনটি কাব্য-কাহিনী নির্মাণ করেছেন। উদ্দেশ্য যাতে রাজপুতদের 'বীরত্ব, ধার্মিকত্ব' প্রভৃতি গুণে বিদেশী শিক্ষায় বিভ্রান্ত আধুনিক হিন্দু যুবকেরা গুণান্বিত হয়। তারা যেন রাজপুতদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী ও চিতোরের রাণী 'পদ্মিনী'র কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। স্কটের 'লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেলের' পদ্ধতি অনুসরণ করে রঙ্গলাল চারণের মুখে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। 'কাঞ্চী-কাবেরী' উড়িষ্যার ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত একটি রোমান্টিক কাহিনী। কাব্যটি উড়িয়া ভাষা থেকে অনূদিত।

রঙ্গলাল কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন (১৮৭২)। রঙ্গলালের পূর্বে এ-কাব্যের দুজন অনুবাদকের সন্ধান আমরা পাই-হারিমোহন কর্মকার (১৮৫৮) এবং প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৬১)। 'মনোজ্ঞ হিতকথা' প্রচারের উদ্দেশ্যে রঙ্গলাল সংস্কৃত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাস ও কাব্য থেকে অনেকগুলো নীতি-কথার অনুবাদ করেছিলেন 'নীতি কুসুমাঞ্জলি' নামে।

রঙ্গলালের 'বাঙ্গলা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম তুলনামূলক কাব্য সমালোচনা। অবশ্য এখানে যথার্থ কাব্য-বিচার নেই। কবি ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বাংলা কাব্যের অশ্লীলতা দোষকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন।

রঙ্গলালের জীবনকাল ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(১৮২৪-১৮৭৩)

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। একই বছরে প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা।' প্রাচীন ধারার সর্বশেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ সালে। এ বছরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমা' কাব্য প্রকাশিত হয়। 'তিলোত্তমা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যে নতুন যুগের সূচনা হল, যেমন গদ্যে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিলো। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের পূর্ণ উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের এ-নতুন অধ্যায়, যখন আরম্ভ হয়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন অধ্যায়েরও সূচনা তখনই। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে 'কুইনস্ প্রোক্লামেশন' (Queen's Proclamation) বলে খ্যাত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে পাক-ভারতের শাসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সত্যিকার বিপ্লবী কবি। অসাধারণ চাঞ্চল্যে এবং জীবন-সচেতনতায় বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন প্রাণময়তা এবং সজীবতার সঞ্চার করেন। রচনা-ভঙ্গিতে এবং বক্তব্যে এবং জীবনবোধের সমন্বয়ে আশ্চর্য শিল্প-কুশলতায় তিনি আমাদের সাহিত্যের গতি পরিবর্তন করেন এবং তার

www.icsbook.info

পরিসর বিস্তারিত করেন। তিনি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেটের প্রবর্তন করেন, বাংলার প্রথম আধুনিক কমেডী ও ট্র্যাজেডীর স্রষ্টাও তিনি। তাঁর 'মেঘনাদবধ-কাব্য' আমাদের সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। মধুসূদনের মধ্যেই বিদেশী সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম নতুন সজীবতায় স্ফূর্তি পায়। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারত থেকে তিনি উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সত্য কিন্তু কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র-সৃষ্টি এবং শব্দ প্রয়োগের কৌশল ও চাতুর্য তিনি শিখেছেন হোমার-ভার্জিল-দান্তে-মিল্টন থেকে। বিদেশী প্রভাব বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ উদ্দীপনা, প্রাণময়তা, দীপ্তি, চাঞ্চল্য সমস্ত কিছুই মাইকেলের কাব্যে এবং জীবনে আমরা পাই। মাইকেলের কাব্য তাঁর জীবন থেকে পৃথক নয়, কিন্তু বিদেশী প্রভাবে তাঁর কাব্য যেখানে উচ্চকিত হয়েছে প্রাণের প্রাচুর্যে, তাঁর জীবন সেখানে নিঃশেষ হয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতায়। বিদেশী জীবন ও সংস্কৃতিকে তিনি আপন জীবনে গ্রহণ করেছিলেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে। শৈশব থেকেই দেশজ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা এবং বিরূপতা ছিলো। এ ঘৃণার প্রকাশ্য পরিচয়স্বরূপ পাই তাঁর হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ এবং খ্রীস্টান ধর্ম অবলম্বন, ইংরেজ রমণীর পাণি গ্রহণ এবং ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনার প্রয়াস। ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনার অসার্থকতা-নিবন্ধন বাধ্য হয়ে মাতৃভাষা তাঁকে অবলম্বন করতে হয়। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর।

মধুসূদনের জীবনে শান্তি ও সুখভোগ ছিলো না। উচ্চাশা এবং বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই মূলত তাঁর সর্বনাশের জন্য দায়ী। তিনি ছিলেন যশোরের সাগরদাঁড়ী গ্রামের এক ধনী আইনজীবীর পুত্র। কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রাম। এ নদী সম্পকে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন–"দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে!" শৈশবে গৃহে মাতৃভাষা ও ফারসী ভাষা চর্চার পর খিদিরপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৩৭ সালে খিদিরপুর বিদ্যালয়ের পাঠচর্চা শেষ করে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে তাঁর শিক্ষাকাল ছয়' বছর। এখানে পাঠকালে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। এ আকর্ষণ শেষে তীব্র উন্মাদনায় পরিণত হয়। ইংরেজীতে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং ইংল্যাণ্ডে যাবার জন্য ব্যাকুল হন। সতেরো বছর বয়সে লেখা এক ইংরেজী কবিতায় এ-ব্যাকুলতার পরিচয় আছে-

"I sigh for Albion's distant shore,
Its villages green, its mountains high;
Tho' friends, relations I have none
In that fair clime, yet oh' I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave."

মাইকেলের উচ্চাশার অন্ত ছিলনা। বালক বয়সেই Blackwood's Magazine এবং Bentley's Miscellaney-তে ইংরেজী কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করেন। এ বয়সে বায়রণ ছিল তাঁর প্রিয় কবি। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাধকদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মালো। তিনি ক্রমান্বয়ে হোমার, ওভিদ, দান্তে, টাসো এবং মিল্টনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। বায়রণ নেপথ্যে গেলেন।

www.icsbook.info

খ্রীস্টান হবার পর তিনি বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তো পূর্বেই ছিলো, এবার তা তীব্রতর হলো। কলেজে অধ্যয়নকালে ন্যূনধিক বারোটি ভাষা আয়ত্ত করেন- বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, ল্যাটিন, গ্রীক, হীব্রু, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান।

খ্রীস্টান হলেন বলে পিতা তাঁর অর্থ সাহায্য বন্ধ করলেন। মধুসূদন তখন ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ যান। স্থানীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি একটি স্কুলে ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে সেখানকার বিবিধ ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে কিছু অর্থোপার্জন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু খ্যাতিও লাভ হয়। এ সময়ে তিনি অনবরত ইংরেজী কবিতা লিখেছেন। টিমোথি পেনপোয়েম (Timothy Penpoem) ছদ্মনামে তাঁর অনেক কবিতা মাদ্রাজ সার্কুলার (Madras Circular), স্পেক্‌টেটর (Spectator) ইতাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুদিন মাদ্রাজের 'হিন্দু ক্রোনিকল' (Hindu Chronicle) পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৫২ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাদ্রাজে আসবার পরের বছর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে মধুসূদনের 'Captive Lady' প্রকাশিত হয়। উক্ত কাব্যের সঙ্গে 'The Visions of the Past' নামক একটি অসম্পূর্ণ কবিতাও প্রকাশিত হয়। এ সময় সম্রাট ইলতুৎমিস-এর দুহিতা রিজিয়াকে নায়িকা করে 'Rizia' নামে একখানি নাট্য-কবিতা রচনা করেন। এ সময় তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিস নাম্নী এক ইংরেজ মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ দিয়ে তাঁর পক্ষে সুখের হয়নি। ইংরেজী কাব্য রচনায় মধুসূদনের খ্যাতি বিশেষ হল না। স্বদেশবাসীর কাছে গৌরবের বিষয় হলেও ইংরেজী সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিতে 'ক্যাপটিভ লেডী' উচ্চ শেণীর গ্রন্থ নয়। মধুসূদন এক খণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডী' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বীটনকে উপহার দিয়েছিলেন। বীটন মধুসূদনের প্রতিভার প্রশংসা করেন, কিন্তু উপদেশ দেন যে মধুসূদন যদি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে চান তবে তার কর্তব্য হবে মাতৃভাষার চর্চা করা। গৌরদাস বসাককে লিখিত এক পত্রে তিনি এ-উক্তি করেছিলেন ঃ

"But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write."

(যোগীন্দ্রনাথ বসু ঃ জীবন চরিত, ৪র্থ সং)

মধুসূদনের পিতার মৃত্যু হয় ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে। তখন মধুসূদনকে বাধ্য হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সে বছরই তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন এবং হেনরিয়েটা নাম্নী জনৈকা ফরাসী মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুখে-দুঃখে সর্বমুহূর্তে মধুসূদনের সহচরী ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী মধুসূদন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র কিশোরী চাঁদ মিত্রের পুলিশ আফিসে। মধুসূদন সেখানে জুডিশিয়াল ক্লার্ক ছিলেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি পুলিশ কোর্টে দোভাষী পদে নিযুক্ত হন।

www.icsbook.info

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ঘটে আকস্মিকভাবে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে সখের নাট্যশালা ছিলো। তাঁর রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক যখন অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তখন মধুসূদনকে 'রত্নাবলীর' ইংরেজী তর্জমা করতে বলা হয়। উদ্দেশ্য, অভিনয়ের দিনে আহূত ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করা। মধুসূদনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদনের মনে নাটক লিখবার সংকল্প জাগে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধরীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতিতে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করলেন। ১৮৫৮ সালে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হল, এবং পরের বছর বেলগাছিয়া নাট্য মঞ্চেই অভিনীত হল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে থেকেই মধুসূদনের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত। এ সময় বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সংস্কার এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পরীক্ষা এবং সম্ভাবনার সূচনা হল। মধুসূদন আরও নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। একটি গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করে 'পদ্মাবতী' রচিত হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। নাটকে গ্রীক দেবদেবীর পরিবর্তে হিন্দু দেবদেবী বসানো হয়েছে, কিন্তু কোথাও মূল কাহিনীর সৌন্দর্য খর্ব হয়নি; বরঞ্চ নতুন আধারে তা নতুনভাবে দ্যুতিমান হয়েছে। এর পর মধুসূদন দুটি সামাজিক প্রহসন রচনা করেন- 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকদের বিপথগমনের চিত্র এঁকেছেন প্রথমটিতে; দ্বিতীয়টিতে তথাকথিত আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের প্রতি শ্লেষ আছে। এ নাটক দুটিতে মধুসূদনের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় আছে। সংলাপ রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা এবং সজাগ অনুভূতির পরিচয় মধুসূদন এ নাটক দুটিতে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী' ও 'শর্মিষ্ঠা'র ভাষা শ্লথ ও আড়ষ্ট কিন্তু প্রহসন দুটি সমাজনির্ভরতার জন্যই সমসাময়িক কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করেছে।

এরপর মধুসূদন আপন ক্ষমতা সম্পর্কে সজ্ঞান হলেন। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ-পরিপণতিরূপে আমরা 'মেঘনাদবধ-কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা'কে পাচ্ছি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমা'র অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের বছর ইংরেজী ১৮৫৯ সালে। একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করে কাব্যটি লেখা। গল্পটি এই-সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই অসুর ভ্রাতাদের সঙ্গ যুদ্ধে দেবতারা পরাভূত হয়েছেন। স্বর্গচ্যুত দেবতারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অসুরদের সঙ্গে জয়ী হতে পারবেন না জেনে ব্রহ্মার সহায়তায় অপরূপ লাবণ্যবতী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে বিন্ধ্য-কাননে রেখে আসেন। সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়েই তিলোত্তমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে। দেবতারা আবার স্বর্গ অধিকার করেন। গল্পটি পৌরাণিক বটে কিন্তু ঘটনা-সংস্থানের কৌশল এবং চরিত্র পরিকল্পনা ইউরোপীয়। কীটস্ -এর Hyperion-এর অনুসরণে মধুসূদন পরাজিত দেবতাদের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু Hyperion-এর প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় 'তিলোত্তমা'য় নেই। ইংরেজী কাব্যে নিবিড় অন্ধকারে পরাজিত দেব-চিত্র অন্ধকারের মতই ভয়াবহ, নিশ্চিন্ত এবং আয়ত্তের অতীত। 'তিলোত্তমা'র লক্ষযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নতুন ছন্দ এবং শব্দ-ব্যবহারে পরীক্ষা। মাইকেল জানতেন যে এ গ্রন্থে মানবীয় বোধের পরিচর্যা ঘটেনি। কিন্তু তবুও নতুন ছন্দ এবং শব্দ-ব্যবহারের কৌশলের দিক থেকে বিচার করে এ কথা বলা চলে যে, 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এতদিন বাংলা কাব্যে ছিলো

www.icsbook.info

পয়ার ও ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণ। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের মধুসূদন পুরানো পয়ারকে অবলম্বন করেই তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত করলেন। চার সর্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে।

ইংরেজী Blank Verse -এর মূল হচ্ছে পঞ্চপার্বিক আয়ামবিক (Iambic)। ইংরেজী ছন্দ সিলেবিক (Syllabic) বা স্বরমাত্রিক হওয়ায়, পর্ব–বিভাগের সময় দুই বা ততোধিক সিলেবলের কোনো শব্দের এক বা দুই সিলেবল এক পর্বে এবং অবশিষ্টাংশ অন্য পর্বে পড়ে। এ-কারণে কবিতা পাঠকালে কণ্ঠযতি সর্বত্র ছন্দ-যতিকে অনুসরণ করে না। এ সুবিধা থাকায় আয়ামবিক ছন্দ ব্লাঙ্ক ভার্সের গদ্যভঙ্গিতে সহজে রূপান্তরিত হতে পেয়েছে। বাংলা পয়ারে স্পষ্টত এ সুবিধাটা ছিলো না। মধুসূদনের পূর্বেকার সকল কবিরাই ছন্দযতি এবং কণ্ঠ-বিরতি একই স্থানে রেখেছেন। উপরন্তু পয়ার বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। মধুসূদনের ক্ষমতা অসাধারণ এ কারণে যে, তিনি পয়ারের মতো ঢিমে-তালের গতানুগতিক ছন্দের মধ্যেও আশ্চর্য সম্ভাবনা আবিষ্কার করলেন। অমিত্রাক্ষর, চরণান্তের মিলকেই কেবল রহিত করলো না, উপরন্তু যতি বিন্যাসের বৈচিত্র্য এনে ছন্দকে অর্থের এবং কণ্ঠধ্বনির অনুগামী করলো। ইংরেজী কাব্যে 'ব্লাঙ্ক্ ভার্স' উদ্ভাবনার যে কৃতিত্ব মার্লোর, বাংলা কাব্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব তারও অধিক। মার্লো 'ব্লাঙ্ক ভার্সে'র পূর্ণ-রূপ দিতে পারেননি, মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে অমিত্রাক্ষরের পূর্ণতা দিয়েছেন। মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকেই প্রথম গদ্যের মধ্যে কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর পয়ারের প্রবর্তন করেন। সেখানে চরণান্তের মিলটাই শুধু রহিত হয়েছে অন্য কোনো পরিবর্তন আসেনি।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'মেঘনাদবধকাব্য' ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মেঘনাদবধকাব্য' গ্রীক আদর্শে রচিত মহাকাব্য। গ্রীক কাব্যের সৌন্দর্য এবং অসাধারণ দীপ্তিকে মধুসূদন সম্পদ করলেন বাংলা ভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে মধুসূদনের ঋণ উপাখ্যানগত কিন্তু গ্রীক সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে তার ঋণ স্টাইল বা রচনাশৈলীগত। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের নির্দেশমত মহাকাব্য মধুসূদন লেখেননি, তিনি মহাকাব্যের প্রাণধর্মকে পেতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের অস্থি-সংস্থানের নির্দেশ আছে, যেমন সর্গ কয়টি হবে, নায়ক কোন বংশের হবেন, বিষয়বস্তু কি হবে, বর্ণনা থাকবে কিসের ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীক অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের প্রাণধর্মের ইঙ্গিত আছে, যেমন ছন্দ ও ভাষা হবে বিষয়বস্তুর অনুগামী এবং সে বিষয়বস্তু হবে বিপুল, ব্যাপক, গভীর এবং উদাত্ত। মহাকাব্যে কবি অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে মানব-ভাগ্যের চিত্র অঙ্কন করবেন।

'মেঘনাদবধকাব্যে' আমরা মানব-জীবনের বিশিষ্ট কোনো একটি দিকের পরিচর্যা পাই না, কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কর্মচঞ্চল অবস্থায় দেখি। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, কবির জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা। গ্যেটে 'ফাউস্ট' সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, 'ফাউস্ট' নাটকে তাঁর বেদনার বাণী অপরিচিত ক্ষেত্র থেকে প্রশংসা এনেছে এবং সে প্রশংসা তাঁকে ভীতিবিহ্বল করেছে। তাঁর স্নায়ুতে কম্পন লেগেছে এবং তিনি ক্রন্দন করেছেন। নতুন প্রাণোন্মাদনায় মাইকেলের স্নায়ুতেও কম্পন জেগেছিলো। জীবনের জটিলতা তাঁকে জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার সুযোগ দিয়েছে। বিতৃষ্ণা, বেদনা, অশেষ আশা, লাঞ্ছনা, নিষ্ফলতা, সংশয় এবং দ্বন্দ্ব এ কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে।

www.icsbook.info

'মেঘনাদবধকাব্যে'র বিভিন্ন অধ্যায়ে মহৎ কাব্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। প্রথম সর্গে সমুদ্রকে লক্ষ করে বীরকুলর্ষভ রাবণ অভিমান এবং আক্ষেপ প্রকাশের মধ্যে জীবনের ক্ষণকালীন বৈকল্যের পরিচয় যেমন দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তি এবং অপবাদ দূরীকরণার্থে আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেদনের মধ্যে জীবনের পূর্ণতার পরিচয়ও দিচ্ছে। যে সমস্ত উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে এ-পূর্ণতার পরিচয় পাচ্ছি, তাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য, গতি এবং বলিষ্ঠতা মূর্ত হয়েছে। প্রথম সর্গের অন্যত্র বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদে রাবণের খেদোক্তি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। শক্তিধর নায়ক আপন সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু সর্বনাশকে রোধ করবার সামর্থ্য তার নেই। সম্ভাব্য প্রলয়ের সম্মুখীন হয়েও সে অকম্পিত পদে মৃত্তিকার ওপর দণ্ডায়মান থাকতে চায়। এভাবেই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' আমরা জীবনের প্রকাশ দেখি দ্বন্দ্বের মধ্যে, সর্বনাশের মধ্যে এবং কোলাহল ও আবর্তকে অবলম্বন করে সর্বশেষ বিলয়ের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর উৎকণ্ঠা এবং অপ্রমেয় আশা রাম-রাবণের সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠেছে। একথা বলা চলে যে মধুসূদন জাতির পূর্ণসচেতন মুহূর্তে বর্তমান ছিলেন, যে মুহূর্তে জাতির মানস-বিকাশ ঘটে, সে মুহূর্তকে তিনি রূপ দিয়েছেন। মানব-অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি যে-কোনো যুগে অতি অল্পসংখ্যক লোকের কাছেই ধরা পড়ে, মধুসূদন সে অল্পসংখ্যকদেরই একজন।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে' হোমারের 'ওডিসি' এবং 'ইলিয়াদ', ভার্জিলের 'ইনিদ', দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' এবং মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রভাব আছে। এ প্রভাবটি তিন প্রকারের। প্রথমত, ঘটনা বা কাহিনীগত; দ্বিতীয়ত, ভাষা বা শব্দব্যবহারগত এবং তৃতীয়ত, আদর্শগত।

ঘটনার দিক থেকে যে কয়টি প্রধান মিল বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পাচ্ছি তা হচ্ছে এই, দ্বিতীয় সর্গে যেখানে 'রক্ষ-কুল-রাজলক্ষ্মী' অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় রামের জয় এবং রাবণের পরাজয় কামনা করেছেন, সে অংশের সঙ্গে ওডিসির প্রথম পুস্তকের মিল আছে যেখানে দেবী এথেনে টেলিমেকাসের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পঞ্চম সর্গে মায়া দেবী স্বপন দেবীকে নির্দেশ দিচেছন ঘুমন্ত লক্ষ্মণের কাছে যেতে। ইলিয়াদের দ্বিতীয় পুস্তকে জিউস স্বপ্নকে নির্দেশ দিচ্ছেন আগামেম্‌ননের কাছে যেতে। অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেকটা স্থূলভাবে রূপ পেয়েছে। এখানে একই সঙ্গে দান্তে, হোমার এবং ভার্জিলের অনুকরণ দেখি; মধুসূদন নিজে অবশ্য শুধু ভার্জিলের 'ইনিদের' কথাই লিখেছেন, কিন্তু আমরা ওডিসির একাদশ পুস্তকের প্রভাবটিই বেশী দেখি। রাম নরকে যাচ্ছেন তাঁর পিতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেমন ইনিদ পাতালে গিয়েছিলেন তাঁর পিতা এ্যানকিশিসের আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অথবা যেমন ওডিসি তার মাতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন চিরনিশাবৃত মৃত্যুর দেশে। 'মেঘনাদবধের' আরম্ভের দেব-বন্দনা ইনিদের দেব-বন্দনার মতো।

ভাষা বা শব্দ ব্যবহারের দিকে থেকে বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে, মধুসূদন বিদেশী ক্লাসিক্যাল ভঙ্গিকে আয়ত্ত করে বাংলা কাব্যকে তার গতানুগতিক বিমর্ষ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে জীবনরসে পরিপূর্ণ করেন। বিশেষণ এবং উপমা প্রয়োগের মধ্যেই মধুসূদনের এ প্রগাঢ় উপলব্ধির পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর কল্পনা এবং বোধের মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি-

www.icsbook.info

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী, সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষ কুল-বধূ।"

অথবা- "যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশদিক; দেখিলে সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধুম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে।"

অথবা- "অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ; সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে।"

প্রথম উদ্ধৃতিতে প্রমীলা আপন লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সর্ব প্রকার বাধাকে উন্মূল করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিচ্ছে। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে রামচন্দ্রের আক্রমণকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে বৃষস্কন্ধে ব্যাঘ্রের আক্রমণের সঙ্গে তার তুলনা করে। উপমানে অর্থের জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় না, কবি সর্বপ্রকারে উপমাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রকৃতির নাটকীয় গতিময় উপমা সর্বপ্রথম হোমার ব্যবহার করেছিলেন বলে এস 'হোমারিক সিমিলি' (Homeric similie) বলা হয়। উপমার ক্ষেত্রে মধুসূদন যে হোমারকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন তার প্রমাণ পাই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' প্রচুর পরিমাণে সিংহ বা ব্যাঘ্রের এবং অগ্নির উপমা প্রয়োগের মধ্যে। 'ইলিয়াদ' এবং 'ওডিসি'র প্রধান প্রধান উপমাই হচ্ছে সিংহ এবং অগ্নির। মধুসূদন ও মেঘনাবধ-কাব্যে' সিংহের উপমা এবং অগ্নির উপমা বহুবার ব্যবহার করেছেন—সিংহ বা ব্যাঘ্রের ছাব্বিশ বার এবং অগ্নির পনেরো বার। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক উপমার অবশ্য মধুসূদন বাঙালী জীবন এবং পরিবেশের নিগূঢ় পরিচয় দিয়েছেন, যেমন-

"হায়রে যেমতি
স্বর্ণ চূড় শস্য ক্ষেত্ত কৃষিদল বলে
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর
রবিকুল-রবি-শূর রাঘবের শরে।"

অথবা- "বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যাজি লজ্জাশীলা
কুল বধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে।"

সব শেষে জীবনাদর্শের কথা। 'মেঘনাদবধকাব্যের' রাবণ চরিত্র পরিকল্পনায় একটি বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ মূর্ত হয়েছে। এখানে মিল্টনের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। 'প্যারাডাইস লস্টে'র শয়তান যেমন দুর্জয় বাসনার প্রতীক, রাবণও তেমনি অশেষ আশা এবং অফুরন্ত শক্তির প্রতীক। রাবণ সমস্ত সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হয়েছে। ভাগ্যের বিরূপতা সে জানে কিন্তু যেহেতু সম্ভাব্য পরিণতি রোধ করা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাই সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থাকতে চায়। অনেকে 'মেঘনাদবধ-কব্যে' গীতিময়তার লক্ষণ পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ

www.icsbook.info

স্বর্গে অশোকবনে সীতার কাহিনীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কোমলতা কখনও দুর্ধর্ষতার বিরোধী নয় বরঞ্চ অনুসঙ্গীই। বিপুল পরিসরের একটি কাব্যে গীতিলালিত্যের প্রয়োজন আছে মহাকাব্যে ভয়াবহ-বোধের রিলিফ (relief) বা উপশমের জন্য। তাছাড়া কাহিনীর দ্রুতগতির মধ্যে কখনও কখনও বিরাম না থাকলে চলে না। চতুর্থ সর্গ কাহিনীর জন্য এভাবেই একটি রিলিফ এবং প্রয়োজনীয় বিরাম সৃষ্টি করেছে।

মধুসূদনের কাব্য-সাধনার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ সময় হচ্ছে ১৮৬১-৬২ সাল। এ-দুই বছরের মধ্যে 'মেঘনাদবধকাব্য,' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। রাধা–কৃষ্ণ বিষয়ক খণ্ডকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এটা বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর আধুনিক পরিণতি। মধুসূদন এগুলোকে 'ওড' (ode) আখ্যা দিয়েছেন। এখানে কবি রাধা বিরহের গান গেয়েছেন। তত্ত্ব বা রূপক-সম্বলিত বৈষ্ণব-ভাব এখানে নেই, সহজ লিরিকের ভাবটাই এখানে প্রধান । যেমন-

"সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম গতি;
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী,
আমার প্রেম-সাগর দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি দিয়াছে আমার বিধি,
বিরহ আঁধার আমি? ধিক্ এ যুকতি!"

এ-সময় তিনি 'সুভদ্রা-উপাখ্যান' নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি নাটক রচনা করেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী হবে না বিবেচিত হওয়ার তা আর প্রকাশিত হয়নি। একই কারণে, 'Rizia' নাট্য কবিতার বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেও তিনি তা প্রকাশ করেননি।

'বীরাঙ্গনা' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে। ইতালীর কবি ওভিদের (Publius Ovidius Naso-43 B.C.-17 A.D) Heroides কাব্যের অনুকরণে 'বীরাঙ্গনা রচিত। ওভিদ প্রাচীন ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এবং পুরাণের বিভিন্ন নায়িকার চিত্ত উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন পত্রাকারে। 'হিরোয়দস' এর পত্র সংখ্যা একুশ। এর মধ্যে প্রথম পনেরোটি ওভিদের। অন্য ছয়টি ওভিদের কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে। প্রথম পনেরোটিই কেবলমাত্র নায়িকাপত্র, কিন্তু পরের ছয়টি নায়ক-নায়িকার উত্তর প্রত্যুত্তর। মধুসূদন একুশটি পত্র লিখেতে চেয়েছিলেন,কিন্তু মাত্র এগারটি পত্র সম্পূর্ণ লিখেছেন, অতিরিক্ত পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রও আছে। 'হিরোয়দস' এ প্রাচীন কাব্য খ্যাত বিভিন্ন পরিত্যক্ত রমণীর কল্পিত পত্র পাই, যেমন ইনিসের কাছে লিখিত দিদোর পত্র, প্যারিসের কাছে লিখিত ইনানীর পত্র, ইউলিসিসের কাছে লিখিত পেনিলোপীর পত্র ইত্যাদি। শুধু মাত্র আবেগের দিক থেকেই নয়, পরিবেশ এবং ঘটনার দিক থেকেও 'বীরাঙ্গনার' সঙ্গে 'হিরোয়দস'- এর সাদৃশ্য আছে। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'কে 'ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপী' পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়, 'সোমের প্রতি তারার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'হিপোটিলাসের প্রতি ফেইড্রা পত্রের ; 'দশরথের প্রতি

www.icsbook.info

কৈকেয়ী' পত্রের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'দোমোফোনের প্রতি ফিলিস' পত্রের।

'বীরাঙ্গনা'য় আমরা অমিত্রাক্ষরের পূর্ণ পরিণতি দেখি। ভাষার গাম্ভীর্যে, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যে 'বীরাঙ্গনা' 'মেঘনাদবধে'র চাইতেও পরিণত সৃষ্টি। পরিপূর্ণ হৃদয়-সংযোগে শব্দ যে অসাধারণ অর্থে শিহরিত হয়ে ওঠে তার পরিচয় আছে 'বীরাঙ্গনা'র সোমের প্রতি তারা' পত্রে-

"যে দিন-কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ–অতুল জগতে।-
যেদিন প্রথমে তুমিএ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে-ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজী
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু কাঁদি বন-দেবী-পদে
দুকুল, কাঁচলি, সিঁতি কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে!
ফেলিনু চন্দন দূরে স্মরি মৃগমদে।
হায়রে অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজি!-
তারাব যৌবন বন-ঋতুরাজ তুমি!"

পিতার মৃত্যুর পর মধুসূদন যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হন। সে অর্থ ব্যয়ে দেশে নিশ্চিত জীবন-যাপন এবং মাতৃভাষার চর্চা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলো, কিন্তু জীবন-ক্ষেত্রে অধিকতর উচ্চ-প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংল্যান্ডে ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য মধুসূদন গ্রেজ ইন–এ দেশে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন কিন্তু পত্তনিদারগণ কিছুদিন পর মধুসূদন এবং তাঁর স্ত্রীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। কোনও রূপে পাথেয় সংগ্রহ করে হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ২রা মে তারিখে ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় পরিবারবর্গ সহ মধুসূদন লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে এবং পরে ভার্সেই এ অবস্থান করতে থাকেন। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে অর্থ সাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগরের নিকট পত্র লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের অর্থানুকূল্যে মধুসূদন চরম দুর্দশা থেকে মুক্তি পান। ভার্সেই এ প্রবাসকালে তিনি আর্থিক ক্লেশ পেয়েছিলেন, অনেক সময় সপরিবারে দেনার দায়ে জেলে যাবার আশঙ্কা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এমন দুর্দিনেও

www.icsbook.info

সাহিত্য -চর্চায় তার অসাধারণ আগ্রহ দেখে অবাক হতে হয়। সে সময়ে লিখিত তাঁর একটি পত্রে আছে-

"Though I have been very unhappy and full of anxiety here I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,— if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe."

মাতৃভাষাকে উজ্জ্বল করবার নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে নানা দেশের নানা রত্ন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে গৌরদাস বসাককে লেখা একটি প্রত্রে কবির সংকল্পের ইতিহাস পাওয়া যায়ঃ

" I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of misfortune in learning the three great continental languages, viz Italian, German and French languages-which are well worth Knowing for their literary wealth, You Know my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well cultivated state- intellectual of coure. Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our tongue ..... I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother tongue and his native land may animate all man of talent among us."

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সেই এ অবস্থানকালে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনায় মনোনিবেশ করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং কলকাতায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে এগুলো প্রকাশিত হয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীই প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের সর্বশেষ কাব্য। ইতালীয় কবি পেত্রাক-এর অনুকরণে চৌদ্দপংক্তির পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করা মধুসূদনের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া এ-গ্রন্থেই মধুসূদনের অপূর্ব মাতৃভূমিপ্রীতির পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। বিদেশে থাকাকালীন নির্বান্ধব পরিবেশে মাতৃভূমির কথা তাঁর মনে জেগেছে এবং তিনি দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, শ্যামা-পক্ষী, শিব-মন্দির এ সবের প্রতি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এ-আকর্ষণ যে কত আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনাবিল তার পরিচয় আমরা পাই 'বঙ্গভাষা' কবিতায়-

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন-
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

www.icsbook.info

পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,-
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।"

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে মধুসূদন ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তিনি চরমভাবে ব্যর্থকাম হন। অর্থাগম যে হয়নি তা নয় ,কিন্তু সমস্ত অর্থ ব্যয় হত পান–ভোজনে এবং অন্যবিধ অপব্যয়ে। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে পুত্রকন্যাসহ তাঁর পত্নী দেশে ফিরে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যারিস্টারীতে মধুসূদনের বিশেষ উন্নতি হল না। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি বাধ্য হয়ে ব্যারিস্টারী ছেড়ে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কছুদিন পর পদত্যাগ করে আবার ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে হোমারের 'ইলিয়দ' এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে 'হেকটর বধ' প্রকাশ করেন। অসুস্থ অবস্থায় 'হেকটর বধ' রচনা করেছিলেন, তা ছাড়া সাহিত্য সাধনার তাগিদেও গ্রন্থটি রচিত নয়। তাই মধুসূদনের প্রতিভার বিশিষ্ট কোনও স্বাক্ষর এ গ্রন্থে নেই। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আগমন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকাবাসীরা তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলো।একটি সনেটে তিনি সম্বর্ধনার উত্তর দিয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি পঞ্চকোর্ট রাজ্যের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন, কিন্তু বেশীদিন সেখানে ছিলেন না। ক্রমান্বয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। গৃহহীন, সহায় সম্বলহীন রোগাক্রান্ত কবি ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ২৯ শে জুন আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। এর দুদিন পূর্বেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটেছিলো।

দেশে ফিরে এসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় মধুসূদন আর কিছু রচনা করেননি। অভাবের তাড়নায় 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতি মূলক কবিতামালা এবং পূর্বে উল্লেখিত 'হেকটর বধ' নামে একটি গদ্যকাব্য লিখবার চেষ্টা করেছিলেন। কোনটাই শেষ হয়নি।

মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একসময় লিখেছিলেন, তাঁর আবির্ভাব হবে ধূমকেতুর মতো। সত্যিই ধূমকেতুর মত অপরিচয়, আকস্মিকতা এবং অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য নিয়েই আমাদের সাহিত্যাকাশে তিনি অতি সংক্ষেপ কালের জন্য সঞ্চরণ করেছিলেন।

www.icsbook.info

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উনিশ শতকের মহাকাব্যের ধারা

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হামিদ আলী

সৈয়দ আলী আহ্সান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

উনিশ শতকের

মহাকাব্যের ধারা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর মহাকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন। এ শতকের শেষে গীতিকাব্যের বন্যাবেগ না এলে, মহাকাব্যের ধারাকে বিশ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত টেনে আনা চলতো। বিশ শতকেরও আমরা অনেক মহাকাব্য পেয়েছি, কিন্তু সমসাময়িক গীতিকাব্যের আন্তরিকতা, সত্যবোধ এবং দীপ্তির কাছে তা অত্যন্ত নিষ্প্রভ হওয়ায় আজ আর তার কোনও মূল্য নেই। বিশ শতকের মহাকাব্যের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কায়কোবাদ, হামিদ আলী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু। এঁদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৩৮-১৯০৩)

বাংলা সাহিত্যের এক অনির্বচনীয় উত্তেজনার মুহূর্তে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব। একদিকে রামমোহন , অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর; অন্যদিকে মধুসূদন বাংলা সহিত্যে নতুন রস-প্রেরণা এনেছেন এবং এক নবযুগের প্রবর্তন করেছেন। রাহমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজ-জীবনে বিপ্লব এনেছিলেন কিন্তু সে বিপ্লব সমাজ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে নি, সে-বিপ্লবের উত্তেজনায় বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণময়তা এসেছিলো। মধুসূদন অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে প্রাচীন পদ্ধতির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকে অস্বীকার করে নতুন সুরের উদগাতা হলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনে আইনজীবী ছিলেন এবং শিক্ষিত হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৬৩) ভূমিকা হেমচন্দ্র লিখেছিলেন এবং সে-সম্পর্কে মধুসূদন মন্তব্য করেছিলেন যে একজন যথার্থ বি.এ. তাঁর কাব্যের ভূমিকা লিখেছেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হেমচন্দ্রের জীবিতকালে, অনেকে হেমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের আবির্ভাব এবং যুগাদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হল। সমসাময়িক কালে যে যে কারণে হেমচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা হচ্ছে এই-

ক. উনিশ শতকের হিন্দু সমাজের জাতীয়তার আদর্শ হেমচন্দ্রের কাব্যে পরিপুষ্টি পেয়েছিলো এবং তিনি এ আদর্শের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

খ. উনিশ শতকের হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস এবং আচারনিষ্ঠাকে তিনি তাঁর কাব্যে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন।

www.icsbook.info

গ. সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাংঙ্গ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।

ঘ. কবিতার বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন এবং বিচিত্র রূপকল্পের কাব্য রচনা করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধকে, জাতীয়তা না বলে গোত্রপ্রীত বলাই সঙ্গত। দেশপ্রেমের মধ্যে যে একটা মাধূর্য, দেশের মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সর্ববস্তুর প্রতি যে একটা মমত্ববোধ থাকে, হেমচন্দ্রের মধ্যে বলিষ্ঠভাবে তার পরিচয় আমরা পাই না। তিনি দেশ বলতে বুঝেছেন, কোনও বিশেষ গোত্রের রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজাত আবাস -পরিকল্পনা। ভারতবর্ষে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে; কিন্তু হেমচন্দ্রের ধারণায় একমাত্র হিন্দুই এদেশবাসী, যাদের বর্তমান লাঞ্ছিত অবস্থার জন্য ক্ষোভ এবং বেদনা প্রকাশ করবার কারণ আছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানকে তিনি হিন্দুদের প্রতিপক্ষ ভেবেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে আমরা যে সত্যিকার জন্মভূমি প্রীতির পরিচয় পাই তার পশ্চাতে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি নেই। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি দেশের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন তীব্রভাবে। দেশের সর্ববস্তু তাঁর দৃষ্টিতে মনোহর হয়ে জেগেছিলো। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক, উপরন্তু সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে জড়িত। হেমচন্দ্রের গোত্রপ্রীতির পরিচয় তাঁর "বীরবাহু কাব্য' এবং 'কবিতাবলী'র মধ্যে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 'বীরবাহু কাব্য' ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ' বিজ্ঞাপনে' এবং মুখবন্ধ কবিতায় কবি আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে পুরাকালে হিন্দুগণ স্বদেশ রক্ষার জন্য সর্বমুহূর্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি এক কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা করেছেন যেখানে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং সর্বশেষে স্বদেশ, ধর্ম এবং নারীর মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের পরাজয় চিত্রিত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য সম্পর্কে নিত্যকৃষ্ণ বসু 'সাহিত্য' পত্রিকার নবম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় লিখেছিলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমালোচকগণ যাহাকে the malady of the age বলেন,কবির বাঙ্গালী যুবাও সেই পীড়ায় পীড়িত। তরুণ-বয়স্ক কবি তখন এই নবীন ব্যাধির ওষধি নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার কাব্যের নায়ককে আত্মহত্যা দ্বারা ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" এ-কাব্যে বায়রনের 'ম্যানফ্রেডে'র ছাপ আছে। রচনারীতিতে ভারতচন্দ্রের এবং ঈশ্বর গুপ্তের প্রথাবলম্বন আছে। কাব্যের নায়ক নবীন বাঙালী যুবক স্বদেশের ও সমাজের দুর্দশা মোচন করা আপন কর্তব্য বলে জ্ঞান করে, কিন্তু কর্তব্য সাধনে অসমর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি চরণে নায়কের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে-ঃ

" কি হবে থাকিয়া হেথা প্রাণের কমল,
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু;
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু।
প্রীতিবারি সমাজেতে ঢালিলাম কই!
স্বার্থ দ্বেষ পরহিংসা নাশিলাম কই?
কই, আপনার মন নিরমল হল?
কই ধর্ম পথে মন স্থির হয়ে রল?"

www.icsbook.info

'বীরবাহু' কাব্যের আরম্ভে কবি আক্ষেপ করেছেন;

"আর কি সে দিন হবে,
জগৎ জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস
শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত।।
যবে দেব অবতংস,
রঘু-কুরু-পাণ্ডুবংশ
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্বার,
সে শোভা হবে কি আর
অযোদ্ধা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত।।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "মনুষ চাপল্য চাপিয়া রাখে, যশোলিপ্সা লুকাইয়া ফেলে, হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে সেই চাপল্য ও যশোলিপ্সাই আপনার সাফাই করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতেছেন।" এই কাব্যে কোথাও কোথাও উপমা ব্যবহারে কবি চাতুর্য দেখিয়েছেন, যেমন—

"শেষ যৌবনের ভরে
দেহ ঢল ঢল করে
অস্তমান ভানুর তুলনা।"

অথবা-

" চকিত নয়নতারা
যেন মৃগী মৃগহারা
চেতনা হারায়ে পথে চলে।"

অথবা-

" সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি
মানিক মুকুতা দেখিলে ধরি
এই উপবনে আসিয়া বসি,
শ্রম নাশি পুনঃ সাগরে পশি।
হলো বহুদিন প্রভাত কালে
সকলে পশিনু জলধি জলে;
সারাদিন জলে ধরিনু মণি-
ভানু অস্ত যান, আসে রজনী ।
দেখিয়া তপন মূরতি শোভা
আমরা কজনে হইনু লোভা।
ধরিব বলিয়া ধাইনু পাছে-
যতদূরে যাই না পাই কাছে।"

www.icsbook.info

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' দুখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। কবিতাবলীতে বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা রয়েছে একটি কবিতার নাম ' ভারতসঙ্গীত'। কবিতাটি ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে লেখা হয়েছিলো। এখানে তিনি বলেছেন যে এককালে হিন্দুদের গৌরব ছিলো, সমৃদ্ধি ছিলো, পরে দৈবদুর্বিপাকে তারা মুসলমানদের হাতে পরাভূত হয়। কবি তাই অভিযোগ করেছেন-

"ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম ভুলে.
আত্মা-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শক্র করতলে
সোনার ভারত করিতে ছার।"

অন্য এক ক্ষেত্রে হিন্দুদের বর্তমান দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'প্রাচীন ঐতিহ্য ও দর্শনকে অস্বীকার করার দরুণই বর্তমানে হিন্দুদের দুরবস্থা। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যখন ছিলেন, অথবা, জৈমিনী, গর্গ,পাতঞ্জলি যখন ধর্মীয় প্রচার করেছিলেন, তখন হিন্দুরা ঘৃণিত ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব গৌরবটুকু মাত্র সম্বল করেই ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা কোনক্রমে বেঁচে আছে। তাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে পাঠান, মোঘল, পারশ্য দুর্মতিদের হাতে।' বর্তমানের বিমর্ষতা এবং লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে 'ইংরাজ শিক্ষিত প্রথা'কে অবলম্বন করা-

'না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত
কে'বা পথে লয়ে যেত
যে পথ অনেক দিন ক'রেছ বর্জন।"

ধর্মীয় আদর্শ এবং আবেগের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র সনাতনপন্থী ছিলেন, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর মনে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উন্মেষ ঘটেছে। নির্বিবাদে অথবা বলা যেতে পারে অন্ধভাবে তিনি ধর্মের আচার এবং সংস্কারকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন এক সময়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সংশয় তাঁর জীবনে সত্য থাকেনি। সংশয় এবং জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সত্য পথের সন্ধান পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। জিজ্ঞাসা তাঁর মনকে বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং প্রশান্তি ও স্থৈর্য নষ্ট করেছিল। অবশেষে গতানুগতিক পথেই তিনি মুক্তির সন্ধান করলেন। মুক্তি অর্থাৎ কোনক্রমে অন্ধভাবে প্রচলিত বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাঁচবার চেষ্টা। তাঁর সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী'তে তরুণ কবি হিন্দুধর্মের সনাতন বিধি এবং প্রাত্যহিক জীবনের আচার ও নিষ্ঠাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে যুক্তির দ্বারা প্রচলিত ধর্মকে পরীক্ষা করে অস্বীকারের পথে তিনি আসেন নি, প্রগাঢ় উপলব্ধির ফল এটা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর নব উদ্ভূত ব্রাহ্ম মতবাদের প্রভাবের ফলে এবং ইংরেজি সাহিত্য পাঠের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপই হেমচন্দ্রের মধ্যে আমরা এই তথাকথিত সংস্কারমুক্ততার পরিচয় পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার যে হেমচন্দ্রের মনোবিকাশের ধারায় 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র স্থান অত্যন্ত নগণ্য। কেননা, কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র তখনও অনুশীলনের পর্যায় অতিক্রম করেননি।

www.icsbook.info

'কবিতাবলী'র মধ্যে হেমচন্দ্রর ধর্ম-বিশ্বসের পরিচয় সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে পাই। 'গঙ্গার উৎপত্তি' এবং 'বিশ্বেশ্বরের আরতি' কবিতা দুটিতে হেমচন্দ্র সনাতন ধর্ম-বিশ্বাস, ভক্তিবাদ এবং আচার নিষ্ঠার সমর্থন জানিয়েছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত আচার নিষ্ঠাকে নতুন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাও আছে। 'গঙ্গার উৎপত্তি'তে তিনি বলেছেন যে ঋষিগণ যোগসাধনা বা ব্রহ্ম-আরাধনায় মনোনিবেশ করেছেন মানবের হিতার্থে। অবশ্য তারা যে কি ভাবে মানবের হিত সাধন করছে তার কোনও পরিচয় কবি দেন নি। আত্মতৃপ্তির জন্য কবিকে একথা বলতে হচ্ছে। আত্মতৃপ্তি একারণে যে সনাতন ধর্মকে হীনপ্রাণ ভাবা অথবা তুচ্ছ করা কবির পক্ষে সম্ভবপর নয়। সনাতন ধর্মের প্রতি তিনি অশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত। আবার আধুনিক শিক্ষা ও রুচির সঙ্গেও তিনি নিজের সম্পর্ক রাখতে চান। সুতরাং আধুনিক উপায়ে গতানুগতিক অন্ধ-বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে হেমচন্দ্র তাঁর 'ছায়াময়ী' কাব্যগ্রন্থে হিন্দুদের রকাল সম্পর্কে কবির যে বিশ্বাস রয়েছে সে বিশ্বাসের একটা পরিচয় দিয়েছেন। যদিও 'ছায়াময়ী' দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র আভাসে রচিত কিন্তু নরক এবং স্বর্গ সম্পর্কে যে মত ও উপদেশ এখানে আছে তা হিন্দু বিশ্বাস ও চিন্তার দ্বারা লালিত। কবি বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, 'বলা বাহুল্য যে ডিভাইনা কমেডিয়া বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খ্রীস্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে-সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রীস্টধর্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সে- সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।" 'দশমহাবিদ্যা' কাব্য-গ্রন্থে হেমচন্দ্রের সনাতন বিশ্বাসের পরিচয় আছে। এ গ্রন্থে বিশ্বসৃষ্টির আদি-অন্ত-কারণ সম্পর্কে নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাদেব সৃষ্টির মূল কারণ এবং আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহিমা বর্ণনা করে নারদকে জীবনের পরম তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

অবশ্য 'দশমহাবিদ্যা'য় পুরাণতত্ত্ব থাকলেও , কবি বলেছেন যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি নতুন ছন্দ পরীক্ষা করা। হেমচন্দ্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, 'বস্তুত আমি কবিতা বলার প্রয়াস পাইয়াছি। শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।' কবির আকাঙ্ক্ষা যাই থাকুক না কেন, তত্ত্বের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। মনে হয় তাঁর প্রধান বক্তব্য যেন-

"লক্ষ্য করি তারি পথ চালা নিত্য মনোরথ
জীব-জন্মে ভয় কিরে'? জগদম্বা জননী।"

হেমচন্দ্র সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে 'বৃত্রসংহার' নামে একটি সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্বে বিধৃত ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র বধের উপাখ্যানকে অবলম্বন করে এই কাব্যটি রচিত। এখানে জীবনের একটা বিশেষ আদর্শ প্রচারও কবির উদ্দেশ্য। আদর্শটি হচেছ, যে সাধনা করবে তার জয় অবশ্যম্ভাবী , সাধনাবিহীন ব্যক্তি পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। অথচ যে সাধনার পরিচয় কবি এ কাব্যে দিয়েছেন সে সাধনার সঙ্গে জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। ইন্দ্র কুমেরু-শিখরে যেয়ে তপস্যা করছে। এ-তপস্যা জীবন ও জগতের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক রহিত তপস্যা। অন্যত্র দধিচী মুনি লোকালয়ের অন্তরালে যোগ-সাধনায় নিমগ্ন। উভয় ক্ষেত্রেই সাধনার পরিচয় কর্মের মধ্যে জীবন-চাঞ্চল্যের মধ্যে

www.icsbook.info

এবং জীবনক্ষেত্রে বিবিধ আয়োজনের মধ্যে পাচ্ছি না। সুতরাং এ- সাধনার সত্যিকারের কোনও মূল্য নির্ণয় করা চলে না। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে', যে বলিষ্ঠতা এবং জীবন-চাঞ্চল্যের পরিচয় আছে তার সঙ্গে তুলনায় হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারের'জীবন অত্যন্ত নিস্প্রভ। কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সমস্ত নির্দেশগুলি অবলম্বন করতে চেয়েছেন অথচ কাব্য-দেহ নির্মাণ করতে হলে সমস্ত অঙ্গের সংস্থানের প্রয়োজন এবং কাব্য–দেহে প্রাণ সঞ্চার করারও প্রয়োজন আছে। হেমচন্দ্রের কাব্যে বিভিন্ন আদর্শের মিশ্রণ ঘটেছে কিন্তু তাদের সমন্বয় সম্ভব হয়নি। শব্দব্যবহার, উপমা রূপকের ক্ষেত্রেও আমরা যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ করি। মহাকাব্যের জন্য যে আশ্চর্য সতেজ ও সজীব এবং প্রাণময় ভাষার প্রয়োজন 'বৃত্রসংহারে' সে ভাষা নেই। 'বৃত্রসংহারে'র ভাষা শ্লথগতি, নির্জীব এবং উপমা-রূপকের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। অল্প কিছু উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। যেমন-'ক্রমে দেববৃন্দ-মুখে বহে গাঢ় শ্বাস", "দেব নাসিকায় বহে সঘন-নিশ্বাস", "নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাস", "মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে" ইত্যাদি।

হেমচন্দ্রের উপমা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থির উপমা, সাধারণ তুলনার মত। গতিময় বস্তুর সঙ্গে অন্য কোনও গতিময় বস্তুর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা সাধারণত তিনি করেননি। অকস্মাৎ নাটকীয় আবেগে সমস্ত ঘটনাকে দৃশ্যমান করার মধ্যে যে কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় হেমচন্দ্রে তা ছিল না। মধুসূদন সাদৃশ্য খুঁজেছেন বস্তুর সঙ্গে বস্তুর, গতির সঙ্গে গতির, হিংস্রতার সঙ্গে হিংস্রতার। বাত্যার বেগ, অগ্নির ভয়াবহতা এবং সিংহের আকস্মিক আক্রমণ তাঁকে উপাদানে জুগিয়েছে। হেমচন্দ্র সাধারণত সাদৃশ্য খুঁজেছেন এক বস্তুর বহিরাবরণের সঙ্গে অন্য বস্তুর পরিদৃশ্যমান অবস্থার—যেমন কোনও বস্তুর কৃষ্ণ রূপের সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা। অথবা মানুষের পাণ্ডুবর্ণ অবয়বের সঙ্গে কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত রজনীর চন্দ্রের তুলনা। এ সমস্ত ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র কখনও কখনও সাবলীলতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন বটে, কিন্তু গতিময় উপমার ক্ষেত্রে কষ্ট-কল্পনার পরিচয় মেলে। যেমন-

"পল্বলের শুষ্ক পত্র পঙ্কেতে যেমন,
সখিরে বৎসের আস্য তেমতি এখন।"
অথবা–"বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমনি দ্রুত বিকম্পিত তার।"
অথবা– "উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম লড়িল যেন আকাশ মার্গেতে,
সময় কেতন অদ্য হৈল সঙ্কুচিত।।"

প্রথম উদাহরণে বিশুষ্কতার সঙ্গে গ্লানি ও পঙ্কিলতার তুলনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় উদাহরণে দ্রুত বিকম্পিত একটি বস্তুর সঙ্গে জিহ্বার কম্পনের তুলনা করা হয়েছে, তৃতীয় উদাহরণে একটি স্থির বস্তুর সঙ্গে একটি গতির তুলনা করা হয়েছে। তিনটি অবস্থাই উদ্ভট এবং হাস্যকর।

যে মহাকাব্যের অথবা নাটকের পরিসামাপ্তি বিয়োগান্ত, তার নায়কের জন্য লেখক করুণার সৃষ্টি করেন। নায়কের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলির প্রতি বারংবার ইঙ্গিত প্রদান করে কবি তার প্রতি আমাদের মনকে করুণা- দ্রব করেন, সঙ্গে সঙ্গে নায়কের

www.icsbook.info

সর্বনাশ এবং হাহাকার আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। গ্রীক সাহিত্যে কোরাস এই করুণা ও ভীতির অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সর্বশেষে দর্শকদের আবদ্ধ মনোধারাকে প্রমুক্ত করে প্রশান্তির সৃষ্টি করে। 'বৃত্রসংহারে' বৃত্রের সর্বশেষ উক্তি আমাদের মনে করুণা ও আক্ষেপের সৃষ্টি করে ঃ

"হেরিয়া দনুজপতি, কাতর-হৃদয়
কহিলা কৈলাশে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
'হা শম্ভু তুমিও বাম!"

এবং অবশেষে বৃত্রের নিধন ভীতির সঞ্চার করে। কিন্তু পরিসমাপ্তিতে প্রশান্তির আভাস পর্যন্ত পাই না। কবি তথাকথিত অন্যায়ের শোধনের কথা মাত্র ভেবেছেন, কিন্তু মিল্টন যাকে বলেছেন 'Calm of mind all passions spent' তার পরিচয় আমরা পাই না। মাইকেলেও সমস্ত আবেগ নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রশান্তির পরিচয় আছে-

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে
ফিরিল লঙ্কার পানে,আর্দ্র অশ্রুনীরে-
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।"
"কিন্তু বৃত্রসংহারের সর্বশেষ কথা-
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা- উন্মাদিনী এবে।"

'আশা-কানন' একটি সম্পূর্ণ ভাবানুষঙ্গে লিখিত কাব্য। 'আশা-কানন' সম্পর্কে হেমচন্দ্র ভূমিকায় লিখেছেন-"আশা-কানন' একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য ;মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজীতে এইরূপ রচনাকে এলীগরি কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, সাদৃশ্যসূচক বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাহায্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য-বোধক। " এ-কাব্যে ইংরজে কবি চসারের 'House of Fame'-এর ভাবানুসৃতি আছে। 'আশা-কানন' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি Shakespeare- এর দুটি নাটকও তর্জমা করেছিলেন, 'রোমিও-জুলিয়েট' (১৮৮৫) এবং "টেম্পেস্ট" (১৮৬৮)। অনুদিত "টেম্পেস্টের" নাম 'নলিনী- বসন্ত'।

হেমচন্দ্রের শেষ জীবন অনেক বেদনাময় হয়েছিল। তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন এবং অর্থনৈতিক নানাপ্রকার অসুবিধার মঁধ্যে তাকে পড়তে হয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'চিত্তবিকাশ' কাব্যগ্রন্থে তিনি আপন মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন। ২৪শে মে ১৯০৩ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র সেন
(১৮৪৭-১৯০৯)

নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কর্মজীবনে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

www.icsbook.info

হেমচন্দ্রের মতো নবীনচন্দ্র সেনও আপন জীবৎকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর খ্যাতি অর্জনের কারণ হচ্ছে-

১. জাতীয়তাবাদের পোষকতা।

২. সনাতন ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে কাব্য সৃষ্টি।

৩. জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সহজ সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করে কাব্য সৃষ্টি। এ সমস্ত শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র সেনের কৌশল হচ্ছে অনুপ্রাস সৃষ্টি, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি, বাক্যাংশ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি। উপরন্তু জীবন সম্পর্কে কোনও গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় না দিয়ে উক্তি মাত্র রূপে কোনও বিষয়কে সর্বসাধারণের নিকট স্পষ্ট করা।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'অবকাশরঞ্জিনী ' নবীনচন্দ্র সেনের খণ্ড কাব্যগ্রন্থ্। নবীনচন্দ্র সেনের পূর্ণ পরিচয় এ কাব্যগ্রন্থ্ দ্বারা আমরা পাই না। কেননা গতানুগতিক বিরহ-বিলাস ছাড়া এ কাব্যের মধ্যে গভীর বেদনা বা পূর্ণকাম উপলব্ধির কোনও পরিচয় নেই। 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী', 'পিতৃহীন যুবক' ইত্যাদি কতিপয় অহেতুক ভাবোচ্ছ্বাস আছে এবং সে কারণে হৃদয়ের যথার্থ আবেদন নেই; তবে হৃদয়ের যথার্থ আবেদন এ ক্ষেত্রে আশাও করা চলে না; কেননা এ কবিতাগুলো কবির প্রথম বয়সের অপরিপক্ক রচনা। সে কারণেই এখানকার শব্দবিন্যাস দুর্বল এবং উপমা অনেক সময়ই অশোভন এবং অস্বাভাবিক। 'বঙ্গদর্শনে' (বৈশাখ, ১২৮০) এ কবিতাগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, এগুলো আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়, উক্তি মাত্রই যার উদ্দেশ্য।

নবীনচন্দ্র সেনের দেশপ্রেমের পরিচয় তাঁর 'ভারত-উচ্ছ্বাস' কবিতা এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে আছে। 'ভারত-উচ্ছ্বাস' ইংলেন্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উদ্দেশ্যে রচিত। কবি আনন্দিত হৃদয়ের উচ্চকিত সুরে এ কবিতাটি রচনা করেছেন। হেমচন্দ্র তাঁর 'ভারত বিলাপে' বেদনার পরিচয় দিয়েছেন, দ্বিধাহীন চিত্তে বিদেশী রাজকুমারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পারেননি। কিন্তু নবীনচন্দ্র সেনের মধ্যে কোনও প্রকার সংস্কার ছিল না, তিনি নির্বিবাদে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। সংশয়বিহীন কবিচিত্ত জতির ভাগ্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেনি, অধিকারীকে সমর্থন জানানোই একমাত্র বল্যাণকর বলে মনে করেছে।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পাঁচ সর্গে সমাপ্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে একটি বিস্তৃত পটভূমিকায় আমরা নবীনচন্দ্র সেনের স্বাদেশিকতার পরিচয় পাচ্ছি। রঙ্গলাল এবং হেমচন্দ্রের কাহিনী-কাব্যে স্বাধীনতাহীনতার ক্ষোভ পরোক্ষ আবেগের মত ছিল, নবীনচন্দ্র সেনই একে প্রথম অপরোক্ষ করলেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' এবং হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু' কাব্যে স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্যবোধের প্রথম পরীক্ষা হয়। কিন্তু 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে নবীনচন্দ্র দেশপ্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা করেন এবং এ- কাব্যগ্রন্থেই সর্বপ্রথম অধিকারী ইংরেজদের সম্মুখীন হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে ক্লাইভকে ন্যায়পরায়ণ, উন্নতমনা এবং শক্তিশালী বলে অঙ্কিত করা হয়েছে। ইংলন্ডের রাজলক্ষ্মীর আশ্বাস, আলীবর্দীর ভবিষ্যৎবাণী, অদৃষ্টচক্রের বিবর্তনকে স্বীকার এবং নিয়তির উপর চরম নির্ভরতা সমস্ত কিছুই ইংরেজের জয় সূচনা করেছে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাঙালী হিন্দুর ধারণা অনুসারে রাজার পরিবর্তনে দেশের স্বাধীনতা বা অধীনতা নির্দিষ্ট হয় না, সমাজ জীবন অক্ষত অনড় থাকলেই হল।

www.icsbook.info

ইংরেজের সঙ্গে মুসলমানের পার্থক্য সূচিত হয়েছে এখানে যে মুসলমানরা এদেশবাসী হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইংরেজ বিদেশীই ছিল; মুসলমানরা পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত ছিল (নবীনচন্দ্র সেনের ধারণায়) কিন্তু ইংরেজ ন্যায়পরায়ণ ছিল। 'পলাশীর যুদ্ধে'র সমস্যা এবং সংকট এখানে যে, পাপাচারী এদেশীয় মুসলমান নৃপতির সহায়তা করব, না ন্যায়পরায়ণ বিদেশী ইংরেজকে বরণ করব? শেষ পর্যন্ত বিদেশী ইংরেজকে বরণ করা হয়েছে। অবশ্য ঘটনার বিবর্তনের মধ্যে বিদেশীর জয় ঘোষিত হলেও এবং কবি কর্তৃক তার সমর্থন জ্ঞাপিত হলেও দেশদ্রোহীকে কবি হীনপ্রভ করেই অঙ্কিত করেছেন। মীর জাফর এবং মীরণ নরাধম, কিন্তু বীর এবং দেশপ্রেমিক হচ্ছেন মোহনলাল।

স্কটের অনুকরণে রচিত 'রঙ্গমতী' কাহিনী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে।

নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্য-'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' 'ও 'প্রভাস'—হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের মহাকাব্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে পৌরাণিক হিন্দু আদর্শের প্রতি শিক্ষিত হিন্দু সমাজের যে শ্রদ্ধা ও কৌতূহল জেগেছিলো এবং যার ফলে প্রাচীন ঐতিহ্যকে নবরূপে হিন্দু জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলেছিলো নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যে তারই পরিচয় আমরা পাই। এ পৌরাণিক হিন্দু আদর্শ ছিলো মূলত কৃষ্ণলীলা। তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কৃষ্ণলীলাকে কখনও জ্ঞানের, কখনও ভক্তির, কখনও কর্মের, কখনও বা জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ের পটভূমিকায় স্থাপন করবার যে চেষ্টা করেছিলেন ত্রয়ী কাব্য সে চেষ্টারই ফলশ্রুতি। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন'-এ কাব্য-ত্রয়ী সম্পর্কে লিখেছেন, "১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কাব্য ত্রয়ের ধ্যান আরম্ভ করি, এবং ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে 'প্রভাস' শেষ করি। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিয়া 'মহাভারত' শুনিয়াছিলেন। আমি চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী এই যজ্ঞ করিয়া শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম।" 'রৈবতক' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে, 'কুরুক্ষেত্র' ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'প্রভাস' প্রকাশিত হয়। এ-কাব্য তিনটিতে মহাভারতের তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বিত হয়েছে। 'রৈবতকে' অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ, 'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্যুবধ এবং 'প্রভাসে' যদুবংশ ধবংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ যথাক্রমে কাহিনী তিনটির মূল আশ্রয়। এ তিনটি কাব্যের মাধ্যমে নবীনচন্দ্র গীতা অনুসরণে নতুন ধর্মরাজ্য স্থাপনার কথা বলেছেন। এই 'ত্রয়ী কাব্যে' নবীনচন্দ্র সেন একই সঙ্গে ধর্ম এবং জাতীয়তার পূর্ণরূপ উদঘাটন করেছেন। অবশ্য এ জাতীয়তা ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা, হিন্দুর ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা'র সঙ্গে এ জাতীয়তার নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে, অথবা বলা যেতে পারে যে ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকেই এ জাতীয়তা-বোধের উদ্ভব। ভারতবর্ষের বিভেদ-বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নবীনচন্দ্র এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এ ধর্ম, হিন্দুধর্ম, এ জাতি হিন্দুজাত; এবং এ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যে উক্তি— পৃথিবী যখন পাপভারে প্রপীড়িত হবে তখন মানবরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটবে। এই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র আদর্শ অনুসরণ করেই এ কাব্য রচিত। এ কাব্য-ত্রয়ীকে অনেকে উনবিংশ শতাব্দীর 'মহাভারত' বলে আখ্যাত করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই নব-মহাভারতের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

মহাকাব্যের জন্য কল্পনার যে বিস্তার এবং আবেগের অগ্নিদাহ প্রয়োজন, ত্রয়ী কাব্যে তার কোনও পরিচয় নেই, শব্দ ব্যবহার দুর্বল এবং মহাকাব্যের উপযুক্ত নয়।

www.icsbook.info

চরিত্র বাস্তবতা-রহিত এবং সজীব নয়। ঐতিহাসিক আবহসুশৃঙ্খলরূপে নির্মিত হয়নি। অর্থাৎ এক কথায় কাব্য-কৌশলের ক্ষেত্রে তিনি কোনও বিশিষ্টতা সম্পাদন করতে পারেননি।

নবীনচন্দ্র সেনের ধর্মানুরাগের পরিচয় আমরা 'চণ্ডী' ও 'গীতার'অনুবাদে এবং 'চৈতন্য কাব্যে' পাই। 'চৈতন্য' রচনা অবশ্য কবি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এছাড়া সাধারণভাব সকল ধর্মের মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। যীশুখ্রীস্ট এবং বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বন করে 'খ্রীস্ট' ও 'অমিতাভ' নামক দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন, হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বন করেও কাব্য রচনা করবার তাঁর ইচ্ছা ছিল।

নবীন সেনের রচনাশৈলী, ছন্দরীতি এবং বাকবিন্যাস বিশ্লেষণ করবার পূর্বে Style-এর প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। যে উপাদান অবলম্বন করে ছন্দোবদ্ধ পদ রচিত হয়, তার সৌন্দর্য, যথাযথ প্রয়োগ এবং বিশিষ্টতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। মনোবিজ্ঞান অথবা দর্শন শাস্ত্রে আমাদের বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি স্পষ্ট হয় এবং বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু কাব্যের বহিরাবরণ অথবা আঙ্গিক কতটা শিল্পায়ত্ত হয়েছে তা আমাদের জানতে হয়। এই আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে প্রথমত শব্দচয়ন। কবি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তা থেকে শব্দচয়ন করে থাকেন, সুতরাং এই শব্দে একদিকে যেমন আশ্চর্য সঙ্গতি থাকে অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের প্রতি একটা নৈকট্য থাকে। নবীনচন্দ্র সেন গণগ্রাহ্য শব্দ এবং তাদের আবেদনের ওপর নির্ভরশীল সহজ ভাবনা-ধারণাকে কাব্যের উপাদান করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার উপাদান কখনও লক্ষ্যগোচর থাকে না। যে সমস্ত প্রস্তরখণ্ডের সমবায়ে অথবা বর্ণের সমবায়ে যথাক্রমে স্থাপত্য এবং চিত্রকলার ভিত্তি পত্তন হয় তারা অন্তরালেই থাকে—কাব্যে উপাদান চিরকালই দৃষ্টির এবং বোধের দ্বারা নির্ণীত থাকে। সুতরাং কবিকে অন্তরাল খুঁজতে হবে অন্যভাবে। প্রতিটি শব্দ ব্যাকাংশ, পূর্ণ ব্যাক্য এবং স্তবকের মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক থাকবে এবং ইংরেজীতে যাকে বলে logical progression অর্থাৎ যৌক্তিক বিন্যাস এবং গতি স্পষ্ট হবে। মধুসূদনের মধ্যে আমরা আশ্চর্য বাকবৈদগ্ধ লক্ষ করেছি। শব্দচয়নের যথার্থতা এবং প্রযুক্ত শব্দগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং বৈপরীত্য রক্ষা মধুসূদনের বিশিষ্টতা। নবীনচন্দ্র সেনের মধ্যে এটা নেই।

দ্বিতীয়ত, শব্দবিন্যাস। শিল্পকে কেউ কেউ দুভাগে ভাগ করে থাকেন— সাদৃশ্য বা অনুকারী শিল্প বা অনুভবাত্মক শিল্প। ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নাট্যকলা এগুলো সাদৃশ্যশিল্প এবং সংগীত ও নৃত্যের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প অনুভবাত্মক। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিল্পের কর্তব্য হচ্ছে Pattern বা রূপকল্প তৈরী করা—এই Pattern বর্ণ, ধ্বনি, বোধ এবং রেখা দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। কাব্য-শিল্পীকে সূক্ষ্মভাবে শব্দ নিয়ে জাল বয়ন করতে হয়। কাব্যে প্রত্যেক বাক্য বা শব্দ ও বাক্যাংশের ধারায় ক্রম-পরিণতি লাভ করে একটি গ্রন্থি রচনা করে, ক্ষণকাল নিরবলম্ব থেকে অবশেষে আপনাকে অভিব্যক্ত করে। শব্দবিন্যাসে এই কৌশল নবীনচন্দ্র সেনের ছিল না। শব্দ আমাদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করে, কৌতূহল উদ্রেক করে এবং আকস্মিকতার আভাস আনে। শব্দের মধ্যে এই কৌতূহল এবং আকস্মিকতার সম্পাদন করা নবীনচন্দ্র সেনের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি।

www.icsbook.info

.বীনচন্দ্র সেন প্রধানত অনুপ্রাস এবং

তৃতীয়ত. বাক্যাংশের এবং শব্দের গ্রাস পেয়েছেন, শব্দের মধ্যে অন্য কোন শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা ধ্বনিতরঙ্গ স´

উপায়ে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতে প্রময়ের এবং তাঁদের পরবর্তী অন্যান্য মহাকাব্য

হেমচন্দ্র. নবীনচন্দ্র এ হচ্ছেন রাজকৃষ্ণ রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রচয়িতাদের মধ্যে উমেচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনেশচরণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কায়কোবাদ, হামেদ আলী এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। দ্বিজেন্দ্রনাথ যে উনিশ শতকের তা নয়, অনেকেই বিশ শতকের এবং রবীন্দ্রনাথের এঁরা স কিন্তু মহাকাব্যের গোত্রভুক্ত বলেই আমরা এঁদের কথা পূর্বাহ্নে উল্লেখ করলাম।

হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের অনুসারী হিসেবে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) সাময়িক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঈশানচন্দ্র হেমচন্দ্রের ভ্রাতা। তার 'যোগেশ কাহিনী' কাব্যে একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শিল্পকর্ম হিসেবে 'যোগেশ' একটি দুর্বল রচনা। কিন্তু বেদনা ব্যাখ্যায় কোথাও কোথাও আন্তরিকতার পরিচয় আছে।

আনন্দচন্দ্র মিত্র
(১৮৫৪-১৯০৩)

ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র মিত্র। আনন্দচন্দ্র দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। শেষ জীবনে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হোমারের 'ইলিয়দ' অবলম্বনে আনন্দচন্দ্র মিত্র 'হেলেনা কাব্য' নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেন। এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৮৭৮ সালে।। 'ভারতমঙ্গল' নামে অন্য একটি মহাকাব্য রচনায় তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এর পূর্ব খন্ড মাত্র প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে।

এ-মহাকাব্যের নায়ক রাজা রামমোহন রায়। ভূমিকায় আনন্দচন্দ্র লিখেছিলেন, "ইংরেজাধিকৃত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনে. প্রাচীন ভারতের ভক্তি, বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে, আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান, প্রেম ও কর্মশীলতার সংযোগ হইয়া নিঃশব্দের যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে ভারতের ব্রাহ্মসমাজ তাহারই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। বিধাতার কৃপার ফলে যে মহাপুরুষ ভারতে অভ্যুদিত হইয়া এই মহাবিপ্লবের অধিনায়করূপে কার্য্য করিয়াছেন সেই রাজর্ষি রামমোহনও এহেন মহাবিপ্লব লইয়া কাব্য লিখিতে উদ্যত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই।"

'হেলেনা' কাব্যের অমিত্রছন্দের বিন্যাসে মধুসূদনের অনুকৃতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যযোগ্য কিন্তু শব্দ-ব্যবহার তরল এবং তাৎপর্যহীন। এছাড়াও তিনটি খন্ড কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন-'প্রেমানন্দ কাব্য', 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা' ও 'মাতৃমঙ্গল'।

www.icsbook.info

ায়কোবাদ

যদিও কায়কোবাদ তাঁর জীবনের প্রা১৯৫২)
করেছেন তবু তিনি মূলত উনবিংশ শতাব্দীরই কাল বিংশ শতাব্দীতে অতিবাহিত হেমচদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যধারার সঙ্গে কায়কোন্থী কবি। নবীনচন্দ্র সেন এবং শতাব্দীর কাব্যের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর কার্ধনিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। বিংশ তিনি বর্তমান রুচি এবং আদর্শের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক পরিবর্তন করেন নি। বিগত শতকেরই ধারণা-বাসনার পোষকতা করেছিলেন। ব চেষ্টা না করে

কায়কোবাদের কাব্য-জীবনকে আমরা তিন পর্যায়ে ভাগ করতে পর্যায় গীতি-কাব্যের—১৮৭০ থেকে ১৮৯৪পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। দ্বিত প্রথম মহাকাব্যের— ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সর্বশেষ তৃতীয় পর্যায় আমরা কাব্য-বৈচিত্র্যের যুগ বলতে পারি। এসময় তিনি খন্ডকাব্য, কাহিনীকাব্য, ধর্মাবেগপূর্ণ মহাকাব্য এবং জাতীয় গীতি গুচ্ছ রচনা করেছিলেন। ১৯১৫ থেকে আরম্ভ করে কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ পর্যায়ের ব্যাপ্তি।

কায়কোবাদের কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে আমরা তিনটি কাব্যগ্রন্থকে পাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিরহ বিলাস প্রকাশিত হয়। তখন কবি অল্প বয়সী বালক মাত্র-মাত্র ১২ বৎসর বয়স। এ বয়সে জীবন যৌবনের কোনও প্রকারের অভিজ্ঞতাই কারও হতে পারে না। বিরহের অভিজ্ঞতা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু গ্রন্থের নাম 'বিরহ বিলাস' থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এখানে বিরহকে নিয়ে বিলাপ করাই হয়েছে, বিরহের কোনও উপলব্ধি নেই। এসময়কার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কুসুম কানন' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখনও কবি বালকসুলভ চাপল্য অতিক্রম করেন নি। সুতরাং গতানুগতিক পথে নিছক অনুকরণ করেই তাঁকে প্রেম, বিরহ ও বেদনার কাব্য রচনা করতে হয়েছে। এ পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালা ' ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'অশ্রুমালা' সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তার কারণ উনিশ শতকে যখন মুসলমান সাহিত্যিকদের যথার্থ অভাব ছিল এবং মুসলমান যখন বাংলা সাহিত্যকে অনেকটা ঘৃণাই করত, সে সময়ই এ নতুন কাব্যের প্রচার হয়। সে সময়কার হিন্দু কবি সাহিত্যিকরাও এ গ্রন্থকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন, তার কারণ কবির ভাষা 'বিশুদ্ধ' এবং 'প্রাঞ্জল' ছিল। 'বিরহ বিলাপ' এবং 'কুসুম কানন' কাব্য দুটিতে হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিনী' এবং নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রভাব এবং অনুকরণ আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু 'অশ্রুমালার' আত্মগত ভাব-উচ্ছ্বাস যথার্থ আন্তরিক। 'বিরহ বিলাস'এবং 'কুসুম কাননের' ভাষা অত্যন্ত সহজ, বক্তব্য আভরণহীন এবং আবেগ দ্বিধাশূন্য। কিন্তু 'অশ্রুমালা'য় আমরা বিরহ তাপিত মনের একান্ত ক্রন্দন লক্ষ্য করেছি। 'অশ্রুমাল'র 'প্রিয়তমার প্রতি', 'সেই মুখখানি' 'নীরব রোদন', 'প্রেমের স্মৃতি', 'ভুলিলে কেমনে', 'উদাসীন প্রেমিক' ইত্যাদি কবিতায় প্রণয়ক্ষেত্রের বঞ্চণা এবং প্রণয়-রঞ্জিত জীবনের প্রগাঢ় বেদনার পরিচয় আছে।

কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' যখন প্রকাশিত হয় তখন মুসলমান সমাজে দোভাষী পুঁথির প্রচলন খুব বেশি ছিল। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান এ পুঁথি পাঠ করে আনন্দ পেত এবং শালীন মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যের সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তা

www.icsbook.info

বলা চলে না। ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে কবিওয়ালাদের যুগের অবসান ঘটে, কিন্তু দোভাষী পুঁথির অবসান ঘটে নি। নতুন যে পরিবর্তিত সমৃদ্ধবান ধারায় সাহিত্য পবহমান হল সে ধারার সঙ্গে মুসলমানদের বিশেষ কোন সম্পর্ক রইল না। এই, পরিপ্রেক্ষিতে কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা'র আবির্ভাবকে বিচার করলে কায়কোবাদকে আমাদের যথেষ্ট মর্যাদা দিতে হয়।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই বৃটিশ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা শহর। তখন থেকেই স্বাধীন চিন্তা, নতুন ইউরোপীয় শিক্ষা ও ধর্মালোচনার সূত্রপাত হয়। হিন্দু সমাজ এই পরিবর্তিত জীবনকে আপন উন্নতির অনুকূল ভেবেছিল এবং এ জীবনকে অবলম্বনও করেছিল। এ নতুন শিক্ষা মুসলমানদের জীবনে সহজে সাড়া জাগায়নি। ১৮৬৩ সালে সর্বপ্রথম একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় 'Muhammedan Literary Society' নামে। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজে স্বাধীন আলোচনার সূত্রপাত করা সমাজনীতি, ধর্ম এবং সাহিত্য সম্পর্কে। নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ নেবার জন্য অনুরোধ করেন। বৃটিশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার যে প্রয়োজন আছে তা তিনি বিশেষভাবে বলেন। এরই পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমীর আলীর 'Spirit of Islam' গ্রন্থ প্রকাশএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ গ্রন্থে আমীর আলী নতুন শিক্ষার আলোতে ইসলামের কোনও প্রকারের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। তিনি বলেছেন ইসলাম তার প্রাথমিক অবিকৃত রূপেই মুসলমানদের নিকট চিরকালের জন্য গ্রহণযোগ্য। হযরত মুহম্মদের জীবন প্রত্যেক মুসলমানের কাছে একমাত্র আদর্শ জীবন। সুতরাং মুসলমানদের কল্যাণ যথার্থভাবে তখনই সম্ভবপর যখন তাঁরা ইসলামকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন। ইসলামই মুসলমানদের উন্নতির সহায়ক এবং চিরদিনকার জন্য কল্যাণ-বাহী।

কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় আমরা মুসলমানদের প্রাচীন সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে কবিকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছি। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা কবিকে বেদনার্ত করেছে তাই তিনি অতীতের সমৃদ্ধমান যুগকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। 'শ্মশান সঙ্গীত', 'সিরাজ সমাধি', 'মোসলেম শ্মশান' ইত্যাদি কবিতায় কবি মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা ও বর্তমানের দুর্দশার কথা বলেছেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে নবীনচন্দ্র সেন 'অশ্রুমালা' সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রকাশ করেন, "মুসলমান যে বাঙ্গলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গলা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যেদিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়, আপনার 'অশ্রুমালা' তাহার প্রভাত শিশিরমালা স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।" -নবীনচন্দ্রের কথায় একটা সত্য স্পষ্ট হচ্ছে যে তখনকার দিনের শিক্ষিত হিন্দুসমাজ মনে করতেন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

www.icsbook.info

উপর অধিকার একমাত্র তাঁদেরই মুসলমান যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারে এ তাঁদের বিশ্বাসের বাইরে ছিল। হিন্দুদের এহেন ধারণার আরও কয়েকটি নজির দিচ্ছিঃ

১. বঙ্গবাসী পত্রিকা, ২১শে ভাদ্র ১৩০৩ সালের সংখ্যায় "মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না।"

২. স্বারস্বতঃ "কবি কায়কোবাদ মুসলমান । কিন্তু তাঁহার বাংলা মুসলামানী নহে।"(১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪)

৩. ঢাকা গেজেট "কবি মুসলমান হইয়া ও বিরহিনী রাধার দুঃখে ম্রিয়মাণ, মুসলমান হইয়াও নির্বাণের মন্ত্রে বিমোহিত, মুসলমান হইয়াও বিধবার বৈধব্যে সমব্যথী।" (১৮ ই চৈত্র, ১৩০২)

কায়কোবাদের কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়কে আমরা 'মহাশ্মশানে'র যুগ বলতে পারি। 'মহাশ্মশান' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রচনা আরম্ভ হয় অনেক আগে এবং গ্রন্থের প্রথম কয়েক সর্গ রওশন আলী চৌধুরীর 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত কায়কোবাদ অন্য কোনও গ্রন্থ রচনায় হাত দেননি, একই মহাশ্মশানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। কবি নিজে এ-কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং এ কাব্যের বিশিষ্টতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

১. মুসলমানগণ বীরপুরুষ, হিন্দুগণও বীরপুরুষ, এই দুই বীর জাতির হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্ব কালের অক্ষয় পটে লিখিয়া গিয়াছেন, তবে হিন্দুগণ বিজিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয়গৌরবে সম্মানিত। এক জাতি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলিদান করিয়াছেন, অন্য জাতিও দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বজাতির কল্যাণের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

২. 'অশ্রুমালা' যখন লিখি, তখন আমার হৃদয়টি নন্দন কাননের মত ফুলে ফলে ও মঞ্জরী মুকুলে সুশোভিত ছিল। 'মহাশ্মশান' স্বর্গ, 'অশ্রুমালা' মর্ত। এ দুইখানি কাব্য স্বর্গমর্ত প্রভেদ। 'অশ্রুমালা'তে কেবল কবির অশ্রুজল, আর 'মহাশ্মশানে' হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতির চিতাভস্ম।

৩. ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য সংবলিত একটি যুদ্ধকাব্য।

৪. অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বিশেষভাবে 'মহাশ্মশান' সম্বন্ধে কায়কোবাদের এ সমস্ত সমস্ত মন্তব্য ছাড়াও সাধারণভাবে কাব্য সম্পর্কে কায়কোবাদের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কায়কোবাদ বলেছেন ঃ

'কবি হওয়ার ক্ষমতা মানবের আয়ত্ত নহে, উহা ঈশ্বরদত্ত। কবিতা প্রাণের জিনিষ, প্রাণের উপরেই উহা ক্রিয়া করে। কবিতা হতাশ মানব হৃদয়ের নিভৃত মনোময় প্রান্তরে এক স্বর্গীয় প্রেমের প্রস্রবণ ফুটাইয়া দেয়। মহাকাব্যের বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে, কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন গঠন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া মাল মসলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ

www.icsbook.info

করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ সবগুলিই পৃথক, এই পৃথকত্বের মধ্যেই আবার একত্ব, ইহাই কবির নতুন সৃষ্টি ও রচনা কৌশল। ইহাই মহাকাব্য।'

কবি ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'মহাশ্মশান'কে মৌলিক মহাকাব্য বলেছেন। 'মহাশ্মশানে'র পূর্বে যে সমস্ত মহাকাব্য বা কাব্য বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে সেগুলির কোনও কোনওটা ইতিহাসকে অবলম্বন করে। কিন্তু কোনওটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ঐতিহাসিক মহাকাব্য নয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' একটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তীকে অবলম্বন করে রচিত কাহিনী কাব্য ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' জাতীয় আবেগমূলক ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্য। একমাত্র ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ ' ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শিবাজী' ঐতিহাসিক মহাকাব্য। কিন্তু এ দুটি কাব্যই 'মহাশ্মশানে'র পরবর্তী। অধিকন্তু যোগীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কায়কোবাদের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কায়কোবাদ যেখানে ইতিহাসকে অবিকৃত রাখবার পক্ষপাতী, যোগীন্দ্রনাথ বসু সেখানে প্রয়োজন অনুরূপ মনোকল্পিত ঘটনা এবং চরিত্র প্রবর্তন করেছেন। পূর্বাপর সম্বন্ধে যা সঙ্গত ও কাব্যোপযোগী বোধ হয়েছে সেরূপ সন্নিবেশিত করেছেন।

কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান'কাব্য পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লিখিত। ৮৭০ পৃষ্ঠার এই বিপুলায়তন কাব্যগ্রন্থে কবি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির একটি চরম সংকটকে গ্রন্থের কেন্দ্রীভূত আবেগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইতিহাসই এর একমাত্র প্রতিপাদ্য। বিষয় নয়, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচিত্র প্রণয়-ব্যাখ্যা দানা বেঁধে উঠেছে। দীর্ঘ পরিসরের গ্রন্থে ইতিহাসই একমাত্র আবেগ হলে কাহিনী পীড়াদায়ক হত। কিন্তু বৈচিত্র্য আছে বলেই একই ছন্দে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কাব্যটি পীড়াদায়ক বলে মনে হয় না। আর একটি বিশিষ্টতা কায়কোবাদের এই এবং যেদিক থেকে কায়কোবাদ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এঁদের প্রত্যেকের অনেক উর্ধ্বে তা হচ্ছে কবির পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িকতা। যে আবেগে তিনি মুসলমানের মনোবেদনা বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ আবেগে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর আবেগে হিন্দুদের মনোবেদনা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যের ভূমিকায় এক স্থানে বলছেন যে হিন্দু মুসলমান উভয়ে একটি চরম আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত এবং উভয়েই বীর এবং ধর্মপ্রাণ। হিন্দুকে দুর্বল করে অঙ্কিত করলে শক্তিমান মুসলমানের কোনও গৌরবের কারণ হত না, কেননা শৃগালের সঙ্গে যুদ্ধে সিংহের কোনও গৌরব নেই। তাই উভয়কেই সমশক্তিমান বলে অঙ্কন করতে হবে। হিন্দু ও বীর, মুসলমানও বীর । 'মহাশ্মশানে' এই উভয় জাতিরই বীরত্বের প্রশংসা আছে।

কায়কোবাদের কাব্যজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়ের ব্যাপ্তিকাল ১৯১৫ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। এ পর্যায় কবির কাব্য-বৈচিত্র্যের সময়। এসময় তিনি অনেক খন্ডকাব্য, কাহিনীকাব্য, ধর্মাবেগপূর্ণ মহাকাব্য এবং জাতীয় গীতিগুচ্ছ রচনা করেছেন। এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলির নাম হচ্ছে- 'শিব মন্দির' (১৯১৭) 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), 'শ্মশান ভস্ম' (১৯২৪), 'মহরম শরীফ' (১৯৩৩)। এছাড়া 'উপদেশ রত্নাবলী' এবং 'হযরত গাওস পাকের জীবনী' এ দুটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

www.icsbook.info

এ পর্যায়ের মূল সুর হচ্ছে সত্যানুসরণ, ধর্মবোধ এবং স্বাজাত্যপ্রীতি। এ সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির একটি অদ্ভুত বিরূপতার পরিচয় পাই এবং এ বিরূপতাই যেন কবিকে আরও বেশি করে সত্যনিষ্ঠ করেছে। 'মহরম শরীফে' কবি সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মত প্রচলিত ইতিহাসের সংশোধন করেছেন, এবং যথার্থ সত্যকে অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে কাব্যগত সৌন্দর্য বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ইতিহাসের সত্য। বর্তমান শতকের বুদ্ধির মুক্তিকে কবি স্বীকার করেন নি। এ যুগের পরিবেশ এবং মানুষকে তিনি যথেষ্ট বিদ্রুপ করেছেন। 'অমিয়ধারা'য় 'কলির অদ্ভুত জীব' নামক কবিতায় এব ভাবটি স্পষ্ট হয়েছে। কবির অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'উপদেশ রত্নাবলী' ও 'হযরত গাওস পাকের জীবনী' কবির ধর্মবোধের কথা আরও সুস্পভাবে তুলে ধরেছে। কবির অন্যান্য অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'প্রেমের ফুল' (৪৮টি খন্ড কবিতা); 'প্রেমের রাণী ও নিহারবালা' (কাহিনীকাব্য' ৪ খন্ডে সমাপ্ত) 'জোবেদামহল কাব্য' (কাহিনীকাব্য, ৪ খন্ডে সমাপ্ত); 'মন্দাকিনী ধারা (খন্ড কবিতা)।

কায়কোবাদ বিশ্বাস করতেন, কবিতা শ্রুতিমধুর হবে, প্রাঞ্জল হবে, কোমল হবে এবং তরল হবে। তিনি মনে করতেন কবিতার ভাষা ও ছন্দে কোন বাধা বিঘ্ন ও জটিলতা থকবেনা। এখন অবশ্য এ বিশ্বাসের দিন আর নেই। এখন সময়ের , কর্মের এবং জীবনের জটিলতার কারণে কবিতাও জটিল হয়েছে, প্রকাশভঙ্গীতে নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য এসেছে। কায়কোবাদ শেষ জীবন পর্যন্ত কাব্যভাবের এ পরিবর্তনটাকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি নিজের সততায় এবং বিশ্বাসে একটি সহনশীল নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করে গেছেন। সময়ের পরিবর্তনকে মান্য করতে পারেন নি।

কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। অল্প কিছুকাল কলকাতা মাদ্রাসায় এবং ঢাকায় শিক্ষা লাভ করে গ্রামে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রামের পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার হয়েই জীবন কাটান। শেষ জীবনে অসুস্থতার জন্য ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

(১৮৭৯ -১৯৩১)

উনিশ শতকের শেষার্ধ মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণ। এ সময়েই ইসলাম ধর্মের প্রতি বাঙালী সাহিত্যিকদের একটা সজাগ মনোভাবের পরিচয় পাই। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইসলাম ধর্মীয় বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের প্রকাশ হতে থাকে এগুলোকে আমরা ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করব না, কিন্তু সে যুগের চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত হতে হলে এ গ্রন্থগুলি আমাদের বিচারের বিষয়ীভূত করতেই হবে। তখন একটা আশ্চর্য স্পৃহা জেগেছিল মুসলমান সমাজের মধ্যে ইসলামকে জানবার এবং ইসলামের আদর্শকে অবলম্বন করবার এ সময়কার প্রভাবশালী গ্রন্থ অবশ্য আমীর আলীর 'Spirit of Islam'। গ্রন্থটি ইংরেজিতে রচিত হলেও শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের উপর এ গ্রন্থের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এর পরে আমরা একই ধর্মীয় ধারায় এবং সমৃদ্ধমান ইসলামী ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মোজাম্মেল হক, মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শেখ আবদুর রহিম, পন্ডিত রিয়াজুদ্দিন

www.icsbook.info

মাসহাদী এ সব সাহিত্য সাধকের পরিচয় পাই। এঁদের সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে ধর্মের আবেগ ছিল এবং অনিবার্যভাবে ইসলামের ইতিহাস সক্রিয় ছিল। এঁদের সকলের মধ্যে সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাষায় মুসলমানদের জাতীয় জীবন এবং সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের আল ইসলাম পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'সাহিত্যশক্তি এবং জাতি সংগঠন' সম্পর্কে ইসমাইল হোসেন শিরাজী নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন ঃ

"বর্তমানে বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য আমাদিগের জড়তাপূর্ণ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে। জাতীয় ভাষা আরবী এবং তৎসহ পারসী ও উর্দু হইতে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রাদির অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতিহাস মুসলমান জাতির প্রাণ স্বরূপ । জাতীয় ইতিহাস এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যতীত মুসলমানদিগের মৃতদেহে শক্তি সঞ্চারের অন্যকোন উপায় নেই।

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সেবকগণ। সাবধান এবং সতর্ক হও। অনুকরণ করিতে যাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িও না। ইসলামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া ভ্রমেও সাহিত্য সেবা করিও না। যদি বঙ্গ সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও, যদি সাহিত্য শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবনতরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও, যদি বঙ্গ সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও কুশল কামনা কর, তাহা হইলে সর্বপ্রকারের কুচিন্তা, কুকল্পনা, ভীরুতা ও দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও; বদ্ধপরিকর হও। সুচিন্তার উদ্যানে উচ্চ কল্পনার স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বায়ুতে ইহাকে বিচরণ করিতে দাও। জগতের যাবতীয় ধর্মবীরদিগের পবিত্র জীবনীর সৌন্দর্যরাশি সাহিত্যে প্রতিফলিত কর। পুরাবৃত্তের দৃশ্য প্রকটন করিয়া মানব জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন্ কোন্ গুণে উন্নত এবং কোন্ কোন দোষে অধঃপতিত বা ধ্বংসের আবর্তে পতিত হইয়াছে তৎসমুদয় দেখাইয়া দাও। প্রাণের উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের তেজে, সত্যের প্রচারে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ কর। দেখিবে সাহিত্যশক্তির ঝটিকা প্রভাবে অচিরেই জাতীয় জীবন মেঘোমুক্ত হইয়া সৌভাগ্যশশীর অমল ধবল কৌমুদী ছটায় আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্যে সুশোভিত হইয়াছে।"
(আল্ ইসলাম, পৃঃ ৫৩, বৈশাখ)

এ আদর্শ সামনে রেখে ইসমাইল হোসেন শিরাজী তাঁর 'অনলপ্রবাহ' কাব্য প্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'অনল প্রবাহ', 'মূর্চ্ছনা', 'বীরপূজা', 'অভিভাষণ: ছাত্রদের প্রতি', 'মরক্কো সংকটে' 'আমীর আগমনে', 'দীপনা', 'আমীর অভ্যর্থনা' এই নয়টি কবিতা নিয়ে 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থে এ কবি মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার কথা চিন্তা করেছেন এবং অধিকারী ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'অনল প্রবাহ', এ হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারত বিলাপ' ইত্যাদি কবিতার ছাপ আছে। 'অনল প্রবাহ' বক্তব্য প্রধান আবেগবহুল কাব্য, তাই শব্দ ব্যবহারে শিল্পগত অচেতনতা অত্যন্ত বেশী পরিস্ফুট। মুসলমানদের অলস নির্লিপ্ত জীবন কবিকে পীড়িত করেছে এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনকামী সংস্কারকের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

www.icsbook.info

"ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবগণ!
মোস্‌লেমের অভ্যুত্থানে ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি জাগাতে জাতীয় প্রীতি
অনল প্রবাহখানি করিয়া রচন
বড় আশে বড় সাধে দিনু তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।
আবার উত্থান লক্ষ্যে বহাঁও জগত বক্ষে
নব জীবনের খর প্রবাহ প্লাবন।
আবার জাতীয় কেতু উড়াও মুক্তির হেতু
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে 'অনল প্রবাহ'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন।

ইসমাইল হোসেন শিরাজীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'স্পেনবিজয় কাব্য' এবং 'মহাশিক্ষা কাব্য'। 'স্পেনবিজয় কাব্য'–স্পেনের সম্রাট রডারিকের সঙ্গে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শিরাজী মুসলমানদের বলিষ্ঠতা, ন্যায়পরায়ণতা, অকুতোভয় এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও গঠন কৌশলের দিক থেকে 'মেঘানাদবধের' অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে তবুও কাব্য নির্মাণের কৌশলের দিক থেকে কবির বিশিষ্টতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

'স্পেনবিজয় কাব্য' ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'স্পেনবিজয় কাব্য' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"তিমির বসনা নিশা নক্ষত্রকুন্তলা
বিদায় হইল এবে। কুসুমভূষণ
শুভ্রজ্যোতি রক্তাঞ্চলা উষা বিনোদিনী
বিনোদিতে ভূমন্ডলে। মৃদু প্রভঞ্জন
চুম্বি ফুলকুল গন্ধ, বহিলেক মন্দ,
ঈশ আশীর্বাদ বিশ্বে কির বিতরণ।
সুধাকণ্ঠ পক্ষিকুল মধুর কুজনে
ঢালিল পীযূষধারা প্রকৃতির প্রাণে
আনন্দ উল্লাস যেন হিল্লোলে হিল্লোলে
বহিল বিশ্বের বক্ষে নব জাগরণে।"

অন্যত্র

"প্রভাত হইল নিশা' উষার কিরণ,
পূরব আকাশ প্রান্তে দিল দরশন,
ফুটিল কুসুমবালা, বহিল পবন
ধীরে ধীরে ধীরে।
সুরঙ্গ বিহঙ্গগণ মধুর কুজনে

www.icsbook.info

সঞ্চারিল প্রাণ যেন নির্জীব ভূবনে,
নীলাকাশে মেঘমালা বিবিধ বরণে
শোভে থরে থরে।"

অন্যত্র

"অবতরি, মূর সেনা গিরি পাদমূলে'
ভূমধ্যসাগর তীরে স্কন্ধবার শ্রেণী
সংস্থাপিল নানা ভাতি। সীমান্ত রক্ষক
স্পেনীয় সৈনিকদল ভীম পরাক্রমে
আক্রমিল মূর সৈন্যে। তুমুল সংগ্রাম
বাধিল উভয় দলে। আরব সেনার
প্রচন্ড অসহ্য বীর্যে স্পেন সেনাদল
সীমান্তের গিরিদুর্গ করি পরিহার
পলাইল প্রাণ ভয়ে। আনন্দে আরবী
মাতিল মৃগয়ারঙ্গে রণ জয়োল্লাসে।
নবীন যুবক বীর কুমার আবদুল্লা
(সেনাপতি তারেকের স্নেহের আত্মজ)
লয়ে সঙ্গ পঙ্কজলে নিবিড় কাননে
পশিলেক মৃগকুল সন্ধান মানসে।
কিছুদূর অগ্রসরি শুনিয়া আবদুল্লা
আছে এক মহাবন ঈষৎ পশ্চিমে
মৃগকুল পরিপূর্ণ। শুনিলা যুবক
চলিলা সে বনপথে অশ্ব আরোহণে।"

'মহাশিক্ষা ' কাব্য 'আল ইসলাম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল। 'মহাশিক্ষা' কারবালার ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ঘটনার ক্ষেত্রে কবির উপাদান ছিল 'বিষাদসিন্ধু'। এবং সে কারণেই এতে যথেষ্ট অনৈতিহাসিক ঘটনার অন্তর্প্রবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন বন্দনা এবং ঘটনার নাটকীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে 'মেঘনাদবধ' এ অনুকৃতি পাই। কাব্যটি জাতীয় উন্নয়নমূলক। বন্দনা অধ্যায়ে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বলছেন ঃ

"হে খোদা, লীলার সিন্ধু, ইচ্ছায় তোমার,
শিক্ষা দিতে নরকুলে অপূর্ব শিক্ষায়
বীরেন্দ্র কুল কেশরী, রাজর্ষি হোসেন,
(মহানবী মোস্তফার নন্দিনী নন্দন,
বীরেশ কুলের ত্রাস আলীর অঙ্গজ।)
অনন্ত কল্যাণপ্রসু প্রজাতন্ত্র প্রথা,
ধর্মের মর্যাদা আর স্বাধীনতা হেতু:
দেখাইলা সেই দৃশ্য, সেই আত্মত্যাগ,
যে ভীষণ বীরধর্শ কঠোর প্রতিজ্ঞা,
সত্যে অবিচল নিষ্ঠা, ন্যায়ের গৌরব,
বিশ্বাসের দীপ্ততেজ, অতুল সাধনা,

www.icsbook.info

অক্লান্ত অসীম ধৈর্য, তীব্র উন্মাদনা,
অতুল অক্ষয় তাহা কবীন্দ্র কুলের
চির অভিরাম ধন।"

'মহাশিক্ষা' সম্পর্কে আবদুল কাদির লিখেছেন, "যতদূর মনে পড়ে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিরাজী সাহেবের 'অনল প্রবাহ' পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয় এবং তাহার মূল্য রাখা হয় আট আনা। এক বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গেলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়; কিন্তু তৎকালীন বাংলা সরকার বইখানি বাজেয়াফত করেন। ১২৪, ১৫৩ ও ১৭৭ ধারা অনুসারে শিরাজী সাহেবের প্রতি পরোয়ানা জারি হইলে তিনি কিছুদিন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া 'মহাশিক্ষা' কাব্যখানি রচনা সমাপ্ত করেন (২১শে আষাঢ়, ১৩১৭)। তিনি কাব্যখানির উপসংহার করেন এভাবে ঃ

" অনন্তর আলীজাদা সুশৃঙ্খল করি
বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যের বিপুল ঘটায়
জয়নাল নগিনা তরে আনন্দ উল্লাসে
বাঁধি পরিণয় পাশে ফিরিল স্বরাজে
ভাসিয়া আঁখির নীরে 'হা হোসেন' বলি।
অভাগা বঙ্গের কবি শোকার্ত শিরাজী
অনাহারে অনিদ্রায় সহি নানা ক্লেশ
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষে বিধি কৃপা বলে
এইখানে মহাশিক্ষা করিলেক শেষ।"

ইসমাইল হোসেন সিরাজী কাব্য এবং সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন নিছক সাহিত্য প্রীতিতে নয়। জাতির কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ এবং মুসলমান সমাজভূক্ত মানুষের কল্যাণ তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় এর প্রমাণ আমরা পাই।

হামিদ আলী

হামিদ আলী চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অর্ন্তগত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

হামিদ আলী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যোপাখ্যান রচনা করেছেন, যেমন 'কাসেমবধ কাব্যে', 'জয়নাল উদ্ধার কাব্য' এবং 'সোহ্‌রাববধ কাব্য'। খন্ড কাব্য হচ্ছে 'কবিতাকুঞ্জ' ও 'ভ্রাতৃবিলাপ'। যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হন, তা তাঁর নিজের ভাষায় এইরূপ "হিন্দু দেবদেবীর উপাখ্যান ও অর্বনাবিহীন কোন একটি প্রসিদ্ধ চিত্তাকর্ষক ঘটনা অবলম্বনে মুসলমান পাঠকদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি ও মনোরম কাব্য গড়নই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।"

নিম্নে 'সোহ্‌রাবধ কাব্য' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"এত বলি বীর
ধরিল সবলে রুস্তমের বাহুদ্বয়;
আকর্ষিলা মহাতেজে করিতে নিক্ষেপ

www.icsbook.info

ভূমে তায়; যথা দুই প্রমত্ত কুঞ্জর
আপনা পাসরি, হয় ক্রীড়াতে প্রমাণ
শ্রেষ্ঠত্ব আপন, সেইরূপ উভয়বীর
বিবিধ কৌশলসহ হয়ে আত্মহারা
যুঝিলা। বসুধা আজি বীরপদভরে,
বীরদর্পে, বীরলম্ফে, বীরের হুঙ্কারে
কম্পমান টলমল, যেন ভূকম্পনে
ঘন ঘন ধরাতল অস্থির, চঞ্চল।"

যোগীন্দ্রনাথ বসু

(১৮৫৪ ১৯২৭)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী লেখক হিসেবেই আমরা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নামের সঙ্গে পরিচিত। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি মধুসূদনের জীবন কাহিনী বিবৃত করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণার পরিচয় আছে। মধুসূদনের জীবন কথা বিন্যাস করতে গিয়ে তিনি মহাকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং মধুসূদন প্রবর্তিত ছন্দের উদ্দীপনামূলক দুটি ঐতিহাসিক মহাকাব্য রচনা করেন। 'পৃথ্বীরাজ' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে এবং 'শিবাজী' প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। ইতিহাসকে অবলম্বন করে ও প্রচুর কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশে কাব্য দুটিতে উপভোগ্য গল্প নির্মাণের প্রয়াস আছে। এগুলোকে মহাকাব্য না বলে দীর্ঘ কাহিনী কাব্য বলাই সঙ্গত। যে সময় কাব্য দুটি প্রকাশিত হয় তখন বাংলা কবিতায় পরিবর্তন এসেছে এবং আত্মগত গীতিকবিতার উন্মেষ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবই শুধু ঘটে নি, তিনি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও হয়েছেন। তবুও যোগীন্দ্রনাথ বসুর নাম এ কারণে উল্লেখ করবো যে, তিনিই মহাকাব্য রচনায় উল্লেখযোগ্য শেষ প্রচেষ্টা করে গেছেন।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

নবম পরিচ্ছেদ

উনিশ শতকের গীতি কাব্য, কাহিনী কাব্য ও বর্ণনামূলক কাব্য

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

গীতিকাব্য

বিহারীলাল
(১৮৩৫-১৮৯৪)

আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের উদ্ভব বিহারীলাল থেকেই। বিহারীলালের পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিষয়ক খণ্ডকাব্যের উদ্ভব আমরা দেখেছি, কিন্তু সে সমস্ত কাব্য প্রায়ই বস্তু নির্ভর। তা থেকে আত্মগত গীতিসুর উৎসারিত হয় নি। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কাব্য ছিল বাংলা ভাষায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। কিন্তু যে বিচারে বিহারীলালের কাব্যকে গীতিকাব্য বলছি ঠিক সে বিচারে বৈষ্ণব কাব্যকে গীতিকাব্য বলা চলেনা তার কারণ বিশেষ ধর্মার্চনার রূপব্যঞ্জনায় বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে একমাত্র নিবেদনের সুরই স্পষ্ট হয়েছে। কবি হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা পাই না। নিবেদনের সুরটাও সর্বত্র একই প্রকারের। জীবাত্মা পরমাত্মার বন্ধন, লীলা বিলাস, আকাঙ্ক্ষা, আশা এ সমস্ত কিছুই রাধাকৃষ্ণের রূপকের মাধ্যমে অনবরত প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং পদ্ধতিটা গতানুগতিক হয়ে পড়েছিল। স্পষ্টভাবে কোনও কবি আপন হৃদয়ের আকুলতা এবং আর্তিকে প্রকাশ করেন নি, মানব জীবনের পরিচয় বহন করাতো দূরের কথা। তবে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ়তা আনবার চেষ্টা এবং সে ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন মধ্যযুগে একমাত্র বৈষ্ণব কবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে নতুন গীতিকাব্যের উদ্ভব দেখলাম তার সঙ্গে মহাজন পদাবলীর ঐতিহ্যগত কোনও সম্পর্ক ছিল না। কবিওয়ালাদের যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর বিকার দেখেছি এবং সে সময়েই ধারণা করা উচিত ছিল যে নতুন যুগে এর মৃত্যু অবধারিত। উনবিংশ শতাব্দীর নতুন সংস্কৃতিবান জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য শিল্প-সাহিত্য সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটেছিল, সে দৃষ্টিভঙ্গির ফলস্বরূপ আমরা বৈষ্ণব পদাবলীকে পেতে পারি না। নতুন যে গীতিকাব্যের উদ্ভব হল তার মধ্যে প্রধানতঃ আমরা পেলাম কবির মনকে এবং ক্রমান্বয়ে পেলাম একটি সূক্ষ্ম বেদনাবোধ এবং মানব কল্যাণের জন্য সচেতনতা। এই মানব কল্যাণটি স্থূলভাবে আদর্শরূপে প্রতিভাত হয়নি, বরঞ্চ কবি হৃদয়ের আন্তরিক স্পৃহা রূপেই আত্মবিকাশ লাভ করেছে। ইংলন্ডের রোমান্টিক যুগের যে নতুন মানব প্রেরণা এবং জীবনবোধ, আমাদের নতুন গীতিকাব্যের মূলে তাই প্রেরণা যুগিয়েছিল। এই রোমান্টিক যুগের আর একটি বিশিষ্টতা ছিল নিছক দৈহিক, সাংসারিক বা সামাজিক বেদনাকে অবলম্বন করা নয়, কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ একটি সূক্ষ্ম বেদানবোধকে হৃদয়ে লালন করা, এবং সে বেদনাকে উপভোগ করা। শেলী, কীট্‌সের কাব্যে আমরা এ বেদনা উপভোগের চরম পরিচয় পেয়েছি। সৌন্দর্য, সুস্নিগ্ধতা এবং আনন্দ এগুলো সমস্ত কিছুই বেদনার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত। বেদনাকে অস্বীকার করে এগুলোকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। বাংলার কাব্যে সর্বপ্রথম বিহারীলাল বেদনা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় বহন করলেন। বিহারীলালের কিছু পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী

www.icsbook.info

কবিতাবলী'র মধ্যে আমরা বেদানাবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করেছি, কিন্তু সে বেদনাবোধের পশ্চাতে একটি নির্ণেয়যোগ্য কারণ রয়েছে। অপরিচিত পরিবেশে নির্বান্ধব অবস্থায় দেশের পূর্বস্মৃতি মনে যে বেদনা জাগায় এ বেদনা তাই। রোমান্টিক বেদনা এর চাইতেও কিছুটা সূক্ষ্ম । সে বেদনার কারণ নির্ণয় করা যায় না, সে বেদনার সঙ্গে অনুভূতি এবং উপলব্ধির একটি নিগূঢ় সম্পর্ক থাকে।

ইংলন্ডের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলী নতুন পৃথিবী এবং নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এর উপরেই একটি নতুন সৌন্দর্যের কল্পনা করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই বেদনার মধ্য দিয়েই তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং সর্বশেষে বেদনাকে গ্রাহ্য করতে হয়েছে। আশ্বাস যা কিছু তা সেই বেদনাকে গ্রাহ্য করার মধ্যেই। 'Ode to the West Wind' কবিআটির মধ্যে শীতের নির্মমতাকে স্বীকার করা হয়েছে, কেননা শীতকে গ্রাহ্য করলেই বসন্তকে পাওয়া যায়। 'Prometheus Unbound এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে প্রমিথিউসের লাঞ্ছনা এবং পীড়ন। লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার এই যে সর্বপ্রকার চরম দৈহিক লাঞ্ছনাতে প্রমিথিউস প্রকৃত প্রস্তাবে আহত হচ্ছে না। কিন্তু সে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে যে-মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ের দৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বেদনাময় চিত্র উদ্ঘাটন করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রমিথিউসের বেদনাটাও মনোগত, উপলব্ধিজনিত। বাস্তব পৃথিবীর রূঢ় আঘাতে তার সৃষ্টি নয়, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতি এবং উপলব্ধি থেকেই তার জাগরণ।

শেলীর কাব্যে আমরা অনন্ত সৌন্দর্যের ধ্যানের পরিচয় পেয়েছি। এ অনন্ত সৌন্দর্য বা বিশ্ব বিমোহিনী কান্তি প্রকৃতি কিংবা জীবনে নয়, কিন্তু বিভিন্ন রমণীর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি অবশ্য বনে পর্বত-কন্দরে উদ্দামভাবে পরিভ্রমণের কথা বলছেন। এ পরিভ্রমণ অনুপম কান্তির সন্ধানেই । কিন্তু "এপিসাইকিডিয়ানে', (Epipsychidian) রমণী মূর্তির মধ্যেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখলাম। এ সন্ধান কবির মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের বিপর্যয় এবং বেদনার সঞ্চার করেছে এবং কখনও কখনও অলৌকিক রহস্য নিমগ্নতার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই, জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এর কোন সংযোগ না থাকলেও কোনও ক্রমেই এ বোধ জীবনরহিত নয়। তার কারণ নতুন পৃথিবী এবং নতুন জীবনের রসাস্বাদের উদ্দেশ্যে কবি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে একটি অনুপম কান্তির সঞ্চরণ দেখেছেন। তাই এ অনুপম কান্তির প্রয়োজন ছিল সে জীবনের কল্পনার জন্য যে জীবন "more real than living men."

বিহারীলাল শেলীর এই বিশ্ববিমোহিনী কান্তির কল্পনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু মূলত উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য এখানে, শেলী যেখানে প্রগাঢ়ভাবে জীবনকে গ্রহণ করেছেন, বিহারীলাল সেখানে জীবন থেকে অন্তরাল খুঁজেছেন। বিহারীলালের কাব্য, বিশেষ করে 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' সম্পূর্ণভাবে জীবন-রহিত সৌন্দর্য-ধ্যান। ধ্যান এ কারণে যে তার মধ্যে আত্মগত উপলব্ধির সততা আছে। তিনি সারদাকে অন্বেষণ করেছিলেন আপন প্রিয়তমার মধ্যে শেলীর মত। কিন্তু সে চিত্র অক্ষুণ্ণ থাকেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে 'সারদাকে' পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল জনকোলাহলশূন্য হিমালয়ের নিভৃতে। অন্য একটা দিক থেকেও শেলীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। বিহারীলালের সৌন্দর্য-পরিকল্পনার সঙ্গে হিন্দুদের পৌরাণিক ধর্মবোধের

www.icsbook.info

একটি সম্পর্ক আছে। সর্বশেষ স্বস্তিবচনের মধ্যে মহাদেবের সঙ্গে আপনার সাজাত্য সন্ধান তিনি করেছেন, এবং সর্বশেষ উক্তিতে পৃথিবীকে অস্বীকার করার এবং একই সঙ্গে আনন্দলোকে 'সারদা'র সঙ্গে সম্মিলনের পরিচয় আছে :

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতি যার খুশী তার"।

সারদা সম্পর্কে তাঁর উক্তিই হচ্ছে—

"তুমি বিশ্বময়ী কান্তি দীপ্তি অনুপমা
কবির যোগীর ধ্যান ভোলা প্রেমিকের প্রাণ
মানব মনের তুমি উদার সুষমা"।

'সারদামঙ্গল' কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনা স্তম্ভিত ভাবাবস্থার শব্দময়ী রূপ। 'কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার' হিমালয়ের ধ্যান-নিবিড়, স্তব্ধ অবিচল মহিমার একটি সুন্দর প্রশস্তি। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, হিমালয়ের সমস্ত জৈব অজৈব পদার্থ কবির দৃষ্টিতে অপরূপ মোহনীয়তা এনেছে। তিনি দেখেছেন ও মুগ্ধ হয়েছেন। হিমানী উজ্জ্বল শৈলশিখর, পাদদেশে নিকুঞ্জ শোভা, কটিদেশে গুল্ম তৃণ, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান চমর-চমরী সব কিছু মিলে এক রোমাঞ্চকর মনোমুগ্ধকর রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও অতিভাষণ নেই, স্বল্পভাষণও নেই, কবিমানসের সম্মোহিত আনন্দোজ্জ্বল স্বরূপের উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে সর্বত্র।

বিহারীলালের জন্ম ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। অনেকগুলো কাব্য তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৮) এবং 'সাধের আসন'। তাঁর সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে তিনি যে আজীবন নারী বন্দনা করবেন তার ইঙ্গিত এখানে আছে—

"বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার
যে ক'দিন বাঁচি তবুগো নারী।
উদার মধুর মূরতি তোমার
যেন প্রাণ ভরে আঁকিতে পারি।"

এ ছাড়া তাঁর অনান্য গ্রন্থ হচ্ছে 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২) 'মায়াদেবী', 'শরৎকাল', 'ধূমকেতু', 'দেবরাণী', 'বাউল বিংশতি', 'কবিতা ও সঙ্গীত', 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০) এবং 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৭৮) নামক একটি পদ্য প্রবন্ধ।

বিহারীলালের কাব্য-ভাষা অত্যন্ত সহজ, অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত। শব্দ ব্যবহারের পশ্চাতে কোন প্রকার নিগূঢ় শিল্প সাধনা যে সক্রিয় ছিল তা বলা চলে না। কিন্তু তাই বলে ভাবের প্রগাঢ়তা যে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে একথাও বলা যায় না।

বিহারীলাল তাঁর কাব্যে নির্বিবাদে আটপৌরে, সহজ-নিরাভরণ শব্দকে ব্যবহার করেছেন। এ সমস্ত শব্দের জন্য তাঁর কাব্যে একটি কথ্য-ভঙ্গি এসেছে।

বিহারীলাল এক সময় রবীন্দ্রনাথের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিহারীলালের রচনাভঙ্গি, শব্দব্যবহার রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় পূর্ণভাবেই ছিল। 'মানসী'র যুগেও এর ছাপ একেবারে মুছে যায়নি।

www.icsbook.info

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য :

"সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্য-কুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজস্ব।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন জগতের মূর্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে সেইরূপ প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদঘাটিত হইয়া গেল—

'সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন
চারিদিকে ঝালাফালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।'

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, বিহারীলালের মধ্যে পুরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। শব্দ ব্যবহারে, উপমা-রূপক প্রয়োগে, ছন্দে এবং ভাবে তাঁর এ-আনন্দ বাংলা-কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কাব্য-সাধনাকে বিহারীলাল 'বিচিত্র মত্ত দশা' বলেছেন :

'হৃদয় প্রতিমা লয়ে
থাকি আমি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান!
বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করি রবি সোমে,
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিছে আলো নয়নের আঁধার।
বিচিত্র এ মত্ত দশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে।
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে!'

www.icsbook.info

দীনবন্ধু মিত্র

(১৮৩০—১৮৭৭)

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্বশক্তির প্রশংসা করেন নি। প্রধানত সেকারণেই এবং পরে নাট্যকার হিসেবে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠার জন্য কবি হিসেবে দীনবন্ধুর প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। অথচ বর্ণনামূলক পদ্য রচনায় দীনবন্ধুর যথেষ্ট দক্ষতা ছিলো। "সুরধুনী কাব্যে" (১ম ভাগ ১৮৭১, ২য় ভাগ ১৯৭৬) তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। হিমালয় গঙ্গা নদীর উৎস, সে স্থান থেকে বঙ্গোপসাগরে সে যাত্রা করেছে। যাত্রা পথে উভয় তীরে যে সমস্ত ঐতিহাসিক অঞ্চল দৃশ্যগোচর হচ্ছে, কবি তা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার ভাষা সহজ, কোথাও আড়ষ্টতা নেই এবং ছন্দের গতি সাবলীল ও নিশ্চিন্ত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

১. অতঃপর চারিদিকে হইল ঘোষণ,
করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন।
সজল নয়নে রাণী মেনকা তখন,
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন।
শৈবাল চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল,
কমল কোরক মালা গলে পরাইল,
সুগোল মৃণাল, করে শোভিল বলয়,
কটিতে মরাল মালা মেখলা উদয়,
প্রবাহ পাটের শাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ,
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ।

২. সাবিত্রী হাসিয়ে বলে, চরণ কেমনে চলে,
ধরেছে কুন্তল বলে বেলা,
বাহুতে বেড়িয়ে বলে, টানিতেছি কেশদলে
ছাড়েনা, তরুর একি খেলা।
সুকোমল তরুবর, পল্লবিত মনোহর,
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ,
তবে কোন তরুরাজ, করিতেছে হেন কাজ,
কামিনী কুন্তল ধরে রঙ্গ?

"দ্বাদশ কবিতা" (১৮৭২) খণ্ড কবিতার সংগ্রহ। রচনা দুর্বল ও বিশেষত্বহীন। 'সংবাদ প্রভাকর' এ প্রকাশিত 'জামাইষষ্ঠী' কবিতাটি সুন্দর রসরচনা—শব্দব্যবহারে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব আছে।

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"দীনবন্ধুর হৃদয়ে আনন্দ আছে; উহা প্রকৃত কবিহৃদয়ের ও কারুকরের আন্তরিক সৃষ্টি সামর্থজনিত পরিতোষ এবং পরিতৃপ্তি।"

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১৮৩৮—১৮৭৮)

সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা কাব্য' রচনা করেছেন, কিন্তু কাব্যগ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু এ অসম্পূর্ণ কাব্যই সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন করছে। আন্তরিকতা,

www.icsbook.info

হৃদয়াবেগের একনিষ্ঠতা এবং শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত শিল্পীসুলভ মনোভাব এ-কাব্যের মধ্যে স্পষ্ট। বিহারীলাল যেখানে সহজ, নিরাভরণ শব্দে একান্ত তন্ময়তার পরিচয় দিয়েছেন, সুরেন্দ্রনাথ সেখানে কঠিন তৎসম শব্দের আবরণে নারীর প্রতি আপন হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'মহিলা' কাব্যের তিনটি অধ্যায়—মাতা, জায়া, ভগ্নী। কবির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের পথে যাত্রায় মানুষের জন্য নারীর সহায়তার প্রয়োজন ছিলো। মানুষের জীবনে কল্যাণশ্রী এসেছে নারীর সাহচর্যে, নারীই তাকে ন্যায়-কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে।

'মহিলা কাব্য' কবির মৃত্যুর পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'হামির' নামক একটি ঐতিহাসিক নাটকও মৃত্যুর পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম— 'ষড়ঋতু বর্ণন' (১৮৫৬), 'সবিতা সুদর্শন' (১৮৭০), 'বর্ষাবর্তন' (১৮৭২), 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' (১৮৭২), বিশ্ব-রহস্য' (১৮৭৭)। শেষের দুইটি গ্রন্থ গদ্য রচনা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৪০—১৯২৬)

সংসার ও সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, চিন্তা ও কল্পনার অন্তরঙ্গতায় সিদ্ধকাম, সরল হৃদ্যতায় অকপট এবং অকুণ্ঠিত মমতাময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' একটি রূপক-কাব্য যেখানে একজন কবির স্বপ্ন-জগতে পরিক্রমণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কাব্যটি হৃদয়লোকের, পার্থিব কোনরূপ ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কালিদাসের 'মেঘদূতে'র পদ্যানুবাদ করেছিলেন (১৮৬০)। পরবর্তীকালে 'মেঘদূতে'র অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোনও অনুবাদই প্রসাদগুণে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদকে অতিক্রম করতে পারেনি। নিম্নে 'মেঘদূত' এর কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হল—

"কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়।
সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে,
পদ্মাসনে অলি করে ঠাট।
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
রমণীয় মণিময় ঘাট।
মাধবীমণ্ডপ পরে, কুরু বক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটে অলিকুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।
অশোক ভাবিছে মনে, পাব আমি কতক্ষণে
বধূটির চরণ আঘাত।
কবে আমি পাব মিঠা, মুখ-মদিরার ছিটা,

www.icsbook.info

বকুল ভাবয়ে দিবারাত।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্যান্য পদ্যরচনা হচ্ছে : "পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' (১৮৯৮) এবং "কাব্যমালা" (১৯২০); এ-দুটি গ্রন্থই অতি সাধারণ রচনা মাত্র। "স্বপ্নপ্রয়াণ" ব্যতিরেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা হচ্ছে সহজ, কথ্য বাক্‌ভঙ্গিকে কাব্যে প্রয়োগ করা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "যৌতুক না কৌতুক" (১৮৮৩) নামে একটি লঘু ভাবের কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয়। কবিতাটির রচনাভঙ্গি তরল এবং তা উচ্ছল হাসিতে পরিপূর্ণ। বাংলা কবিতার ছন্দ ও শব্দব্যবহার নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অন্যতম। তিনি বাচনভঙ্গিতে সংস্কৃত স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রবর্তন করেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তার 'রেখাক্ষর-বর্ণমালা' বাংলা ভাষার শর্টহ্যাণ্ড লিখন-পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন বলা যায়। এ-পুস্তকটি ছন্দে বর্ণিত।

গদ্য রচনায়ও দ্বিজেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'গীতাপাঠ' একটি সরল যুক্তিপূর্ণ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এর পর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রনাথের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়।

আপন রচনা সম্পর্কে স্মৃতিকথায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি অনেক লিখিয়াছি; এই লেখাপড়া ছাড়া আর আমি জীবনে বড় একটা কিছুই করিতে পারিলাম না; কখনও আমি বিষয়-কর্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না.... কিন্তু কখনও কোথায়ও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদয় হয়, যাহা উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়–তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন?"

মীর মশাররফ হোসেন
(১৮৪৭—১৯১২)

মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান গদ্যশিল্পী। গদ্যের যা প্রধান গুণ-প্রতিটি বাক্যে স্পষ্ট অর্থদ্যোতক শব্দের সুনিশ্চয় স্থিতি এবং যুক্তিনির্ভর বক্তব্যে বিবাদহীন প্রতিষ্ঠা, এগুলো তাঁর প্রধান রচনাগুলোতে আমরা পাই। কিন্তু

www.icsbook.info

কখনও কখনও কবিতার আবেশ বা সম্মোহন তাঁর রচনাকে পদ্যরচনার নিকটবর্তী করেছে। তাতে মনে হয় তাঁর সমসাময়িক অনেকের মত তিনিও বর্ণনামূলক পদ্যে দক্ষতা দেখাতে পারতেন। 'বিষাদ সিন্ধু'তে গদ্য রচনায় মশাররফ হোসেন বর্ণনায় যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন, তা সমপর্যায়ে পদ্যেও রূপ পেতে পারতো। কিন্তু পদ্যের যে নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন, তা ভারতচন্দ্রের কালের। কিন্তু ভারতচন্দ্রের চাতুর্য, শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা, কৌতূহল, বিশেষণ-উপমা-রূপকের প্রয়োগ মশাররফ হোসেনের পদ্যে নেই। বিস্মিত হতে হয় এ-কথা ভেবে যে, যিনি গদ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত বেশী সচেতন ছিলেন, পদ্যের ক্ষেত্রে তারই শব্দব্যবহার তাৎপর্যহীন এবং বটতলার পুঁথির মতো গতানুগতিক। 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থে পদ্যের ব্যবহার আছে কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদীর গতানুগতিক সঙ্গতি ছাড়া কবিতার অন্য কোনও নিদর্শন তার মধ্যে নেই।

দেবেন্দ্রনাথ সেন
(১৮৫৮—১৯২০)

বিহারীলাল যে গীতিকাব্যের উদ্ভাবন করলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন সে ধারাকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হলেন। তাঁর কাব্য সহজ, সুন্দর এবং মধুর। তিনি প্রত্যেক সুন্দর বস্তুর রসাস্বাদন করতে চান এবং সে কারণে তাঁর কবিতা অলংকারে সুষমামণ্ডিত এবং সেখানে কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার আমরা লক্ষ করি— এক প্রকার নিরুদ্দেশ গতির উল্লাসের মত, জীবনের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন নিশ্চিন্ত স্বপ্নসঞ্চয়ের মত। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় কাব্য-বিলাস আছে, কথাকে নানাভাবে অলঙ্কারের প্রাচুর্যে সাজান আছে। এমন অপূর্ব ধ্বনিবৈচিত্র্য বাংলা কাব্যে খুবই কম দেখা যায়। "ডায়মণ্ডকাটা মল" বলে একটি কবিতা আছে। সেখানে সুন্দর নৃত্যলীলার মত কথা ছুটে চলেছে। অল্প একটু উদ্ধৃত করছি ঃ

"ঝর্মর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম, বাজে ওই মল!
উঠিছে পড়িছে কিরে, নামিছে উঠিছে কিরে,
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্ত গৃহে খুলিয়ে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চহাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কিরে আনন্দে চঞ্চল?
ঝমর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল?"

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'ফুলবালা' প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। পরে ক্রমান্বয়ে 'উর্মিলা-কাব্য (১৮৮১), 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১), 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'হরিমঙ্গল' (১৯০৫), 'দগ্ধকচু' (১৯১২), 'শেফালীগুচ্ছ' (১৯১২), 'পারিজাতগুচ্ছ' (১৯১২), 'জ্ঞানদামঙ্গল' (১৯১২), অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২), 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' (১৯১২), 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' (১৯১২), 'গৌরাঙ্গমঙ্গল, (১৯১২), 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২), 'শ্যামামঙ্গল'(১৯১২), 'জগদ্ধাত্রীমঙ্গল' (১৯১২), 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২), 'কার্তিকমঙ্গল'

www.icsbook.info

(১৯১২), 'গণেশমঙ্গল' (১৯১২), 'খ্রীষ্টমঙ্গল' (১৯১২), অপূর্বব্রজাঙ্গনা, (১৯১৩) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এবং পরিহাস-রসের কবিতা রচনা করলেও দেবেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা, প্রকৃতি, সমাজ এবং মানুষ সম্পর্কে আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধের কবিতা রচনার মধ্যে। বিভিন্ন ফুলের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

"হে অশোক কোন্ রাঙ্গা চরণ-চুম্বনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি লালে-লাল?
কোন দোল পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে,
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি-দুলাল?
কোন চির-সধবার ব্রত-উদযাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দুর-বরণ?
কোন বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন?
বৃথা চেষ্টা–হায়! এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তবু-জীব-প্রাণী।
পরাণে লাগিয়া ধাঁধাঁ আলোক আঁধারে,
তরুও গিয়েছে ভুলে অশোক কাহিনী।
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা';
তেমনি অশোক তোর লালে লাল খেলা!"

সনেটের আধারে রচিত এ-কবিতাটি কবির সৌন্দর্য বোধের একটি সুন্দর নিদর্শন। দেবেন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য আরও অনেক সনেট রচনা করেছেন।

যদিও দেবেন্দ্রনাথ সেন সৌন্দর্যপিপাসু ছিলেন এবং লঘুভাবে রসাস্বাদন করতে চাইতেন তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তিনি জীবন ও সংসার থেকেই উপমা-রূপক আহরণ করে তাঁর কল্পনাকে সঞ্জীবিত করেছেন।

অক্ষয়কুমার বড়াল
(১৮৬০—১৯১৯)

কাব্যভাবের গভীরতার দিক থেকেই অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রধান পার্থক্য। অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় যে সব শব্দ, উপমা ও রূপক ব্যবহৃত হয়েছে সে সবের মূল্য বাক্যের ব্যাকরণসঙ্গত বিন্যাসের জন্য নয়, কিন্তু আবেগ, উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রকাশের জন্য। তাঁর কবিতা পাঠ করলে প্রথমেই আমাদের একথা মনে পড়ে যে, এ সমস্ত কথা হৃদয় থেকে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস, উপলব্ধি, উল্লাস ও ব্যথা থেকে কাব্য কথা উৎসারিত হয়েছে। তাঁর কথায় আতিশয্য নেই। জীবনকে তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, তাই তাঁর কাব্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতো ভ্রূক্ষেপহীন স্বপ্ন-সঞ্চয়ের আনন্দ নেই। কিন্তু জীবনের সত্য আছে। তাঁর সৌন্দর্য কল্পনা অনাবিল, স্নিগ্ধ ও প্রগাঢ়।

অক্ষয়কুমারের রচিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে, 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) 'ভুল' (১৮৮৭), 'শঙ্খ' (১৯১০) ও 'এষা' (১৯১১)। 'প্রদীপ' অক্ষয়কুমারের খণ্ড-

www.icsbook.info

কবিতার প্রথম সংগ্রহ। এ কাব্যেই কবির ভবিষ্যৎ জীবনের কাব্যধারার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে পথ-নির্ণয় করা তখন পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না হলেও পথের ইঙ্গিত আছে এবং ক্ষুদ্র আনন্দের মধ্যে পূর্ণাবয়ব উপলব্ধির আভাস আনবার চেষ্টা আছে। এ সম্পর্কে কবির উক্তি হচ্ছে—

"ক্ষুদ্র বন-ফুল-বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে;
ক্ষুদ্র উর্মি-মূলে মূলে প্রলয় প্লাবন;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির উষা জেগে আছে;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।"

অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'এষা'। বাংলা সাহিত্যে শোকাত্মক কাব্য-মধ্যেই যে 'এষা' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তাই নয়, সাধারণভাবে বাংলার গীতি-কবিতার বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে 'এষা' একটি উজ্জ্বল রত্ন। প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় তিনি অসহ্য মানসিক অশান্তিতে পীড়িত, কিন্তু চরম হাহাকারের মধ্যেও তিনি স্বস্তি লাভের প্রয়াস পেয়েছেন। মৃত্যু অমোঘ, তাই তার আবির্ভাবকে তিনি মহত্তর ও বৃহত্তর উপলব্ধির সোপান বলে ভাবছেন। তাঁর এ কাব্যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আছে কিন্তু রসোপভোগের ক্ষেত্রে তত্ত্ব কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। এক প্রকার সকরুণ মূর্ছনা, সত্যিকারের অনুভূতিলব্ধ সৌন্দর্যের পরিবেশন, 'এষা'ক মধুর করেছ। তিনি এখানে বৃহত্তর জীবনের উন্মেষের কথা বলেছেন-

"নেত্রনীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়।"

মৃত্যুতে অস্তিত্বের যে বিলোপ ঘটে তাঁকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

"তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী।" ধ্বনিপ্রতিধ্বনির, সুর বৈচিত্র্যের কৃত্রিমতার মধ্যেই যেখানে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার প্রাণ, সেখানে অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা হৃদয়ের উলব্ধি দ্বারা উজ্জীবিত।

স্বর্ণকুমারী দেবী
(১৮৫৫—১৯৩২)

স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তিনি সাহিত্য চর্চা, সংবাদপত্র সেবা, নারীকল্যাণ এবং স্বদেশ সেবার সঙ্গে আজীবন জড়িত ছিলেন। ইংরেজী সভ্যতা এবং সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, নারী সমাজের পক্ষে সে নবজাগরণের পরিচয় বহন করলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর অকুণ্ঠ অপরিমিত দানের পরিচয় রয়েছে। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মত জাতীয়তাই ছিল স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সেবার উৎস। স্বর্ণকুমারী দেবী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাই অধিক। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম এবং প্রকাশের তারিখ এখানে দিচ্ছি : 'বসন্ত উৎসব' (গীতিনাট্য ১৮৭৯), 'গাথা' (১৮৮০), 'কবিতা ও গান (১৮৯৫), 'দেবকৌতুক'(কাব্যনাট্য ১৯০৬), 'যুগান্ত কাব্যনাট্য' (১৮৯২)। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক প্রদান করেন।

www.icsbook.info

সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর বিশেষ কীর্তি মাসিকপত্র সম্পাদন। তিনি অনেকদিন পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
(১৮৫৮—১৯২৪)

প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামীর মৃত্যু এবং তজ্জনিত বেদনা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্য-প্রেরণার উৎস। বাস্তব জগতে স্বামী তাঁর সান্নিধ্যে নেই, কিন্তু অশরীরী আত্মায় মিশে আছেন এ-ভাবটাই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭) কাব্যগ্রন্থে তিনি এ-বেদনার পরিচয় দিয়েছেন। দুঃখই হচ্ছে তাঁর কাব্যের মূল সুর। 'অশ্রুকণা', 'আভাষ' (বাং ১২৯৭), 'অর্ঘ' (বাং ১৩০৯) এ সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এ বেদনার ভাবটাই পরিস্ফুট। তিনি 'স্বদেশিনী' (বাং ১৩১২), 'সিন্ধুগাথা' (বাং ১৩১৪), 'শিখা' (১৩০৩), 'ভারতকুসুম' (১৮৮২) ও কবি তাহার' (১৮৭৩) নামে কতকগুলো কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। 'জাহ্নবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। গিরিন্দ্রমোহিনীর ভাষা নিরাভরণ এবং স্বচ্ছ। গ্রাম্য জীবনের, গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর পটুতা বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁর 'কবির প্রতি কবি প্রিয়া' কবিতা থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"ঘনশ্যাম নীপকুঞ্জে,
নবশ্যাম তৃণপুঞ্জে
 ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মাজিয়া এ শ্যাম কায়
শাওন দিবার প্রায়
 করে দিব তোমারে বিহ্বল।
নিঃশেষে করিয়া পান—
ধরিবে নবীন গান;
 গুরু গুরু গম্ভীর মেদুর!
চকিত জগৎবাসী
চমকি চাহিবে আসি,
বিসরি অলস হাসি
 বিলাস বধূর।"

কামিনী রায়
(১৮৬৪-১৯৩৩)

উনিশ শতকের শেষে বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন মহিলা-কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, কামিনী রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার সংযোগ ঘটেছিল। এ কারণেই তাঁর রচনা শিল্প-সুষমামণ্ডিত এবং মার্জিত। কামিনী রায় নিজে এক পত্রে লিখেছেন— "সুখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশা,

www.icsbook.info

আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানব জীবন, তাহার একটি জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটি সরল, সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে এবং থাকিবে।" কামিনী রায়ের কাব্যের মধ্যে আমরা মানব জীবনের তীব্র বেদনাময় অস্তিত্বের একটি সবল প্রকাশ লক্ষ করেছি। স্বামীর মৃত্যু কামিনী রায়কে বেদনায় পীড়িত করেছে এবং সে বেদনা তাঁর কাব্যের উৎস হয়েছে।

কামিনী রায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), 'নির্মাল্য' (১৮৯১), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭) 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), 'অশোক-সঙ্গীত' (১৯১৪), 'অম্বা' (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯), 'জীবন পথে' (১৯৩০)। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে 'গুঞ্জন' (শিশু-কবিতা, ১৯০৫), 'ধর্মপুত্র' (গল্প, ১৯০৭), 'শ্রাদ্ধিকী' (জীবনী, ১৯১৩), 'সিতিমা' (গদ্য-নাটিকা, ১৯১৬)। হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকা লিখেছিলেন। হেমচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— "এই কবিতাগুলো আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষায় আমি এইরূপ কবিতা অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি— বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি।"

মানকুমারী বসু
(১৮৬৩—১৯৪৩)

মানকুমারী বসু মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বিধবা হবার পর সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ষাট বৎসরকাল তিনি সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন। তাঁর কবিতায় বিয়োগ-বেদনার সুরটিই প্রধান। তিনি সহজ সরল ভাষায় নিজের মনের কথা নিবেদন করেছেন। মানকুমারী বসু সামাজিক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতি, জাতীয়তা, পুরাণ এবং ইতিহাসও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে—'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬)। 'বীর কুমারবধকাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিমন্যু-বধ বর্ণিত হয়েছে। কবি কায়কোবাদের উপর মানকুমারী বসুর প্রভাব যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। কায়কোবাদের 'ভুল ভেঙে দাও' কবিতাটি মানকুমারী বসুর 'ভাঙ্গিওনা ভুল' কবিতার ধরনে লেখা। বক্তব্য বিষয় পার্থক্য থাকলেও প্রকাশভঙ্গিতে এবং শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

মোজাম্মেল হক
(১৮৬০—১৯৩৩)

গদ্য রচয়িতা হিসাবেই প্রধানত মোজাম্মেল হকের খ্যাতি কিন্তু ইনি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছেন। জাতীয় আদর্শ, ইসলামের নব উজ্জীবন, প্রধানত এসবই ছিল তার কাব্যের বিষয়বস্তু। তাঁর সাহিত্য-সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিশু পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেন। উর্দু সাহিত্যে 'ইসমাইল

www.icsbook.info

মারাঠির' যে দান, শিশু-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যেও মুসলমান সমাজে মোজাম্মেল হকের অনুরূপ দান। তিনি 'সাহিত্যশিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা', সরল বাংলা শিক্ষা' 'শিশুরঞ্জন বর্ণ শিক্ষা', 'পত্র দলিল লিখন শিক্ষা' ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের শিশু পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া কাব্য ক্ষেত্রে তাঁর দান হচ্ছে 'জাতীয় ফোয়ারা', 'ইসলাম সংগীত', 'কুসুমাঞ্জলি', 'অপূর্ব-দর্শন কাব্য', 'প্রেম-হার' এবং 'হযরত মোহাম্মদ' কাব্য। তিনি 'লহরী' নামক একটি কবিতার মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং 'মোসলেম ভারত' নামক একটি সাহিত্যিক পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন। তাঁর 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্য ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"জাতীয় ফোয়ারা' কতকগুলো জাতীয় কবিতার সমাবেশ—দুঃস্থ সমাজের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সময়ে সময়ে যে সকল কবিতা সভা-সমিতিতে পঠিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশ তত্রসমুদয়ের সংগ্রহ মাত্র। ইহাতে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কিছুই লিখিত হয় নাই। এতৎ পাঠে যদিই কোন পাঠকের হৃদয় জাতীয় ভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল ও বাসনা পূর্ণ হইবে।" —এ গ্রন্থে কবির বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামকে অবলম্বন করে এক সময়ে মুসলমান বীরত্বে, স্থাপত্যে এবং বিজ্ঞানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এবং তখন তাদের সমকক্ষ অন্য কোন জাতি ছিল না। বর্তমানে তাদের অগৌরবের কাল। তার কারণ, অলসতা তাদের মজ্জাগত হয়েছে এবং বিলাসিতাকে তারা অবলম্বন করেছে। পূর্ব খ্যাতি পুনর্বার অর্জন করতে হলে তাদের কর্তব্য হবে—

"অলসতা বিলাসিতা করি পরিহার,
লভিতে হারান ধনে; কর যত্ন প্রাণপণ,
সম্মুখে করম-ক্ষেত্র রয়েছে বিস্তার,
ঘুচিবে সকল জ্বালা, হাসিবে আবার।"

'ইসলাম সংগীত' গ্রন্থেও মোজাম্মেল হক ইসলামের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেছেন। মুসলমানদের কল্যাণের জন্য ইসলামকে অবলম্বন করা যে তাঁদের জন্য বাঞ্ছনীয় একথাও তিনি ভেবেছেন।

মোজাম্মেল হকের কাব্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হযরত মোহাম্মদ' কাব্য। এ গ্রন্থে কবি হযরত মোহাম্মদের জন্ম কাহিনী, বাল্যলীলা, মাহাত্মথা, পয়গম্বরী প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচারের কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এখানেই গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। সুতরাং কাব্যটি অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ হলেও কবির কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ-পরিচয় এ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ভাষা মার্জিত এবং শালীন, শব্দ ব্যবহারে কোথাও লঘু এবং চটুল বিন্যাসের পরিচয় নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি অনুপম গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি অগ্রসর হয়েছে। লঘু পরিহাসে কোথাও গাম্ভীর্যের হানি ঘটায়নি। একথা সত্য যে মঙ্গলাচরণ এবং গুণকীর্তন অধ্যায় দুটিতে হিন্দু ভাবের পরিচয় আছে কিন্তু এটাকে ত্রুটি না বলে সে যুগের একটি স্বাভাবিক ধর্ম বলাই সঙ্গত। কবি হযরত মোহাম্মদকে অসাধারণ মানুষ হিসেবে অঙ্কন না করে মানুষ হিসেবে অঙ্কন করেছেন। খোদেজার সঙ্গে বিবাহের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, সে বর্ণনার মধ্যে সত্যিকারের মানবীয় বোধ পরিস্ফূট হয়েছে। সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও স্পৃহায় পরিপূর্ণ যে মানুষ, 'হযরত

www.icsbook.info

মোহাম্মদ' কাব্যে আমরা সে মানুষেরই পরিচয় পাই। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে—

"এদিকে খোদেজা দেবী প্রেমের তাড়নে
আকুল বিহ্বল প্রাণ, শূন্য হেরে ধরাখান,
কিছুতে না সুখ পান জাগ্রতে শয়নে।
ভোজনে না পান স্ফূর্তি, বিষাদ মণ্ডিত মূর্তি,
হারায়ে গিয়াছে আহা কি যেন রতন,
নিয়ত নির্জনে বসি, আ মরি রূপসী-শশী,
ক্ষুণ্ন মনে থাকে তার ধ্যানেতে মগন।
শেষে নিজ সহচরী নফিসা সকাশে
অন্তরের অভিপ্রায়, ব্যক্ত করিলেন হায়,
থাকে কি অনল রাশি ঢাকা কভু বাসে?
যাহাতে সে মনোচোর, পরে বিবাহের ডোর,
যাহাতে সে হিয়ানিধি হিয়া-মাঝে আসে,
সে উপদেশ দিয়া, দিল ধনী পাঠাইয়া
দূতীরূপে নফিসায় প্রিয়তম পাশে।
চতুরা নফিসা গিয়া হযরতের কাছে,
বলে, "যে যুবকবর কতদিন একেশ্বর
রহিবে আর? বাধা বিবাহে কি আছে?"
ধীরে কহিলেন তিনি, "অয়ি মম হিতৈষিণী!
সত্য বটে, কিন্তু সে যে কঠিন ব্যাপার।
দীন আমি, অর্থ নাই, বিবাহে অনিচ্ছা তাই,
হায় মম শক্তি কোথা পত্নী পালিবার?"
এ-গ্রন্থ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রিয়ম্বদা দেবী
(১৮৭১—১৯৩৪)

প্রিয়ম্বদা দেবী এ-নামে দুজন কবির পরিচয় আমরা জানি। এঁদের মধ্যে একজন সংস্কৃত-সাহিত্যে বিদূষী কবি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ইনি ফরিদপুর জেলার পণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা ছিলেন। এঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তিনি তাঁর পরিবারের কুলদেবতা গোবিন্দদেবকে উদ্দেশ্য করে সংস্কৃত শ্লোক নির্মাণ করেছিলেন। 'শ্যামারহস্য' নামে তাঁর একটি তন্ত্রগ্রন্থও আছে। তিনি 'মদালসা' উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা প্রণয়ন করেছিলেন।

অন্য একজন প্রিয়ম্বদা দেবী বাংলার কাব্য-সমাজে সুপরিচিত। তাঁর কবিতার মধ্যে মমতা, সঙ্কোচ এবং বিনয় সকরুণতায় প্রকাশ পেয়েছে। মূলত দুঃখই ছিলো তাঁর প্রতিপাদ্য—একটি নৈরাশ্যের ভাব অথবা বলা যায় জীবনের নশ্বরতা প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার একমাত্র আবেগ। ব্যক্তিগত জীবনে প্রথমে স্বামীর লোকান্তর এবং অল্প কিছুকাল পরে অকালে পুত্রের মৃত্যু প্রিয়ম্বদাকে দুঃখবাদী করে তোলে। প্রিয়ম্বদাও

www.icsbook.info

বাংলাদেশের কবি, পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রাম ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে—'রেণু' (১৯০০), 'তারা' (১৯০৭), 'পত্রলেখা' (১৯১১), 'অংশু' (১৯২৭)। 'চম্পা ও পারুল' নামে অন্য একটি কাব্য তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু ঘটে।

অতুলপ্রসাদ সেন

(১৮৭১—১৯৩৪)

বাংলা কবিতা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ সেনের নাম এ-কারণে উল্লেখ করতে হয় যে তিনিই প্রথম গজল গানের ঢঙে বাংলা গানে নতুন প্রবৃত্তির সুর সংযোজন করেছিলেন। তাঁর হাতে যে ভঙ্গির সূত্রপাত নজরুল ইসলামের হাতে তারই পরিপূর্ণতা ঘটলো। অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্কলন 'কয়েকটি গান।' এ গ্রন্থটিই পরে 'গীতিকুঞ্জ' (১৯৩১) নামে মুদ্রিত হয়।

শেখ ফজলুল করিম

(১৮৮২—১৯৩৬)

শেখ ফজলুল করিম হযরত মোহাম্মদের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'পরিত্রাণ কাব্য'।

মক্কা ও মদীনা নগরীতে পূর্ণভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা 'পরিত্রাণ কাব্যের' বিষয়বস্তু। কবি ধর্ম-প্রতিষ্ঠার আবেগকে কবিতার ভিত্তিভূমি করে ধর্মপ্রচার, সংগ্রাম ও যুদ্ধবিরতির বর্ণনা দিয়েছেন। ছন্দ, শব্দ-ব্যবহার, অনুপ্রাস এবং ধ্বনির আবর্তনের ক্ষেত্রে কবি সম্পূর্ণরূপে নবীন সেনের অনুসারী। প্রথম সর্গে কাফেরগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা হযরত মোহম্মদকে হত্যা করবে। সিদ্ধান্ত শেষে পরিবেশের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

"বাজিল বিজয়-ডংকা। বিহ্বল সভ্যেরা
ত্যেজি মন্ত্রণা সভা চলিলা আলয়ে
উলঙ্গ কৃপাণ করে। ঘন শ্মশ্রুরাশি
চুম্বিতেছে বক্ষঃস্থল। চঞ্চল চরণ
কোথায় পড়িছে, তাহে নাহিক ভ্রূক্ষেপ।
কামাসক্ত মদ্যপায়ী বিশৃঙ্খল পদে,
চলে যথা ঢলি ঢলি নগরে পথে।
প্রমত্ত কুহক-স্বপ্নে ভ্রষ্টাচারী দল,
ইসলাম ডুবাতে শেষে বাঁধিলেক বল।
নীরব নিস্পন্দ গৃহ,—বহেনা নিশ্বাস;
আবাত-বিক্ষুব্ধ যথা জলধি-জীবন।
কল্পনায় তীক্ষ্ম কর্ণে পশিল গম্ভীরে
সুদূর আকাশপথে হেন দৈববাণী,—
"কি করিলি? কি করিলি'? রে মোহান্ধ নর!

www.icsbook.info

কে পারে মারিতে তাঁরে, বিধি সখা যাঁর?
ঘোর অর্বাচীন তোরা; মজিয়া পাপেতে
কোথায় কাহারে আজি বধিতে যন্ত্রণা?
সত্য না ডুবিবে কভু, ইসলাম আলোক
পথভ্রান্তে দেখাইবে সনাতন পথ।
তুচ্ছ তোরা নীতি-ভ্রষ্ট কি করিবি তাঁর?
শত শত নরপতি, বিপুলা ধরণী
যাঁর পদে দিবে শির সানন্দ অন্তরে,
শুরেন্দ্র-সেবিতে সেই শ্রী-পদযুগল
না ধরি হৃদয়ে, হায় জন্মান্ধের মত
পাপাত্মার পাপমোহে হেরিয়া আঁধার
উদ্যত নাশিতে সেই ঋষিপূজ্য জনে।"

দ্বিতীয় সর্গে হযরত মুহম্মদ সাহাবাগণকে আশ্বাস দিচ্ছেন সত্যের জয় নিশ্চয়ই ঘটবে এবং আলোক এলে অন্ধকার যেমন চলে যায় তেমনি ইসলামের প্রসারে ক্রমান্বয়ে পৃথিবী থেকে পাপ এবং অকল্যাণ দূরীভূত হবে। তৃতীয় সর্গে বিরোধী দলের আবু সুফিয়ান সঙ্গিগণসহ হযরত মোহাম্মদের হত্যার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করছে। চতুর্থ সর্গে হযরত আলীকে শয্যায় রেখে কোরেশদের অগোচরে হযরত মোহাম্মদ মক্কা ত্যাগ করছেন। পঞ্চম সর্গে কোরেশদের বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হযরত মোহাম্মদ পর্বতগহ্বরে আবুবকরকে নিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। ষষ্ঠ সর্গে মক্কায় আবু সুফিয়ানের গৃহে কোরেশদের পুনরায় মন্ত্রণা। সপ্তম সর্গে মদিনায় মসজিদ-প্রাঙ্গণে মুসলমানগণ ভবিষ্যৎ আলোচনা করছেন। অষ্টম সর্গে মরুপথে কাফেরগণ অগ্রসর হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। নবম সর্গে গিরিশৃঙ্গতলে হযরত মোহাম্মদ গভীর চিন্তায় মগ্ন। দশম সর্গে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়। এখানকার বর্ণনা নিম্নরূপ—

"দিনকর করজালে ছাইল মেদিনী
পাখীরা প্রভাতী গানে
লহর তুলিল কানে,
আনমনে দিশি দিশি ছুটিল সকলে,
নবোৎসাহ সঞ্চারিত হল ধরাতলে!
উছলি পড়িল যেন সহস্র কিরণ
গাছে গাছে পাতে পাতে
শিশির কণিকাপাতে
শোভিল মুকুতাহার; বনফুল দল
ফুটিল; উড়িল অলি লুটি পরিমল!
সহসা কাঁপিল গিরি, রণবাদ্যরোল;
দুর্মদ কোরেশিগণ

www.icsbook.info

করি অস্ত্র আস্ফালন
বজ্রসম হুঙ্কারিল, প্রলয় গর্জনে
পশুপক্ষী প্রবেশিল নিবিড় কাননে।"

একাদশ সর্গে মদিনার মসজিদ-প্রাঙ্গণে পরাজিত কোরেশবৃন্দের বিচার হচ্ছে। বিচারে সাব্যস্ত হল যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা মুক্তি পাবে, আর যারা করবে না তারা দাসরূপে গণ্য হবে। সর্গের আরম্ভে কবি তাঁর মাতৃভাষার কথা ভাবছেন-

" অয়ি মাতৃভাষা। মা'গো কলকণ্ঠে তব
কি শক্তি এ দীন দাসে দোলাইবে মালা;
সাজাবে তোমার অঙ্গ অনুরাগ ভরে
সুদুর্লভ পারিজাত করিয়া উজালা।
শুধু যদি দয়া কর, স্নেহটুকু দাও,
তবে মা হইবে ধন্য, হইব অমর!
পরাধীন সন্তানের মলিন শ্রদ্ধায়
আজি মা সান্ত্বনা লভি' যাও দিয়া বর!
শক্তি আছে, সাধ্য আছে বঙ্গ সন্তানের,
কেবল ভক্তি নাই উপরে মায়ের।"

দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ সর্গের মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং বিধর্মীদের পরাজয় চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চদশ থেকে বিংশ সর্গের মধ্যে হযরত মোহাম্মদের মক্কা যাত্রা এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে মক্কা অধিকারের সঙ্গে শান্তি ও সত্যের প্রচ্ছায়ে মানুষের পরিত্রাণ ঘটছে।

'পরিত্রাণ' কাব্যটি প্রধানত বর্ণনা ও আবেগমূলক। যুদ্ধ বর্ণনা এবং প্রকৃতি বর্ণনা এর অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। সংসার এবং গৃহাঙ্গনের কথা এখানে বিশেষ নেই। কবির অবলম্বিত আবেগ হচ্ছে ধর্ম, সততা এবং নিষ্ঠা।

'গাথা' গীতিকাব্য। প্রথম সংস্কারণে প্রকাশকের নিবেদনে ১৫ ই বৈশাখ ১৩২০ তারিখ দেওয়া আছে। শেখ ফজলুল করিমের কাব্য ভাষার সঙ্গে মোজাম্মেল হকের ভাষায় একটু সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু কবির মূল অনুপ্রেরণা মাইকেল এবং নবীনচন্দ্র সেন। একথা লেখক ভূমিকায় স্বীকার করেছেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস
(১৮৫৫-১৯১৮)

গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য এনেছে কিন্তু শান্তি আনেনি। উচ্চ শিক্ষালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি, কিন্তু আপন স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা নিয়েই তিনি কাব্যসাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ী পূর্ববঙ্গে, সেখানকার নদীমাতৃক সমতল আশ্রিত জীবনের প্রতিফলন তাঁর কাব্যে আছে। তিনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের রাজ-পরিবারের কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকুরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

www.icsbook.info

কবি হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা হচ্ছে সহজতা, পরিচিত পরিবেশ ও জীবন সম্পর্কে সহজ মনোভাবের অভিব্যক্তি এবং গ্রাম্য-প্রকৃতির স্নিগ্ধরূপের পরিচয় দান। তাঁর মনে যে ভাব জেগেছে, নিরাভরণরূপে তাকে প্রকাশ করেছেন। এই নিরাভরণ প্রকাশ কখনও কখনও আশ্চর্য সরলতা এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, আবার কখনও কখনও তাতে রুক্ষতা এবং অস্পষ্টতাও আছে। তবে আজ আমরা তাঁকে তাঁর সর্বপ্রকার ত্রুটি সত্ত্বেও স্বভাবকবি, প্রকৃতির কবি এবং মানুষের কবি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

নিগূঢ় আন্তরিকতায় তিনি আবেগকে প্রকাশ করেছেন।এ-আবেগ প্রবনতা প্রকৃতি নিয়ে। রমণীও তাঁর আবেগের অবলম্বন হয়েছে। দেহজ কামনাকেও তিনি মর্যাদা দিয়েছেন।

তিনি ১৮৮৭-৮৮ সালে প্রধানত কলকাতায় ছিলেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি 'বিভা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে- 'প্রসূন' (১৮৭০), 'প্রেম ও ফুল' (১৮৯৮), 'কুস্কুম' (১৮৯২), 'মগের মুলুক' (ব্যঙ্গকাব্য-১৮৯৩), 'কস্তুরী' (১৮৯৫), 'চন্দন' (১৮৯৬), 'ফুলরেণু' (সনেট-১৮৯৬), 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৫), 'শোক সান্ত্বনা' (১৯০৯), 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৯১০)।

তাঁর রচনার নিদর্শনস্বরূপ একটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরাযে যায়!
মাঝের রবি ডুবছে সাঁঝে দিনটা গেল বৃথা কাজে,
এক পা কেবল পারে আছে, এক পা দিছি নায়।
আজ করবনা করব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়।"

রজনীকান্ত সেন
(১৮৬৫-১৯১০)

পাবনা জেলায় জন্ম। স্বাদেশিকতা এবং ভগবদ্ ভক্তি বা নিবেদিতচিত্ততা তাঁর কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। বাংলা দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ রজনীকান্তের নিম্নলিখিত দেশাত্মবোধমূলক গানটি তখন সমগ্র দেশে একটি অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল ঃ

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে-রে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের

www.icsbook.info

সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তবু, তাই বেচে, কাচ, সাবান মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমার মায়ের নামে
এ প্রতিজ্ঞা করব ভাই;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

সুগভীর আন্তরিকতায় চরম দুর্ভরতার মধ্যেও বিশ্বাস এবং ভক্তির যে পরিচয় নিম্নলিখিত কবিতাটিতে আছে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ ঃ

"আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছ,
গর্ব করিতে চূর;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছ দূর।
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা -কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছ দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করেছ চূর।"

এ- গানটি শুনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন। আজ আপনার জীবন সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

রজনীকান্ত সেনের কাব্যগ্রন্থ মোট ৮টি-'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০), 'আনন্দময়ী' (১৯১০), 'বিশ্রাম' (১৯১০), "অভয়া' (১৯১০) 'সদ্ভাব-কুসুম' (১৯১৩), 'শেষ দান' (১৯২৭)—এ গুলোর মধ্যেমাত্র প্রথম তিনখানি কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হয়েছিল।

রজনীকান্ত সেন ব্যঙ্গ কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বুড়ো বাঙ্গাল কবিতাটি রস-নিবেদনে এবং ব্যঙ্গ চাতুর্যে অপূর্ব

"বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিচি পায়;
তোমার লগে কেমতে পারুম, হৈয়্যা উঠছে দায়।
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুলে বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়?
বেলোয়ারী চুরি দিচি,পাছা পাইর‍্যা কাপড় দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর‍্যা দিবার লাগচ গায়।
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি ফায়
বুরা বুরা কৈরা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্‌ কোরচ্‌ পাগল?
যহন বিয়্যা কোরচ, ফেলবা ক্যামতে?
কৈয়্যা দ্যাও আমায়।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

(১৮৩৭-১৯০৬)

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে খুলনা জেলায় তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম জীবনে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কাব্যকীর্তি হচ্ছে ফারসী কবি হাফিজের এবং সাদীর কবিতার অনুবাদ । তবে প্রধানত হাফিজের দীওয়ান থেকে নেওয়া। অনুবাদ গ্রন্থটির নাম 'সদ্ভাব শতক', (১৮৬১)। অনুবাদটি আক্ষরিক নয়। মূলত এটি ভাবানুবাদ। 'সদ্ভাব-শতকে' সংসার বিষয়ে নির্লিপ্ততাএবং বেদনাহতদের জন্য সহানুভূতির পরিচয় আছে। 'সদ্ভাব-শতকে'র অত্যন্ত পরিচিত কতগুলো চরণ হচ্ছেঃ

১. "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয়।
কেবল ঈশ্বর, এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলেরি তিনি।"

২. "যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আশুগৃহে তার দেখিবেনা আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"

৩. "বহুমুল্য পরিচ্ছদ রতন ভূষণ,
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্ধন।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা ইংরেজী epigram-এর মত। বাংলাতে একে আমরা বলতে পারি উদ্ধৃতি-যোগ্য সারগর্ভ কাব্য-ভাষণ। 'মোহনভোগ' (১৮৭১) নামে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অন্য একটা কাব্যগ্রন্থ আছে। মহাভারতের একটি উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

(১৮৫০- ১৮৯৮)

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর খ্যাতি ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে আসার জন্যই। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, যতীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে ও এঁর কথা উল্লিখিত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পাণ্ডিত্য এবং মেধা ছিল অসাধারণ। শুধুমাত্র কবিতাই যে তিনি লিখেছেন তা নয়, সঙ্গীত শিল্পেও তাঁর দক্ষতা ছিল এবং বিভিন্ন সুরে তিনি গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের কিছু কিছু গান আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কখনও ছিল না, তিনি কবি, সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত শিল্পীর প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ মাত্র তিনটি;'উদাসিনী' (১৮৭৪) , 'সাগর- সঙ্গমে' (১৮৮১) এবং 'ভারত গাঁথা' (১৮৯৫)।

'উদাসিনী' দশটি সর্গে সমাপ্ত একটি আখ্যায়িকা কাব্য। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস অবলম্বনে 'ভারতগাথা' রচিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র পোপ এর 'এলোইস টু আবেলোড' অবলম্বনে 'মাধবমালতী' কাব্য রচনা করেছিলেন।

www.icsbook.info

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ "সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

নিত্যকৃষ্ণ বসু

(১৮৬৫-১৯০০)

বাংলা ভাষায় নিত্যকৃষ্ণ বসুই সর্বপ্রথম সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর 'সাহিত্যসেবকের ডায়রী'তে সাময়িক ও শাশ্বত সাহিত্য সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য আছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মায়াবিনী' (১৮৮৬)। 'মায়াবিনী' কাব্যে কবি শোভাময় প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে অনন্তের ভাব যদি হৃদয়ে জাগাতে হয় তাহলে সংসারের কর্মকে নয়, প্রকৃতিকে অবলম্বন করতে হবে। 'প্রেমের পরীক্ষা' (১৮৯৩) ও 'ভবানী' (১৯১৯) নিত্যকৃষ্ণ বসুর রচিত গদ্যগ্রন্থ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১৮৬৩-১৯১৩)

নাটক রচয়িতা হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের খ্যাতি। কিন্তু তিনি কবিতা ও গানে ছন্দের ও সুরের বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। হাসির গান এবং স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসেবে প্রাচুর্যের দিক থেকে এবং প্রখর দীপ্তির দিক থেকে তিনি সর্বক্ষেত্রেই আপন পৌরুষের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে জন্য মানুষের কাপুরুষতা এবং দুর্বলতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় এমন একটা "তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট চিত্র- নির্মাণের কৌশল, ঋজুতা, বাস্তববুদ্ধি এবং প্রমোদ-আনন্দের পরিচয় আছে" যাকে দুর্লভ বলে স্বীকার করতেই হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। তাই যদিও তিনি আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল, তবুও কবি হিসেবে তাঁর বিশেষ স্বীকৃতি ঘটেনি। বর্তমানে নতুন করে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা আবিষ্কার করছি। কবিতায় মানুষের প্রতিদিনকার বাচনভঙ্গির পরীক্ষা এবং বিচিত্র কৌশলে শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারের দুঃসাহসে দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণত্ব লক্ষ করা যায় 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে 'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ

"দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নতুন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাহারাই দেখাইয়া দেন- পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা কাব্য ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায় , ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃতুমন্থর আবেশ ভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (১৮৮২)। 'আর্যগাথা'একটি গীতি সঙ্কলন- পরতীকালে গীতিকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির প্রথম স্বাক্ষর।

www.icsbook.info

'আর্যাগাথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৯৩) ইংরেজি, স্কচ্ ও আইরিশ সঙ্গীতের অনুবাদ আছে। 'The Lyrics of Ind' নামে ইংরেজি কবিতাগুচ্ছ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। কবিতাগুলি সৃষ্টিকর্ম হিসেবে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) নামক ব্যঙ্গ কাব্যে কবি হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষমতার প্রথম পরিচয় পাচ্ছি। শব্দ তাঁর কাছে নিশ্চিন্তে ব্যবহারযোগ্য উপাদান- অত্যন্ত লঘুভার মসৃণ উপলখণ্ডের মতো। অপরিসীম নিশ্চিন্ততায় এবং নির্ভাবনায়, প্রচলিত ছন্দের পরিমাপের দিকে লক্ষ না রেখে তিনি উচ্চহাস্যে গল্প বলেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাধবধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?" Ingoldsby Legends এর অনুকরণে "আষাঢ়ে"র কবিতাগুলি রচিত। 'হাসির গান' (১৯০০) বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নতুন সংযোজন। হাসির উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনার অপপ্রয়োগ, সামাজিক বিকৃতি, প্রেমের কল্পনা ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার বঞ্চনা, প্রকৃতি বিলাসের আতিশয্য, যুক্তিহীন চিন্তা, খাদ্যপ্রীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হাসির কবিতা লিখেছেন। রসিকতা এবং আনন্দে পরিপূর্ণ কবিতাগুলি এখনও অত্যন্ত উপভোগ্য। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ

১. প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে অনাসক্ত
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত
বিশ্বাস হ'ল খৃষ্ট ধর্ম-ভজতে যাচ্ছি খৃষ্টে-
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে।
ছেড়ে দিলাম পথটা,-বদলে গেল মতটা,
অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্‌লায়।
(বদ্‌লে গেল মতটা)

২. নন্দ বাড়ীর হ'তনা বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্টোয় গাড়িখানি;
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী-চাপা পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে , কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল-ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।
(নন্দলাল)

৩. উহু, সন্দেশ, বুঁদে, গজা, মতিচুর, রসকরা, সরপুরিয়া;
উহু, গড়েছে কি নিধি, দয়াময় বিধি। কতটা বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও তাহা খালি- আঃ
মদীয় বদনে ঢালিয়া;
উহু কোথায় লাগে বা কুর্মা কাবার, কোথায় পোলাউ কালিয়া।
(সন্দেশ)

www.icsbook.info

'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'মন্দ্র' প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। ছন্দোবন্ধনের মধ্যে গদ্যের গতি এবং সংলাপকে তিনি উপস্থিত করেছেন। রচনা কোথাও অসংযত হয়েছে, কিন্তু নতুন পরীক্ষার ক্ষেত্রে তা কোনও অপরাধ নয়।

'ত্রিবেণী' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৯ সালে, 'আলেখ্য' (১৯০৭) কাব্যগ্রন্থে ভাষা ও ছন্দের পরীক্ষায় কবি আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। ভূমিকায় এ-সম্পর্কে কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্যাদা ও আদর্শ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি-যেমন কচ্ছি, কচ্ছিলাম ইত্যাদি। অন্য পদ নির্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ শব্দ ব্যবহার করা।"

মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ

(১৮৬২-১৯৩৩)

মুন্সী মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন সাহিত্য-সাধক যতটা তার চেয়ে বেশী হচ্ছেন সমাজ-হিতৈষী এবং জনকল্যাণকামী।তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যেমন-'মুসলমান', 'নব-সুধাকর', 'সুলতান', 'মিহির ও সুধাকর', 'নবযুগ', 'রায়তবন্ধু' এবং 'মুসলিম বাণী'। ইনি 'কৃষক বন্ধু' নামক কাব্যগ্রন্থের লেখক। জাতির উন্নতি এবং কৃষকের উন্নতির জন্য এ গ্রন্থটি রচিত হয়। 'গরীব শায়ের' এই ছদ্মনামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বলছেন ঃ

"গরীব শায়ের বিদ্যাবুদ্ধি নাই মাত্র
কৃষকের দুঃখে প্রাণ কাঁদে দিবারাত্র।
তাই এ দুঃখের গীত সোজা কবিতায়।
প্রকাশিত একমাত্র ভাবিয়া খোদায়।"

কবি মূলত মুসলমান কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার কথাই বলেছেন। এবং এ কৃষককে উপলক্ষ্য করে তিনি সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের কল্যাণের কথা বলেছেন। ভবিষ্যৎ মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং সুদূর প্রসারী কল্যাণ-কামনায় কবি মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ের কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগরকে একটি পত্র লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বোধোদয়ে'র একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে এ-কথা স্বীকার করেছেন। (১৮৮৩)

কবি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি নন, এবং তাঁর 'কৃষক বন্ধু' মূলত কাব্যগ্রন্থ নয়,- সমাজ সংস্কারমূলক ছন্দবদ্ধ বক্তব্য। তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ- 'পদ্য-প্রসূণ' এবং'জঙ্গেরুম' ও 'ইউনান'। শেষের কাব্যটি ছন্দে রচিত ইতিহাস গ্রন্থ।

মুন্সী দাদ আলী

(১৮৫২-১৯৩৬)

ইনি কুষ্টিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। এঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভাঙাপ্রাণ', ও 'আশেকে রসুল'।

www.icsbook.info

'ভাঙাপ্রাণ' কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' বা নবীনচন্দ্র সেনের "অবকাশ রঞ্জিনী' ধরনের গ্রন্থ। বেদনা এবং বিলাপকে কবি এখানে একমাত্র অবলম্বন ভেবেছেন। আত্মগত গীতোচ্ছ্বাসে যে আন্তরিকতা ও তীব্রতা থাকে এখানে তা নেই। কেননা, এখানে বেদনা- বিলাসিতাই প্রবল। 'আশেকে রসুল' কাব্যগ্রন্থে কবি হযরত রাসূলে খোদার জীবনের কতগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে অবলম্বন করে আত্মনিবেদনের ধরণে কিছু কবিতা রচনা করেছেন। বিভ্রান্ত মানুষকে হযরত মোহাম্মদের জীবন কল্যাণব্রতী করবে এ-উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। 'আশেকে রসুল' আবেগময় খন্ডকাব্য। গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ৩৬ টি কবিতা এবং দ্বিতীয় খন্ডে ১৩টি কবিতা আছে। কবির 'ভাঙাপ্রাণ' ১৯০৫ এবং 'আশেক রসুল' ১৯০৭খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'শান্তিকুঞ্জ' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) এবং 'সমাজ শিক্ষা' পদ্যে রচিত শান্তি ও সমাজবিষয়ক বক্তব্য।

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী

ইনি টাঙ্গাইল জেলার চারাণ গ্রামের অধিবাসী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থর নাম 'উদাসী'। 'উদাসী' প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। গ্রন্থে তিনটি কাব্য সংকলিত হয়েছে- 'উদাসী', 'কিরণপ্রভা' ও 'অরুণভাতি'। 'উদাসী' খন্ড কবিতার সংকলন। দেশের দুর্দশার জন্য কবির আক্ষেপের অন্ত নেই- বেদনা, হতাশা এবং চিত্তদাহ এ-কাব্যের বিষয়বস্তু। কবিতাগুলির নাম মুল বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করছে, যেমন, 'ভগ্নাশপ্রবাসী', 'শ্মশানসঙ্গীত', 'উৎপীড়িত প্রেমিক', 'শেষ শয্যায় ', 'খর নিদাঘে', 'নিরাশ সঙ্গীত', 'বিষাদ সঙ্গীত' ইত্যাদি। 'কিরণপ্রভা' ও 'অরুণভাতি' দুটি কাহিনী কাব্য। উভয় কাব্যের বিষয় প্রেম ও বিরহ। কাহিনী দুটি রোমান্টিক-অবাস্তব প্রণয়লীলায় কাহিনীগুলি আরব্য উপন্যাসের প্রাচীন যুগের ও প্রাচীন ক্ষেত্রের ।

সৈয়দ এমদাদ আলী

(১৮৭৬-১৯৫৬)

সৈয়দ এমদাদ আলী নিরহঙ্কার এবং নির্লিপ্ত স্বভাবের কবি ছিলেন। তাঁর জীবনেও যেমন, তেমনি তাঁর কবিতায়ও একটি পরিচ্ছন্নতা এবং শান্তি আমরা লক্ষ করি।

সৈয়দ এমদাদ আলীর জন্ম ১৮৭৬ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। ঢাকা জেলাই তাঁর শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্র ছিল। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি 'নবনূর'পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে 'নবনূরের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি তিন বছর নয় মাস জীবিত ছিল।

সৈয়দ এমদাদ আলীর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ডালি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'ডালি'তে মোট ৩৩ টি কবিতা স্থান পেয়েছে-ডালি, ঈদ, পূজনীয়া, খোদেজা বিবি, মুছে ফেল, সেকেন্দ্রা, বাসনা, ভক্তি উপহার, বিদায়, একটি বালিকার প্রতি, নববর্ষ, উপেক্ষিতা, অমরতা, অভ্যর্থনা, কোন নব-পরিণীত বন্ধুর প্রতি, কবির মন, বিবি

www.icsbook.info

ফাতেমা জোহ্‌রা, দেবাত্মার প্রয়াণ, স্বর্গ আশীর্বাদ, বর্ষ-আবাহন, ভুল সংশোধন, শরতে কামনা, নিবেদন, পরীবিবি, স্রোতস্বতী, কাহিনী, মাধুরী, মোস্‌লেম নারীর প্রতি, বিশ্বদেব, আমীর খসরু, মীর মশারফ হোসেন, চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল, প্রার্থনা। 'ডালি'র দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি। দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এ-সংস্করণে কিছু নতুন কবিতা সংযোজিত হয়েছে এবং পুরোনো কবিতা কিছুটা সংশোধিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে কবির ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকায় কবি আপন কাব্যসাধনার আগ্রহ ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ঃ

"শৈশব হইতে কবিতা আমার মেরু মজ্জায় ছিল, কিন্তু তাহার সাধনা আমি করিতে পারি নাই। সময় সময় মনে যে সব ভাবের উদয় হইয়াছে কখনও কখনও তাহা ছন্দে গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। 'ডালি'তে তারই কতকগুলি স্থান পাইয়াছে। কোনো কবির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ইহার একটিও রচিত নয়, সেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও আমার ছিল না, এখনও নাই। আমি কবি-সম্রাটও নই, মহাকবিও নই। আমি একজন নগণ্য সাহিত্যসেবী মাত্র— মাতৃভাষার আমি একজন দীন সাধক। এ দাবীর ভিতরে কোন অহমিকা নাই।

পাঠক-পাঠিকাগণ এ কবিতাগুলির মধ্যে একটিমাত্র সুর সকলের আগে লক্ষ্য করিতে পারিলেই আমি নিজেকে পরম ধন্য মনে করিব। সে সুরটি হইল-ইসলামী জাতীয়তা। এই জাতীয়তা প্রাদেশিকতা-বর্জিত। তরুণ বয়সে যে সুরটি আমাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়াছিল, আমার নগণ্য শক্তি দ্বারা 'ডালি'তে তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শালীনতা-বর্জিত কোনো কবিতা ইহাতে নাই, প্রেমের কবিতাও নাই। নিজের স্ত্রী ছাড়া কাহাকেও ভালবাসি না , অতএব হা-হুতাশপূর্ণ একঘেয়ে প্রেমের কবিতা রচনা করিয়া নিজের দগ্ধ মনকে শান্ত করার কোনো প্রয়োজন আমার হয় নাই। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে রচিত যে কয়টি কবিতা ইহাতে আছে, তাহার মধ্যে একটিমাত্র তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত, আর কয়টি পরের রচনা।

আমার পরবর্তী তরুণ কবিদের মধ্যে যাঁহারা আশানুরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, দ্বিধাহীন চিত্তে আমি তাঁদের বরণ করিয়া লইয়াছি। আমি আগেও বহুবার বলিয়াছি, এখনও বলি, সাহিত্যের পূর্ববর্তী দল হইতে পরবর্তী দল যদি অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে জাতির জীবনে নূতন ও স্থায়ী ভাবের বন্যা আসিতে পারে না। এই ভাবের বন্যা আসিলেই প্রগতিলাভ সম্ভব হয়। যাঁহারা বুঝেন তাঁহারা জানেন অগ্রগমনের প্রকৃত সাধক যাঁহারা তাঁহাদের মনে হিংসার স্থান নাই। কখনও আমি স্তাবকদল পরিবেষ্টিত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভে বিন্দু মাত্র চেষ্টা করি নাই। ইহা আমি সাহিত্যিক আদর্শের অপমান বলিয়া সর্বদা মনে করি।

প্রলিফিক ভার্সিফায়ার' হইলেই যে খুব বড় কবি হওয়া যায় একথা আমি আগেও বিশ্বাস করি নাই, এখনও করি না। জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি বৃদ্ধির জন্য যে কবির রচনা সমৃদ্ধ নয়, তাঁহারা বা তাঁহাদের রচনার মূল্য দিতে আমি পূর্বে যে রূপ নারাজ ছিলাম, এখনও তাই—আমার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই।"

সৈয়দ এমদাদ আলীর রচনার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কবিতার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল:

www.icsbook.info

১. নবীন ধানের শীষগুলি
বায়ু ভরে পড়িছে লুটিয়া
আকাশে নবীন মেঘথর
পথ ভুলে বেড়ায় ছুটিয়া।
নীড় ছাড়ি প্রভাতে চাতক
উঠিয়াছে উধাও গগনে,
নিরন্তর সঙ্গীতের ধারে
প্লাবিয়াছে মলয় পবনে।
(কবির মন)

২. স্বপনে ঘুমের ঘোরে ছিনু পড়ি এতদিন
যদি জাগাইলে নাথ, রেখনা অলস দীন
অভাগা জাতিরে আর, জ্ঞানে ধর্মে সর্ব কর্মে
অতীত কাহিনী শত জাগাইয়া দেও মর্মে।
যে পথে চলিলে মোরা লভিব বঞ্চিত ফল,
সে পথে চরিতে প্রভু দেও প্রাণে নব বল।
(প্রার্থনা)

৩. ঘন ঘোর অন্ধকারে আরব গগন
যবে সমাচ্ছন্ন দেবি, আরব সন্তান
কু আচার, ব্যভিচারে ঘোর নিমগন,
সে সময়ে যে বীরেন্দ্র মানব -প্রধান,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ করি বিতরণ
নাশিল তিমির রাশি, সকলের আগে
চিনিলে তাহারে তুমি। করিয়া যতন
শত ভালবাসা দিয়া, শত অনুরাগে
বরিলে সে বর বপুঃ একান্ত অন্তরে
স্থাপিলে বিশ্বাস দেবি, ইসলাম উপরে।
(পূজনীয়া খোদেজা বিবি)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
(১৮৮০ -১৯৩২)

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে লিখেছেন, "বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে মিসেস আর,এস, হোসায়েনের নাম স্মরণীয়। বাঙ্গালাদেশের মুসলমান-নারী-প্রগতির ইতিহাস-লেখক এই নামটিকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না। রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে চুপি চুপি বিছানা ছাড়িয়া বালিকা মোমবাতির আলোকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে ইংরাজী ও বাংলায় পাঠ গ্রহণ করিতেন। পদে পদে গঞ্জনা সহিয়াও এভাবে দিনের পর দিন তাঁহার

www.icsbook.info

শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। কতখানি আগ্রহ ও একাগ্রতা থাকিলে মানুষ শিক্ষার জন্য এরূপ কঠোর সাধনা করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।"

তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর নামানুসারে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন' নামে এক মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'সুলতানার স্বপ্ন' এবং 'অবরোধবাসিনী'।

'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে রোকেয়ার দুটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আছে। আমরা নিম্নে একটি উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

" কুজ্‌ঝটিকা মাত্র নাই গগনমণ্ডলে
এ সময় কাদম্বিনী কোথা গেছে চলে?
পেয়ে দিব্য অবসর মেঘমুক্ত দিবাকর
সগর্বে আসীন হয়ে সুনীল অম্বরে,
ছড়াইছে হাসি হাসি উজ্জ্বল কিরণ রাশি,
ভাসাইছে জ্যোতিধারে বিশ্বচরাচরে,
পেয়ে সে প্রখর কর হাস্যময় চরাচর,
কিরণ ঝলকে যেন হাসিছে পুলকে
জীবজন্তু, নর, দেব ভূলোকে দ্যুলোকে।
এদিকে একটি দু'টি বনফুল আছে ফুটি
ওদিকে চায়ের ফুল মাধুরী ছড়ায়
বহে মৃদু সমীরণ করে স্নিগ্ধ প্রাণমন,
বসন্তের গন্ধ যেন তাহে পাওয়া যায়,
সাগর লহরী প্রায় স্তরে স্তরে শোভা পায়
ভূধর তরঙ্গমালা ত্রিদিকে বিস্তৃত;
কেবল দক্ষিণ দেশে অতি অপরূপ বেশে,
হরিৎ প্রান্তরখানি রয়েছে নিদ্রিত।
পূর্বের পর্বতখানি আপনারে শ্রেষ্ঠ জানি,
গৌরব গরবে যেন চুম্বিছে গগন!
পশ্চিমের উপত্যকা দাঁড়ায় রয়েছে একা,
বুকে লয়ে গুটি কত সুরম্য ভবন।
ওকি ও অনেক দূরে উত্তর গিরির চূড়ে
স্তুপাকার মুক্তা হেন ওকি দেখা যায়?
ও বুঝি কাঞ্চনজঙ্ঘা? তাইত! কাঞ্চনজঙ্ঘা।
কি হেতু 'কাঞ্চন' নাম কে দিল উহার?
এত স্বর্ণবর্ণ নয়, মুক্তানিভ সমুদয়,-
ধবল তুষারস্তম্ভ অতি মনোহর!"

www.icsbook.info

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন
(১৮৭২-১৯৬৪)

কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন আজীবন গ্রাম্য পরিবেশে নিঃশঙ্ক নিভৃতে সময় কাটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় কোনও দ্বন্দ্ব নেই, সমস্যা নেই, অসন্তোষ নেই। 'দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ' গ্রন্থে আপন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ঃ

" আমার আজীবন নিভৃত স্থানে বাস করা অভ্যাস। আমার চক্ষে ফলপুষ্প-শোভিত কুঞ্জবন যেমন তৃপ্তিকর, গগনস্পর্শী নানা কারুকার্য ভূষিত কলিকাতার কোনও ধনী প্রাসাদ সেরূপ রুচিকর কোনোকালেই হয় নাই।"

একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

"বিধাতা দিলেন তোমা করুণার দান-
পাতার কুটিরে বাস তাতে সুখী বারোমাস
বিজন কানন মোর রাজার প্রাসাদ;
তুমি ধন তুমি ধ্যান তুমি কত সাধ।।
নাহি সাধ অন্য কোনো, নাহি চাই ধন,
বাজায়ে তোমার বীণ সুখে যাক মোর দিন;
আমার কুটিরে হোক সেই বীণাধ্বনি,
বিভোর সেভাবে থাকি দিবস রজনী।।"

গোলাম হোসেনের 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য' ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যের উপজীব্য হচ্ছে, শারীরিক এবং মানসিক শক্তিতে নারীরা পুরুষকে পরাভূত করেছে এবং সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছে। কাব্যটি বিদ্রূপাত্মক। গোলাম হোসেনের সর্বশেষ প্রকাশিত পুস্তক 'কাব্যযূথিকা' (১৯৬০)।

www.icsbook.info

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলা নাটক
উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়;
বাংলা নাট্যক্ষেত্রে মুসলমান

সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বাংলা নাটক

আমাদের দেশে বাংলা নাটকের উদ্ভব ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলেই। বহু যুগ পূর্বে এদেশে সংস্কৃত নাটক ছিল, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত নাট্যকলার কোনও সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। কেউ কেউ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নাটক রচনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এ চেষ্টা কোনও ক্রমধারার ফল নয়। মধ্য-যুগের দীর্ঘ পরিসরে বাংলা সাহিত্যে শুধু কাব্যই পেয়েছি, নাটকের কোনও পরিচয় পাই নি। তবে আমাদের দেশে যাত্রা ছিল এবং এ যাত্রা ছিল বহু প্রাচীন কাল থেকেই।

মানুষের জীবনে আনন্দানুষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ আছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে বহুবিধ আনন্দ-উৎসবের সঙ্কেত ও প্রকাশ আছে। শিব-পুরাণ এবং ধর্মসংহিতায় শিবকে কেন্দ্র করে অনেক প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাই। তা ছাড়া মঙ্গল গান, লোকসংগীত ও পালাগান যুগে যুগে জনসাধারণের প্রাণকে উৎফুল্ল রেখেছিল। এ সমস্ত উৎসব থেকেই ক্রমান্বয়ে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান ও সংলাপ, মঙ্গলগান এবং পাঁচালী ছন্দে গীত রামায়ণ মহাভারত যাত্রাগানের প্রেরণাস্থল ছিল বলা যায়। আঠারো এবং উনিশ শতকে এ-দেশে যাত্রার ব্যাপক প্রচলন হয়। চৈতন্যের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'কালীয়দমন' এবং লৌকিক সরস 'বিদ্যা সুন্দর' কাহিনী খুবই প্রচলিত ছিল।

যাত্রায় আধুনিক ধরনের স্টেজের প্রয়োজন ছিল না। নাট-মন্দিরে সাধারণত যাত্রা হতো। কোন প্রকার নাটকীয় কলাকৌশল ব্যতিরেকেই এক প্রকার আবেগময় অসম্ভব দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে যাত্রার উপাখ্যান দৃশ্যত বর্ণিত হয়। সাধারণ জীবনের সঙ্গে যাত্রার কোনও প্রকার সম্পর্ক ছিল না। সেজন্য বাস্তব জীবনের কোন কাহিনীকে অবলম্বন করে যাত্রা রচিত হত না। কবিগান, পাঁচালী, কথকতা, টপ্পা, কীর্তন এবং হাফ আখড়াই ছিল যাত্রার বিভিন্ন অঙ্গ। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, যাত্রা মূলত সংগীতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আধুনিক অপেরার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও সংগীত বৈচিত্র্যের দিক থেকে অপেরার সঙ্গে এর কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আধুনিক বাংলা নাটক যাত্রার সংশোধিত এবং মার্জিত নাগরিক রূপ নয়। যাত্রায় সুবিন্যস্ত কাহিনী ছিল না। সংগীত ঠিক থাকতো কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে অভিনয়কালে সংলাপ নির্মিত হত। এ সংলাপের ভাষা ছিল আবেগ বহুল, উচ্চারণ ছিল সংগীতের সহযাত্রী। যাত্রার সংলাপ পদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা নাটকে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষে নেপালে কিছু বাংলা নাটক রচিত এবং অভিনীত হয়েছিল। এ নাটকগুলোর সঙ্গে অবশ্য বাংলা নাটকের ক্রমধারার কোনও প্রকার

www.icsbook.info

সংযোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু এ সংবাদটি উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। নেবারী হরফে নাটকগুলো লিখিত কিন্তু ভাষা বাংলা। অবশ্য বাংলা ভাষায় হিন্দী এবং মৈথিলী শব্দের অন্ত প্রবেশ ঘটেছে। সম্ভবত যে সমস্ত বাঙালী ব্রাহ্মণ নেপালের রাজসরকারে চাকুরি করতেন তাঁরাই এ সমস্ত নাটকের রচয়িতা।

কলকাতায় সর্বপ্রথম যে থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় তা ইংরেজী নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য। '১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে ওল্ড কোর্টহাউজের নিকট ইংরেজদের একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময় থেকেই নাটক অভিনয়ের একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা এদেশে দেখা দিতে থাকে। বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা একজন রুশীয়, নাম হেরোসীম লেবেডফ। হেরোসিম লেবেডফ কলকাতার মতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীটে) বেঙ্গলী থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করলেন। লেবেডফের থিয়েটার অধিককাল স্থায়ী হয়নি— দুবছরেরও কম। তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সাহায্যে তিনি দুটি ইংরেজী প্রহসন বাংলাতে অনুবাদ করেন 'The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor। তৎকালীন বাঙালী সমাজের শিক্ষা ও রুচি অনুসরণ করে তিনি অনূদিত নাটক দুটিতে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা থেকে অনেক গান দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে এদেশের লোকেরা ব্যঙ্গ কৌতুক এবং পরিহাসের পক্ষপাতী, গম্ভীর বিষয় তারা অবলম্বন করতে চায় না। তিনি তাই বিদেশী প্রহসনকে এদেশের উপযোগী করার জন্য এদেশীয় কয়েকটি টাইপ চরিত্রের প্রবর্তন করেন, যেমন পাহারাওয়ালা, চৌকিদার, চোর, গুণ্ডা, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি।

প্রহসনের অনুবাদ এবং নাট্যশালা স্থাপন ছাড়া লেবেডফের অন্য এক কীর্তি বাংলা 'শুভঙ্করী' এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' রুশ ভাষায় অনুবাদ।

তখনকার দিনে বাংলা নাটককে শিক্ষিত লোকেরা অবজ্ঞা মিশ্রিত অনুকম্পার চোখেই দেখত। নাটক সম্পর্কে সে সময়কার প্রচলিত উক্তি হচ্ছে- 'না-টক না মিষ্টি'। রাজা রামমোহন রায়ের সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী'তে 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একটি প্রাচীন নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনা দ্বারা যতদূর বোঝা যায় এটা অনেকটা যাত্রা এবং গতানুগতিক সংলাপের মিশ্রণে রচিত এক ধরনের উপন্যাস। নাটকের কোন প্রকার গুণ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দু থিয়েটারে' 'জুলিয়াস সিজারে'র নির্বাচিত দৃশ্য এবং 'উত্তর রামচরিত' ইংরেজীতে অভিনীত হয়। ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে নবীন বসু একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে নবীন বসুর নাট্যশালায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। অভিনয়ে স্ত্রী ভূমিকাগুলিতে অভিনেত্রীরাই অবতীর্ণ হন। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়। উল্লেখযোগ্য নামগুলি হচ্ছে- বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমহ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দকে আমরা বাংলা নাটক রচনার ইতিহাসের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বছর ধরব। এ বছর পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনীত হয়। এ সময় অভিনীত আরও কতকগুলো নাটকের নাম আমরা অধুনা জেনেছি তা হচ্ছে- তারাচান শিকদার রচিত ভদ্রার্জুন', নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', কালিপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক।

www.icsbook.info

হরচন্দ্র ঘোষ
(১৮১৭-১৮৮৪)

হরচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি প্রধানত অনুবাদক, কিন্তু অনুবাদক হলেও বাংলা নাটকের উন্মেষের ক্ষেত্র যারা প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। হরচন্দ্রের প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫২) শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিসের' ভাবানুবাদ। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, এদেশের বালকদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তিনি নাটকটি অনুবাদ করেন। হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব-বিয়োগ নাটক' (১৮৫৮)। মহাভারতের একটি উপাখ্যান অবলম্বন করে নাটকটি রচিত। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক এবং ইংরেজি নাট্যপদ্ধতিতে লিখিত বলে নাট্যকার দাবী করেছেন। 'চারুমুখ–চিত্তহরা' ' (১৮৬৪) শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েটের' ভাবানুবাদ। 'রজতগিরিনন্দিনী, (১৮৭৪) একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক ব্রহ্মদেশীয় একটি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায়, হরচন্দ্রের কোনও নাটক অভিনীত হয়নি।

প্রথম বিয়োগান্তক নাটক

সংস্কৃত নাটকের সমাপ্তি সর্বদাই মিলনে হয়েছে। বিষাদান্ত নাটক সংস্কৃত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য রীতি নিয়ম প্রবর্তনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যেও বিয়োগান্তক নাটক রচিত হয়নি। সর্বপ্রথম বিয়োগান্তক নাটক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস নাটক' (১৮৫২)। নাটকের ভূমিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সমর্থন জানিয়েছেন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– "শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়।" পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করলেও নাট্যকার সংস্কৃত রীতি অনুসারে নাটক-মুখে নান্দী ও 'নান্দ্যতে সুত্রধার' রেখেছেন। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। আলোচ্য নাটকে সপত্নী-পুত্র বিদ্বেষ এবং তার নিষ্ঠুর পরিণতি দেখানো হয়েছে।

তারা চরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'

'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকের উপজীব্য অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণ। 'ভদ্রার্জুন'ই সর্বপ্রথম বাংলা নাটক যেখানে কাহিনীর সুসংহত গতি, নাটকীয় কৌতূহল এবং সংলাপগত স্বাচ্ছন্দ্য আমরা লক্ষ করি। পাশ্চাত্য আদর্শে নাটকটি রচিত। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক এবং প্রতিটি অঙ্কে কয়েকটি দৃশ্য আছে। এলিজাবিথীয় নাটকের Prologue এর মতো 'আভাস' বা প্রস্তাবনা আছে। কাহিনীটি মহাভারতের কিন্তু বাঙালী সমাজের অনেক আচার এবং প্রথার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, যেমন বিবাহের প্রথা ও স্ত্রী আচার প্রভৃতি। 'ভদ্রার্জুন' পয়ার ছন্দের পদ্যে রচিত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

শিল্পের সমৃদ্ধি এবং প্রসারের জন্য শিল্পীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ব্যক্তি বা সমাজের সমর্থন এবং উৎসাহ। উনিশ শতকে ব্যক্তির প্রেরণা বিশেষ

www.icsbook.info

তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ এমনি একজন কৃতবিদ্য, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যাঁর সহায়তায় এবং উৎসাহে বাংলা ভাষার কথ্য বাচনভঙ্গি পরীক্ষিত হয়েছিল, নাটকের অভিনয় এবং নাটক রচনার পথ সুগম হয়েছিল। রঙ্গালয়ের ইতিহাসের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

কালীপ্রসন্ন প্রধানত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন। তাঁর প্রথম অনুবাদ নাটক কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭)। দ্বিতীয় অনুবাদ ভবভূতির 'মালতী মাধব' (১৮৫৮)। 'বিক্রমোর্বশী'র ভাষা আড়ষ্ঠ, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নাটকটিকে কৃত্রিম করেছে কিন্তু 'মালতী মাধবে'র ভাষা সংস্কৃত অলঙ্কারের আবহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নাট্যকারের ভাষায় তিনি এখানে সংস্কৃতে অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নি। কালীপ্রসন্নের 'বাবু' নাটক' একটি প্রহসন। 'মহাভারত' এর বন পর্বের সাবিত্রী উপাখ্যানের মর্মমাত্র অবলম্বন করে তিনি 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৯৫৮) নামক অন্য একটি নাটক রচনা করেছিলেন। 'সাবিত্রী সত্যবান' সম্পর্কে সুশীলকুমার দে-র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -"কথাবস্তু, চিত্তাকর্ষকভাবে কথিত হইলেও নাটকখানি খুব উঁচুদরের নহে। দৃশ্যগুলি স্বল্পায়তন, ক্ষিপ্রগতি ও অবাস্তব বিষয়ের বাহুল্য বর্জিত, কিন্তু চরিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই।"

রামনারায়ণ তর্করত্ন
(১৮২৩-১৮৮৫)

'কুলীনকুল সর্বস্ব ' (১৮৫৪) দ্বারাই রামনারায়ণের সত্যিকারের খ্যাতি। হিন্দু সমাজে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করাই এ নাটকের উদ্দেশ্য। নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক এবং বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্যই লিখিত হয়েছিল। রামনারায়ণ দক্ষ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত নাট্য কৌশলের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। সে কারণে তিনি সংস্কৃত নাট্য পদ্ধতি অবলম্বন করেই নাটক রচনা করেছিলেন, সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী, প্রস্তাবনা, নট-নটী ইত্যাদি তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের কাহিনীর মধ্যে কোনও প্রকার বৈচিত্র্য নেই, এবং নাটকীয় কাহিনীকে নাট্যকারের সমাজ-সংক্রান্ত অভিমত এবং সমালোচনায় আজ্ঞাবহ করা হয়েছে। এ নাটকটি ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে বিবাহযোগ্য চারটি কন্যার পিতা কুলপালকের মানসিক অশান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ঘটকদের ছলনা এবং কূট-কৌশলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে; তৃতীয় অংশে বাঙালী রমণীরা বিবাহে যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করেন তার বিস্তৃত বর্ণনা পাই; চতুর্থ অংশে কুলীন বিবাহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহ নয় কিন্তু এক প্রকার ব্যবসা তারই পরিচয় এবং পঞ্চম অংশে রহস্য-কৌতুকের মাধ্যমে জনৈক বিপত্নীকের বিয়ে করবার বাসনার একটি ছবি আঁকা হয়েছে। ষষ্ঠ অংশে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা আছে। চরিত্র-সৃজনের দিকে নাট্যকারের মোটেই লক্ষ্য ছিল না, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামাজিক ত্রুটি সংশোধনের জন্যই তিনি নাটক রচনা করেছিলেন ইংরেজীতে যাকে holding the mirror upto nature অর্থাৎ মানব প্রকৃতির উদ্‌ঘাটন, রামন রারায়ণ তাই করেছিলেন। রামনারায়ণ যেন জনসন এবং মলিয়র এর মত সমাজ সংস্কারক। অবশ্য তাদের মত মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

www.icsbook.info

রামনারায়ণ আরও তিনটি মৌলিক নাটক রচনা করেছিলেন-'নবনাটক' 'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১) 'কংশবধ' (১৮৭৫)। এ তিনটি নাটকের মধ্যে 'নবনাটক'টি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'নবনাটকে' ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ গুণাবলী না থাকলেও কিছুটা ট্র্যাজিক ভাব এতে আছে। এবং এ কারণে সংস্কৃত নাট্যরীতির ব্যতিক্রমই এখানে ঘটেছে বলা যেতে পারে। 'নবনাটক'টিও সমাজ সংস্কারমূলক। এখানে লেখক বহুবিবাহ প্রথার সমালোচনা করেছেন। নাটকটি উদ্দেশ্য প্রধান এবং উদ্দেশ্যকে সদাজাগ্রত রাখবার জন্য অনেক অসংলগ্ন তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য তত্ত্বের আচ্ছন্নতা অতিক্রম করে আমরা যদি অগ্রসর হতে পারি তবে কখনও কখনও নাট্যকারের রঙ্গরসের পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হব।

রামনারায়ণ চারটি সংস্কৃত নাটকের তর্জমা করেছিলেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) নাটকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এ নতুন রঙ্গমঞ্চের জন্য রামনারায়ণ শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নামক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। অভিনয়ের দিন আমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকের সুবিধার্থে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অনুরোধ করা হয় 'রত্নাবলী'র ইংরেজী তর্জমা করার জন্য। 'রত্নাবলী' পাঠ করে নতুন ধরনের বাংলা নাটক লিখবার ইচ্ছা মধুসূদনের হয়। তাঁর অন্য তিনটি অনুবাদ নাটকের নাম 'বেনীসংহার', 'আভিজ্ঞান শকুন্তলা' ও 'মালতী মাধব। প্রকাশের তারিখ যথাক্রমে ১৮৫৬, ১৮৬০, ১৮৬৭।

এছাড়া রামনারায়ণ তিনটি প্রহসন রচনা করেন- 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'চক্ষুদান' ও উভয় সঙ্কট'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাটকটি ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রহসনটি প্রকাশের তারিখ জানতে পারিনি। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি এবং তার হাস্যকর শাস্তি প্রহসনটির উপজীব্য। 'চক্ষুদান' নাটকের বিষয়ও একই। শুধু পরিসমাপ্তি ভিন্ন। স্ত্রী এখানে বিশেষ কৌশলে স্বামীর চিত্তে চৈতন্য জাগিয়েছে। 'উভয় সংকটের' বিষয় সপত্নী সমস্যা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে আমরা লিখেছি যে রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এসেই বাংলা ভাষার বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে তিনি অনবরত চিন্তা করলেন এবং অবশেষে তার মধ্যে শব্দ ও ধ্বনির ঐশ্বর্য আবিষ্কার করলেন। বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চই কবি মধুসূদনের অনুপ্রেরণার উৎসভূমি।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদনের দান সম্পর্কে বলা যায় যে,

ক. মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলা নাটককে মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন অর্থাৎ অভিনয় ও মঞ্চ সজ্জার মধ্যে নাটককে দৃশ্যমান করলেন। মধুসূদনের পূর্বে বাংলাতে অভিনয়ের উপযোগী নাটক লিখিত হয়নি, সেজন্য দুঃখ করে 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

'অলীক কুনাট্যরঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

www.icsbook.info

খ. মধুসূদনই সর্বপ্রথম সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আচ্ছন্নতা থেকে যতটা সম্ভব বাংলা নাটককে মুক্ত করেছিলেন।

গ. তিনিই সর্বপ্রথম নাট্যকাহিনীতে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ রূপ দেন। তাঁর কাহিনীগুলিতে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি আছে।

ঘ. পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুশীলনে বাংলা নাট্যশিল্পে তিনি বিপুল পরিবর্তন আনলেন।

মধুসূদন প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকটি রচিত। 'শর্মিষ্ঠা'র নির্বাসন থেকে আরম্ভ করে যযাতির জরামুক্তিতে নাটকটি শেষ হয়েছে। হিন্দু পুরাণে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করার মধ্যে মধুসূদন এখানে মহাভারতের কাহিনী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। যেহেতু নাটকটি পরীক্ষামূলক এবং জীবন সম্পর্কে কবির কোনও জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য এখানে নেই তাই উপাখ্যানভাগে মধুসূদন কোনও পরিবর্তন আনেন নি।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকটিতে কয়েকটি নাটকীয় বিচ্যুতি আছে, যেমন— (১) প্রধান কাহিনী গুলি বিবৃত হয়েছে,চারিত্রিক দ্বন্দ্ব বা ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট হয়নি। (২) বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে অথচ নাটকের গতিবিধিতে তার পরিচয় নেই। (৩) প্রতিটি চরিত্রই প্রথমাবধি অত্যন্ত স্পষ্ট, কোনও চরিত্রই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়নি। যযাতির জীবনের দুটি বিবাহ উপাখ্যান-নাটকটির উপজীব্য। প্রথম উপাখ্যানে পাচ্ছি- দেবযানীর সঙ্গে প্রণয়, বিবাহ ও সংসার জীবন; দ্বিতীয় উপাখ্যান পাচ্ছি- শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচয়, গোপন প্রণয় ও বিবাহ। এই উভয় কাহিনীর মধ্যে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত মূলত কোনও সংযোগ নেই, অস্বাভাবিকভাবে চতুর্থ অঙ্কে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে।

'শর্মিষ্ঠা'র পরে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) রচনা করেন। গ্রীক পুরাণের কাহিনী নাটকটির ভিত্তিভূমি।

গ্রীক পুরাণের কলহ দেবী বা Discordia অন্যান্য দেবীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য একটি স্বর্ণনির্মিত আপেল নিক্ষেপ করেন। আপেলটি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেবীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জুপিটারের পত্নী জুনো জ্ঞান ও নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনাস সুবর্ণ আপেল পাবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামলেন। বিচারের ভার পড়ল ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের উপর। প্যারিস ভিনাসকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বিবেচনা করে তাঁকেই আপেল দিলেন। প্যালাস ও জুনো অভিমান ও ঈর্ষায় প্যারিসের সর্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনাস, ডিসকর্ডিয়া, প্যারিস এবং হেলেনের আদর্শে অঙ্কিত। যক্ষ্মারাজমহিষী মূরজা দেবী হচ্ছেন গ্রীক পুরাণের প্যালাস দেবী।

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। প্রাচ্য নাট্যরীতি অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্য অলঙ্কারের নির্দেশ অনুসরণে কবি 'কৃষ্ণকুমারী'কে বিয়োগান্ত করেন। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে নির্যাতিত জীবনের ভয়ানক পরিণতি 'কৃষ্ণকুমারী'র উপজীব্য। কৃষ্ণকুমারী পুর্বে যে দুটি বিয়োগান্ত নাটকের সন্ধান আমরা পাই, 'কীর্তি বিলাস' ১৮৫২ এবং 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬) সেগুলো

www.icsbook.info

শুধুমাত্র মৃত্যু-পরিণতির কারণেই শোকাবহ। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিচয় তাতে নেই। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে নরনারীর হৃদয়-বেদনা আবেগে এবং সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। মধুসূদন এ নাটকে নাটকীয় সংলাপের প্রকৃতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই প্রথম ইঙ্গিত করেন যে নাটকের পাত্রপাত্রীর সংলাপ কাব্যভাবে ভারাক্রান্ত না থেকে চরিত্রকে সুস্পষ্ট করবে এবং কাহিনীর গতিধারা নির্মাণ করবে। "I Shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouthmere poetry."

'মায়াকানন (১৮৭৪) অত্যন্ত দুর্বল নাটক। মধুসূদনের জীবন যখন নিঃশেষিত প্রায় সে সময় ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি এ নাটকটি রচনা করেন। প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর।

প্রহসন রচনায় মধুসূদন অসাধারণের দক্ষতার পরিচয় বহন করেছে 'একেই কি বলে সভ্যতা'(১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। কথ্য রচনাভঙ্গির নিশ্চিত স্বাভাবিক গতি, বিভিন্ন চরিত্রের নির্বাধ প্রকাশ এবং সমাজের বিকারের কৌতুকাবহ উন্মোচন প্রহসন দুটিকে উজ্জ্বল করেছে।

দীনবন্ধু মিত্র
(১৮৩০-১৮৭৩)

সমাজ সচেতনতা দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বিশিষ্টতা। দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বেই আমরা অবশ্য সমাজ সচেতন নাটকের পরিচয় পেয়েছি। যেমন কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে ব্যঙ্গাত্মক রচনার পরিচয় এর পূর্বেই আমরা পেয়েছি। রামনারায়ণের কৌলিন্য প্রথা অবলম্বনে রচিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক, বিধবা বিবাহ অবলম্বনে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ' নাটক, বহু বিবাহ অবলম্বনে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক', এ সমস্ত নাটক সমাজ সচেতনতার পরিচয় বহন করেছে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই সামাজিকতাকে অতিক্রম করে সার্বজনীন মানব বোধকে অবলম্বন করতে পারেনি। সমসাময়িক সমাজের গ্লানি এবং বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে এগুলো রচিত কিন্তু এসমস্ত বিচ্যুতির মধ্যেও আনন্দ, দুঃখ, দৈন্য, সর্বনাশ ও সমৃদ্ধির মধ্যে যে মানুষ কালাতিপাত করে তার পরিচয় এগুলোতে নেই। দীনবন্ধু মিত্রই সর্ব প্রথম সামাজিক সমস্যার মধ্যে জীবন এবং মানব চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক সংস্কার মূলক বা উদ্দেশ্যমূলক নাটক সন্দেহ নেই, কিন্তু এ নাটকের মধ্যে সহজ ও সরল গ্রাম্য মানুষের যে পরিচয় দিয়েছেন বাংলা নাট্য সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন। সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রায় প্রতিটি মানুষের সুস্পষ্ট এবং সুতীক্ষ্ণ পরিচয় পাই। পূর্বে যেখানে ভাষার আচ্ছন্নতায় চরিত্র প্রায় অপ্রত্যক্ষই থাকতো, 'নীলদর্পণ' এ চরিত্র সেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই সংলাপ সৃষ্টিতেই দীনবন্ধু মিত্র অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং আজও সেক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ নাট্যকারের অভাব দেখা যায়। বাংলাদেশে নীলকরদের পটভূমি করেই এ-নাটকটি রচিত। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখন দেশব্যাপী একটি প্রবল চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনূদিত হয় এবং ইংরেজী গ্রন্থের প্রকাশের জন্য জেমস লং রাজরোষে পতিত হন।

www.icsbook.info

নাটকটির পাত্র পাত্রী সকলেই টাইপ (Type)। উদ্দেশ্যমূলক নাটক বলেই চরিত্রগুলি প্রসারধর্মী আবর্তধর্মী, নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংশয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তারা ঘটনা প্রতিষ্ঠা করেন না। এ ছাড়া নাটকটি সংযত ভাবে কোনও নাট্য কৌশলকে অবলম্বন করে রচিত হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লাঞ্ছিতজনের প্রতি করুণার উদ্রেক করা এবং লাঞ্ছনাকারীদের প্রতি আমাদের মনে অসন্তোষ জাগ্রত করা। নাট্যকার প্রতিপাদ্য ঘটনা থেকে বিছিন্ন হয়ে নাটকটি নির্মাণ করেননি। আবেগের দিক থেকে তিনি ঘটনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন।

'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী'(১৮৬৭) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) দীনবন্ধু মিত্রের অন্য তিনটি জটিল জীবন সংঘাতের নাটক।

দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক রীতিনীতির একজন সূক্ষ্ম দর্শক ছিলেন। পরিচিত পৃথিবীর যে সমস্ত ঘটনা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং তার মধ্যে যে বিকৃতি ও অশোভনতা ছিল, সেগুলিকে তিনি কৌতুকপূর্ণরূপে তাঁর নাটকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিধাবিমুক্ত উচ্ছ্বসিত হাসি দীনবন্ধুর বিশিষ্টতা। আমাদের জীবনে অসঙ্গতি আছে, অসংলগ্নতা আছে, অসতর্ক বিচ্যুতি আছে। এ সমস্ত কিছু একটি মনোরম হাস্যরসের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। তিনি সমাজ সংস্কারকের মতো নিষ্প্রাণ আঘাতে জীবনের বিচ্যুতি প্রকাশ করেননি, স্বভাবজাত পরিহাস রসিকতায় সঙ্গত জীবনধারার ব্যতিক্রম আমাদের উপভোগের বস্তু করেছেন। সমাজের সঙ্গে দীনবন্ধুর পরিচয় ছিল নিগূঢ়। তাই তাঁর প্রশস্ত রাজপথ যেমন তিনি জানতেন তেমনি তার গোপন অন্তরাল সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। অপরিসীম মমতার সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষকে তাদের ভাবভঙ্গি, পদচারণ এবং কণ্ঠস্বর যথাযথরূপে তিনি জাগ্রত করেছেন। নিঃসংশয় বাস্তব স্থিতি নিয়ে তাঁর সমস্ত চরিত্র নিঃসংকোচে উদঘাটিত হয়েছে। দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজী শিক্ষিত যুবা সম্প্রদায়ের নিখুঁত ছবি। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রভাব এতে আছে, কিন্তু 'সধবার একাদশী' অধিকতর সার্থক এবং পূর্ণাবয়ব। নাটকটির মধ্যে জটিল কোনও কাহিনী নেই। অনেক সময় মনে হয় যেন কোনও কাহিনীই নেই, কিন্তু তাতে রসোপভোগের কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। সংলাপের অসাধারণ চাতুর্যে দীনবন্ধু নাটকটিকে প্রাণবান ও দীপান্বিত করেছেন।অত্যন্ত বাস্তব এবং সরস বাণীভঙ্গিতে নাটকটি উজ্জ্বল। 'সধবার একাদশীর নিমচাঁদ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। করুণা এবং শ্লেষ এই উভয়বিধ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিপর্যয়ের পটভূমিতে নিমচাঁদ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একটি অক্ষয় চরিত্র।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনটিও মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র দ্বারা প্রভাবান্বিত। একটি উন্মুক্ত উদার হাস্যরস নাটকের সংলাপে ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে।

'জামাই বারিক' (১৮৭২) এর হাস্যরস farce এর পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। বিষয়কে অদ্ভুত এবং অতিরঞ্জিত করে তিনি এক প্রকার উন্মাদ আনন্দ পরিবেশন করেছেন। কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের অধিকারী ছিলেন, নাটকে দীনবন্ধু মিত্র তারই পরিচয় প্রদান করেছেন। হতে পারে দীনবন্ধু মিত্র কোমল, সুন্দর, সহজ এবং গভীর জীবন বেদনার পরিচয় বহন করতে সক্ষম হননি। কিন্তু সুস্পষ্ট সুতীব্র দৃষ্টিতে

www.icsbook.info

তিনি জীবনের সর্বপ্রকার গ্লানি এবং অকল্যাণকে অবলোকন করেছেন। এ ক্ষমতা সাধারণ নয়।

মনোমোহন বসু
(১৮৩১-১৯১২)

মনোমোহন বসুর খ্যাতি অপেরা বা গীতাভিনয় রচনার জন্য। মধুসূদন এবং দীনবন্ধু যখন পাশ্চাত্য রীতিকে অনুসরণ করে বাংলা নাটকে নতুন সুর আনলেন সে সময়ে মনোমোহন বসু প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করে এবং যাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কয়েকটি গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন। যাত্রার নিয়ম অনুসারে তিনি পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করেছিলেন। সঙ্গীত প্রধান এই নাটকগুলি দৃশ্যকাব্যরূপে জনসাধাণের মন হরণ করতে সমর্থ হয়েছিলো। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়গুলির নাম-'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭), 'সতী' (১৮৭৩) এবং 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫)। 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) এবং 'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০) মনোমোহন বসু রচিত দুটি সামাজিক নাটক। তাঁর অন্যান্য নাটক ও প্রহসনের নাম 'নাগাশ্রমের অভিনয়'(১৮৭৫)এবং 'পার্থ পরাজয় নাটক' (১৮৮১)।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
(১৮৪৮-১৯২৫)

উনিশ শতকের কবিতায় বাঙালী হিন্দুর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ আমরা লক্ষ করেছি। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন বিভাগে তাদের স্বাধিকার বোধ প্রবল হয়ে ওঠে। 'তত্ত্বোধিনী' পত্রিকার আমল থেকেই স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। এর কিছুকাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল-হাঙ্গামা বাঙালীর সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলকাতায় চৈত্র মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই চৈত্র-মেলা পরে হিন্দু মেলা নামে খ্যাতি লাভ করে। হিন্দুর মেলার উদ্দেশ্য ছিল সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যার অন্য নাম জাতিধর্ম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলার জন্য সঙ্গীত রচনা করেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার চৌধুরী এবং আরও অনেক জাতীয় ভাবপূর্ণ কবিতা লেখেন। এই জাতি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জাতি। এ সময়কার কবি এবং সাহিত্যিকদের কল্পনা ও চিন্তায় মুসলমানদের কোনই স্থান ছিল না। তাঁরা যে ভারতবর্ষের জাগরণ চেয়েছিলেন সে ভারতবর্ষ সর্বাংশে হিন্দুদের। হিন্দু-মেলার কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত একটি কবিতায় আরও পাই–

কোথা ক্ষত্রবীর সব-ক্ষত্র রাজগণ!
কোথা ভীষ্ম কীর্তিবীর্য পাণ্ডুর নন্দন!
কোথায় হামির রায়,-কোথা ভীমসিংহ হায়,
কোথায় প্রতাপ আদি বীরবরগণ!
দেখুক ভারত তারা কি দশা এখন!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময় হিন্দুদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'হিন্দু মেলার পর হইতে

কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম এবং প্রধান ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' (১৮৬৪)। প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্বাধীন রাজা পুরুব বিক্রম কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। তাঁর অন্যান্য নাটক-'সরোজিনী' (১৮৭৫)' 'অশ্রুমতি' (১৮৭৯) এবং 'স্বপ্নময়ী'(১৮৮২)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘটনা-সজ্জায় যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রয়োজন মত ইতিহাসের ঘটনার পরিবর্তন সাধন করেছেন। এবং নতুন অনেক ঘটনা কল্পনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি জাতীয়তার আদর্শ অনুসরণ করলেও মানবজীবনের প্রেম এবং বিরহের দ্বারা অধিকতর আচ্ছন্ন ছিলেন। তাই তাঁর সমস্ত নাটকেই প্রেম, ঈর্ষা এবং বিরহ প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

তিনি কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেছিলেন। প্রহসনগুলির নাম– 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'এমন কর্ম আর করিব না।' (১৮৭৭), 'হিতে বিপরীত'(১৮৯৬) 'হঠাৎ নবাব' (১৮৯৪) এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০২)। শেষের দুটি প্রহসন ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের নাটকের অনুবাদ।

রাজকৃষ্ণ রায়
(১৮৪৯-১৮৯৮)

বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংস্কার সাধন এবং সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা অসাধ্য সাধন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় অন্যতম। তিনি অভিনয়কুশলী ছিলেন এবং অভিনয়ের জন্যই তিনি স্বাধীনভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর রঙ্গালয়ের নাম 'বীণা রঙ্গভূমি'। এ-ভাবে রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সামাজিক, পৌরাণিক এবং ব্যঙ্গরসাত্মক বহুবিধ নাটক র

চনা করেন। তাঁর কয়েকটি নাটকের নাম 'অনলে বিজলী (১৮৭৮)' 'লৌহ কারাগার' (১৮৮০) 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'চন্দ্রহাস'(১৮৮৮)। 'মীরাবাই'(১৮৮৯), 'বেনজীর বদরেমুনীর' (১৮৯৩)।

জাতীয়তামূলক কয়েকটি নাটক

এসময় তথাকথিত জাতীয় ভাব নিয়ে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। নাটকগুলি বিদ্বেষপ্রসূত এবং তত্ত্বভারাক্রান্ত। এই সমস্ত নাটক অভিনীত হয়ে হিন্দু মানসকে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করেছে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ করেছে। আশ্চর্য এই যে এ সময় হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনও প্রকার শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিরোধের কথা চিন্তা করা যায় না। অধিকন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে মুসলমানরা তখন অন্তরালবর্তী। সুতরাং কারো সঙ্গে সংঘর্ষে আসবার উৎসাহ এবং ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সেই সময় স্থানীয় মুসলমানদের নিশ্চেতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী নির্মাণ করে বিজাতীয় আনন্দ লাভ করা রুচিবিকারের পরিচায়ক।

www.icsbook.info

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত মাতা' (১৮৭৩) এবং 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) নামক দুটি নাটক রচনা করেন। নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্বকালীন অবস্থা এবং মুসলমান শাসনাধীন অবস্থা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত করা। কৌতুকের বিষয় এই যে, 'ভারত মাতা' নাটকের জাতীয়ভাব হচ্ছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বক্ষপুটে আশ্রয়গ্রহণ; কিন্তু 'ভারতে যবন' নাটকের মধ্যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল পূণ্যভূমি ভারত হতে 'যবনগণকে দূরীভূত করা।' চিত্তবিকারের এর চেয়ে আশ্চর্য নিদর্শন আর হতে পারে কিনা জানি না। হারাণচন্দ্র ঘোষের 'ভারত দুঃখিনী' (বাং ১২৮২) এ ধারারই চার অঙ্কের একটি দুর্বল রূপক নাটক। নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এই কি সেই ভারত' (১৮৮২) নিতান্ত তাৎপর্যহীন রচনা।

হরলাল রায় 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটকে বখ্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অধ্যায়কে উপস্থাপিত করেছেন। তেজসিংহের কবল থেকে চিতোররাজ বিক্রমসিংহকে উদ্ধার এবং 'যবন'এর আক্রমণ থেকে চিতোরপুরী রক্ষা তাঁর অন্য নাটক 'হেমলতা'র (১৮৭৩) প্রধান উপজীব্য। 'শত্রুসংহার নাটক' (১৮৭৪), 'রুদ্রপাল নাটক' (১৮৭৪), 'কনকপদ্ম' (১৮৭৪) হরলালের রচিত আরও তিনটি নাটক। উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' (১৮৭৫) লেখকের মতে, আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক প্রকৃত ঘটনাময় দৃশ্যকাব্য।

এ-সময়কার অন্য কয়েকজন নাট্যকার যাঁরা তথাকথিত স্বাদেশিকতার উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, প্রমথনাথ মিত্র এবং উমেশচন্দ্র গুপ্ত।

এ জাতীয় নাটকগুলি লিখিত হয় প্রধানত ১৮৭০–১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপিত হয়।

মুসলমান রচিত প্রথম সামাজিক নক্সা

মুন্সী নামদার নামক এক ব্যক্তি সামাজিক-নকশা জাতীয় কিছু প্রহসন রচনা করেছিলেন। এগুলো মঞ্চের জন্য রচিত হয়নি এবং মঞ্চের উপযোগীও ছিলো না। এক ধরনের কথোপকথনের পদ্ধতিতে এগুলো রচিত হয়েছিল। মুন্সী নামদার সম্ভবত ছদ্মনাম। এঁর জন্মস্থান ছিলো হুগলী জেলার বালিয়া ভূপতিপুর। তাঁর নামে রচিত বলে যে পুস্তিকাগুলোর তালিকা পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে, 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প নারীদের একি দম্ভ' (১৮৬৩) 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭)' 'ননদ ভাজের ঝগড়া' ও 'বাঞ্ছারামের গল্প' (১৮৬৭), 'নূতন ঝড়' (১৮৬৭) 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' (১৮৬৭), 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (১৮৬৮)। এ প্রহসনগুলো গদ্য-পদ্য মিশ্রিত, মাঝে গীতও আছে।

সেখ আজিমউদ্দীন নামে অন্য একজন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি নামদারের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও পশ্চিমবঙ্গের লোক। তাঁর 'কি মজার কলের গাড়ি' ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮) গদ্যে-পদ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত প্রহসন। রচনা বিশেষত্বহীন।

www.icsbook.info

গোলাম হোসেন নামে একজন লেখকের 'হাড়জ্বালানী' নামে (১৮৬৪) একটি বিশেষত্বহীন প্রহসনধর্মী রচনা পাওয়া যায়। নাম দেখে মুন্সী নামদারের 'কলির বউ হাড় জ্বালানী'র সঙ্গে এর মিল আছে বলে মনে হয়। তবে যেহেতু 'কলির বউ'-এর প্রকাশনা পরে হয়েছে তাতে বিশ্বাস জন্মে যে মুন্সী নামদার গোলাম হোসেনের অনুকরণ করেছিলেন। পরিচর্যাহীন এবং বিশেষত্বহীন এ সমস্ত রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে কোনও স্বাক্ষর রেখে যায়নি।

শিমুয়েল পিরবক্স

পিরবক্স-এর জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। নামদৃষ্টে মনে হয় যে ভদ্রলোক এক সময় মুসলমান ছিলেন, পরে ধর্মত্যাগ করেন। তাঁর খ্রীস্টান হবার সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়, 'খ্রীস্টীয় গীতসংহিতার' একটি সংস্করণ সম্পাদনা করার মধ্যে। পিরবক্স 'বিধবা বিরহ নাটক' নামে একটি সামাজিক নক্সা জাতীয় নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকটি ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিধবা-বিবাহের উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকটি রচিত। ছয় অঙ্কে সমাপ্ত নাটকটিতে তৎকালীন হিন্দু সমাজ-জীবনের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তাতে নাট্যকারের বাস্তব সচেতনতা অসঙ্কোচে প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের বিধবা নায়িকা মনোমোহিনী তাঁর অতি বৃদ্ধ কামাতুর পিতার বিবাহ প্রবৃত্তি দেখে এবং আপন যৌবনের ব্যর্থতার কথা ভেবে অসহিষ্ণু হয়ে কুলত্যাগ করে। এ ঘটনাটিকেই পল্লবিত করে নাটকটি রচিত হয়েছে।

নাট্যকার স্থানে স্থানে সংলাপ-রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য বাচনভঙ্গি অমার্জিতরূপেই স্থান পেয়েছে।

মীর মশার্‌রফ হোসেন
(১৮৪৭—১৯১২)

বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান এবং প্রতিষ্ঠিত গদ্যশিল্পী মীর মশার্‌রফ হোসেন একাধিক বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর সর্বপ্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী' ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি এ নাটকটিকে বলেছেন "অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম।" নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—ইন্দ্রপুরের রাজা বীরসিংহ বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হলেন। রাজমন্ত্রী বৈশম্পায়ন তাঁকে অনুরোধ করলেন দ্বিতীয়বার পাণি গ্রহণ করতে। বৃদ্ধ রাজা তরুণী ভার্যা রেবতীকে গৃহে আনলেন। যুবরাজ নরেন্দ্রসিংহের প্রতি বিমাতা রেবতী আসক্ত হলো। নরেন্দ্রসিংহ তার প্রণয় নিবেদন প্রত্যাখ্যান করল। ক্রুদ্ধ বিমাতা ষড়যন্ত্র করল। পরিণামে সমগ্র রাজ-পরিবার ধ্বংস হলো। সংস্কৃত নাটকের রীতি অবলম্বন করে মীর মশার্‌রফ হোসেন প্রস্তাবনায় নট-নটীর অবতারণা করেছেন।

'বসন্তকুমারী' নাটকে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ছাপ আছে। কিন্তু 'কীর্তিবিলাসে'র তুলনায় 'বসন্ত কুমারী' নাটক অনেক বেশী সংহত সৃষ্টি।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপন্যাসে মীর মশার্‌রফ হোসেন কথ্য বাচনভঙ্গি প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ করেছি। 'বসন্তকুমারী' নাটকের সংলাপে এই কথ্যভঙ্গির প্রয়োগ

www.icsbook.info

চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক ও সহজ করেছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি : 'প্রিয়ম্বদা। ফুল দেখলে মন খুশী হয় এও কি একটা কথা। কোথায় ফুল কোথায় মন। সম্বন্ধও ভারি। কী মজার কথা, ছোঁবনা, খাবনা, দেখেই খুশী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ!..... দেখুন এই উদ্যান, এই অর্থ ভাণ্ডার ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না শুকলেও মন খুশী হয়। সে কি মহারাজ? বলেন কি? কিসের বয়েস? আপনার চুল পাকছে? কই আমি একটা পাকা চুল দেখতে পাইনে।'

মীর মশার্‌রফ হোসেনের দ্বিতীয় নাটক 'জমিদার দর্পণ' ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর তেরো বৎসর পূর্বে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। নামকরণের সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তুর এবং ঘটনা সংস্থানের দিক থেকে পার্থক্য আছে। মীর মশার্‌রফ হোসেন জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম করতেন এবং সে কারণে তিনি জমিদারের অনেক অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তৎকালীন সমাজে জমিদারের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাই সে সময় জমিদারের বিরুদ্ধে কোনও কিছু লিখবার মধ্যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় আছে। 'জমিদার দর্পণ-এর মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এইঃ হাওয়ান আলী একজন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির জমিদার। স্বেচ্ছাচারিতায় তার আনন্দ। প্রজা আবু মোল্লার যুবতী স্ত্রী নুরুন্নেহারকে লাভ করবার তার ইচ্ছা। বলপূর্বক নুরুন্নেহারকে হাওয়ান আলী তাঁর বৈঠকখানায় নিয়ে আসে। নুরুন্নেহার তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তার নারীধর্ম রক্ষা করে, কিন্তু প্রাণ রক্ষা করতে পারে না। জমিদারের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ হলো বটে কিন্তু উৎকোচের দ্বারা সাক্ষী বশ করে জমিদার মুক্তি পেলো। নুরুন্নেহারের স্বামী আবু মোল্লা উন্মাদ হয়ে গ্রাম ত্যাগ করলো।

মীর মশার্‌রফ হোসেন রচিত অন্য দুটি নাটক 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯) এবং 'এর উপায় কি' (১৮৭৬) নামক একটি প্রহসন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁর ভাষার প্রশংসা করেছিলেন।

মুহম্মদ আবদুল করিম

মুহম্মদ আবদুল করিমের জন্ম হয় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর আত্মজীবনী 'আশা-বৃক্ষ' গ্রন্থে এ সংবাদটি আছে। মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। আবদুল করিম 'জগৎমোহিনী' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাট্য-উপাখ্যানটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

বিমান নগরের রাজা কালীকান্তের চন্দ্রকান্ত নামে একমাত্র পুত্র কর্ণনাটের রাজপুত্র রজনীকান্তের সঙ্গে শত্রু অধিকৃত কর্ণনাট রাজ্য উদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন চৌদ্দ বছর আগে। বর্তমানে তাঁর কোনও সংবাদ নাই। রাজকন্যা বিলাসবতী রাজগৃহে একাকিনী সময় ক্ষেপণ করছেন বিবাহের অপেক্ষায়। এ সময় বিমান নগরে এক তাম্বুলকারিণীর আবির্ভাব ঘটে। তাম্বুলকারিণীর রূপে রাজা মুগ্ধ হলেন, মন্ত্রী মুগ্ধ হলেন এবং এভাবে দেশে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তারপর অনেক জটিলতার সৃষ্টি হল— বাস্তব অবাস্তব বহু ঘটনার আবর্ত জাগালো। সর্বশেষে চন্দ্রকান্ত ফিরে এলেন এবং তখন আবিষ্কৃত হল যে তাম্বুলকারিণী তাঁর স্ত্রী জগৎমোহিনী। একই সঙ্গে রজনীকান্তও ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিয়ে হল বিলাসবতীর।

www.icsbook.info

একটি নাটক অভিনয় এবং চরিত্র-বিকাশের প্রয়োজনে যতটা কাহিনী বহন করতে পারে, 'জগৎমোহিনী'র কাহিনীটি তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুভার। তাছাড়া অধিকাংশ ঘটনাই পাত্র-পাত্রীর মুখে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর সর্বপ্রকার জটিলতা উপাখ্যানগত, চরিত্রগত নয়।

'জগৎমোহিনী' আবদুল করিমের একমাত্র নাটক।

কাদের আলী

মীর মশাররফ হোসেনের সমসাময়িক অন্য একজন নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁর নাম কাদের আলী। 'মোহিনী প্রেমপাশ' (১৮৮০) তাঁর একমাত্র নাটক। উনিশ শতকের হিন্দু জমিদার গৃহের একটি কাহিনী নাটকটির উপজীব্য। স্ত্রী পরমা সুন্দরী কিন্তু স্বামী রূপবান নয়। এহেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চিত্তে অনাসক্তি জেগেছে। অল্প কালের জন্য অন্য পুরুষের প্রতি স্ত্রীর আসক্তিও জেগেছে। অবশেষে জটিলতা দূরীভূত হল এবং স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘটল। নাটকের সংলাপ সহজ এবং স্বাভাবিক। নাট্যকারের বাস্তব সচেতনতার পরিচয় সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আইনগত কোনও প্রকার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে বাংলাদেশে অজস্র নাটক রচিত হয়েছে এবং অভিনীত হয়েছে। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে নাটক এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি বাধার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে 'ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস কনট্রোল বিল' নামক একটি আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয় এবং বছরের শেষের দিকে তা আইনে পরিণত হয়। এই আইনের সমালোচনা করে অমৃত বাজার পত্রিকায় (১৪-১২-৭৬) লেখা হয় ঃ

"নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে কিন্তু ইহা দ্বারা গভর্ণমেন্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের অভাবে নির্জীব হইয়াছি। গভর্ণমেন্ট যদি আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধহয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এই আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটি তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।" এই আইন প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার স্বাধীনতা খর্ব হলো। আইনের বলে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হলো যে আপত্তিজনক মনে করিলে পুলিশ যে কোনও নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে পারে।

এই আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাট্যশালার স্বাধীন অভিব্যক্তির যুগ শেষ হয়।

www.icsbook.info

গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(১৮৭৭—১৯১২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ যুগের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং খ্যাতিমান নাট্যকার। অভিনয়ের আশ্চর্য দক্ষতার গুণে এবং কুশলী পরিচালনা-ক্ষমতার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। ধর্ম, সমাজ, সংসার এবং রাজনীতি সমস্ত কিছুই তাঁর নাটকের উপজীব্য ছিল। তিনি যে শুধু নাটক রচনা করেছেন তাই নয়, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করেছেন এবং অভিনয় শিল্পের প্রবর্তন করেছেন। মঞ্চে অভিনীত হলেই যে নাটকের সত্য ধরা পড়ে এবং নাটক যে পাঠের জন্য নয়, বরং মঞ্চে পরিদৃশ্যমান হবার জন্য গিরিশচন্দ্র এ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে জাতীয় রঙ্গালয়ের পিতাবলা হয়। তিনি কোনও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেননি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁকে এই আখ্যা দেওয়া হয়, তার কারণ তিনি তৎকালীন রঙ্গমঞ্চকে পরিপুষ্ট রেখেছিলেন, অনবরত অভিনয়োপযোগী নাটক পরিবেশন করে তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রাণরক্ষা করেছিলেন এবং তাকে আনন্দপূর্ণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক অনেক প্রকারের নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকীয় আবেগ বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় অবলম্বন করে শতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার সন্ধান খুঁজেছিলেন ধার্মিকতা এবং ত্যাগের মধ্যে। তাই তাঁর প্রতিটি নাটকে তত্ত্বানুসন্ধানের ইঙ্গিত আছে। ভক্তি ও করুণ রসে তাঁর নাটকগুলি গম্ভীর এবং সে কারণেই জীবনের সকল দিকের পরিচর্যা সেখানে আমরা পাই।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসী 'রামায়ন' এর নিকট তিনি অনেকটা ঋণী। তাঁর 'রাবণবধ' (১৮৮১), 'সীতার বনবাস', (১৮৮২), 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮২), 'রামের বনবাস' (১৮৮২) এবং 'সীতাহরণ' (১৮৮২) কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে'র বিভিন্ন ঘটনার যথাযথ অনুকৃতি মাত্র। তাই তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীগুলি কৃত্তিবাস-কথিত পাত্র-পাত্রীর অনুরূপ। 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮১) এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এ দুটি নাটক 'মহাভারত' এর মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পৌরাণিক নাটক গিরিশচন্দ্র আরো অনেক লিখেছেন; কিন্তু সেগুলি বিশেষত্বহীন। যেমন— 'ধ্রুবচরিত্র', 'কমলে-কামিনী', 'নলদময়ন্তী', 'শ্রীবৎস চিন্তা'। পৌরাণিক যে নাটকটি গিরিশচন্দ্রকে খ্যাতির উচ্চশিখরে পৌঁছে দেয়, তার নাম 'বিল্বমঙ্গল।' যে কারণে খ্যাতি অর্জন করেন তা হচ্ছে তৎকালীন হিন্দু সমাজের মানস-প্রকৃতি। গিরিশচন্দ্র হিন্দুদের বিনীত-চিত্ততা এবং ভক্তিভাবের অনুগত হয়ে নাটকটি রচনা করেছিলেন। প্রেম এবং বৈরাগ্যলীলা এই নাটকের উপজীব্য। 'জনা' (১৮৯৪) নাটকটিও এক সময় খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। চৈতন্যকে অলৌকিক শক্তির আধাররূপে কল্পনা করে 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬) নাটক রচনা করেন। 'শঙ্করাচার্য' (১৯১০) নাটকে জটিল অদ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা আছে।

কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর সমস্যা নিয়ে গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯)। এক সময় নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সম্বর্ধনা পেয়েছে। তাঁর অন্যান্য সামাজিক নাটক— 'মায়াবসান' (১৮৯৮) 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি ও শান্তি' (১৯০৮) এবং 'গৃহলক্ষ্মী' (১৯১২)।

www.icsbook.info

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য এবং জাতীয়তাবোধ এই নাটকগুলোর বিশেষত্ব। এই পর্যায়ের প্রধান নাটকগুলি হল 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'। 'সিরাজদ্দৌলা' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তির পর থেকে নাটকের আরম্ভ এবং তাঁর শোচনীয় পরিণতির পর মীর জাফরের মসনদ লাভে নাটকের শেষ। সিরাজদ্দৌলার জীবনধারাকে অনুসরণ করে নাট্যকার স্বাধীনতার আবেগকে প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন সমাজে পরাধীনতার বেদনায় বাঙালীর যে চিত্তবিক্ষোভ, 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক তার পরিচয় বহন করছে।

গিরিশচন্দ্র 'আলাদীন', 'আবুহোসেন' ইত্যাদি সঙ্গীতমুখর রম্যনাটকও রচনা করেছিলেন।

যে সমস্ত কারণে গিরিশচন্দ্র ঘোষের খ্যাতি, সে কারণগুলিই গিরিশচন্দ্রের নাটকের শিল্পগত অসমৃদ্ধির জন্য দায়ী। তিনি মঞ্চ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজে ছিলেন প্রসিদ্ধ অভিনেতা, সে কারণে বিশেষ মঞ্চের উপযোগী এবং আত্ম-অভিনয়যোগ্য একটি বিশেষ বলিষ্ঠ চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকই গড়ে উঠেছে। তিনি নিজে যে ধরনের অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন এবং রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য নট-নটীর যে ধরনের অভিনয়কুশলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল তিনি সেই প্রকৃতির চরিত্র নির্মাণ করতেন। এতে তাঁর নাটকে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা আসেনি এবং ভাষার মধ্যেও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়নি। আবেগধর্মী ভাষায় অত্যন্ত লঘুভাবে জীবনকে স্পর্শ করা হয়েছে মাত্র। গভীরভাবে জীবনে প্রবেশ করে জীবনের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা কোথাও নেই।

গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

অমৃতলাল বসু
(১৮৭৫—১৯২৮)

গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলাল বসুও ছিলেন খ্যাতিমান নট। মঞ্চ-পরিচালনা এবং অভিনয়-শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে।

বিষয়বস্তু এবং আবেগের দিক থেকে অমৃতলালের নাটক ছিল গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিপরীত। গিরিশচন্দ্র যেখানে তত্ত্বসন্ধান করেছেন, অমৃতলাল সেখানে পরিহাসের কোলাহল তুলেছেন। অবশ্য অমৃতলালের পরিহাস দীনবন্ধুর মতো স্নিগ্ধ অনুভূতি সম্পন্ন এবং উন্মুক্ত ছিল না। অমৃতলালের পরিহাস উদ্দেশ্যমূলক তীক্ষ্ম বিদ্রূপের মতো। তিনি প্রধান বিদ্রূপ করেছেন পাশ্চাত্যভাবে বিকৃত পুরুষ ও স্ত্রী সমাজকে।

অমৃতলালের প্রথম রচনা "হীরক চূর্ণ নাটক" (১৮৭৫)। তাঁর অন্যান্য নাটক হচ্ছে "তরুবালা" (১৮৯১), "বিমাতা বা বিজয় বসন্ত" (বাং ১৩০০), "হরিশচন্দ্র" (বাং ১৩০৬), "আদর্শ বন্ধু', (বাং ১৩০৭), "খাস দখল" (১৯১২), "নবযৌবন" (১৯১৪), এবং "যাজ্ঞসেনী (১৯২৮)। অমৃতলাল রচিত প্রহসনগুলোর নাম হচ্ছে "চোরের উপর বাটপাড়ি" (১৮৭৬), "তিলতর্পণ" (১৮৮১), "ডিসমিস" (১৮৮৩), "চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে" (বাং ১৩০৪), "তাজ্জব ব্যাপার" (বাং ১২৯৭), "রাজা বাহাদুর" (১৮৯১), "কৃপণের ধন" (বাং ১৩০৭), "বিবাহ বিভ্রাট" (১৮৮৪) "সম্মতি সংকট" (১৮৯১),

www.icsbook.info

"কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা" (বাং ১২৯৯), "একাকার" (বাং ১৩০৩), "গ্রাম্য বিভ্রাট" (বাং ১৩০৪), "বাবু" (১৩০০), "বৌমা" (বাং ১৩০২), "সাবাস আটাশ" (১৮৯৯), "অবতার" (বাং ১৩০৮), "সাবাস বাঙালী" (১৯০৬), "ব্যাপিকাবিদায়" (১৯২৬), "দ্বন্দ্বেমাতরম্' (১৩৩৩) ইত্যাদি। অমৃতলাল ঘোষ নিছক রঙ্গরস ছাড়া শিক্ষামূলক প্রহসন রচনা করেছেন। আধুনিক বাঙালীর দুর্বলতার চিত্র অনেক নাটকে অঙ্কন করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালীর জাতীয় জীবনের যে বিচ্যুতি এবং অহমিকা প্রবেশ করেছিলো সেগুলি নিয়ে অমৃতলাল বিদ্রুপ করেছেন। অমৃতলালের বিভিন্ন প্রহসনে কৌতুক আছে কিন্তু বিদ্বেষ নেই। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো কৌতুকরসের সৃষ্টি এবং হাসির মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক অসঙ্গরি দিকে ইঙ্গিত করা।

সেক্সপীয়রের অনুবাদ

উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটতে থাকে। সে পরিচয়ের প্রথম সূত্রে সেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং তা অভিনীত হয়। একই সময়ে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ চলছিলো, কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের চিন্তায় নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে। ১২৫৫ সালে গুরুদাস হাজরা "লেম্‌স্‌কৃত ইতিহাসে গ্রন্থ অবলম্বন করে ' রোমিও জুলিএটের' মনোহর উপাখ্যান" প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ সালে এডওয়ার্ড রোয়ার (Edward Roer) কৃত "মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা" ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ বছরেই সেক্সপীয়রের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) সেক্সপীয়রের "মার্চেন্টি অব ভেনিস" এর বাংলা অনুবাদ "ভানুমতি চিত্ত-বিলাস" নামে প্রকাশ করেন। নাটকটি গদ্য ও পদ্যে রচিত। বাংলা অনুবাদে কয়েকটি অবান্তর পাত্র-পাত্রী যুক্ত হয়েছে এবং শেষে একটি নতুন দৃশ্য এসেছে যা মূলে নেই। নাটক হিসাবে এটি অভিনীত হয়েছিলো কিনা জানা যায় না তবে এটি যে একটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠা তা অনুভব করা যায়। হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিএটে'র অনুবাদ করেছিলেন "চারু-মুখ চিত্তহরা" নামে। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ নাটকটিও অসার্থক ছিলো। সেক্সপীয়রের অনুবাদ স্বাভাবিকভাবেই আরম্ভ হয়েছিলো বাংলা সাহিত্যের বিকাশ এবং সমৃদ্ধির জন্য। তাছাড়া সেক্সপীয়র পাঠ করেই ট্র্যাজেডী সম্পর্কে আমাদের প্রথম ধারণা জন্মে এবং বাংলা ভাষায় প্রথম প্রথম ট্র্যাজেডী রচিত হয়। কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় "বাঙালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টি লাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতির জন্য" সেক্সপীয়রের নাটক অনূদিত হয়।

নিম্নে অনূদিত নাটকগুলির তালিকা দেওয়া হলো—

১৮৫২	ভানুমতী চিত্তবিলাস (The Merchant of Venice)	হরচন্দ্র ঘোষ
১৮৬৪	চারমুখ চিত্তহরা (Romeo and Juliet)	হরচন্দ্র ঘোষ
১৮৬৭	সুশীলা বীরসিংহ (Cymbeline)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.icsbook.info

১৮৭০	কুসুমকুমারী (Cymbeline)	চন্দ্রকালী ঘোষ
১৮৭০	বসন্তকুমারী (Romeo and Juliet)	রাধামাধব কর
১৮৭৩	ভ্রমকৌতুক (The Comedy of Errors)	বেণীমাধব ঘোষ
১৮৭৪	রুদ্রপাল (Macbeth)	হরলাল রায়
	অমর সিংহ (Hamlet)	প্রমথনাথ বসু
১৮৭৫	ম্যাকবেথ (Macbeth)	তারকনাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৭৬	মদন মঞ্জরী (The Winter's Tale)	অজ্ঞাতনামা
১৮৭৭	সুরলতা (The Merchant of Venice)	প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়
১৮৭৮	অজয় সিংহ ও বিলাসবতী (Romeo and Juliet)	যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষ
১৮৭৯	নলিনী বসন (The Tempest)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮০/৮৪	প্রকৃতি (The Tempest)	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮৮৩	শরৎশশী (A Midsummer Night's Dream)	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
১৮৮৪	কর্ণবীর (Macbeth)	নরেন্দ্র নাথ বসু
১৮৮৫	ভীমসিংহ (Othello)	তারিণীচরণ পাল
১৮৯২	হ্যামেলট় (Hamlet)	ললিতমোহন অধিকারী
১৮৯৪	হ্যামলেট (Hamlet)	চন্ডীপ্রসাদ ঘোষ
২৮৯৫	রোমিও জুলিয়েট (Romeo and Juliet)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৬	হরিরাজ (Hamlet)	নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী
১৮৯৭	অনঙ্গ রঙ্গিণী (As You like it)	অন্নদাপ্রসাদ বসু
১৮৯৯	ম্যাকবেথ (Macbeth)	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	হরিরাজ (Hamlet)	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকই ভাবানুষঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু যথাযতরূপে অনূদিত হয়নি।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র
(১৮৫৭—১৯১২)

অতুলকৃষ্ণ মিত্র আজীবন রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাটকের অন্যান্য দিকের চাইতে মূল গীতিনাট্য রচনায় তিনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন এবং মোট যোলটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে যে কয়টি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল সে কয়টির নাম হচ্ছে— 'আদর্শ সতী' (১৮৭৬), 'বিজয়া বা প্রতিমা

www.icsbook.info

বিসর্জন' (১৮৭৮), 'অপ্সর কানন বা রত্নবেদি' (১৮৮০), 'গোপীগোষ্ঠ' (১৮৮৯), 'আমোদ-প্রমোদ' (১৮৯৩), 'শিরী ফরহাদ' ১৯০৬ 'হিন্দা-হাফেজ' (১৯০৮), 'আয়েষা' (১৯০৯)। মুসলমান বিষয় নিয়ে নাটক রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ পথে অগ্রসর হয়ে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ধর্মবীর মহম্মদ' নামে একটি নাটক প্রকাশ করেন কিন্তু মুসলমানদের আপত্তিহেতু এ নাটকের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। নবাব আবদুল লতিফ এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে তাঁর আপত্তিজনিত অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(১৮৬৩—১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের বন্যা প্রবাহিত করেন। তাঁর পূর্বে পৌরাণিক নাটকের বন্যাবেগ দেশকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, বিচ্ছিন্নভাবে একটি-দুটি ঐতিহাসিক নাটকের সন্ধান পাওয়া গেলেও দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব পর্যন্ত তা কোনও বলিষ্ঠ ধারা নির্ধারণ করে নি। ঐতিহাসিক নাটকে লৌকিক জীবনের সমৃদ্ধি এলো এবং পৌরাণিক নাটকের দৈবলীলা অন্তরালে গেল। স্বদেশহিতৈষণা, পরাধীনতার মর্মবেদনা এবং জাতীয় জীবনে প্রতিনিয়ত যে বিক্ষোভ, ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে তার পরিচয় স্পষ্ট হল। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণাস্থলে হল নতুন ঐতিহাসিক নাটক। এ সময়কার ঐতিহাসিক নাটকেই সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষ হিসাবে এলো ইংরেজ এবং স্বাধীনতার ভিত্তিমূলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কর্মপ্রেরণার কথা উচ্চারিত হল।

'তারাবাঈ' (১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। উপাখ্যানটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'রাজস্থান' থেকে। নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলী বিক্ষিপ্ত এবং কিছুটা অসমঞ্জস। তাছাড়া কৌতূকরসের প্রাবল্য নাটকটির ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য নষ্ট করেছে। 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকটি তাঁরাবাঈ' নাটকটির চেয়ে অনেক বেশী বলিষ্ঠ এবং উজ্জ্বল। এই নাটকে স্বদেশপ্রীতির একটি উজ্জ্বল চিত্র নায়ক প্রতাপসিংহের বিভিন্ন ধারণা-বাসনা এবং কর্মপ্রবাহের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। আদর্শের জন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতাপসিংহ নিজের ভাইকে হারিয়েছেন এবং স্ত্রীকেও হারিয়েছেন। নাটকটির ভাষা আবেগময় কিন্তু দ্রুতগতি ও স্বচ্ছন্দ। 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) নাটকে কয়েকটি মুসলমান চরিত্র শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এই নাটকেই সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিমূলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। নাটকের একটি চরিত্র দিলির খাঁ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা অনেকবার বলছেন। 'নূরজাহান' (১৯০৮ নাটকটি ট্রাজেডি। ইতিহাস এখানে প্রেমের উৎসভূমি হয়েছে, স্বাদেশিকতার নয়। এই প্রেমকে মমতা, করুণা বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাগ্রত করেছেন। নারীর প্রেমে দুই শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতা অন্যায়ভাবে এক পক্ষের পরাজয় এবং সর্বনাশ, নারীচিত্তে ক্ষোভ এবং বঞ্চনা; অবশেষে চরম হাহাকারের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি 'নূরজাহান' নাটকটিকে একটি সার্থক ট্রাজেডিতে পরিণত করেছে। 'মেবার পতন' (১৯০৮) একটি নীতিমূলক ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকারের ভাষায় সেই নীতি হল বিশ্বপ্রেম। মঞ্চের সাফল্যের দিক থেকে 'সাজাহান' (১৯০৯) নাটক বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত

www.icsbook.info

অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের আরেকটি বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি। উনিশ শতকের হিন্দু কবিদের মত তিনি আওরঙ্গজেবকে শুধুমাত্র নিষ্ঠুর ও উৎপীড়ক হিসেবে চিত্রিত করেন নি, হৃদয়বৃত্তির একটি করুণ আবেদনও এই চরিত্রের মধ্যে আমরা পাই। 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) এবং 'সিংহল-বিজয়' (১৯১৫) নাটক দুটিতে ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণ এবং কিংবদন্তীর উপর লেখককে বেশী নির্ভরশীল হতে হয়েছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়োপযোগী একটি জনপ্রিয় নাটক। 'সিংহল-বিজয়' নাটকটি পাঠযোগ্য উপভোগ্য নাটক কিন্তু মঞ্চের উপযোগী নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র দুটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন— 'পরপারে' (১৯১২) এবং 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)। 'পরপারে' নাটকটির পরিণতি আধ্যাত্মিক। ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো কাহিনীগত জটিলতা এবং কৌতূহল এই নাটকটিতে যথেষ্ট আছে। 'বঙ্গনারী'ও একটি আবেগবহুল সমাজচিত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কথা আমরা অন্যত্র বলেছি। প্রহসন রচনায় তাঁর একটা স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। তাঁর প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫)। এতে বিলেত ফেরৎ নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া এবং পতি এঁদের সকলের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। 'বিরহ' (১৮৯৭) একটি বিশুদ্ধ প্রহসন।

লেখকের উদ্দেশ্য ছিল "অল্প আয়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যরস অংশটুকু দেখানো।" 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০) উদ্দেশ্যহীন কৌতুককর রচনা। 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) প্রহসনে বিলাত ফেরৎ নব্যহিন্দু এবং শিক্ষিত রমণীদেরকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) প্রহসনে নীতিকথা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু কুশীদজীবী যাদবের লাঞ্ছনার ছবি যথেষ্ট কৌতূকাবহ নাটকটি মঞ্চোপযোগী এবং উপভোগ্য। 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) একটি প্যারোডি। এখানে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন— 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪)।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং পরিহাস-নাটক এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি আখ্যানবস্তু গঠনে যেমন নৈপূণ্য দেখিয়েছেন, তেমনি দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র গঠনেও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। মানবমনের স্পৃহার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার যে দ্বন্দ্ব এবং হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির যে দ্বন্দ্ব তার পরিচয় তাঁর অধিকাংশ নাটকেই আছে। অনেক নাটকে স্বদেশহিতৈষণার পরিচয় আছে, পরিহাস-নাটকের তো কথাই নেই। ব্যাপ্তি এবং প্রগাঢ়তার দিক থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে তিনি পত্র-পুষ্পে পল্লবিত করেছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
(১৮৬৪—১৯৩৭)

গীতিনাট্য রচয়িতা হিসেবেই ক্ষীরোদপ্রসাদের দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি। আরব্য-উপন্যাসের রোমাঞ্চকর এবং রহস্য-প্রগাঢ় উপাখ্যান অবলম্বন করে তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করেছিলেন আনন্দ উপভোগের অকৃত্রিমতায় তা আজও আমাদের নিকট প্রীতিপ্রদ। এক সময় নৃত্যগীতের সঙ্গে পরিবেশিত হয়ে দর্শককে এ গীতিনাট্যগুলি অবিরাম আনন্দ দিয়েছে এবং বর্তমানকালেও এদের প্রসাদগুণ নষ্ট হয়নি। 'আলিবাবা'

www.icsbook.info

(১৮৯৭) একটি সর্বসময়ের জন্য সমাদৃত গীতিনাট্য। রহস্য, রঙ্গকৌতুক, রোমান্স এবং তাদের নিশ্চিত প্রবাহ নাটকটিকে চিত্তগ্রাহী ও আনন্দময় করেছে। 'বেদৌরা' (১৯০৩) নাটকে আরব্য-উপন্যাসের অন্য একটি উপাখ্যান নাট্যরূপ পেয়েছে। আরব-ইরান-তুর্কীর কয়েকটি কাহিনী নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'জুলিয়া' (১৮৯৯), 'সপ্তম-প্রতিমা' (১৯০২), 'দৌলতে দুনিয়া' (১৯০৮), 'পলিন' (১৯১১), 'মিডিয়া' (১৯১২), 'রূপের ডালি' (১৯১৪), 'বাদশাজাদী' (১৯১৬) ইত্যাদি কয়েকটি উপভোগ্য নাটক রচনা করেন।

যুগের রীতি অনুসারে ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটিও হৃদয়গ্রাহী হয়নি। নাটকগুলির নাম 'বভ্রু বাহন' (১৮৯৯), 'সাবিত্রী' (১৯০২), 'উলুপী' (১৯১৬), 'ভীষ্ম' (১৯১৩), 'মন্দাকিনী' (১'৯২১) ও 'নবনারায়ণ (১৯২৬)।

ক্ষীরোদ প্রসাদের কয়েকটি 'ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল এবং তাদের জনপ্রিয়তা এখনও নষ্ট হয়নি। 'আলমগীর' (১৯২১) কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় (১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১)। কোনও আদর্শকে উপলক্ষ্য না করে নাট্যকার প্রধান চরিত্রের দ্বন্দ সংঘাতকে অনুসরণ করেছেন। দুই বিরোধী' হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আলমগীরের চরিত্র জাজ্বল্যমান হয়েছে। নাট্যকার ইতিহাসকে সর্বাংশে অনুসরণ করেন নি, কেননা তিনি রসোপভোগকে দ্বিধামুক্ত রাখতে চেয়েছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক- 'অশোক' (১৯০৭), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭) ও 'বাঙ্গলার মসনদ' ('১৯১১)।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আহেরিয়া' (১৯১৫) ও 'বঙ্গে রাঠোর' (১৯১৭) এক সময় খ্যাতি অর্জন করেছিল। নাটক দুটির ভিত্তিমূলে ইতিহাস আছে, কিন্তু চরিত্র কাল্পনিক।

ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকটি উপন্যাসও লিখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি বিশেষ খ্যাতি পায় নি।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে ভিন্ন একটি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

শরৎচন্দ্রের নাটক

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিলো। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের 'ষোড়শী' (১৯২৭) নাট্য-মন্দির কর্তৃক অভিনীত হয়। 'পল্লী সমাজে'র নাট্যরূপ 'রমা' (১৯২৮) আর্ট থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। তাঁর অন্য জনপ্রিয় নাটক দত্তার নাট্যরূপ বিজয়া' (১৯৩৪)

কাজী নজরুল ইসলাম

কৈশোরে নজরুল ইসলাম গ্রাম্য যাত্রাদলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আসানসোল অঞ্চলে লেটো গানের প্রচলন ছিল। সঙ্গীত, নৃত্য এবং রূপকথার মাধ্যমে লেটো গান পরিবেশন করা হতো। লেটোর দলে থাকাকালীন তিনি কয়েকটি গীতি-নাট্য রচনা করেছিলেন। নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য না হলেও, নজরুলের মানস-গঠনের

www.icsbook.info

ইতিহাস-আলোচনায় এ সংবাদটি মূল্যবান। এ সময়কার রচনাগুলির মধ্যে 'চাষার সঙ' নামক গীতিবহুল নাটকটি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গীতিনাট্যগুলির নাম হলো 'ঠগপুরের সঙ' মেঘনাদবধ','শকুনীবধ', 'দাতাকর্ণ', 'রাজপুত্র' কবি কালিদাস', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি।

নজরুল ইসলামের 'ঝিলিমিলি' গীতিনাট্য বাংলা ১৩৩৪ সালের আষাঢ়ে 'নজরোজ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় এবং তাতে চারটি একাঙ্কিকা স্থান পায়–'ঝিলিমিলি' 'সেতু-বন্ধ', 'শিল্পী' ও 'ভূতের ভয়'। 'ঝিলিমিলি' নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘরে'র ছাপ আছে। কিন্তু 'ডাকঘরে' যেখানে পৃথিবীর আনন্দকে উপভোগ করবার ব্যাকুলতার কথা আছে 'ঝিলিমিলি'তে সেখানে নরনারীর প্রেম এবং বিরহের কাথাই মুখ্য। গল্পাংশ হলো এই ঃ ফিরোজা প্রেমিক হাবিবের সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না। তার পিতা মির্জা সাহেব বাধা দিচ্ছেন। তিনি তাকে পূর্বদিকের জানালা খুলতে দেন না; কেননা এ জানালা খুললে প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার মিলন ঘটবে। বাধা এবং ব্যবধানের মধ্যে সে তার প্রেমাস্পদ হাবিবকে পাচ্ছে স্বপ্নে। স্বপ্নপুরিতে সে হাবিবের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সপ্তমী চাঁদের নৌকায়। সর্বশেষ আমরা দেখি ফিরোজার মৃত্যু হলো এবং হাবিবের চিত্তে উন্মত্ততা জাগলো। নাটকটিতে আমরা যৌবনের জয়গানের পরিচয় পাই এবং নব যৌবনের আকাঙ্খা ও প্রেমের সমর্থন পাই। 'সেতুবন্ধ' একাঙ্কিকার কাহিনী হলো ঃ মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে প্রকৃতির সহজ প্রবাহকে রুদ্ধ করে দিয়ে পদ্মার উপর সারা ব্রিজ নামে একটি সাঁকো তৈরি করলো। কিন্তু মেঘ-বৃষ্টি-নদী-তরঙ্গের বিক্ষোভ এবং আক্রমণে সারা ব্রিজ ভেঙ্গে পড়লো। এ নাটকে নজরুল দ্বিধাবিমুক্ত গতি এবং উদ্দামতাকে সমর্থন জানিয়েছেন। 'শিল্পী' একাঙ্কিকার কাহিনী হলো ঃ চিত্রকর সিরাজ তার স্ত্রী লায়লীকে সংসারের নিত্যকর্মের মধ্যে আনন্দবেদনায় পেতে চায় না, সে তাকে চায় প্রেরণারূপে এবং চিত্তলোকে মানস প্রতিমারূপে। লায়লী অন্যদিকে সিরাজকে চায় সংসারকর্মের নিত্যসঙ্গী স্বামীরূপে। এই দ্বন্দ্বে যখন লায়লী বিপর্যস্ত তখন শিল্পীর প্রেরণারূপে চিত্রার আবির্ভাব ঘটলো এবং চিত্রাকে নিয়ে সিরাজ গৃহত্যাগ করলো। লায়লী পিতৃগৃহে গিয়ে শিল্প-সাধনার চেষ্টা করলো। এদিকে কিছুদিন যেতেই চিত্রাও প্রেরণা হয়ে থাকতে চাইলো না, স্ত্রী হবার বাসনা তার চিত্তেও জাগলো। যখন তা সম্ভব হলো না তখন চিত্রা বিদায় নিলো। শিল্পী সিরাজ তখন সত্যিকারের শিল্পী হবার সাধনায় পৃথিবীর মানুষের বেদনা এবং দুঃখের পথে যাত্রা করলো। 'ভূতের ভয়' একাঙ্কিকাটি তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করে লেখা।

নজরুল ইসলামের 'আলেয়া' (১৯৩১) গীতিনাট্যটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। নাটকটির গল্পাংশ সংক্ষেপে এই ঃ গান্ধারের রাজা এবং যশলমীরের স্বাধিকার প্রমত্তা রাণী একে অন্যের প্রতি হৃদয়াবেগজনিত আকর্ষণ অনুভব করেন এবং পরস্পরের হৃদয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধের পর মিলনের লগ্ন যখন সমীপবর্তী তখন রাণী রাজার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেন। নাটকটি প্রতীকধর্মী। ভূমিকায় কবি বলেছেন ঃ 'এই ধূলির ধরায় প্রেম-ভালবাসা-আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিকের পথ থেকে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় প্রতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।' গ্রন্থ মুদ্রিত

www.icsbook.info

হওয়ার পূর্বেই সম্ভবত পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে ১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা কল্লোলের সাহিত্য-সংবাদে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ 'নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথম তার নাম দিয়েছেন 'মরুতৃষ্ণা' সম্প্রতি নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্য খানি সম্ভবতঃ মনোমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ৩৩ খানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশা করি এ নাটিকাখানি জনসাধারণের মন হরণ করবে।" 'আলেয়া' নাটকটি মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয় নি, অভিনীত হয় 'নাট্যনিকেতনে' ১৩৩৮ সালের ৩রা পৌষ।

নজরুল ইসলামের 'মধুমালা' গীতিনাট্যের রচনাকাল ১৩৩৭ সাল। পল্লীগীতিকায় মদনকুমার-মধুমালার যে সুপরিচিত কাহিনী আছে নজরুল ইসলাম সেই কাহিনী অবলম্বন করেই এ গীতিনাট্যটি লিখেছেন। গল্পাংশ এইঃ প্রাগজ্যোতিষপুরের কাঞ্চননগরের অধিপতি দন্ডধরের পুত্র মদনকুমার এবং সন্দ্বীপ রাজ্যের অধিপতি তাম্বুল রাজার কন্যা মধুমালা। মদনকুমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে মধুমালার সন্ধানে নির্গত হন। পথে জাহাজডুবি হয়ে তাঁর সৈন্য-সামন্ত মারা যায়। জ্ঞান ফিরে এলে রাজকুমার দেখলেন তিনি মগরাজ্যের রাজপুরীতে বন্দী ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রজিতের কন্যা কাঞ্চনমালার সঙ্গে মগরাজের কুব্জপৃষ্ঠ পুত্র বিচিত্রকুমারের বিবাহ নির্দিষ্ট ছিল। মগরাজ কাঞ্চনমালার সঙ্গে ছলনা করে মদনকুমারকেই মগরাজপুত্র বলে পরিচয় দিয়ে কাঞ্চনমালার সঙ্গে বিচিত্রকুমারের সম্বন্ধ ঠিক করেন। মগরাজার সঙ্গে মদনকুমারের শর্ত ছিল যে বাসর ঘরে ঢুকেই মদনকুমার বেরিয়ে পড়বেন এবং মগরাজ তাঁর সেনা দিয়ে মদনকুমারকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। মদনকুমার মধুমালার সন্ধানে গেলেন এবং এদিকে কাঞ্চনমালা মদনকুমারকেই একমাত্র স্বামী বলে স্বীকার করে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন যোগিনীর বেশে। মধুমালা মদনকুমারের সঙ্গে মিলিত হলেন না। তিনি কাঞ্চনমালার হাতে মদনকুমারকে সমর্পণ করে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করলেন।

'মধুমালা' গীতিনাট্যটির ভাষা মূলত সঙ্গীতধর্মী আবেগ প্রধান; নজরুল ইসলামের অধিকাংশ গদ্যেই কবিতার আবেগ এবং কল্পনার প্রসার আমরা লক্ষ্য করি। গীতিনাট্যগুলিতে সেগুলি আরো প্রবল। চরিত্র-নির্মাণ সফলকাম হয় নি। পাত্র-পাত্রীদের উক্তিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে আবৃত্তিযোগ্য সুন্দর ভাষণের মতো।

নজরুল ইসলাম চলচ্চিত্রের জন্য দুটি কাহিনী লিখেছিলেন– একটির নাম 'বিদ্যাপতি' অন্যটির নাম 'সাপুড়ে'। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে 'বিদ্যাপতি' ছায়াচিত্র মুক্তি লাভ করে এবং 'সাপুড়ে' মুক্তিলাভ করে ১৯৩১ সালে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর জন্য নজরুল ইসলাম অজস্র গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। সেগুলি আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

একাদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্য

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

কবিতা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ষাট বছরেরও অধিককাল বিস্তৃত। ব্যাপকতা, প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে একমাত্র ভিক্টর হুগোর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। এক হাজারের অধিক কবিতা লিখেছেন, দ্বাদশটি নাটক লিখেছেন, আটটি উপন্যাস, অষ্টাধিক ছোটগল্পের গ্রন্থ, দু হাজারেরও অধিক গান— শুধুমাত্র যার বাণী নয়, সুরও তিনি দিয়েছেন। এ ছাড়া সাহিত্য ও সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ তাঁর আছে। ভ্রমণকাহিনীও তিনি লিখেছিলেন অনেক। সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবেও তাঁর দান অনুল্লিখিত থাকতে পারে না। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার ইংরেজী তর্জমাও আছে, যে তর্জমাগুলোর অধিকাংশই তিনি নিজে করেছেন। সুতরাং প্রাচুর্যের দিক থেকে এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের তুলনা, অন্য কারো সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ধারায় যে পরিবর্তন আনয়ন করলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগ্রত জীবন এবং যৌবনের সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বাংলার প্রচলিত গীতিধারায় তা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এই বিপ্লব-পন্থাকে অনুসরণ করেন নি, তিনি বাংলার প্রচলিত গীতিধারারই পোষকতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার উন্মেষ যুগে আমরা জয়দেবের এবং বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদ-লালিত্যের প্রভাব দেখেছি। তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী'ই এ প্রভাব সমর্থন করে। বিশেষ ভাবে লক্ষযোগ্য এই যে, যে পাশ্চাত্য প্রভাব মাইকেলের কাব্যে অসাধারণ দীপ্তি, সংঘর্ষ ও সংগ্রামের আবেগ এনেছে, সে পাশ্চাত্য প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রগাঢ় সৌন্দর্য তন্ময়তা এনেছে এবং তাঁকে স্বজাতিকতার সীমা থেকে আন্তর্জাতিক বোধের ক্ষেত্রে উপনীত করেছে। রাজা রামমোহন রায় যে বিশ্বব্যাপী মানব-সংস্কৃতির সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ এবং সংঘর্ষে বর্তমান বিশ্ব যখন বিপর্যস্ত, তখন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই সর্ব-মানবের কল্যাণ করা সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথের এই আন্তর্জাতিকতার মূলে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম এবং আদর্শ সক্রিয় রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, সমস্ত আদর্শের মূল থাকবে স্বদেশের মৃত্তিকায় প্রোথিত এবং দেশের মাটি থেকেই তা রস আহরণ করবে কিন্তু তা পত্র-পল্লব বিস্তৃত করবে সর্বদিকে।

মানবপ্রীতি এবং সহানুভূতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক স্বজাতিকতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন এ কথা বলা চলে না, যদিও তিনি মূলত ভারতবাসী এবং বাঙালী।

www.icsbook.info

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের এক বিত্তশালী সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তাঁর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছিল ধর্মীয় পরিবেশে এবং একই সঙ্গে শিল্প ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে। ধর্মক্ষেত্রে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বেদ এবং উপনিষদ থেকে। কিন্তু রামমোহনের মত বেদের একাত্ম বোধকে একমাত্র অবলম্বন করে থাকতে পারেননি, বৈষ্ণব দ্বৈতবাদ তাঁর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানবাত্মা এবং জীবাত্মা একে অন্যকে জানবার চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে একে অন্যের সান্নিধ্যে আসছে এবং অবশেষে পরিপূর্ণ ভাবে মিলিত হচ্ছে, এ ভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় এবং নাটকে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ আপন শৈশবের শিক্ষা, পরিবেশ এবং বংশগত স্মৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেছেন যে মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছ-পালার স্বাতন্ত্রের মধ্যে তাঁর জীবনে এক স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছিল এবং যে পরিবারে তাঁর জন্ম, উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে সে পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাংলাদেশের ধর্ম-সাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পিতৃগৃহে তাঁর ছোঁয়া লাগে নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্ত সমাহিত চিত্তের আনন্দময় পুরুষ। আবার এই পরিবারে ইংরাজী সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। কবির শৈশবের স্নিগ্ধ প্রহর এভাবেই কেটেছিল প্রকৃতির শুশ্রুষায়, ধর্মের শান্তি, বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য এবং আত্মীয় স্নেহের ঘনচ্ছয়ায়।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সাধনার উন্মেষ যুগের কাহিনী বিবৃত করেছেন। এখানে আমরা অবাস্তব এবং আত্মকেন্দ্রিক কৈশোর জীবন থেকে বিশ্বের জীবন এবং প্রকৃতিতে কবির বিনির্গমনের কাহিনী পাই। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবি-আত্মাকে অন্ধকার গহ্বরে আবদ্ধ ঝর্ণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একদিন সূর্যের আলো গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং ঝর্ণার উচ্ছ্বসিত আবেগকে মুক্তি দিল। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় শৃঙ্খলবদ্ধ কবি- প্রতিভা প্রেমের স্পর্শে যে মুক্তি পেয়েছে তার কাহিনী পাই। 'প্রভাত সঙ্গীতে', 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন- "এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বন্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল— ক্ষুদ্রকে লইয়াই জগৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নেই।" 'প্রভাত সঙ্গীতে'র পর রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র বিষয় এবং বিচিত্র ভূমিকা অবলম্বন করে অগ্রসর হতে থাকে। তাঁর গীতি-প্রতিভার নিদর্শন আমরা 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'তে পাই এবং এ দুই কাব্যের গীতিময়তা 'সোনার তরী' ও 'চিত্রাতে' পরিপূর্ণতা লাভ করে। 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন সচেতন কাব্য। তিনি যে মানুষের জন্য চিন্তা করছেন এবং কর্তব্যের নানা সঙ্কল্প নিচ্ছেন, সে সঙ্কল্পের পরিচয় 'সোনার

www.icsbook.info

তরী'র কবিতাগুলিতে আছে। কবির বুদ্ধি এবং কল্পনা বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব লোকের মধ্যে একটি সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করেছিলো। 'সোনার তরী' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানে। সে সময় তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এদেশের প্রকৃতির ও মানুষের ভাষা এবং সুরকে তিনি চেনেন এবং সেই সুর ও ভাষার উদ্বোধন ঘটেছিল তাঁর চিত্তে। এ কাব্যে কবি বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশেষ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। কবি এক যুগ্মসত্তা অনুভব করেছিলেন, যে সত্তা তাঁরই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত। এক সত্তায় চিত্তের তাপ থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর অন্য এক সত্তায় কর্মে তার বহিঃপ্রকাশ। সংসার জীবনে এই দুই সত্তার বিরোধ জীবনে বিশৃঙ্খলা আনে। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' কাব্যে আদর্শ এবং কর্মযোগের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সমন্বয়ের কথা কবি বললেও সত্যিকারের সমন্বয় এখানে ঘটেনি। জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উম্মেষ ঘটেছে; কিন্তু এ-কাব্যে একদিকে জিজ্ঞাসা যেমন সত্য, অন্যদিকে কল্পনার নির্মল শান্তিও তেমনি সত্য। কোন্‌টি যে প্রবল তা সব সময় আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় না। কেন না কবি 'পরিস্ফুট ফুলের' মতো সুখকে কামনা করেছেন এবং সে সুখকে চিরদিনের জন্যে আপনার করে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ চিরকালের জন্য ধরা দেয়নি, এ-বেদনাই কবিকীর্তিকে মহৎ করেছে।

'চিত্রা'র 'উর্বশী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধের একটি চমৎকার নিদর্শন। 'উর্বশী' হচ্ছে সৌন্দর্যের আদর্শ—অমানবিক নীতিবিহীন। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এ সৌন্দর্যকেই কবি পরিব্যাপ্ত দেখেছেন। সুইনবার্ণের 'এফ্রোদিতি'র সৌন্দর্য পরিকল্পনার সঙ্গে উর্বশীর সৌন্দর্য কল্পনার মিল আছে। উভয় ক্ষেত্রেই এ সৌন্দর্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই এ সৌন্দর্য দীপ্তমান এবং আনন্দ উদ্বেল, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বেদনার সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে সম্পর্কিত। 'সোনার তরী' কাব্যে' আমরা সর্বপ্রথম মরমীবাদের স্পর্শ দেখতে পাই। কবি বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এই মরমীবাদ, দার্শনিক চেতনা এবং প্রগাঢ় ধর্মবোধ, এককথায় নিবেদিতচিত্ততা, 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' এবং 'গীতাঞ্জলীতে' পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

'সোনার তরীতে' যে দার্শনিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণের মধ্যে সে চেতনা নিবেদিত-চিত্ততায় রূপ পেয়েছে 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', উৎসর্গ' ও 'গীতাঞ্জলীতে'। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে 'নৈবেদ্য', সম্পর্কে বলছেন, "জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিছেন- আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্যে দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকে আমি মুক্তির সাধনা বলি।"

'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানকার শব্দগুলি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, স্পষ্ট এবং অলঙ্কারবিহীন। শব্দগুলি একান্ত নির্ভাবনাময় এবং স্বচ্ছ,তন্ময় মুহূর্তের উচ্চারিত আড়ম্বরহীন ধ্বনির মত। কয়েকটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে ঃ

www.icsbook.info

১. বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ মাঝারে তোমার
স্মরিব জীবননাথ।
২. নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।
অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায়, তারা যায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।
৩. তোমার পতাকা যাকে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের অবতরণিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, 'নৈবেদ্য উৎসর্গ খেয়া গীতাঞ্জলী'র কবিতা সম্পর্কে তা উজ্জ্বলরূপে সত্য। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই, "আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্ম নিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্থাৎ আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি-তাতে বাইরে থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ।"

www.icsbook.info

একই সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, মানুষকে প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার এবং পরম পুরুষের প্রতি আত্মনিবেদন 'উৎসর্গ' এবং 'খেয়া'র কবিতাগুলিকে ভাষা, ছন্দে এবং সহজ বর্ণনায় উপভোগ্য করেছে। নিম্নে 'উৎসর্গ' এবং 'খেয়া থেকে, কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া গেল ঃ

১ আপনারে তুমি করিবে গোপন
কী করি।
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।
[উৎসর্গ]

২. তোমায় পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝিগো আমি বুঝিগো তব
ছলনা,
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বলনা।
[উৎসর্গ]

৩. জানিনা কখন এল নূপুর বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণরেখা
কী লিখিল শেষ লেখা
দিগন্তের তুলি
আমি যে ছিলাম একা
তাও ছিনু ভুলি
আইল গোধূলি।
[উৎসর্গ]

৪. পথ চেয়ে তো কাটলো নিশি
লাগছে মনে ভয়-
সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়।
দাঁড়ায় আমার দুয়ার দেশে
বনছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছে তো তার জানা-
ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস,
করিসনে কেউ মানা।
[খেয়া]

www.icsbook.info

'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে খ্যাতির উচ্চশিখরে পৌছে দিয়েছে। গীতাঞ্জলির সহজ সরল নিবেদনের সুর, দ্বন্দ্বহীন নির্ভাবনায় পরম পুরুষকে কামনা এবং নিভৃত প্রাণের প্রসন্নতা বিদেশে প্রশংসা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ যে চৈতন্যের কথা বলেছেন ইউরোপের কাছে তা অনাস্বাদিত। সমগ্র ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে উন্মুক্ত চিত্তে গ্রহণ করলো। সর্বত্র একথাই আলোচিত হলো, যে ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং চিত্তের ঔদার্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অলৌকিক সৌন্দর্যের প্রতিফলন এনেছে তৎকালীন ইউরোপে তার নির্দশন কোথাও নেই। খ্যাতনামা আইশি কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ১৯১২ সালে ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লিখে ইউরোপের কাছে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত করলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। 'গীতাঞ্জলি' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয় এবং ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'তে শুধুমাত্র 'গীতাঞ্জলি'রই কবিতা নেই -'খেয়া', 'উৎসর্গ' এবং অন্যান্য গ্রন্থেরও কবিতা এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন, জীবন নিজেকে বিকশিত করে গতির মধ্যে এবং অনবরত সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে। মানুষের আত্মস্বরূপ গতির প্রবাহে অনবরত আপনাকে বিকশিত করছে। এই যে গতিময় সৃজন শক্তি, এটাই হলো মানুষের ধর্ম। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এ-তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে স্থিতির মধ্যে জীবনের কোনো মূল্য ধরা পড়ে না। জীবনের মূল্য আবিষ্কৃত হয় উম্মুক্ত প্রসারের এবং গতির মধ্যে। 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটিকে বাণীরূপ দিয়েছেন এভাবে-

" শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু কর না সঞ্চয়,
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহুতে কিছু তব নাই,
তুমি তাই।
পবিত্র সদাই।"

'বলাকা' যখন প্রকাশিত হয় (১৯১৬) তখন ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী এ বিপর্যয়কে মানুষের চিত্ত-উদঘাটন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কল্যাণকর মনে করলেন। সংগ্রাম এবং বিশৃঙ্খলা জীবনকে নিঃশেষ করে না, বরঞ্চ নবরূপে সজ্জিত করে। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সংগ্রামের এই সমর্থন শব্দবিন্যাসে এবং ছন্দ যোজনায় দুর্ভাগ্যক্রমে ততটা ধরা পড়েনি, যতটা ধরা পড়েছে গতির আবেগ 'বলাকা', 'ছবি' এবং 'চঞ্চলা' কবিতায়। তার কারণ বোধ হয় গতির মধ্যে একটা বিস্তারের স্বীকৃতি আছে, কল্পনার ব্যাপকতা এবং স্বপ্ন-সঞ্চয় আছে। কিন্তু সংগ্রামে যে চিত্তদাহ এবং বঞ্চনা আছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তা অনুপস্থিত ছিল।

'বলাকা'র পর ১৯১৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার কোনোটাই শব্দ ব্যবহার, সুর এবং ধ্বনিতে চিত্ত বিকাশের দিক

www.icsbook.info

থেকে 'বলাকা'কে অতিক্রম করতে পারেনি। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'সোনার তরী' প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'বলাকা'। এই বাইশ বছর রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। ব্যাপকতায়, প্রগাঢ়তায়, চাঞ্চল্যে এবং জীবনবোধে এই বাইশটি বছর রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরিপূর্ণ বসন্তের কাল। 'বলাকা'র পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'পলাতকা' (১৯১৮), 'পূরবী' (১৯২৫), 'লেখন' (১৯২৭), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'বনবাণী' (১৯৩১)।

১৯৩২সালে 'পুনশ্চ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রানাথের কবিতার একটি নতুন রূপ আমাদের সামনে উপস্থিত হল। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে পদ্যের নিরুপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙলেন এবং এভাবে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রশস্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণ জীবনের প্রাঙ্গণে নেমে এলো। ছন্দের বন্ধন এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে সম্ভ্রান্ত এবং সুসংস্কৃত করে রেখেছিল। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কবিতা সাধারণ মানুষের জীবনকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলো। 'পুনশ্চে' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'আঁটি আঁটি খড় বোঝাই' -এর কথা শুনলাম, 'ছেড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা এলো গড়িয়ে মিশিয়ে', 'বাঁধা গরুর দড়ি ' কেটে দিলো যে ছেলে তার দৌরাত্ম্যের কথা শুনলাম এবং 'কিনু গোয়ালার গলি'র একটি বাড়ীর সংবাদ পেলাম, যে বাড়ীর 'লোনা-ধরা দেয়ালের মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি, মাঝে মাঝে স্যাঁতা পড়া দাগ'। 'পুনশ্চে'র পর রবীন্দ্রনাথ গদ্য ভঙ্গিতে আরো যে কয়টি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেন সেগুলির নাম হচ্ছে- 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'পত্রপুট' (১৯৩৬)।

অসুস্থতার পর রচিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' (১৯৩৮) এবং 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। জীবনে সমাপ্তি এসেছে এটা কবি অনুভব করেছেন এবং সমাপ্তি সান্নিধ্যে কবি ধরিত্রীর সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় বন্ধন ছিল সে বন্ধনের কথা অনবরত বলছেন। 'সেঁজুতি'র 'অমর্ত্য' কবিতায় কবি লিখেছেন-

" আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা
ঐখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে উঠে ঘাস,
যার পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্য পাগল নটরাজের পিছে।
ফুল ফোটাবার যে রাগিণী বকুল শাখায় সাধা
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা,
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখ্‌না তুলি।"

মৃত্যুর পূর্ব বছর এবং মৃত্যু বছরে (১৯৪০-১৯৪১) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে নতুন করে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে জীবনের স্পন্দনের অনুরণন পাই। এতদিনের সাধনার পরও রবীন্দ্রকাব্যে আবার নতুন বোধের স্তর আবিষ্কৃত হচ্ছে, যার পরিচয় নিম্নের দুটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট ঃ

১. "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

www.icsbook.info

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" (জন্মদিনে)

২. " ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঝে মাঝে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।" (আরোগ্য)

অশীতিবর্ষের কূলে এসে কবির দৃষ্টি গভীর এবং উদার হয়েছে এবং কবিতার বাণীরূপ হয়েছে সহজ, অলঙ্কার বর্জিত নির্ভাবনাময় বিকাশের মতো। সুরের একাগ্রতায় এ কবিতাগুলির তুলনা নেই। 'শেষ লেখার' একটি কবিতা-

" প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে-
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-
কে তুমি?
পেল না উত্তর।"

জীবনের শেষ দিনে আপন কবিতার মূল সুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন- " মানুষকে ভালবেসেছি মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। সেই সংবাদ ঠেকা দিয়েছে পালের হাওয়ার মত কল্পনার তরীতে, কখনও এ বাঁকে কখনও ও বাঁকে, কিন্তু পুঁথিগত আইনের সীমানা থেকে দুরে।" (প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৪৫)।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ সংক্রান্ত এবং রাজনীতি বিষয়ক কবিতাগুলি খুব বেশী পরিচিত নয়—কিন্তু এ সমস্ত কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন এবং অসাম্য এবং অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গীতি-কাব্যের লালিত্য এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কিছুটা কিন্তু সর্ব মুহূর্তে দেশের মর্মবেদনাকে তিনি অনুভব করছেন এবং তাঁর কাব্যের মধ্যেও এ মর্মবেদনার প্রকাশ রয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কয়েকটি ঘটনায় আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। ১৯০৫ সাল থেকে যখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে একটা তীব্র বিক্ষোভের রূপ ধারণ করে এবং রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিরা স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন, রবীন্দ্রনাথও সে সময় থেকেই রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' পদবী পরিত্যাগ করেন এবং একটি পত্রে ভাইরসয়কে লেখেন ঃ

www.icsbook.info

"The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those my countrymen, who for their so called insigmificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings."

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতা এ ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে তিনি চিত্তের ঔদার্য, নির্ভীকতা এবং জ্ঞানের মুক্তির কথা বলেছেন। কবিতাটি এই ঃ

' চিত্ত যেথা ভয়-শূন্য, উচ্চ সেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস -শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে, কর্মধারা ধায়,
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা -আনন্দের নেতা;
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার মধ্যে উচ্চ আদর্শবাদ নিহিত আছে। এ জাতীয়তা রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের নিছক গোত্র-প্রীতি নয়, কিংবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিশ্চিন্ত সুস্নিগ্ধ মাতৃভূমি প্রীতি নয়। এর মধ্যে তিনি একটি সুমহান সত্য এবং পরম ঐক্যের পরিচয় দিতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

কবিচিত্ত কখনও সজ্ঞান -চিন্তায় নাটক রচনায় উম্মুক্ত হয় না- অন্তত হওয়ার পক্ষে অসুবিধা আছে বিস্তর। নাটকে বস্তু থেকে স্রষ্টার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে প্রাথমিক, অথচ গীতিধর্ম হচ্ছে এর বিপরীত। গীতিকবি বস্তুর গভীরে প্রবেশ করেন, বস্তুর মর্ম উদঘাটন করেন। কিন্তু নাট্যকার বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বস্তুর স্বরূপকে নির্ণয় করেন।

রবীন্দ্র প্রতিভা মূলত গীতি-প্রতিভা এবং রবীন্দ্রনাথ কোনও মুহূর্তে আপন গীত-ধর্মকে বিস্মৃত হতে পারেননি; নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে নাটকের বিশেষ কলা-কৌশল এবং আঙ্গিকের উপর জীবনকে নির্ভরশীল হতে দেননি। জীবন সম্পর্কে তাঁর যে বক্তব্য আছে সজাগভাবে সে বক্তব্যকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এখানেই নাট্য-রীতির

www.icsbook.info

সঙ্গে কবি হৃদয়ের একটা সংঘর্ষ উপস্থিত ছিল এবং শিল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাটক সমৃদ্ধ হতে পারেনি। শিল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাটক সমৃদ্ধ না হওয়ার আরও কতকগুলো কারণ আছে। একটি হচ্ছে আদর্শের অযাচিত অনুশাসন দ্বিতীয়টি সঙ্গীতের অতিরিক্ত প্রয়োগ, এবং সর্বশেষ হচ্ছে ধর্মসংক্রান্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য বা মরমীবাদের প্রলেপ।

নিছক নাটক হিসেবে একমাত্র 'বিসর্জন' এবং 'রাজা ও রাণী'র উল্লেখ করা চলে। ইংরেজী মেলোড্রামার মত রক্তপাত, আকস্মিকতা এবং অপ্রস্তুত ভয়াবহ পরিণতি 'রাজা ও রাণী'র বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়াবেগজনিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এখানে, কিন্তু তা পরিপূর্ণ ভাবে রসঘন হতে পারেনি। আবেগ এবং ঘটনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বৈপরীত্য সম্পাদন 'রাজা ও রাণী' নাটকে স্থুল বিষয়গত হয়ে পড়েছে। সুমিত্রা এবং তাঁর স্বামী বিক্রমদেবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সে দ্বন্দ্বের সংবাদ সংলাপের মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে মাত্র, বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা সঙ্গত পরিণতি লাভ করেনি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এ নাটকটির পরিবর্তন সাধন করে অন্য একটি নাটক রচনা করেছিলেন 'তপতী' নামে। একান্তভাবে নাটক বিচার করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে 'বিসর্জন'। নাটকের যা প্রধান প্রয়োজন অর্থাৎ মঞ্চ এবং অভিনয়ের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক, এ নাটকটিতে তা যথার্থভাবে বিদ্যমান। লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার এই যে, রবীন্দ্রনাথ সুষ্ঠু এবং সঙ্গত অভিনয়ের প্রয়োজনে অনবরত এ নাটকটির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। 'বিসর্জনে' নাটকীয় ঘটনা সংস্থান অত্যন্ত নিবিড় এবং যে দ্বন্দ্ব এবং মানসিক সংঘর্ষের পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন 'রাজা ও রাণী'তে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'বিসর্জনে' সে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হয়েছে। জয়সিংহের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এ দ্বন্দ্বকে অসাধারণ শিল্প কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এক দিকে অপর্ণার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং অপর্ণার দিক থেকে নিষ্কলুষ প্রণয়ের আহ্বান অন্য দিকে গুরু রঘুপতির নিদারুণ নির্দেশ এবং সর্বপ্রকার কোমলতাবিহীন স্নেহের নিষ্ঠুর শাসন। এ উভয় দিককার দ্বন্দ্বে জয়সিংহের অন্তর প্রতিমুহূর্তে সংশয়াঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। অবশেষে সর্বপ্রকার সংশয়ের নিরসন করল জগৎসিংহ আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিয়ে। গুরু রঘুপতি যখন রাজরক্ত দাবী করল তখন জয়সিংহ বলছে ঃ

"আছে আছে। ছাড় মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন! রাজ-রক্ত
চাই তোর দয়াময়ী জগৎ- পালিনী
মাতা! নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষ্ণা! আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহ বংশ–রাজ-রক্ত আছে দেহে
এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুর।"

-এর পর জয়সিংহ আত্মহত্যা করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতির মনের মধ্যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি হল। রঘুপতি তাকে অসম্ভব রকম ভালবেসেছিল, কিন্তু সে

www.icsbook.info

ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল নিষ্ঠুরতা এবং কর্মক্ষেত্রে দ্বিধাশূন্য নির্মম প্রেরণা। জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতির মনের মধ্যেও সংশয় উপস্থিত হলো। একদিকে অপর্ণার হৃদয়ভেদী আকুলতা অন্য দিকে রঘুপতির অবলম্বনহীন নিঃসহায় অবস্থা। এ দুয়ে মিলে রঘুপতির মনে যে পরিবর্তন আনলো সে পরিবর্তনের পরিণতি হচেছ মন্দির থেকে দেবী 'বিসর্জন'। তীব্র গতি চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে 'বিসর্জনের' কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি আবর্তিত এবং রূপায়িত হয়েছে এবং সর্বশেষে মঞ্চ এবং অভিনয়ের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে নাট্যবস্তুটি বিকশিত হয়েছে।

'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'মালিনী' এ সমস্ত নাটক মূলত নাট্যরূপে বর্ণিত কবিতা। 'চিত্রাঙ্গদাকে' প্রমথ চৌধুরী বলেছেন একটি সম্পূর্ণ 'রাগিণী'। 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিকাব্যের সুষমামণ্ডিত। নারীরূপে 'চিত্রাঙ্গদা'র জাগরণ এবং সর্বপ্রকার সংস্কার বিবর্জিত দেহ-নির্ভর নিঃসংশয় প্রণয়সাধনাই এ গ্রন্থের উপজীব্য।

'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'গোড়ায় গলদ'— রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের মধ্যে এ কয়টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকরস বেশ সূক্ষ্ম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিছক সংলাপের চটুলতার ওপর নির্ভরশীল; নাটকীয় ঘটনা সংস্থান এবং কুশলতার সঙ্গে এই কৌতুকরসের শিল্পসঙ্গত কোনও বিশেষ সংযোগ নেই।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ গতিধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। রূপক-নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', এবং 'রক্তকরবী।' এ নাটকগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন আদর্শবাদ এবং ধর্ম-নির্ভর দুরূহ জীবনতত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। এ নাটকগুলির মধ্যে আমরা অধ্যাত্ম-সাধনার রূপ দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে নাট্য-কৌশলের মধ্য দিয়ে বিবৃত করতে চেষ্টা করেছেন। 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' এ তিনটি প্রধান রূপক নাটক 'গীতাঞ্জলি' এবং 'গীতিমাল্যে'র মাঝখানে রচিত। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি' এবং 'গীতিমাল্য'—এ সমস্ত কাব্যে আমরা যে আত্মনিবেদনের সুর পাই এবং জীবন-রহস্য জানবার জন্য যে আকুলতার পরিচয় পাই, রূপক-নাটকের মধ্যে তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কবিতায় যে উপলব্ধি শব্দের সংকেতে প্রকাশিত হয়, নাটকের মধ্যে তা সংলাপের কৌশলের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। সংলাপটা ভঙ্গি মাত্র—রূপকের ব্যঞ্জনা সংলাপের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। নিছক নাটক হিসেবে এগুলির চরম ত্রুটি হচ্ছে আচ্ছন্ন ভাষা এবং সংলাপের ক্ষেত্রে নাটকীয়তার অভাব। 'রাজা' নাটকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক অন্ধকার ঘর এবং বহিঃপ্রকৃতির আলোকের রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'রাজা' নাটকের গল্পাংশ এই—

অন্ধকার কক্ষের পরিত্রাণহীন আচ্ছন্নতার মধ্যে রাণী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন হয়। রাণী রাজাকে আলোকের মধ্যে দেখবার আকাঙক্ষা করলেন। রাজা বললেন যে, বসন্ত-উৎসবের দিন জনতার মধ্যে তিনি থাকবেন, তাঁকে খুঁজে নিতে হবে। বসন্ত উৎসবের দিনে অনেকেই রাজা সেজে এলো; রাণী তাদের মধ্যে একজনকে রাজা বলে মনে করলেন, তার নাম সুবর্ণ। কাঞ্চী-রাজা সুদর্শনাকে পাবার জন্য উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দিলেন। রাজ-বেশী সুবর্ণকে রাণী বললেন উদ্যান রক্ষা করতে। কিন্তু সুবর্ণ

www.icsbook.info

মুকুট ফেলে দিয়ে পালালো। এমন সময় রাজা এলেন রাণীকে রক্ষা করতে অতল সমুদ্রের মতো কালো রূপে। রাণী এই কালো রূপকে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কাঞ্চী, কৌশল, অবন্তী, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা রাণীর পিতৃরাজ্য আক্রমণ করলেন। সুদর্শনার পিতা স্বয়ম্বর-সভা ডাকলেন। এমন সময় রাজা এলেন এবং যুদ্ধ করে সকলকে বিতাড়িত করে চলে গেলেন। সুদর্শনা রাজার সাক্ষাৎ না পেয়ে পথে নামলেন এবং অবশেষে রাজাকে আবিষ্কার করলেন; সুদর্শনা রাজাকে প্রথমে বাইরে খুঁজেছিলেন, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করতে চান নি। কিন্তু অবশেষে দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি জানলেন যে প্রকাশ্য জনকোলাহলে সত্য অননুভূত থাকে কিন্তু হৃদয়ের নিভৃতে সত্য জাগরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে—আপন অন্তরের আনন্দরসে উপলব্ধি করা।

'অচলায়তন' নাটকের বক্তব্য হচ্ছে, অচলায়তনের রুদ্ধগৃহে যে জ্ঞান সংগৃহীত হয় সে জ্ঞান নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ বলেই প্রাণহীন এবং নিঃস্ব। কিন্তু যখন চতুর্দিকের দেয়াল ভেঙ্গে যায় এবং বাইরের আনন্দ চিত্তে প্রবেশ করে, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তখনই সার্থক হয়। পঞ্চক হচ্ছে অনিয়ম এবং স্বাধীনতার প্রতীক এবং মহাপঞ্চক হচ্ছে বিধিবদ্ধ নিয়মের প্রতীক।

'ডাকঘর' নাটকে কবি বলেন যে, বাহিরের পৃথিবীর আলো এবং বাতাস মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান। ঋতু-পরিবর্তনের রূপ-বৈচিত্র্যে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যপটে অনবরত পরিবর্তনের মধ্যে যে রস এবং আনন্দ, নিভৃত গৃহে আবদ্ধ কোণে সে আনন্দ নেই। কিন্তু সব চেয়ে চরম আনন্দ অসীম এবং অনন্তের মধ্যে বিলীন হওয়া।

এ-তিনটি রূপক নাটকের মধ্যে নাটকের ধর্ম কোথাও রক্ষিত হয়নি, মূলত তত্ত্বমূলক এবং রহস্যঘন সংলাপের মাধ্যমে কবি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। যদি তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে বলতে হয় যে এ নাটকগুলি তত্ত্ব এবং অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম অর্থাৎ কবি এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতিকে একটি একাগ্র কবিতায় প্রকাশ না করে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের উচ্চারণের মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে গীতিনাট্য; যেমন-'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা'। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাব্যনাট্য; যেমন- 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তি-সংবাদ', 'নরক বাস', 'সতী', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা।' তৃতীয় পর্যায়ে রূপক-নাটক; যেমন-'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্ত করবী', 'কালের যাত্রা', 'তাসের দেশ।' চতুর্থ পর্যায়ে ট্র্যাজেডি; যেমন- 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী।' পঞ্চম পর্যায়ে কৌতুক-নাটক; যেমন- 'গোড়ায় গলদ', বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা।' এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঋতুচক্র নিয়েও নাটক লিখেছেন অনেক এবং অনেকগুলি নাটককে নৃত্য-নাট্যে রূপ দিয়েছেন। এ গুলিকে নাটকের পর্যায়ভুক্ত না করাই সঙ্গত। ঋতুচক্র এবং নৃত্য-নাট্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাব-মূর্তিকে নির্মাণ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম রসবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন।

www.icsbook.info

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ছোটগল্প ছিল না, উপাখ্যান ছিল। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সত্যিকার শিল্পসঙ্গত ছোটগল্প রচনা করেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা প্রতিবদ্ধ মানুষের সাধারণ গতানুগতিক জীবনের মধ্যে হঠাৎ কখনও কখনও এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষ নতুন ভাবাবেগে, আনন্দে বা বেদনায় চঞ্চল হয় এবং সে মুহূর্তে যেন তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সাধারণ জীবন থেকে এমন অজস্র মুহূর্তের সন্ধান দিয়েছেন এবং জীবনকে অনুরূপ বেদনা, বিস্ময়, আনন্দ এবং উপলব্ধির মধ্যে সংস্থাপিত করেছেন। আশ্চর্য এই, কবি রবীন্দ্রনাথ যেখানে আপন গীতিভাবের প্রাবল্যে নাটকের মত বস্তু নির্ভর শিল্পকেও বিকল করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই ছোট-গল্প রচনার ক্ষেত্রে বিধাতার মত নির্মম এবং উদাসীন। এ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে জীবনের পরিচয় যত সুস্পষ্ট, বাংলা সাহিত্যে অন্য কারো গল্পে ততটা নয়। চরিত্র-বিশ্লেষণে, কাহিনীর নতুন বিন্যাসে, মননশীলতায় রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের জীবনের ছোট প্রাণ, ছোট কথা এবং ছোট আনন্দকে তিনি অবলম্বন করেছেন এবং এ ক্ষুদ্র জীবনই তাঁর গল্পে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পগুলির প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারই দুচারিটি অশ্রুজল;
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে, সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।"

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' তাঁর অমর-কীর্তি। কাহিনী-বিন্যাসের মৌলিকতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে সাধারণ উপভোগ্য ঘটনার অন্তরালে একটি নিগূঢ় জীবনবোধের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু উপদেশে পরিণত না হয়েও জীবন সম্পর্কে আমাদের মনে এক গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্পের আদিস্রষ্টা বলেছেন। সাহিত্যের এ অঞ্চলে তাঁর সৃষ্টিও ছিল অফুরন্ত। বাঙালীর তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জীবনেও যে রহস্য আছে, বিস্ময় আছে, রোমাঞ্চ আছে রবীন্দ্রনাথই তা প্রথম আবিষ্কার করলেন। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত জীবনেও উত্তেজনার কল্লোল জেগেছে। এতদিন যা আমাদের পরিচয়ের আড়ালে ছিল, এখন তা বিশ্বাসের সামগ্রী হয়ে জীবনকে চমকিত করল। 'স্বর্ণমৃগ', 'জীবিত ও মৃত', 'মহামায়া' যে কোনও ভাষায় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সৃষ্টি।

www.icsbook.info

অতি-প্রাকৃতকে অবলম্বন করে যে আবহ সৃষ্টির নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথ 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা' এবং 'কঙ্কাল' গল্পে দেখিয়েছেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

কবিতায় যা সম্ভব কখনই হয়নি, শুধু আকাঙক্ষারূপে বর্তমান ছিল, ছোট গল্পে তা সম্ভব হয়েছিল প্রথম থেকেই। নিতান্ত সাধারণ এবং সামান্য জীবন গল্পের উপজীব্য হয়েছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই 'এক রাত্রি', 'পোস্টমাস্টার', 'মাস্টার মশাই', 'দিদি', 'বিচারক', 'শাস্তি' প্রভৃতি গল্পে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আমরা যে পৃথিবীকে দেখি, মানব মনের অন্তর্গূঢ় রহস্য নিয়ে সে পৃথিবী আশা ও আশ্বাসে, আনন্দে ও বেদনায়, চৈতন্য ও সম্মোহনে চিরকালের জন্য দীপ্তিমান।

রবীন্দ্রনাথ মোট বারোখানি উপন্যাস লিখেছিলেন— 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়' ও 'চতুরঙ্গ'। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' প্রথম যৌবনে লেখা উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ এবং ছাব্বিশ। উপন্যাস দুটি কাহিনী প্রধান এবং কাহিনীর উপকরণ এসেছে ইতিহাস থেকে। এই উভয় উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'বিসর্জন' অধিকতর বলিষ্ঠ এবং সংযত সৃষ্টি।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'চোখের বালি' তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে একটি আকস্মিক চেতনার মতো। এ উপন্যাসেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'মানব বিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার' বিবরণ পেলাম। বাংলা ভাষায় প্রথম দেখা দিল মানব চিত্তের বিভিন্ন জটিল রহস্যের বিশ্লেষণ। মানুষের যে জীবন সমাজকে আশ্রয় করেছে এবং যে জীবনের আকাঙক্ষা ও নিবৃত্তি যৌন-চেতনার উপর নির্ভরশীল, রবীন্দ্রনাথ সে জীবনকেই এ উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু করেছেন।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান। চরিত্র এবং আবেগের উপর নির্ভরতা নেই বলেই কাহিনীটি লঘুগতি এবং তরল। হিন্দু সমাজের সংস্কার এখানে জয়ী হয়েছে, নরনারীর প্রেম কোন সমর্থনই পায়নি।

'গোরা' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের চিত্তের ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। উপন্যাসখানি দীর্ঘ কলেবরের কিন্তু এর উপাখ্যান ভাগ অতি সংক্ষিপ্ত। এ উপন্যাসে একটি জাতির আশা-আকাঙক্ষা ধর্ম ও সমাজের বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার আগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক এবং ধর্মবিশ্বাসগত মতবাদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং চিত্তবিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, সংকীর্ণ জাতীয়তা সীমাবন্ধনের মধ্যে মানুষ এবং সমাজকে নির্যাতিত করে। কিন্তু সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সকলের সমান-অধিকারের মধ্যে যে সত্যোপলব্ধি তাই হল নতুন যুগের জাতীয় চেতনার জন্মভূমি। 'আনন্দমঠের' জাতীয়তা বিবেকহীন শব-সাধনার মতো, মানব অধিকারের প্রতিষ্ঠায় 'গোরা' 'আনন্দমঠে'র প্রতিবাদ। কিন্তু সকল প্রকার তত্ত্বালোচনার অন্তরালে বিনয় এবং ললিতা, গোরা এবং সুচরিতা ক্রমান্বয়ে একে অন্যের সান্নিধ্যে এসেছে প্রেমে ও বেদনায়, সংকীর্ণতা ও সহিষ্ণুতায়, বিরোধ ও সমর্থনে।

www.icsbook.info

স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আপন ভাবাদর্শে উজ্জ্বল। লোকধর্ম ও দেশধর্মকে অবলম্বন করে নীতিজ্ঞানবর্জিত যে আত্মপ্রচার— সন্দ্বীপের চরিত্রে তারই প্রকাশ দেখি। অন্যদিকে অবিমিশ্র আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠায় বাইরের পৃথিবীতে নিখিলেশ পরাজিত। নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা এ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। একদিকে তার স্বামী স্থির প্রতিজ্ঞ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং আদর্শের প্রশ্রয়ে অকুতোভয়, অন্যদিকে দেহগকামনায় সুনিশ্চয়, আবেগপ্রবণ, তথাকথিত দেশপ্রেমিক সন্দীপের আকর্ষণ সে অস্বীকার করতে পারছে না। এ ভাবেই তার সংসারের সর্বনাশ এলো।

'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'র মতো 'যোগাযোগ' উপন্যাসখানি সামাজিক পরিবেশে রচিত।

'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর সৃষ্টি। প্রেমের দ্বৈতরূপ—প্রতিদিনের সংসারের সমর্থনে তার একটি স্নিগ্ধ বিকাশ আবার একটি অখণ্ড উপলব্ধিরূপে প্রাত্যহিকতার বাইরে তার জাগরণ 'শেষের কবিতা'র উপজীব্য। উপন্যাসখানিতে, উপন্যাসের নয়—কাব্যের অধিকার সংলাপে, বর্ণনায়, চরিত্রে সর্বত্র স্বীকৃত।

'দুই বোন' উপন্যাসের পটভূমি সমাজ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের বৈচিত্র্যহীন জীবন। স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ সংক্ষিপ্ত জীবনে শ্যালিকা উর্মিমালা এলো একটি প্রাণবন্ত কোলাহলের মতো। অতি নিরাভরণ এ উপাখ্যানটিকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বকথা এবং প্রতীকের ব্যঞ্জনায় ভারাক্রান্ত করেছেন। 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি 'দুই বোনের' সগোত্র। উপাখ্যানভাগে কোনও নতুনত্ব নেই।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে কবিকল্পনার ঐশ্বর্যে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, রহস্যময় সংকেত এবং বিবৃতিতে। বাংলা গদ্য যে কত প্রগাঢ় হতে পারে, তার শোষণ ক্ষমতা যে কত প্রচণ্ড এ উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ অবলম্বনে রচিত। এখানে একদিকে প্রেম এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ পন্থা এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখান হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ একজন মহৎ শিল্পী। অজস্র তত্ত্বালোচনাও তাঁর উপন্যাসকে পীড়িত করেনি, কেননা তত্ত্বকেও তিনি উপন্যাসের রসমূর্তির জন্য অপরিহার্য করেছিলেন।

রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনা-পঞ্জী

৭মে ১৮৬১ (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮)। রাত্রি আড়াইটার পরে কলকাতায় পৈতৃক বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭–১৯০৫) ও সারদা দেবীর (১৮২৪-১৮৭৫) চর্তুদশ সন্তান। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪–১৮৪৬) পৌত্র।

১৮৬৮-৭২। বয়স ৭-১১। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল ও বেঙ্গল একাডেমিতে অনিয়মিত অধ্যয়ন। গৃহে জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বিবিধ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষালাভ, ব্যায়ামচর্চা। কাব্যরচনার সূত্রপাত ১৮৬৯।

১৮৭৩-৭৫। বয়স ১২-১৪। উপনয়ন। পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে হিমালয় গমন। পিতার নিকট শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রভাব লাভ। মাতৃবিয়োগ-৮ মার্চ, ১৮৭৫।

১৮৭৭। বয়স ১৬। 'ভারতী' পত্রের প্রকাশ। 'ভারতী'তে নিয়মিত সকল প্রকার রচনা প্রকাশ–'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'ভিখারিণী,' 'করুণা' (অসম্পূর্ণ), 'কবি কাহিনী'।

www.icsbook.info

১৮৭৮-৮০। বয়স ১৭-১৯। বিলাত যাত্রার পূর্বে আহমেদাবাদে বাস, যেখানে নিজে সুর দিয়ে গান রচনা। বিলাত প্রবাস–সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-ফেব্রুয়ারি ১৮৮০। 'বনফুল'।

১৮৮১-৮৩। বয়স ২০-২২। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা ও বাল্মীকি রূপে অভিনয়। জ্যোতিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দননগরে বাস। ১০ নম্বর সদর স্ট্রীটে (১৮৮২) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা। কারোয়ার প্রবাস। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ, ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩। 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত,' 'কালমৃগয়া', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

১৮৮৪। বয়স ২৩। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ১৯ শে এপ্রিল। 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

১৮৮৫–৯১। বয়স ২৪-৩০। 'রামমোহন রায়', 'আলোচনা,' 'রবি-চ্ছায়া', 'কড়ি ও কোমল', 'রাজর্ষি', 'চিঠিপত্র', 'সমালোচনা'। মাধুরীলতা (১৮৮৬) ও রথীন্দ্রনাথের (১৮৮৮) জন্ম। 'মায়ার খেলা'। 'মানসী' (১৮৯০), য়ুরোপ প্রবাস, পরে জমিদারির কার্য ভার গ্রহণ, ১৮৯০। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' নাটকে অভিনয়। 'হিতবাদী' পত্রে 'পোস্টমাস্টার'ইত্যাদি ছোট গল্প। 'সাধনা' পত্র প্রকাশ।

১৮৯২। বয়স ১৩। রেণুকার জন্ম। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ'। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সমর্থনে 'শিক্ষার হেরফের'। 'সোনার তরী'র সূচনা।

১৮৯৩-৯৪। বয়স ৩২-৩৩। উড়িষ্যা-ভ্রমণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ। সাধনায় 'মেয়েলী ছড়া', 'পঞ্চভূতের ডায়রি'। মীরার জন্ম। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি' ২য়, 'সোনার তরী', 'ছোট গল্প', 'বিচিত্র গল্প' ১ম, 'কথা চতুষ্টয়', 'বিদায় অভিশাপ'।

১৮৯৫–৯৭। বয়স ৩৪-৩৬। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের স্বদেশী শিল্প-প্রচেষ্টায় সাহায্য। 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচনা। শমীন্দ্রনাথের জন্ম। 'গল্পদশক', 'নদী', 'চিত্রা', 'কাব্য গ্রন্থাবলী', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'পঞ্চভূত'।

১৮৯৮। বয়স ৩৭। 'ভারতী' সম্পাদনা। সিডিশন অ্যাক্টের প্রতিবাদে টাউন হলে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ-পাঠ। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'।

১৮৯৯–১৯০০। বয়স ৩৮-৩৯। কলকাতায় প্লেগ, ১৮৯৯–সেবা-কার্যে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সহযোগিতা। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও স্বদেশী শিল্প-ব্যবসায়ের অবসান। 'কণিকা', 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গল্পগুচ্ছ' ১ম।

১৯০১। বয়স ৪০। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি'র সূচনা। 'ব্রহ্মমন্ত্র' 'গল্প', 'নৈবেদ্য', 'বাঙলা ক্রিয়াপদের তালিকা'। মাধুরীলতা ও রেণুকার বিবাহ।

১৯০২-০৪। বয়স ৪১-৪৩। বিদ্যালয়ে অর্থাভাব। পুরির জমি ও স্ত্রীর গহণা বিক্রয়। মৃণালিণী দেবীর মৃত্যু, ২৩ নভেম্বর ১৯০২। 'স্মরণ'। খণ্ডে খণ্ডে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। 'হিতবাদী', 'উপহার', 'রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী' প্রকাশ। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে 'আত্মজীবনী' –বাদানুবাদ।

১৯০৫। বয়স ৪৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯ জানুয়ারি 'ভাণ্ডার পত্র' প্রকাশ। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে নিবেদিত, ওকাকুরা, হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান। দেশপ্রেমমূলক গান ও বক্তৃতা। 'আত্মশক্তি', 'বাউল', 'স্বদেশ'।

www.icsbook.info

১৯০৬। বয়স ৪৫। কৃষিবিদ্যা শিখতে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় প্রেরণ। 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া', 'নৌকাডুবি'। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গঠনে সহযোগিতা।

১৯০৭। সমাজ সেবায় অভিনিবেশ। 'ব্যাধি ও প্রতিকার'। 'গোরা' উপন্যাসের সূচনা। মীরার বিবাহ। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। গদ্য গ্রন্থাবলীতে 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চারিত্র পূজা', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক' ইত্যাদি প্রকাশ।

১৯০৮। বয়স ৪৭। 'পথ ও পাথেয়'। 'প্রজাপতির নিবন্ধ', 'রাজা-প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শারদোৎসব', 'শিক্ষা'।

১৯০৯-১১। 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম', 'প্রায়শ্চিত্ত'। 'তপোবন'–আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা। 'গোরা', 'গীতাঞ্জলি', 'রাজা', 'শান্তিনিকেতন'। 'প্রবাসী' পত্রে 'জীবনস্মৃতি'।

১৯১২-১৩। বয়স ৫১-৫২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি-সম্বর্ধনা, ১২ জানুয়ারী ১৯১২। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ, ১৬মার্চ ১৯১২। 'ডাকঘর', 'গল্প চারিটি', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র' ও 'অচলায়তন'। ইংরেজী Gitanjali-র সূচনা।

তৃতীয় বিদেশ-যাত্রা। ইংলন্ডে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ রোটেন্‌স্টাইন্‌কে প্রদর্শন এবং ঘরোয়া সভায় বিদ্বজ্জন-সমক্ষে তা পাঠ। ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক Gitanjali প্রকাশ। সি. এফ. এনড্রুজের সঙ্গে পরিচয়। সুরুল কুঠিক্রয়। আমেরিকায় গমন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক ভাষণ–Sadhanaনামে প্রকাশ। দেশে প্রত্যাবর্তন। Gitanjali-র জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি দান।

১৯১৪-১৫। বয়স ৫৩-৫৪। পিয়ার্সনের শান্তিনিকেতনে বাস-গ্রহণ। এন্‌ড্রুজ ও নন্দলালের আশ্রম পরিদর্শন। 'সবুজপত্রে'র সূচনা। 'সবুজপত্রে' প্রকাশ–'ফাল্গুনী', 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'। গীতালী। নাইট উপাধি লাভ।

১৯১৬-১৮। বয়স ৫৫-৫৭। বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষ তহবিলের জন্য 'ফাল্গুনী' অভিনয়। চতুর্থবার বিদেশযাত্রা, মে ১৯১৬–মার্চ ১৯১৭। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা। আমেরিকায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা–Nationalism ও Personality। জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক কবি-সম্বর্ধনা। অ্যানি বেসান্টের অনুরোধে আলফ্রেড থিয়েটারে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পাঠ। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা–'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধ। স্যাড্‌লার কমিমন ও ভারত সচিব মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। 'তোতাকাহিনী' রচনা। মাধুরীলতার মৃত্যু, ১৬মে ১৯১৮। 'শান্তিনিকেতন', 'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'বলাকা', 'গল্প সপ্তক' 'পলাতকা'।

১৯১৯। বয়স ৫৮। দক্ষিণ ভারত পর্যটন। আদেয়ারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-রূপে ভাষণ। 'শান্তিনিকেতন' পত্রের প্রকাশ ও সম্পাদনা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ, ৩০ মে। বিশ্বভারতীর কার্যে আত্মনিয়োগ ও অধ্যাপনা। 'জাপানযাত্রী'। 'লিপিকা'র বহু রচনা।

১৯২০-২১। বয়স ৫৯-৬০। পশ্চিম-ভারত পরিক্রমা। পঞ্চম বার বিদেশ যাত্রা, মে ১৯২০। ফ্রান্সে বের্‌গসঁ, সিলভ্যাঁ লেভী প্রমুখ গুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। হলান্ডে বিপুল সমাদর, হেগ ও লিডেনে বক্তৃতা। আমেরিকায় গমন ও বক্তৃতা। পুনরায় ইংলন্ড হয়ে ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে গমন। রোম্যাঁ রোঁলা, কাউন্‌ট কেসার লিং, টমাস মান প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'পয়লা নম্বর'।

www.icsbook.info

দেশে প্রত্যাবর্তন, জুলাই ১৯৩১। 'শিক্ষার মিলন', 'সত্যের উৎসব'। ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে বিশ্বভারতীর উদ্‌বোধন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনের সমুদয় সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান।

১৯২২। বয়স ৬১। দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পরিভ্রমণ। "মুক্তধারা', 'লিপিকা', 'শিশু ভোলানাথ'। creative Unity প্রকাশ।

১৯২৩। বয়স ৬২। বিশ্বভারতীকে গ্রন্থস্বত্ব দান। Visya Bharati Quarterly প্রকাশ। পশ্চিম ভারত গমন। 'বিসর্জন'নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়। কবি নজরুল ইসলামকে উৎসর্গীকৃত 'বসন্ত' নাটকের প্রকাশ।

১৯২৪। বয়স ৬৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা। চীনে আমন্ত্রণ। জাপান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। পেরু দেশের আমন্ত্রণে আমেরিকা-যাত্রা। 'পূরবী'র কবিতা ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি' রচনা। প্রবাসী পত্রে 'রক্তকরবী'।

১৯২৫। বয়স ৬৪। ইতালি হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। জ্যোতিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু, ৪ঠা মার্চ। প্রথম ভারতীয় ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসে সভাপতিত্ব। 'পূরবী' 'গৃহপ্রবেশ', 'প্রবাহিণী'।

১৯২৬। বয়স ৬৫। সর্বজ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোধান, ১৮ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক সম্বর্ধনা।

ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ-যাত্রা। মুসোলিনী কর্তৃক রাজকীয় সম্বর্ধনা। ইতালীয় ভাষায় 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়। রোঁম্যা রোঁলার আমন্ত্রণে সুইজারল্যান্ডে গমন ও জর্জ দুহামেল প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অষ্ট্রিয়া ও ইংলন্ড হয়ে নরওয়ে ও সুইডেন যাত্রা। নরওয়ের রাজার অভ্যর্থনা। রোয়ার্ সন, যোহান বোয়ার, নান্‌সেন, স্বেন হেডিন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডেন্‌মার্ক হয়ে জার্মানিতে আগমন এবং বার্লিনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি,, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশর হয়ে সাত মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্তন। 'লেখন' ও 'বৈকালী' মুদ্রণ। 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'নটির পূজা'।

১৯২৭। বয়স ৬৬। বরতপুর, জয়পুর, আগ্রা ও আহমেদাবাদে ভ্রমণ। শিলঙে অবস্থান ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সূচনা। 'নটরাজ' ও 'ঋতুরঙ্গ'।

নবমবার বিদেশ যাত্রা। মালয়- বালী-জাভা ভ্রমণ। শ্যামদেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন। বিচিত্রা পত্রে 'জাভা-যাত্রীর পত্র'। মাসিক বসুমতীতে 'শেষ রক্ষা'।'

১৯২৮। বয়স ৬৭। সিংহল ও বাঙ্গালোরে গমন। 'শেষের কবিতা' রচনা।

১৯২৯। বয়স ৬৮। কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশে যাত্রা। জাপান হয়ে ভ্যাঙ্কুবারে গমন ও বক্তৃতা যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দোচীন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। 'যাত্রী', 'যোগাযোগ', শেষের কবিতা', 'তপতী', 'মহুয়া'।

১৯৩০। বয়স ৬৯। পুনরায় বিদেশ যাত্রা। ফ্রান্স হয়ে ইংলন্ডে গমন। অক্‌স্‌ফোর্ডে হিবার্‌ট লেকচার, পরে গ্রন্থাকারে Religion of Man নামে মুদ্রিত। জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডেন্‌মারর্ক হয়ে রাশিয়ায় গমন। ফ্রান্স, জার্মানি, ডেন্‌মার্ক রাশিয়া ও আমেরিকায় চিত্রপ্রদর্শনী। The Child রচনা। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'।

www.icsbook.info

১৯৩১। বয়স ৭০। সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দান। টাউন হলে সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিপুল সম্বর্ধনা, ২৭ ডিসেম্বর। The Golden Book of Tagore প্রকাশিত। 'প্রশ্ন' কবিতা রচনা। 'রাশিয়ার চিঠি' 'বনবাণী', 'সহজ পাঠ'। 'গীতবিতান' ও 'সঞ্চয়িতা'। 'শাপমোচন'।

১৯৩২। বয়স ৭১। আমন্ত্রিত হয়ে পারস্যে গমন। রেজা শা পহ্‌লবী ও পারস্যবাসীর বিপুল সম্বর্ধনা। ইরাক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। 'পরিশেষ', 'কালের যাত্রা', 'পুনশ্চ', 'গীতবিতান', ৩য় খণ্ড।

১৯৩৩। বয়স ৭২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বক্তৃতা–মানুষের ধর্ম', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'ছন্দ'। বোম্বাই যাত্রা। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা -Man। রামমোহন মৃত্যু-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব–'ভারতপথিক রামমোহন রায়'। 'দুই বোন', 'বিচিত্রিতা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'বাঁশরী'। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'।

১৯৩৪। বয়স ৭৩। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে সিংহল ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা। 'মালঞ্চ, শ্রাবণগাথা', 'চার অধ্যায়'।

১৯৩৫। বয়স ৭৪। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অভিভাষণ। এবং ডি. লিট. উপাধিলাভ। এলাহাবাদ, লাহোর ও লক্ষ্ণৌয়ে ছাত্রসভায় ভাষণ। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ২১ জুলাই। জাপানী কবি নোগুচির শান্তি নিকেতনে আগমন। কলকাতায় 'অরূপরতন' অভিনয়ে ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ। 'শেষ সপ্তক' ও 'বিথিকা'।

১৯৩৬। বয়স ৭৫। শিক্ষা-সপ্তাহে বক্তৃতা–'শিক্ষার ধারা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধিলাভ। নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'পত্রপুট', 'ছন্দ', 'শ্যামলী', 'সাহিত্যের পথে। 'জাপানে-পারস্যে', 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'।

১৯৩৭। বয়স ৭৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলায় অভিভাষণ। চীনা-ভবনের উদ্‌বোধন। 'খাপছাড়া', 'কালান্তর', 'সে'। আলমোড়ায় অবস্থান–'ছড়ার ছবি' ও 'বিশ্বপরিচয়' রচনা। গুরুতর পীড়ার পর 'প্রান্তিক' রচনা।

১৯৩৮। বয়স ৭৭। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি লাভ। কালিম্পঙে ও মংপুতে গ্রীষ্মবাস। 'চণ্ডালিকা', নৃত্যনাট্য, 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'সেঁজুতি' 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'মুক্তির উপায়'। 'Poet to Poet' (নোগুচির পত্র ও উত্তর)।

১৯৩৯। বয়স ৭৮। পুরিতে বাস। মংপু এবং কালিম্পঙে গ্রীষ্মবাস। মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ১৯ আগস্ট। মেদেনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি মন্দিরের উদ্‌বোধন, ১৬ ডিসেম্বর। 'প্রহাসিনী' 'আকাশ-প্রদীপ', 'শ্যামা', 'নৃত্যনাট্য, 'পথের সঞ্চয়'। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম ও ২য় খণ্ডের প্রকাশ।

১৯৪০। বয়স ৭৯। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অক্‌স্‌ফোর্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধিলাভ, ৭ আগস্ট। কালিম্পঙে রোগের আক্রমণ, ২৬ সেপ্টেম্বর। 'নবজাতক', 'সানাই', 'ছেলেবেলা', 'তিন সঙ্গী', 'রোগশয্যায়'। 'চিত্রলিপি'।

১৯৪১। বয়স ৮০। ১লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি উৎসব। জন্মদিনের ভাষণ–'সভ্যতার সংকট'। 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে',

www.icsbook.info

'গল্পসল্প', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক 'ভারতভাস্কর' উপাধি দান, ১৩ মে। পীড়ার বৃদ্ধি। কবিকে কলকাতায় আনয়ন। ৩০ জুলাই অস্ত্রোপচারের পূর্বে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'। ৭ আগস্ট ১৯৪১ (২২শ্রাবণ ১৩৪৮) বেলা বারোটার কিছু পরে, ৮০ বৎসর ৩মাস বয়সে জোড়া-সাঁকোর পৈতৃক বড়িতে দেহ ত্যাগ।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্য

রবীন্দ্রকাব্যের বিকাশকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। সুতরাং অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য বাংলার সাহিত্য-জীবনকে প্লাবিত, প্রাণপূর্ণ এবং সঞ্জীবিত করেছে। শুধুমাত্র এ-কারণেই রবীন্দ্র-যুগের অনেক ক্ষমতাশালী কবিও আমাদের লক্ষ্যগোচর হননি। অথবা লক্ষ্যগোচর হলেও পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পাননি। রবীন্দ্র-প্রতিভার অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে অন্যান্য সকলের দীপ্তি নিষ্প্রভ মনে হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে বিশেষ ভঙ্গি এবং সুরের প্রবর্তন করলেন সে ভঙ্গি এবং সুরের সঙ্গে সম্পর্কিত করেই আমরা অন্যান্যের কাব্য বিচার করবার চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত নিকটে যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সময়ে তাঁর শব্দব্যবহার এবং ছন্দ-মাধুর্যের খুব কাছাকাছি, তাঁরা তাঁর সুরে-গানে-কবিতায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন যে তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ছিল অনিবার্য। এক অনতিক্রম্য মহৎকবির ছন্দ ও বাণীর প্রাচুর্যে বিহ্বল ছিলেন বলে তাদের চিত্তবিকাশের সম্ভাবনা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়েছিল।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, করুণানিধান, কিরণধন, কালিদাস রায় এ-সমস্ত কবিগণের শৈশব-কৈশোর-যৌবনে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'চিত্রা' 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা, 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্য এবং আশ্চর্য স্বপ্ন ও মায়ায় রবীন্দ্রনাথ তখন যে নতুন জগৎ সৃষ্টি করে চলেছিলেন, সে জগতে যে সমস্ত নতুন নতুন কবির আবির্ভাব দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যে তাঁরা মুগ্ধ এবং বিহ্বল, বিস্মিত এবং অভিভূত। তাঁদের জীবনের ব্রত হলো, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলাকে অনুসরণ করা। এ-অনুসরণের প্রবৃত্তি তাঁদের কাব্যে অসহায় উচ্ছ্বাস আনলো, অর্থহীন ফেনিলতার আবর্ত সৃষ্টি করলো এবং এক প্রকার তন্দ্রামোহ জাগালো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বচ্ছতা, সহজতা এবং ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার অনুকরণের জন্য সহজ হলো, কিন্তু যে একান্ত অনুভূতি এবং আত্মচেতনা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে উজ্জ্বল করেছে, তার অভাবে অনুকারীদের কবিতা হলো ক্লান্ত এবং পাণ্ডুর। মধ্যযুগের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের অনুকারীদের মধ্যে যেমন কোনও ভেদচিহ্ন ছিল না, তেমনি রবীন্দ্রযুগের কবিদের মধ্যে ভেদচিহ্ন আমরা দেখি না, একজন কবিকে অন্য একজন কবির থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের শব্দ-ব্যবহার, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত অলঙ্কার এবং রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ব্যবহার করেই পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও এঁদের পক্ষে নতুন কিছু করা সম্ভবপর ছিল না, কেননা কাব্যক্ষেত্রে শব্দের যে বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশল রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, তাকে অতিক্রম করা ছিল অসম্ভব। যেমন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে এবং

www.icsbook.info

তাদের পদলালিত্য অনুসরণ করে অনেক কবি মহাজন-পদাবলীর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন কিন্তু তাকে নতুন ঐশ্বর্যে মহার্ঘ করতে পারেননি, তেমনি রবীন্দ্রযুগের কবিরাও রবীন্দ্রনাথের পদলালিত্য অনুসরণ করে বাংলার কাব্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন কিন্তু নতুন দানে তাকে আনন্দিত এবং সমৃদ্ধ করতে পারেননি।

কয়েকজন মাত্র কবি রবীন্দ্রযুগে কিছুটা নতুন সুর এবং কথার কোলাহল তুলেছিলেন। বিরাট মহীরূহ সর্বমুহূর্তেই আশ্চর্যরূপে দৃষ্টি গোচর, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতারও বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং সজীবতা থাকে। রবীন্দ্রযুগে আমরা তিনজন কবিকে তাঁদের নিজস্ব রঙে ও রূপে পেয়েছি। এঁরা হচ্ছেন–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম। একটি প্রতিকূল সময়ে যখন কবিদের উপর রবিরশ্মির প্রতিফলন স্বাভাবিক ছিল, সে সময়ে এঁরা কয়জন কবি স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় কথা বলবার চেষ্টা করলেন।

প্রমথ চৌধুরীও নতুন রূপে কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ছিলেন মূলত গদ্যশিল্পী। আধুনিক বাংলা গদ্যে সুতীক্ষ্ণ চটুল কথ্যভঙ্গির প্রবর্তক তিনি। কবিতায় তাঁর প্রবেশ কিছু সংখ্যক সনেট নিয়ে। আঙ্গিকের দিক থেকে সনেটগুলো পরীক্ষোত্তীর্ণ। তিনি ছিলেন কুশলী শিল্পী, তাই শব্দকে নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলা করেছেন এবং অপূর্ব বাণীমূর্তি নির্মাণ করেছেন। ফরাসী ভাষার সংহত এবং তীক্ষ্ণ দীপ্তি বাংলা ভাষায় প্রমথ চৌধুরী আমদানি করেন। এ সুতীক্ষ্ণ, সংহত, সজাগ উপলব্ধির পরিচয় তাঁর সনেটের মধ্যেও আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৮৮২–১৯২২)

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত নিকটবর্তী কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমসাময়িক অন্যান্য কবির মধ্যে তিনি ব্যতিক্রম, পুরোপুরি রবীন্দ্র অনুসারীও তিনি নন। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যা কিছু সাজসজ্জা ছিল, তিনি যতটা সম্ভব তাই ব্যবহার করেছেন কিন্তু লঘু সরসতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রম, অর্থাৎ যে তরলতা এবং চাপল্য জনসাধারণের উপভোগের বস্তু, রবীন্দ্রনাথের সুরে এবং শব্দে তিনি সেই চাপল্য এনে জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন। ছন্দের সম্মোহন এবং তার দ্রুতগতি আনন্দ-আবেদনে সত্যেন্দ্রনাথ জনসাধারণের চিত্তের অত্যন্ত নিকটে এসেছিলেন। সহজ কলাকৌশল এবং ধ্বনির অনুরণন দিয়ে তিনি এক মায়া-জাল বিস্তার করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকের জন্য এ সংবাদটি মনে রাখার মত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিশিষ্টতা সম্পর্কে একটি কথা বলা হয়ে থাকে যে তিনি বাস্তববাদী কবি। কবি তাঁর চোখে যা দেখছেন বিভিন্ন ছন্দে তাই প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। উপমার ন্যূনতা নেই, ছন্দের দ্বারা তাকে হিল্লোলিত করবার চেষ্টাও আছে, কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে কবিতা প্রকৃত রসশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, তার অভাবে সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই ছন্দ-বদ্ধ সাধারণ পদ্য হয়েছে মাত্র। পদ্মার উপর কবিতা রবীন্দ্রনাথের আছে, সত্যেন দত্তেরও আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার আরম্ভে পাই–"হে পদ্মা, প্রলয়ঙ্করী, হে ভীষণা, ভৈরবী সুন্দরী"–একটি সাধারণ বর্ণনা

www.icsbook.info

মাত্র, অথবা বলা যেতে পারে নিছক একটি উক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পদ্মার আরম্ভে যে আছে—"হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা কত শত বার"—এ কথার তুলনা হয় না। আমরা এখানে ভূগোলের পদ্মাকে পাই না, পাই কবির মানস-লোকের সৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির কৌশল ও কারুকলায় সৌষ্ঠব-সম্পন্ন এক কল্লোলময়ী নদী।

বাস্তব ঘেঁষা কবিতার অসুবিধা এই যে অনেক সময়ই তা ছন্দোবদ্ধ রিপোর্ট-এর মত দাঁড়ায়। কি দেখলাম তা বলা সাধারণত সহজ, কিন্তু কি অনুভব করেছি তা বলা সম্ভব হয় না। সত্যেন দত্ত দেখার উপর জোর দিয়েছেন, অনুভূতির উপর নয়। তাঁর 'পদ্মা', 'রামধনু', 'গঙ্গার প্রতি' সমস্ত কবিতাই এ পর্যায়ের। বাস্তবতার স্পর্শে সত্যেন দত্তের অনেক কবিতা প্রায়ই সাধারণ স্তরে নেমে পড়েছে। অনেক স্থানে আরম্ভের উদাত্তগম্ভীর সুরের সঙ্গে পরবর্তী ছত্রগুলো সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারেনি। 'গঙ্গার প্রতি' কবিতার প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে পরবর্তী ছত্রদ্বয়ের কোনও সামঞ্জস্য নেই। আরম্ভের উচ্চ সুর মনকে সত্যই কিছুটা আবিষ্ট করে ঃ

"সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যামশস্য হাসি
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি ছড়াইছ ফেন-পুষ্প রাশি।"

এ চরণ দুটি গ্রাহ্য করতে আমাদের অসুবিধা হয় না. কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন পড়ি ঃ

"অয়ি সুরধুনী ধারা অমোঘ তোমার আশীর্বাদ।
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল বিষ্ণুরি প্রসাদ।"

তখন মনে হয়, কেবলমাত্র বাক্যের অর্থ ও ছন্দের ধ্বনিকে আশ্রয় করে ভাব যেন কোনও রূপে আপনাকে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

প্রায় অনেক ক্ষেত্রে স্তুতি এবং তত্ত্বের প্রশ্রয়ে সত্যেন দত্তের কবিতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাদ প্রায়ই সত্যকে পিছনে ফেলে অহেতুক অপ্রাকৃত আবেগ হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। সাম্যবাদের আবেগে কবি উল্লাসে অধীর হয়ে মেথরকে বলেছেন—"কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?" আবার প্রসংসার চরম করে শূদ্রকেও তিনি দেবোপম করেছেন।

ছন্দের বৈচিত্র্য-সম্পাদন করতে গিয়ে সত্যেন দত্ত বাংলা কবিতায় সর্বত্র রসাস্বাদ-মাধুর্য আনতে সক্ষম হয়েছেন এ-কথা বলা চলে না। ভাব ভাষার অধীন হয়ে পড়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত অসঙ্গত উপমার প্রাচুর্য কবিতার ভাব-স্রোতকে বিঘ্নিত করেছে। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। 'রাত্রি বর্ণনা'য় সত্যেন দত্ত মিত্র ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তা কাব্য হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে ঃ

"ঘড়িতে বারোটা ; পথে বরোফ! বরোফ...লোপ!
উড়ি উড়ি আরসুলা দেয় তুড়ি লাফ...সাফ!
পালকি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে...তুড়ে।
আঁধারে হাড়ু-ডু খেলে কান করি উঁচা...ছুচা।
পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ...খোদ!
বেতালা মাতাল তাই যায় হাল কিল..কিল!"

তবে উপভোগ্য উদাহরণও আছে, যেমন ঃ

"পারবনা এক্‌লাটি আজ ঘরে পারবনা রইতে।

চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
নিরালার কোল-ভরা ফুল জাগে আলো করা,
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে।
অথই পাথর-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হল হাওয়া চৈতে।"
"এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে
গিরি-দরি-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা।"

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় প্রচুর ফার্সী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অপ্রচলিত অনাদৃত দেশজ শব্দের সংস্কার করে তাকে ও কবিতায় স্থান দিয়েছেন।

চটুল ব্যঙ্গের কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন। জাতীয় অন্যায় ও অশোভন রীতিনীতি দেখে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং কাব্যকলার মাধ্যমে মানুষের মনে এ সকল রীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আনতে চেয়েছেন।

বাংলার কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ একমাত্র অনুবাদ-ক্ষেত্রেই যথার্থ অনন্যসুলভ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য-সাহিত্যে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর দানকে যতই তুচ্ছ করি না কেন, অনুবাদক্ষেত্রে তাঁর দানকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাঁর অনূদিত কবিতার মধ্যে সত্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী কবি যে মনোভাব নিয়ে প্রথমে কবিতা লিখেছিলেন, মর্মে মর্মে সে মনোবৃত্তিকে জাগ্রত করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ করেছিলেন, তাই সেই রূপান্তরিত কবিতার মধ্যেও আমরা মূল কবিতার রসাস্বাদ করতে পারি। এ কারণে এগুলোকে অনুবাদ না বলে মৌলিক সৃষ্টি আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন, "অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে ; ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।"

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির দ্বৈত বিকাশের মধ্যে অনুবাদের ধারাটিই একমাত্র পরিমার্জিত এবং সার্থক। পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে–কখনও মূলের সঙ্গে, কখনও ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথের ঘটেছিলো। আপন মৌলিক কাব্যধারার দৈন্য তিনি দূর করবার চেষ্টা [illegible] নব নির্মিতির বিভায় উদ্ভাসিত অনুবাদের দ্বারা। সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজী, সংস্কৃত, [illegible] ফারসী ও ফরাসী ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করেছিলেন। বিষয়-নির্ভর বা তত্ত্বপ্রধান কবিতারই অনুবাদ করেছিলেন বেশী এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। অথর্ববেদ থেকে, কঠোপনিষৎ থেকে, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ থেকে যে সমস্ত অনুবাদ তিনি করেছেন সেগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং সুপাঠ্য হয়েছে। 'তীর্থ সলিল', (১৯০৮) এবং 'তীর্থরেণু' (১৯১০) গ্রন্থ দুটি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার সঙ্কলন। সত্যেন্দ্রনাথ যখন অনুবাদ কর্মে হস্তক্ষেপ করেন তখন অর্থাৎ অনুবাদ কর্মের প্রথম বিকাশের কালে বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সকল প্রধান সাহিত্যিকই অনুভব করেছিলেন। শশাঙ্কমোহন সেন বলেছিলেন যে দৃঢ়-নিরূপিত শিল্পের দৃষ্টান্ত

www.icsbook.info

সাহিত্যে দুর্লভ; দুর্লভ বলেই অনুবাদ অপরিহার্য। পরকীয়া সাহিত্যের মহাজন-ভাণ্ডার থেকে ঋণ-গ্রহণ ছাড়া অন্য উপায় নেই। যেমন জগতে, তেমনি সাহিত্যে, মহৎ ব্যক্তিবিশেষের অনির্বচনীয় সৃষ্টিশক্তি আর দ্বিরাবর্তন করে না; সে শক্তিই মহৎ জীবনের অতুলনীয় সিদ্ধি।

ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্ভাবনা-কৌশল ছিল তাঁর সময়ের পক্ষে অসাধারণ। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ পদ্ধতি বজায় রেখে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের কাঠামো আনবার চেষ্টা করেন। ভারত-চন্দ্র প্রমুখ অনেক কবি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনে বাংলা ভাষার উচ্চারণ–পদ্ধতিকে বিকৃত করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ হসন্ত ধ্বনিকে দীর্ঘ বিবেচনা করে সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের অভাব দূর করেছিলেন। যেমন, যেখানে পূর্বে সংস্কৃত তোটক ছন্দের উদাহরণ আমরা পাচ্ছি–"অচিরে নগরে উপনীত সবে"। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের হাতে রূপ পরিবর্তন ঘটলো এভাবে–"একি চাষ দিয়ে রাশ করে ফুল ফোটানো।" প্রথম উদাহরণে 'রে, রে 'নী' এবং 'বে' ছন্দের প্রয়োজনে দীর্ঘ করা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের 'চাষ', 'রাশ' এবং 'ফুল' বাংলা উচ্চারণের স্বভাব অনুসারেই কিছুটা দীর্ঘ। সত্যেন্দ্রনাথ 'মালিনী', 'মন্দাক্রান্তা', 'পঞ্চচামর', 'রুচিরা' ইত্যাদি সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্তন বাংলা কবিতায় করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ হচ্ছে–'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) 'হোমশিখা'(১৯০৭), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৩) 'বেলা শেষের গান'(১৯২৩), 'বিদায় আরতি' (১৯২৪)। শেষ দুটি কাব্য কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

মোহিতলাল মজুমদার
(১৮৮৮–১৯৫২)

মোহিতলাল মজুমদার সুদক্ষ শব্দ-শিল্পী। সুসংস্কৃত, সুমার্জিত ভাষায় বক্তব্যকে তিনি শিল্পায়ত্ত করতে চেয়েছেন। একারণে তাঁর অধিকাংশ কবিতা শব্দের দুরূহ অরণ্যে আত্মগোপন করেছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ভাস্করের হাতে সুদৃঢ়, কঠিন পৌরুষের মূর্তি যে গড়ে উঠেনি তা বলা চলে না। শিল্পী হিসেবে তিনি যে কতটা সজাগ ছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় আরবী, ফার্সী শব্দ-ব্যবহারের মধ্যে। বিশেষ পরিবেশ এবং বিশেষ সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি বিশিষ্ট ধরনের শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সে শব্দ-প্রয়োগ সত্যেন দত্তও করেছেন, কিন্তু সেখানে শব্দ যেন হৃদয়াবেগ থেকে উৎসারিত হয়নি। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদার এ-সমস্ত ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগের পরিচর্যা দিয়েই শব্দকে সুকুমার করেছেন, পরিবেশগত এবং জীবন-নির্ভর করেছেন। নজরুল ইসলামের পূর্বেই আরবী-ফার্সী শব্দের সার্থক প্রয়োগ মোহিতলাল মজুমদারে আমরা পাই। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁর 'দিলদার' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"রাতভোর শোর-গোল–
দিল খোল্, খেয়ালি।
কলিজায় দিক্ দোল্,

দিল্ নয় খোয়ালি।
দূর কর্ আফসোস
জামিয়ার কুর্তির,
গেয়ে যা'না আপ্-খোস্-
ওক্ত যে ফুর্তির।
বড় মিঠা শরবৎ।
-ফের ভর্ পেয়ালি,
কানে বাজে নওবৎ,
চোখে লাগে দেয়ালি!"

মোহিতলাল মজুমদার শুধু যে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করছেন তাই নিয়, তিনি ইসলামের ইতিহাস থেকে মোহনীয় হৃদয়াবেগের এবং দুর্ধর্ষ জীবন-যাত্রার কাহিনী অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ', 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'শেষ শয্যায় নূরজাহান' ইত্যাদি। মোহিতলালের 'বেদুঈন' কবিতাটি আরব দেশের বেদুঈনদের সংগ্রামবহুল দুর্ধর্ষ জীবন-যাত্রার পরিচয় বহন করছে। তাদের এই দুর্ধর্ষ জীবন-যাত্রার মধ্যে কখনও কখনও নারীর প্রেম মাদকতা এনেছে। কবি এই মাদকতা এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ধর্ষতাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এ-কবিতার জন্য মোহিতলাল উপদান গ্রহণ করেছেন প্রাক্-ইসলামি যুগের কবি ইমরুল কয়েস এবং জোহায়েরের 'মোয়াল্লকা' থেকে।

মোহিতলাল কাব্যক্ষেত্রে ছিলেন হিন্দুদের বামাচারী তান্ত্রিকের মত। দেহকে অবলম্বন করেনএবং সেই দেহ-উপভোগের পরিপূর্ণতার মধ্যে তিনি কোনও প্রকার স্নিগ্ধ রসাবেশ কামনা করেননি। তিনি সেই উপলব্ধির প্রগাঢ়তায় বহ্নিময় হয়ে উঠতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেনঃ

"দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা-
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা।
এই সুগঠন দেহ উদূখলে
কঠিন মর্ম দলি' কুতূহলে,
আমি নিদাঘের দাবদাহে রচি হিন্দোল-মূর্চ্ছনা!"

মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্ত গোধূলী'।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
(১৮৯৯-১৯৭৭)

নজরুল ইস্‌লামের প্রতিভার মূল্য নির্ধারণের পূর্বে আমরা প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলার সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং তার প্রভাব সাহিত্যে ও জীবন-ক্ষেত্রে কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল-তা আলোচনা করতে চেষ্টা করব। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান-পক্ষীয়দের জয় যখন অনেকটা অবধারিত বলে মনে হয়েছিল, সে-সময় ভারতবর্ষের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য জাগে। তারা তখন ধারণা করলেন যে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই এ

www.icsbook.info

সুযোগে স্বাধীন হতে পারে। তারা সমস্ত দেশব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। এবং দেশের সর্বত্র গোপন সন্ত্রাসবাদের আয়োজন চলতে লাগল। এ-সময়কার রুশ বিপ্লব দেশীয় লোকদের মনে দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে আরও সহজ বলে ভাববার সুযোগ দেয়। ১৯১৮ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে কিছুটা গৌণভাবে জড়িত এক বাঙালী যুবক ভারতবর্ষে ফিরে এসে এদেশে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির এক শাখা স্থাপন করেন। দেশের সন্ত্রাসবাদ এবং সর্ব প্রকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগ ছিল। ইনি সাহিত্যিক প্রতিভাবাপন্ন ছিলেন এবং নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এঁর নাম মুজাফ্ফর আহমদ। দেশের মধ্যে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছে তা তিনি তখনকার অনেক প্রবন্ধে লিখেছেন এবং তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছিলেন রবীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং আরও অনেকে। এ সময় বাংলা দেশের মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করবার অন্য একটা উপায় ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাভূত এবং পর্যুদস্ত হয় এবং তার নব-জাগরণের সম্ভাবনা অনেকটা নষ্টই হয়ে যায়। কামাল পাশার আবির্ভাব ঘটে এর অব্যবহিত পরেই। কামাল পাশা জাতীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে খেলাফত উঠিয়ে দেন। তখন আমাদের দেশে একটা প্রবল প্রতিবাদ ওঠে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে খেলাফত-কমিটি স্থাপিত হয়। দেশব্যাপী খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী মুসলমানকে একত্রিত করা এবং স্বাধীন ক্ষেত্রে তাদের বিচরণের সুযোগ দেওয়া। সুতরাং তখনকার স্বরাজ এবং বিভিন্ন প্রকার বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে এর সহজেই একটা যোগসূত্র স্থাপিত হল। কেননা, স্বাধীনতার দাবীর দিক থেকে এদের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল।

দেশের এই তুমুল হট্টগোলের সময় নজরুল ইসলাম সেনাদলে যোগদান করেন এবং যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তিনি যখন করাচীর সেনা-নিবাসে অবস্থান করছিলেন তখন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে এই সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমরা তাঁর মনোভাবকে বুঝতে পারছি। তিনি বিপ্লব এবং সংগ্রামকে কামনা করেছেন সর্ব-মুহূর্তে, কেননা তিনি ভেবেছেন যে সর্বপ্রকার অসদাচরণ এবং অকল্যাণ থেকে জাতি এবং দেশকে মুক্ত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংগ্রামকে অবলম্বন করা। এই বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের আবেগ তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রথম পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল ইস্‌লাম সর্বাত্মক বিক্ষোভকে প্রশস্তি জানিয়েছেন এবং নতুন সৃষ্টির জন্য ধ্বংসকে অনিবার্য ভেবেছেন। এ-কবিতা দিয়েই নজরুল ইস্‌লামের বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আগমন, এ-কবিতাই তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠার কারণ। 'বিদ্রোহী কবিতাতেই স্পষ্ট হয় যে নজরুল ইস্‌লাম বেগবান এবং অস্থিরচিত্ত। জীবনের সর্ব প্রকার মোহনীয় আবেগকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন, এবং গ্রহণ করতে চেয়েছেন একমাত্র অস্বস্তিকে।

সুতরাং নজরুল ইস্‌লাম বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারার মধ্যে এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি করলেন বলা যতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্নিগ্ধ শান্ত কাব্য ধারার সঙ্গে এর সমন্বয় নেই বরং অসৌজন্য আছে বলা যেতে পারে। এর কিছুটা সাজাত্য বরং আছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বৈপ্লবিক আবেগের সঙ্গে। তবে মাইকেলের সঙ্গে পার্থক্য এখানে যে মাইকেলের বাণী যেখানে সমস্ত জীবন মথিত করে উৎসারিত হয়েছে—নজরুল ইস্‌লামের বাণী সেখানে অত্যন্ত অগভীর। এর একমাত্র কারণ এইযে নজরুল ইস্‌লামের

www.icsbook.info

মধ্যে স্থৈর্যের অভাব ছিল। জীবনকে মুহূর্তে সচকিত করবার আবেগ তাঁর ছিল। কিন্তু গভীরভাবে জীবনকে উপলব্দি করবার মত অন্তদৃষ্টি তাঁর ছিল না। তাঁর 'অগ্নিবীণা' ও 'বিষের বাঁশি' দুস্থ মানবতার জয় ঘোষণা-কল্পে লিখিত এবং এ দুটি কাব্যগ্রন্থে দেশের অধিকারীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। তখনকার দিনের বাংলাদেশ ও সমাজ এ বিক্ষোভকেই কামনা করেছিল এবং আপন মনের অনুযোগ নজরুল ইস্‌লামের মধ্যে পেয়ে তারা দ্বিধাহীন চিত্তে নজরুল ইস্‌লামকে স্বীকার করেও নিয়েছিল।

নজরুল ইস্‌লামের সর্ব প্রধান বিশিষ্টতা হচ্ছে তাঁর সাময়িকতা। সাময়িক ঘটনা, সাময়িক জীবন, অথবা কোনও সাময়িক আবেগকে অবলম্বন করে এত প্রচুর কবিতা তাঁর মত আর কেউ লিখতে পারেনি। এদিক থেকে ইংরেজ কবি কিপ্‌লিঙের সঙ্গে তার মিল আছে। কিপ্‌লিঙ সম্পর্কে টি. এস.ইলিয়ট বলেছেন, কিপ্‌লিঙ কাব্যক্ষেত্রে সাংবাদিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং অধিকাংশ মুহূর্তেই শিল্পায়ত্ত কবিতা লিখবার চেষ্টা করেননি। অথচ তাঁর এ সমস্ত সাময়িক কবিতা আপন সাময়িকতা নিয়েই অত্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত। নজরুল ইস্‌লাম সম্পর্কেও নির্বিবাদে একথা বলা চলে। তিনি একই সঙ্গে কবিতা লিখেছেন, প্রচারমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সংবাদপত্র পরিচালনা করেছেন। প্রেমের কবিতা যখন লেখেন তখনও সাময়িকতা তাঁর কাব্যে বিদ্যমান। এভাবে বিদ্যমান যে মানুষের মুক্তি তিনি যাঞ্চনা করেছেন এবং সে জন্য তিনি সংগ্রামেও লিপ্ত, কিন্তু তখনও প্রেয়সীর মত নয়ন তাঁর দৃষ্টিতে ভাসছে। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সরকার বিরোধী প্রবন্ধ লেখার জন্য নজরুল ইস্‌লামকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

নজরুল ইস্‌লাম অজস্র গান লিখেছেন, সেগুলোর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থের নাম হচ্ছে–'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'সাম্যবাদী', 'চক্রবাক', 'ছায়ানট', 'দোলন চাঁপা,' 'নতুন চাঁদ'। তাঁর গানের বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–'বুলবুল', 'জুলফিকার ও 'বনগীতি'। কাব্যানুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ',। নজরুল ইস্‌লামের নাটকের কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। তাঁর উপন্যাসের কথাও আলোচিত হয়েছে।

নজরুল ইস্‌লাম 'আমপারার' তর্জমা করেছেন বাংলা পদ্যে এবং 'মরু ভাস্কর' নামক কাব্যগ্রন্থে হযরতের জীবনী আলোচনা করেছেন।

নজরুল ইস্‌লাম বাংলা কবিতায় নতুন স্বাদ এবং উত্তেজনা আনলেন। একটি সম্পূর্ণ নতুন স্বভাবের নির্দেশে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে এলেন। এ-ভাবেই আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি একটি নতুন আকাঙক্ষা জাগালেন। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ছাড়াও বাংলা কবিতার বিকাশের যে নতুন পথ আছে, নজরুল ইস্‌লাম তা প্রমাণ করলেন। তিনটি কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, নজরুল ইস্‌লাম জন্মেছিলেন ইসলামের ঐতিহ্যের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যও তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না; দ্বিতীয়ত, নজরুল ইস্‌লাম এসেছিলেন অল্প-শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্য থেকে এবং সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল; তৃতীয়ত, দেশের রাজনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

আমরা নিম্নে নজরুল ইস্‌লামের কতকগুলো বিশিষ্ট উপমা এবং সৌন্দর্য-কল্পনার উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

www.icsbook.info

১. এসো তুফান যেমন আসে
সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ গতি
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে, হবেনা কাহারো ক্ষতি।
২. খোল অর্গল পাষাণের, খুশী বহুক অনর্গল
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন উড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, উঠ দূর গিড়িচূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে।
৩. বণিকের দুটা জাহাজ ডুবিবে তা'বলে সিন্ধু ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে শুনিয়াছে কভু কেউ?
ঐরাবৎ কি চলিবেনা পথে পিপীলিকা মরে ব'লে?
ঘর পুড়ে বলে প্রবল বহ্নিশিখা উঠিবেনা জ্বলে?
অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না বেহিসেবী যৌবন,
ভাঙ্গা চাল দেখে নামিবে না কিরে শ্রাবণের বর্ষণ?

নজরুল ইস্‌লামের বাংলা গজলের একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল,
আজও তার ফুল কলিদের ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল।
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরি বায় ঝুরছে নিশিদল,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া মৌমাছি বিভোল।"

'অগ্নিবীণায়' (১৯২২) যে কবি-কণ্ঠস্বর শোনা গেল রবীন্দ্রনাথের যুগে তা এক বিস্ময়কর কলধ্বনি। ধ্বনি-বিন্যাসের নতুন প্রযত্নে, শব্দ-ব্যবহারের একটি হিল্লোলিত তরঙ্গাঘাতে, বক্তব্যের একটি নিশ্চিন্ত উদ্দাম দ্বিধামুক্ত গতিতে বাংলা কাব্যে 'অগ্নিবীণা' একটি অভিনব সংযোজন। ভক্তি ও নিবেদনের বিনয়াবর্তে যে বাংলা কবিতা এতদিন রবীন্দ্রকাব্যের ধ্যান-গম্ভীরতায় স্থিতধী ছিল, নজরুল ইসলাম সে কবিতায় একটি সাবলীল স্বাধীন স্ফূর্তি এবং অবাধ-আবেগ সঞ্চার করলেন। 'অগ্নিবীণার' সুর আরও উচ্চকিত হল 'বিষের বাঁশী'তে (১৯৪২)। নজরুল ইস্‌লাম 'বিষের বাঁশী'র কৈফিয়তে লিখেছিলেন ঃ "এ বিষের বাঁশীর বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশ-মাতা, আর আমার অপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।" রাজনৈতিক বিবেচনা বা যুক্তি নয়, জাতীয়তাবোধ মূলক সমৃদ্ধির আশ্বাস নয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন কামনার একটি তীব্র ভাবাবেগ এ কাব্যের ভাব-ব্যঞ্জনায় সঞ্চারিত। একই বছর প্রকাশিত হয় ' ভাঙার গান'। এ-কাব্যে বৃটিশ বিরোধিতাকে কবিতায় প্রত্যক্ষ আবেগ হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়েছে। এভাবে ক্রমশ নজরুল ইস্‌লাম শ্রমিক আন্দোলনের প্রবক্তা হলেন। ১৯২৫ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'লাঙল' প্রকাশ আরম্ভ করেন। 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬) ও 'ফণি-মনসা' (১৯২৭)-এ তিনটি কাব্যগ্রন্থে নজরুল ইস্‌লাম গণ-আন্দোলনের সংগ্রামী কবি হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করলেন দেশ ও জাতির সম্মুখে। কিন্তু দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং কংগ্রেসের ভেদ-বুদ্ধি কবিকে অত্যন্ত আঘাত করে। তখন কবির আশ্রয় হল রোমান্টিক স্বপ্নালোক যেখানে আত্মরতি হচ্ছে কবির রক্ষাকবচ। এ-সময়কার কাব্য গ্রন্থ হল 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭), বুলবুল'

www.icsbook.info

(১৯২৮), চোখের চাতক' (১৯২৯) ও 'চক্রবাক' (১৯২৯)। কিন্তু বেশীদিন নিরাসক্ত থাকা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবার তিনি নিপীড়িত জনতার আর্তনাদ শুনেছেন এবং বিপ্লবের বাণী উচ্চারণ করেছেন। কবি চিত্তের এ-সময়কার বিপ্লব আবহকে বহন করেছে 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'প্রলয়শিখা' (১৯৩০) ও 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩০)।

চরম পরিতাপের বিষয় ১৯৪১ সাল থেকে নজরুল ইস্‌লাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বোধশক্তিরহিত ও বাক্‌শক্তি রহিত জীবন্মৃত অবস্থায় ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর ঢাকায় তিনি পরলোকগমন করে।

সমসাময়িক অন্যান্য কবিগণ

রবীন্দ্রনাথের কারণে যেমন রবীন্দ্রনাথের সময়ে আবির্ভূত অনেক কবি সুদক্ষ শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও কোনও বিশেষ কথা এবং সুর বাংলা কবিতায় দিয়ে যেতে পারেননি রবীন্দ্রনাথের সুরের সম্মোহনেই তাঁরা আচ্ছন্ন ছিলেন; তেমনি নজরুল ইসলামের পর অনেক মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা শিক্ষিত ও রুচিবান ছিলেন এবং পদ্য-রচনায় কুশলী ছিলেন, কিন্তু নজরুল ইস্‌লামকে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নজরুল ইস্‌লামকে অনুসরণ করেছেন বক্তব্যে অথবা ছন্দে, আবার কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ধারারই পোষকতা করেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের স্বীকৃতি প্রয়োজন কেননা হঠাৎ একজন কি দুইজন কবি আপন বিশিষ্টতায় সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ করেন না, বরঞ্চ তাঁদের সমসাময়িক ক্ষুদ্র কবিগণই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট এবং প্রসারিত করেন।

যেহেতু নজরুল ইস্‌লামের চঞ্চলতা রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত, তাই নজরুল ইস্‌লামের অনুকরণ খুব বেশী হয়নি। দুজন কবির মধ্যে কিছুটা বিশিষ্টভাবে নজরুল ইস্‌লামের বিদ্রোহ এবং চাঞ্চল্য রূপ পেয়েছিল, তাঁদের একজন হচ্ছেন–বেনজীর আহমদ এবং অন্য একজন মহীউদ্দীন (১৯০৬–১৯৭৫)। বেনজীর আহমদের জীবনেও যুগের রাজনৈতিক বিক্ষোভের ছাপ আছে। তিনি আজীবন সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এক সময় খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কিছুদিন বিপ্লবী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ দুটি –'বন্দীর বাঁশী' ও 'বৈশাখী'। শব্দ ব্যবহারে এবং ধ্বনির সামঞ্জস্য ও অনুসরণে ইনি নজরুল ইস্‌লামের অত্যন্ত নিকটবর্তী। মহীউদ্দিনও বিপ্লবী কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে অনেক দিন ধরে জড়িত ছিলেন। এক সময় মার্কসপন্থী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর কবিতা গ্রন্থ ছয়টি,–'পথের গান', 'জনসাধারণ', 'স্বপ্ন সংঘাত', 'যুদ্ধ বিপ্লব', 'দিগন্তের পথে একা', 'গরীবের পাঁচালি' এবং 'এলো বিপ্লব'। মহীউদ্দীনের বক্তব্যে অনুশাসন আছে কিন্তু ছন্দে ও কথায় তিনি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র অনুসারী।

গোলাম মোস্তফা

(১৮৯৭-১৯৬৫)

কাব্য-সাধনায় নজরুল ইসলামের সমসাময়িক। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণীর রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মোজাম্মেল হকের মত শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন এবং শিশু ও কিশোরদের জন্য অজস্র কবিতা লিখে তিনি মুসলমান সমাজের যে উপকার করেছেন তার তুলনা হয় না। এক সময় সমগ্র বাংলায় তাঁর স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি

www.icsbook.info

নিষ্ঠা ও সুরুচির জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু প্রধানত দুটি–ইসলাম ও প্রেম। তিনি সর্বদাই ইসলামের আদর্শের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন, এবং এক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব আপোষহীন। এজন্য তিনি জনসাধারণের দ্বারা কীর্তিত এবং বহুল প্রশংসিত কবি নজরুল ইসলামকে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রথম যৌবনের নরনারীর প্রেমের একটি তরল আনন্দ এবং উল্লাস আছে। প্রণয়ের বিরহবিলাস তাঁর 'সাহারা' কাব্যের উপজীব্য। তিনি একজন দক্ষ ছন্দশিল্পী। হালি এবং ইকবালের উর্দু কবিতার তিনি প্রশংসনীয় অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'রক্তরাগ' (১৯২৪) 'হাস্নাহেনা' (১৯২৭), 'খোশরোজ' (১৯২৯), 'কাব্য কাহিনী' (১৯৩২), 'সাহারা' (১৯৩৬), 'মুসাদ্দাস-ই-হালী' (১৯৪১), 'তারানা-ই-পাকিস্তান' (১৯৪৮), 'বুলবুলিস্তান' (১৯৪৯), 'আল-কুরআন' (১৯৫৭), 'কালামে ইকবাল' (১৯৫৭), 'বনি আদম' (১৯৫৮), 'শিকওয়া' ও 'জবাব-ই-শিকওয়া' (১৯৬০)।

নজরুল ইসলামের খ্যাতির কারণে প্রাচীন ধারার দুজন কবি নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠার সময় যথেষ্ট অন্তরালে ছিলেন। এরা হচ্ছেন **শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী** (১৮৯৫-১৯৪৫) এবং **শেখ হবিবর রহমান** (১৮৯১-১৯৬১)। মোহাম্মদ ইদরিস আলীর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'আমার প্রিয়া','পিযুষ প্লাবন', 'মর্মবীণা', ও 'মুক্তিবীণা'। প্রথম গ্রন্থটি শোকগাথা। শেষের তিনটি গ্রন্থে জাতীয়তামূলক কবিতা আছে। শেখ হাবিবুর রহমান বয়সে নজরুল ইসলামের পূর্ববর্তী বটে, কিন্তু তাঁর গানে এবং কবিতায় নজরুল ইসলামের প্রভাব আছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'আবেহায়াত', 'কোহিনূর কাব্য', 'চেতনা', 'বাঁশরী', 'পারিজাত' ও 'গুলশান'। তিনি শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁর অনুবাদ করেছেন। শেখ হাবিবর রহমানের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

শাহাদাৎ হোসেন
(১৮৯৩–১৯৫৩)

কবি শাহাদাৎ হোসেন রবীন্দ্রধারার সমর্থক ও অনুসারী। পরিচিত ধারায় তিনি কোনো পরিবর্তন আনেন নি। রবীন্দ্রযুগে অধিষ্ঠিত থেকে রবীন্দ্রনাথের ছায়াচ্ছন্ন থেকেই তিনি লালিত, পরিবর্ধিত ও গৌরবান্বিত। প্রাচীন রচনা-শৈলীর অনুশাসন স্বীকার করে শাহাদাৎ হোসেন তার স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। শাহাদাৎ হোসেনের কবিতায় ছন্দকুশলতা বিদ্যমান এবং পয়ারের একটি পরিশীলিত বিকাশ সেখানে আমরা লক্ষ্য করি। আদর্শের দিক থেকে শাহাদাৎ হোসেন বৃহত্তর ইসলামী জাতীয়বাদী। যে স্বপ্ন থেকে খেলাফাৎ আন্দোলনের উদ্ভব সেই বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন আজীবন কবির কাছে পরম সত্য ছিলো। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'মৃদঙ্গ', 'কল্পলেখা', 'চিত্রপট' এবং 'রূপচ্ছন্দা'। 'রূপচ্ছন্দা' কাব্য গ্রন্থ সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাজী আকরাম হোসেনের (১৮৯৬-১৯৬৩) কবিতায় একটি সরল ও স্নিগ্ধ আনন্দ আছে। তিনি পল্লী-প্রকৃতির তাৎপর্য এবং কোমলতাকে কবিতায় প্রকাশ করার চেষ্টা

www.icsbook.info

করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'যুগবাণী', 'মুক্তিবাণী', 'পল্লীবাণী', 'আমরা বাঙালী' ও 'পথের বাণী'। তিনি হাফেজ, রুমী এবং সাদীর কবিতার অনুবাদ করছেন।

আবদুল কাদির (১৯০৬–১৯৮৫) বাংলা কবিতার ছন্দ-বিজ্ঞানে পারদর্শী। সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। শাহাদাৎ হোসেনের মত তিনিও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম–'দিলরুবা' ও 'উত্তর বসন্ত'।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭–১৯৭৮) গদ্যে ও পদ্যে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশু পাঠ্য পুস্তক-প্রণয়নে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 'ময়নামতির চর' কাব্যগ্রন্থে পল্লী জীবনের যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে একটি নতুন স্বাদ ও গন্ধ আছে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম–'পদ্মানদীর চর', 'ময়নামতী চর', 'অনুরাগ', 'ক্ষুধিত ধরিত্রী,' 'অস্তাচল', 'দক্ষিণ দিগন্ত'।

বেগম সুফিয়া কামাল
(জন্ম ১৯১১)

বেগম সুফিয়া কামালের কবিতার প্রধান গুণ যে তাতে কোথাও অস্পষ্টতা দোষ নেই, ভাবের জটিলতা নেই, ছন্দের আড়ষ্ট ভাব নেই। তাঁর কবিতা লঘু, স্বচ্ছ ও নির্মল। অসংলগ্নতা দোষ থেকে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তিনি কারো অনুকরণ করেন নি; তিনি করুণ সুরে এবং প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। সারা জীবন অনেক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে এবং এ সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর যে সমস্ত কবিতা তিনি রচনা করেন সেগুলোতে শোকের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটেছে। শোকের অভিব্যক্তি থাকলেও তাঁর বিরহের কবিতায় একটি স্নিগ্ধতা আছে, শূন্যতার জন্য তীব্র হাহাকার নেই। সংসার জীবনে তিনি স্বামী সেবা, গৃহকর্ম এবং সন্তান পালনকে তাঁর নিজের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছেন এবং তাতেই আত্মশক্তি নিয়োগ করেছেন। কামিনী রায়ের পর বাংলা সাহিত্যে অনেক দিন পর্যন্ত বিশিষ্ট কোনো নারী কণ্ঠস্বর শুনা যায় নি। বেগম সুফিয়া কামালের কবিতায় সে কণ্ঠস্বর আবার নতুন করে উচ্চারিত হলো। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে 'সাঁঝের মায়া' (১৯৩৮), 'মায়া কাজল' (১৯৫১), 'মন ও জীবন' (১৯৫৭), 'উদাত্ত পূরবী' (১৯৭১)।

কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৬-১৯৮৩) স্বরমাত্রিক লঘুছন্দে কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। এক প্রকার চাপল্য এবং আনন্দে তার কবিতা বিশিষ্ট। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'মরাল' ও 'নীল কুমুদী'। উভয় কাব্যই চিত্রময়। তাঁর অনেক কবিতায় বাংলার পল্লীপ্রকৃতির মধুর শ্যামলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ফজলুর রহীম চৌধুরী
(১৯০০–১৯৩০)

ফজলুর রহীম চৌধুরী দীর্ঘজীবী ছিলেন না, কিন্তু স্বল্প জীবনকালেই তিনি সাহিত্যিক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর রচিত দুটি গদ্যগ্রন্থ এবং একটি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গদ্যগ্রন্থ দুটির নাম 'পয়গম্বর কাহিনী' (১৯১৮) এবং

www.icsbook.info

'এসমাইল বংশীয় নবীগণ' (১৯২৪)। 'পয়গম্বর কাহিনী'তে সৃষ্টির সূত্রপাত থেকে হযরত ইউসুফ পর্যন্ত নবীগণের ধরাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রচিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সোহ্‌রাব-রুস্তাম' ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। কবি চণ্ডীচরণ মিত্রের তিনি ভাবশিষ্য ছিলেন। কবি এ-কাব্যকে 'গাথাগ্রন্থ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নজরুল ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতায় সমাজ-চেতনা অত্যন্ত প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। নজরুল ইসলামের 'কুলি', 'শ্রমিক', 'মানুষ' ইত্যাদি কবিতায় নিম্নশ্রেণীর মানুষের জয় ঘোষণা আছে। নজরুল ইসলামের এই যে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অবলম্বন করবার চেষ্টা এর পশ্চাতে মানুষের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহের আবেগকে অবলম্বন করবার আগ্রহ। এ ভাবেই নজরুল ইসলাম সাধারণ মানুষকে বাংলার শালীন কাব্যে স্থান দিলেন। যদিও গ্রাম্য-গীতিকায় এর স্থান পেয়েছিল অনেক আগেই তবুও বাংলার সমৃদ্ধমান কাব্যধারায়, যার পথ-নির্দেশক হচ্ছেন মাইকেল, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, নিম্নশ্রেণীর লোক স্থান পায় নি। এই সমৃদ্ধমান ধারার মধ্যে নজরুল ইসলামই সর্ব প্রথম সাধারণ মানুষের কথা সার্থকভাবে বললেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই নজরুল ইসলামের পর রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের শেষে দিকে কয়েকটি কাব্য-গ্রন্থে সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' এবং 'জন্মদিনে', এ-তিনটি কাব্য-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেশি সমাজসচেতন। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন যে আজীবন সাধারণ মানুষের কথা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয় নি। তবে তিনি আজ সে কবির বাণীর জন্য প্রতীক্ষায় আছেন, যে কবি কৃষাণের, মজুরের এবং শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে একাত্ম।

এ সময়কার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমাদের এখানে করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের সমাজ-জীবনে আশ্চর্য রকমে ভাঙন ধরে। যুদ্ধ মানুষের জীবনের সর্বপ্রকার কল্যাণের আশাকে নষ্ট করে দেয় এবং বুদ্ধি বৃত্তিকে বিকল করে। ইয়োরোপের সর্বব্যাপী হাহাকারের পরিচয় টি.এস. ইলিয়ট-এর "The Waste Land" কাব্যে আমরা পাই। জীবনের স্থৈর্য নষ্ট হয়ে গেছে, মননশীলতা মূল্যহীন হয়েছে, এক কথায় জীবনের যে পরিচয় নির্মমরূপে পরিদৃশ্যমান তা হচ্ছে তার চরম বন্ধ্যাত্ব। শুধুমাত্র ভাবের দিক থেকে এ-পরিবর্তন টি. এস. ইলিয়ট আনলেন তাও নয়—ভাবের সংরাগে কবিতার গঠনরীতিতে চরম পরিবর্তন ঘটল। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ নতুন মূল্য নিয়ে এল—এবং কবিতার গঠন কৌশলের মধ্যে এতদিনকার গতানুগতিক যৌক্তিক পারম্পর্য আর রইল না। জীবনের স্বপ্নভংগ কাব্যলোকের স্বপ্নকেও বিনষ্ট করল। বাংলাদেশের কবিদের কাছে টি.এস. ইলিয়ট পরিচিত হলেন। ইলিয়টকে পরিচিত করবার মূলেও রবীন্দ্রনাথেরা দান রয়েছে। তিনিই আধুনিক ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন এবং টি.এস. ইলিয়ট-এর একটি কবিতা বাংলায় তর্জমা করেন। এতদিনকার গতানুগতিকতার মধ্যে বাঙালী কবি প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, ইলিয়টের কাব্য পাঠ করে তাঁরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবিতাকে এতটা আচ্ছন্ন করেছিলেন যে, রবীন্দ্রযুগে অবস্থান করে কবিতায় শব্দ-ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। টি.এস. ইলিয়ট সেই সুযোগ তাঁদের দিলেন। সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কবিরা নতুন কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

www.icsbook.info

রবীন্দ্র কাব্যধারার এই ব্যতিক্রম কালকে ১৯১৮ থেকো ১৯৪৮ পর্যন্ত ধরে নিতে পারি। নজরুল ইসলাম মূলত এ সময়েরই কবি। ব্যতিক্রমবহুল অন্যান্য কবি হচ্ছেন–বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং সমর সেন। 'কল্লোল যুগ' বলে একটি যুগের কথা আজকাল বলা হয়ে থাকে বটে-কিন্তু মূলত এ যুগে রবীন্দ্রধারা থেকে যে কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে তা বলা চলে না– কেননা এ যুগের প্রধান পুরুষ যাঁরা অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু, অচিন্তা সেনগুপ্ত, এঁরা কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণেরই পুররাবৃত্তি করেছেন। সে-সঙ্গে অবশ্য যথেষ্ট বাচালতা এবং অনুপলব্ধ যৌন ভাবাবেগের বাহুল্য ছিল।

নজরুল ইসলাম যে সমাজবোধের পরিচয় কাব্যে এনেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি দেখি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্যগ্রেন্থ্। অবশেষে এই বোধ শব্দে সমর্পিত হয়ে কবিতার গঠন-রীতিতেও যে পরিবর্তনা আনলো তার পরিচয় পাই বিষ্ণু দের রচনায়। এদের মধ্যে সুধীন দত্ত শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলাল সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও ব্যতিক্রম আছে এদিক থেকে যে মোহিতলাল শব্দকে যেখানে পরিপাটিরূপে সজ্জিত করেছেন–সূধীন দত্ত সেখানে দুরূহ দুরুচ্চার্য শব্দ ব্যবহার করে আমাদের স্বপ্ন-ভঙ্গ করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
(১৯০১–১৯৬০)

কাব্য-রচনায় গভীর নিষ্ঠাবান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বহুভাষাবিদ পন্ডিত, দার্শনিক, তত্ত্বানুসন্ধানী এবং বক্তব্য বিশ্লেষণে অসাধারণ বুদ্ধিমান। অত্যন্ত মনোযোগী শিল্পী হিসেবে, সচেতন অনুভূতির বিবেচনায় তিনি বাংলা কবিতাকে আবেগের উচ্ছলতা থেকে আধুনিক মননশীলতা ও যুক্তির রাজ্যে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও ঔৎসুক্য কাব্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। কবিতা যে শিল্প এবং সে ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন যে আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বে এত স্পষ্টভাবে আমরা তা বুঝিনি। অত্যন্ত বেশি সচেতন কবির কাছে কবিতার কলা কৌশল একাগ্র নিষ্ঠা এবং সুচিন্তিত সাধনার ফল। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অধীত বিদ্যা এবং অসামান্য বৈদগ্ধ্য কবিত্বের অনুষঙ্গ করছিলেন। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তাঁর কাব্য-দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–"স্বপ্নচারী পথিককে যেমন, অনুপ্রাণিত কবিকে, আমি তেমনই ডরাই; এবং কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মূল্য বাড়ছে বই কমছে না।" আরও বলেছেন, "উক্তি ও উপলব্ধি যখন অবিচ্ছেদ্য তখন অন্ততঃ অভিজ্ঞতাপ্রধান লেখা পড়লে, বোঝা উচিত তার কতটুকু রচয়িতার নিজস্ব আর কতখানি গতানুগতিক।"

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। এ-কাব্যে কবির যুগ-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নি। রবীন্দ্রনাথের ছায়াপাত রয়েছে সর্বত্র, কবি যাকে 'জ্ঞানকৃত ঋণ' বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এখানেও কবির শব্দ-নির্বাচনের একটি বিশিষ্ট চেষ্টা ধরা পড়ছে যদিও তা সর্বত্র সমভাবে উচ্চকিত নয়। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'অর্কেস্ট্রা'ও একই পর্যায়ের কাব্য যদিও কবি এখানে অধিকতর স্থিতধী এবং অপরিচিত ও স্বল্পপরিচিত শব্দকে নতুন অভিজ্ঞায় বাঙ্ময় করেছেন। অধিকন্তু কবি

www.icsbook.info

এখানে সর্বপ্রথম শাশ্বত মূল্যবোধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন এবং 'স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্য'কে স্মরক করেছেন জীবন এবং জগতের। এ-মর্মের একটি কবিতা 'মহাসত্য' নিম্নে উদ্ধৃত হল–

"অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ;
অসংগত চির প্রেম; সংবরণ অসাধ্য অন্যায়;
বন্ধদ্বারে অন্ধকার প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়।।
সে মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা; দিবে না স্মারক অঙ্গুরীয়
ব্যবধি ব্যাপক জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রুপ।।
তবু রবে অন্তশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি;
তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনে নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি
মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে।"

১৯৩৭ সালের প্রকাশিত 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থ আধুনিক কালের অবক্ষয়, উত্তরাধিকার সূত্রেপ্রাপ্ত ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি তীব্র সংশয় এবং অস্থির আত্মপরিক্রমার যন্ত্রণা রূপলাভ করেছে। 'উটপাখি; কবিতায় কবি বলেছেন–

"কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা
প্রাক্ পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।"

'সৃষ্টিরহস্য' কবিতায় চিত্তের অভাববোধকে প্রকাশ করেছেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে–

"কপোল কল্পনা ত্যাগ; নিরাশক্তি অসাধ্যসাধন;
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা, সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র নাই।"

১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'উত্তরফাল্গুনী' 'ক্রন্দসী'র পরিপূরক গ্রন্থ এখানেও "দুঃস্বপ্নের বিপর্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি।"

সুধীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ, 'সংর্বত' (১৯৫৩)। কাব্যের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন, "মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট। আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য।" ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী প্রতিকী কবি মালার্মে কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন– Poetry is the expression by means of human language restored to its essential rhythm, of the mysterious sense ot the aspects of existence; it endows our sojourn with authenticity and

www.icsbook.info

constitutes the sole spiritual our sojourn with authentinticity and constiutes the sole spiritual task."

এ-কাব্যেও কবির জড়বাদ জীবনের মূল্য সন্ধানে অসমর্থ হয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে–

"হয়তো ঈশ্বর নেই; স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত গ্রাসে;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে;
জঙ্গলের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত।।
প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে;
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের। দুর্মর প্রকাশে;
শক্তিরা অব্যয়ভাবে তুল্যমূল্য ঘাত প্রতিঘাত।।
তাই আর্ত প্রার্থনার অপভ্রষ্ট আকাশ দুহিতা;
নাস্তিপ্রত্যাখ্যাত হয়ে, ফেরে গূঢ় দৈব্যবাণী-রূপে;
বুঝি দুঃখ আবশ্যিক; দূরদৃষ্টে দোষার্পণ বৃথা;
করে প্রতিবিম্বপাত বৈকল্পিক মুক্তি অন্ধকূপে।।
অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপঃ
আমার শান্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম–'প্রতিধ্বনি' (১৯৫৪) ও 'দশমী' (১৯৫৬)। 'প্রতিধ্বনি' অনুবাদ কবিতার সমষ্টি। শেক্সপীয়র, হাইনে, গ্যয়টে, মালার্মে, পল ভালেরী, ডি. এইচ. লরেন্স, জন মেসফীল্ড এঁদের কবিতার সতর্ক অনুবাদ গ্রন্থটিকে বিশিষ্ট করেছে।

সুধীন্দ্রনাথ কবিতাকে দুরূহ করেছিলেন বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে। এ-শব্দগুলিই তাঁর কবিতার রসাস্বাদনের পথে প্রচণ্ড বিঘ্ন স্বরূপ। বিচিত্র ধ্বনি-নির্মাণের জন্য এবং বিভিন্ন শব্দের যুক্তিসহ সুশৃঙ্খল বিন্যাসের জন্য অচলিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধান তাঁকে করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন; কিন্তু বাংলা কবিতায় তা গৃহীত হল না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, দুরূহতাই হল অচলিত শব্দের একমাত্র বিস্ময়, কিন্তু প্রচলিত শব্দের মধ্যে নতুন অর্থদ্যোতনায় যে বিস্ময় আছে তা অনেক বেশি ব্যাপক এবং গভীর।

জীবনানন্দ দাশ
(১৮৯৯-১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশ প্রধানত প্রকৃতির কবি। তিনি যে জগৎ নির্মাণ করেছেন সে জগৎ তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলের নয়। তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী হচ্ছে কুহেলিকার, ছায়ার, হেমন্তের জলস্রোতের, ইঁদুরের, প্যাঁচা আর বাদুড়ের এবং ছায়া ও আলোতে যে হরিণ খেলা করছে তার। যা কিছু গোপন এবং মানুষের সম্পর্কহীন তাই তাঁর মনে মাদকতা জাগিয়েছে। পাখি এবং প্রাণী তাঁর পৃথিবীর প্রধান অধিবাসী, তাই নাটোরের বনলতা সেনও পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে তাকান। ফরাসী চিত্রকর রুশোর মত তিনি

www.icsbook.info

পরিচিত পৃথিবী থেকে অন্তরাল খুঁজেছেন। রুশোর ছবিতে সাপ আছে, হাঁস আছে, অপরিচিত লতা-ফুল-ফল আছে এবং তার সঙ্গে অনৈসর্গিক হয়ে বসেছে মানুষ। রুশোর ছবির প্রধান রং হচ্ছে ঘন সবুজ এবং নীল। জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতির রং ধূসর। তাঁর কাব্য চিত্ররূপময়। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৫২), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'বেলা অবেলা কালবেলা' এবং 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭)।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর সরল সত্তার সঙ্গে পল্লী প্রকৃতিকে ওতপ্রোত করে ছিলেন। মাটির গন্ধ, বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ, ফলভারে আনত গাছের ডালের সজীবতা, আকাশে-নদীতে-প্রান্তরে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ কবির অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়েছে। শরৎকালের পরিচ্ছন্নতা এবং হেমন্তে শস্যসম্ভারের বর্ণবিন্যাস কবির সর্ব সময়ের আশ্রয়। জীবনান্দ দাশের প্রকৃতি অসম্ভব মমতাময়। 'দুধে আদ্র' মাতার স্তনের মতো কোমল এবং নবনীত। ভেবেছেন গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দকে, পায়ের তলার ভেজা মাটিকে গাছের ডালের শালিক বা চড়ুই পাখিকে। জীবননান্দ দাশ পল্লী-প্রকৃতির মধ্যে আপন চিত্তের নিভৃত লোকের আর্তিকে পেয়েছিলেন। নগরে পরিচয়হীন প্রতিদিনের দেখার মধ্যে যে বিস্ময়হীনতা, কর্মে দ্রুততার মধ্যে অন্তরের যে অনুদঘাটন, তার যন্ত্রণার স্বাক্ষর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পাই। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অন্যপক্ষে পল্লী প্রকৃতিতে সংশয়হীন মমতার চিরায়ত স্বাক্ষর আমরা অবিষ্কার করি। শুধুমাত্র এ-কারণেই জীবনানন্দ দাশ একই সঙ্গে সুন্দর শিল্পী এবং জীবনের সংশয় ও সঙ্কট থেকে পলায়নপর দুর্বল পুরুষ। জীবনানন্দের কাব্যে চলমান জীবন সম্পর্কে একটি বেদনাময় নির্মম ঔদাসীন্য আছে।

বিষ্ণু দে
(১৯০৯-১৯৮২)

বিষ্ণু দের কবিতায় শব্দ-বিন্যাস এবং ছন্দ কৌশলের একটি নতুন আবিষ্কার আমরা লক্ষ করি। বিভিন্ন চিন্তার ভগ্নাংশ নিয়ে একটি সামগ্রিক আবেগের ইশারা তাঁর কবিতাকে অনেক সময় দুর্বোধ্য করেছে। আঙ্গিকের এ নতুন অভিজ্ঞতার জন্য তিনি টি. এস. ইলিয়টের নিকট ঋণী।

বিষ্ণু দে সমাজ-সচেতন কবি এবং চিন্তায় মার্কস-পন্থী। সামাজিক বিভিন্ন অবস্থা এবং মানুষের বৈলক্ষণ্যর যে প্রকৃতি, তিনি কাব্যে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। কখনও কখনও হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কোন চরণ দুর্ঘটনার মত আবির্ভূত হয় এবং তখন আমরা লক্ষ করি যে আবির্ভূত চরণটি নতুন অর্থে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর কাব্যবিন্যাসে ব্যাকরণের যুক্তি নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন চরণ কিংবা স্তবকগুলি পারম্পর্য বিরোধী কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনুভূতির উজ্জ্বলতা ধরা পড়ে।

বিষ্ণু দের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্ব-লেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অনিষ্ট' (১৯৫০) এবং 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০)।

আধুনিক কবিতাকে রবীন্দ্রকাব্যের সম্মোহন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় বিষ্ণু দে তাঁর সমকালীন অন্য কবিদের চেয়ে অগ্রগামী। কবিতার শৃঙ্খলিত সৌষম্য এবং

www.icsbook.info

রূপকল্পকে বিক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত করলেন এ বিবেচনায় যে, যে পৃথিবীতে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ভেঙ্গে গেছে এবং যেখানে মানুষের পদক্ষেপ অর্থহীনতায় কম্পমান সেখানে কবিতায় শৃঙ্খলিত সুরের সম্মোহন জাগতে পারে না। সেখানে কবিতা হবে বিচিত্র ভঙ্গুর শব্দচূর্ণের উদ্দেশ্যহীন সমস্বর। আধুনিক জীবনের অন্য একটি বিবেচনাকেও বিষ্ণু দের কবিতায় আমরা আবিষ্কার করি। সে বিবেচনা বলছে যে আবেগ যদি চিন্তার দ্বারা সমর্থিত না হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত না হয়, তবে সে আবেগ কুহেলিকা সৃষ্টি করতে পারে- জীবনের সম্ভাবনা জাগায় না। তাই শুধু মাত্র আবেগের উপর নির্ভরশীল যে সব কবিতা তাতে কোনও বিস্ময় নেই। আধুনিক কবিতায় ইতিহাসের খণ্ডাংশ, অতর্কিত বিস্তার, সংশয়, স্মৃতির অনুরণন, ধর্ম-নির্দেশের নিষ্পেষণে আত্মার আর্তনাদ একসঙ্গে কথা বলে উঠবে। বিষ্ণু দের বিভিন্ন কবিতা এহেন আধুনিকতার দুর্মর সাক্ষ্য বহন করেছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করা হল ঃ

১. মিলাক্ আমারও সত্তা শত ঘূর্ণীপাকে, একাকার
টলোমলো সমুদ্রের একরাশি জলধারা হাজার হৃদয়
হোক্ হোক্ শত আত্মম্ভরিতায় কানা নদী মজাখাল
সবাই সবাই আজ খুঁজে পাক, কপিলের গুহা,
মহিমায় মিলাক অণিমা, কমলে কামিনী কিম্বা
কালীয়দমনে।

২. এখন আসন্ন সন্ধ্যা। উপড়িয়ে হিরন্ময় পত্র
উন্মুক্ত বিরাট নীলে সত্যবান প্রাণ পায় রক্তিম ক্রান্তিতে।
পশ্চিমের ছটা বই আমারও হৃদয়ে-একমাত্র
বাধা আজ অঘ্রাণের সোনা কালবৈশাখী চৈত্রীতে
লুটেরায় লুট করে। তাই আজ হতে পারি তোমার মৈত্রীতে
মিলাও সন্ধ্যার রঙে প্রেমের সংরাগ তীব্র সংহত শান্তিতে।

৩. প্রলাপে প্রলাপে বুঝি নাচে ক্ষ্যাপা বসন্ত আকাশ,
জীবনের তেপান্তরে বাউল হওয়ার হাঁকে হাঁকে।
বেল মল্লিকার শুভ্র প্রণিপাত পায়ে দলে দলে
চৈতালী-ঘূর্ণীয় রাজা নাচে একা মরীয়া গাজনে!
দোল পূর্ণিমার স্মৃতি বৈশাখীতে শ্মশানে ছড়ায়,
মড়ক মড়ক ঢাকে, ছিন্নভিন্ন শূন্যে হাহাকার!

অমিয় চক্রবর্তী
(১৯০১-১৯৮৫)

বাংলা ভাষার কাব্যকর্মে আধুনিক ভঙ্গির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ও ফরাসী কবিতার ধ্বনির কৌশলকে বাংলা কবিতার শব্দ-বিন্যাসে উপস্থিত করবার চেষ্টায় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রজ্ঞাকে বাংলা কবিতায় আত্মস্থ করবার ইচ্ছায় যাঁর সতত সতর্ক দৃষ্টি ছিলো তিনি অমিয় চক্রবর্তী। আধুনিক বাচনভঙ্গির মধ্যে তিনি নানা স্বভাবের ছন্দের পরীক্ষা করেছেন। হাল্কা ছন্দে কঠিন দার্শনিক বিষয়কে আয়ত্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর দুঃসাহস অসাধারণ। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি 'দৃষ্টির দর্শন'কে সর্ব

www.icsbook.info

মুহূর্তে ব্যবহার করেছেন। আরও বলেছেন,–"ভাবের তরঙ্গ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং ধ্বনিত হলে একটু বিস্তার করে দিতে হয়– সেই কাজই করছি। আশ্চর্য এই যে গভীর অনুভূতির স্মৃতি বা প্রসঙ্গ কোনদিনই অন্তরে প্রশমিত হয় না, যেন কত বছরের আমি কত একই বেদনার মধ্য দিয়ে কিসের সন্ধান খুঁজেছি।" অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'এক মুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'পারাপার' (১৯৫৩) এবং 'পালাবন্ধক' (১৯৫৫)।

অমিয় চক্রবর্তীর একটি স্নিগ্ধ মনোরম চিত্রায়িত কবিতা 'বৃষ্টি'। সেখান থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।।
বৃষ্টি ঝরে ইক্ষু মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে,
স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠ, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতেরা কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারা জলে।।"

বুদ্ধদেব বসু
(১৯০৮–১৯৭৪)

বাংলাদেশের কুমিল্লায় ১৯০৮ সালে বুদ্ধদেবের জন্ম। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল নোয়াখালিতে, পরে ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর বন্ধু অজিত দত্তের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় 'প্রগতি' প্রকাশ করেন বাংলা ১৩৩৪ সালে। ১৯৩১ সালে বুদ্ধদেব স্থায়ীভাবে কলকাতাবাসী হন। ১৯৩৫ সালে তিনি 'কবিতা' নামে কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পঁচিশ বছরেরও অধিককাল তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করে আধুনিক কাব্যআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায়, সদিচ্ছায়, শাসনে এবং নিয়ন্ত্রণে আধুনিক বাংলা কবিতা তার যথার্থ আধুনিকতায় রূপলাভ করে। 'কবিতা' পত্রিকা তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আধুনিক বাংলাা-সাহিত্যের যে অধ্যায়কে বলা হয় "কল্লোল যুগ" সেই অধ্যায়ের তরুণতম প্রতিনিধি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ১৩৩০ সালে যখন 'কল্লোল' প্রকাশিত হয় তখন বুদ্ধদেবের বয়স মাত্র পনেরো। কলিকাতায় 'কল্লোল' (১৩৩০) এবং 'কালিকলমে'র (১৩১৩) মতো ঢাকায় 'প্রগতি' ছিল সে যুগের আধুনিকতার মুখ্য বার্তাবহ। গ্রন্থকার হিসেবে বুদ্ধদেবের জীবনে ১৯৩০ সালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরেই তাঁর 'বন্দীর বন্দনা' (কাব্য) 'সাড়া' (উপন্যাস) এবং 'অভিনয় নয়' (ছোট গল্প-সংকলন) প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবেমাত্র একুশ বৎসর বয়স অতিক্রম করেছেন।" বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩) 'বন্দীর বন্দনা'র পরিপূরক গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থেই শরীরী প্রত্যয়ে প্রেমের অভিব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। কিছুটা স্বাদের ব্যতিক্রম এসেছে–'কঙ্কাবতী'

www.icsbook.info

(১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থে। পদ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে একটি ধ্বনি আবর্ত নির্মাণ করে বুদ্ধদেব বসু যৌবনের আনন্দগানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'দময়ন্তী, 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা', বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'নতুন পাতা', 'যে আঁধার আলোর অধিক, 'মরচেপরা পেরেকের গান'। জীবনের শেষের দিকে তিনি নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ', 'কালসন্ধ্যা', 'পুনর্মিলন', 'অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ' প্রভৃতি নাট্যকাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শিল্পরূপের জন্ম দিয়েছে।

জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, "বস্তুত শুধু নিজে অজস্র রূপ ও রীতির কবিতা লিখেই নয়, সহযাত্রী এবং উত্তরসূরি আধুনিক কবি সমাজকে কবি মার্যদায় সমুন্নীত করে 'কবিতা' সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু একালের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।"

জসীম উদ্‌দীন
(১৯০২-১৯৭৭)

রবীন্দ্রনাথের পর যেভাবে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তেমনি জসীম উদ্‌দীনও সম্পূর্ণ নুতন কাব্য চেতনার পোষকতা করে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অবশ্য বাংলার শালীন কাব্যধারার সঙ্গে নজরুল ইসলামের একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের সম্পর্ক মূলত চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং গ্রামের অজস্র কাব্য গীতিকার সঙ্গে। গ্রাম্য জীবন এবং গ্রাম্য পরিবেশ তাঁর কাব্যের উপাদান জুগিয়েছে এবং তাঁর কবিতার কলা-কৌশলের মধ্যেও গ্রাম্য আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি। কিন্তু তাই বলে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে গ্রাম্য কবি নন। তার কারণ উপমারূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন, এবং কাব্য-কাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের গঠন প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন। অবশ্য গোবিন্দচন্দ্র দাস যতটা পল্লী কবি, জসীম উদ্‌দীন তার চাইতে বেশি পল্লী কবি। তার কারণ জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে গ্রাম্য বিষয়বস্তু ও জীবনের যতটা প্রাচুর্য আছে গোবিন্দ দাসের মধ্যে ততটা নেই। জসীম উদ্‌দীন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন 'কবর' কবিতাটি নিয়ে। এ-কবিতার মধ্যে অতর্কিতে আমরা একটা নতুন বেদনার সুর শুনতে পেলাম। অসাধারণ হৃদয়াবেগ বা বলিষ্ঠ কোন জীবনাদর্শ নেই, অথচ সাধারণ জীবনের তুচ্ছ বেদনা যে এত মর্মান্তিক হতে পারে তার পরিচয় আমরা আগে কখনও পাইনি।

জসীম উদ্‌দীনের বিশিষ্টতা হচ্ছে সহজ এবং সতেজ উপমা ব্যবহারের মধ্যে, গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে যে অনায়াস-সহজতা বিদ্যমান জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতির সে-পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। জসীম উদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থের নাম-'রাখালী' (১৯২৭), 'বালুচর' (১৯৩০), 'ধানখেত' (১৯৩১), 'নক্সীকাঁথার মাঠ', (১৯২৮), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', (১৯৩৩) 'মাটির কান্না', 'হাসু', রঙিলা নায়ের মাঝি', 'এক পয়সার বাঁশী।' অবশ্য 'মাটির কান্নায়' জসীম উদ্দীনের সত্যিকারের সুর শুনতে পাই নে। এখানে নাগরিক জীবনের চাঞ্চল্য ধরা পড়েছে। তাঁর 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ইংরেজীতে তর্জমা হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থের নাম "The Field of the Embroidered Quilt."

www.icsbook.info

জসীম উদ্‌দীনের দুটি গাথা-কাব্যই রূপসজ্জায় আধুনিক এবং নাগরিক প্রকর্ষের লক্ষণাক্রান্ত। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' এবং 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' উপাখ্যান দুটির উপকরণ পল্লী-অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, কিন্তু নির্মিত কাহিনীর বিন্যাস এবং চরিত্রের ক্রমবিকাশ প্রচলিত পল্লীগীতিকার মতো নির্বিঘ্ন ও সহজ নয়। প্রচলিত পল্লী-গীতিকায় কাহিনীর কোনও আবর্তন নেই, একটি নিশ্চিত স্রোতোধারা আছে মাত্র। সেখানে অনবরত নতুন নতুন ঘটনায় কাহিনী অগ্রসর হয়ে চলে। জসীম উদ্‌দীনের গাথা দুটিতে কেন্দ্রীয় আবেগ আছে যার প্রস্তুতি, আবর্তন এবং বিকাশ কাহিনীতে একটি ঐক্যতত্ত্ব (Unity) দান করেছে।

'নক্সী কাঁথার মাঠে'র আরম্ভে আমরা গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্মোচন পাই! দিগন্ত প্রসারিত মাঠের দুই প্রান্তে দুটি গ্রাম। বিরোধ-ব্যবধান-অশান্তি এবং মিলনের মধ্য দিয়েই উভয় গ্রামের অধিবাসীদের সময় কাটে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নায়কের পরিচয় পাচ্ছি। তার দেহের গঠন-সৌষ্ঠব, শক্তি এবং সাহস, কবি বিভিন্ন উপমা-রূপকের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ভিন্ন গ্রামের কুমারী মেয়ে সাজুর পরিচয়। চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রামের একটি উৎসবে সাজুর অংশগ্রহণ এবং সাজুর আরও বিস্তৃত পরিচয়। এ অধ্যায়ে নায়কের সঙ্গে নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হচ্ছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ে বিয়ের প্রস্তাব এবং অষ্টম অধ্যায়ে বিবাহ। নবম এবং দশম অধ্যায়ে রূপা ও সাজুর অপেক্ষা, পীড়া এবং অবশেষে মৃত্যু। আমরা দেখতে পাচ্ছি গাথাটির কাহিনী বিন্যাস সম্পূর্ণরূপে একটি কাহিনী ও আবহ প্রধান উপন্যাসের মত। লেখক কাহিনী-নির্মাণে যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, সে কৌশল গ্রাম্য গীতিকারের নয়। পল্লী-গীতিকায় একটি চরিত্রের অনুসরণ করা হয় এবং সে চরিত্রের চূড়ান্ত পরিণতির পর অন্য চরিত্রের অনুসরণ আরম্ভ হয়। কথকতার মধ্যে অথবা গানে কাহিনীর একটা ধারা যখন শেষ হয় তখন গীতিকার শ্রোতাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে এদিককার ঘটনা তো শেষ হলো, এখন ওদিকে কি হলো তা বলছি। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় এর প্রচুর, উদাহরণ আছে। জসীম উদ্‌দীন আধুনিক উপন্যাসের রীতি-প্রকৃতি অনুসারে প্রেমের পূর্বরাগ, মিলন এবং বিরহকে যুক্তি সহকারে গড়ে তুলেছেন।

জসীম উদ্‌দীন যে সমস্ত উপমা ব্যবহার করেছেন সেগুলোর উপাদান গ্রাম থেকে সংগৃহীত, কিন্তু উপমার বাখ্যাসূত্র প্রধানত নাগরিক। উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে একটি যুক্তিসহ নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাসূত্র আছে, যা বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক কবিতার লক্ষণ। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি;

১. এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল।
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু;
গা-খানি তার শাঙন মাসে যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী-মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হয়েছে কখনও কখনও। তাঁর 'কর্ণফুলি' (১৯৬২) উপন্যাসটি নদীভিত্তিক নরনারীর জীবনযাত্রার কাহিনী। মূলত চট্টগ্রামের মাঝিদের কঠিন জীবনযাপনের ঘটনা নিয়ে এ উপন্যাসটি নির্মিত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪), 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (৯৬০), 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২)। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসটি বুলগেরিয় ভাষায় অনূদিত হয়ে সোফিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনার মধ্যে যৌন আবেগ একটি অন্তরঙ্গ অভিপ্রায় হিসাবে উপস্থিত। আজাদের গল্পগ্রন্থের নাম 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৮), 'উজান তরঙ্গ' (১৯৬২), 'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'মৃগনাভি' (১৯৫৪), 'যখন সৈকত' (১৯৬৭), 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার' (১৯৭৫)।"

জহির রায়হান
(১৯৩৩-১৯৭২)

'জহির রায়হান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন। চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণ এবং সংলাপ পদ্ধতি তাঁর উপন্যাসকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে তাঁর উপন্যাসে একটি তাৎপর্যবহ নতুন শিল্পভঙ্গি নির্মিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে জীবন সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, যে প্রশ্নগুলো আংশিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক আবার আংশিকভাবে মানবতাবাদী। তাঁর উপন্যাসগুলোর নাম 'আর কতদিন' (১৯৭০), 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮), 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯), 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) এবং তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'সূর্য গ্রহণ' (১৯৫৫)।"

আবুবকর সিদ্দিক
(জন্ম ১৯৩৪)

মূলত কবিতা রচনায় দীর্ঘদিন ধরে আত্মনিবেদিত থাকলেও সাম্প্রতিককালে আবুবকর সিদ্দিক একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শ্রেণী শোষণ এবং সমাজের নীচু তলায় অবস্থিত মানুষদের লড়াকু স্বভাব ও প্রত্যয়কে বিষয়বস্তু করে উপন্যাস লিখে চলেছেন তিনি। সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ-বাংলা আর খরাপীড়িত উত্তর-বাংলার মানুষকে যে ভিন্নমুখী পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়, 'জলরাক্ষস' (১৯৮৫) এবং 'খরাদাহ' (১৯৮৭) উপন্যাস দুটিতে আবুবকর সিদ্দিক যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের মানুষ একদিকে জোতদারী শোষণ এবং অপরদিকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও মহামারীতে পূর্ণ যে প্রাকৃতিক পীড়ন সহ্য করতে না পেরে কখনও শিকার হয় অকালমৃত্যুর, আবার কখনও শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়েও চালিয়ে যায় বাঁচার দুর্জয় লড়াই—'জলরাক্ষস' এ ঘটেছে তারই প্রাণবন্ত প্রকাশ।

'খরাদাহ' উপন্যাসটিতেও প্রাধান্য পেয়েছে শোষিত মানুষের দ্বিমুখী সংগ্রাম-আলেখ্য। একদিকে বৈরী প্রকৃতি আরেকদিকে জোতদারী ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে

www.icsbook.info

এখানে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চালাতে হয়েছে মাটিঘেঁষা নিঃস্ব মানুষদের। তবে 'জলরাক্ষস' উপন্যাসে যেখানে জলের প্রবল পীড়ন বিড়ম্বিত করেছে জনজীবনকে, সেখানে 'খরাদাহ' উপন্যাসে জলহীন শুষ্ক প্রকৃতি অতিষ্ট করে তুলেছে মানুষের জীবন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

(জন্ম ১৯৩৪)

"আবদুল গাফফার চৌধুরী কুশলী কাহিনীকার। এক সময়ে ছোটগল্প লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিষয়বস্তু মূলত প্রেম এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের সাংসারিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫৯), 'সম্রাটের ছবি' (১৯৫৯), 'সুন্দর হে সুন্দর' (১৯৬০)। তাঁর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' (১৯৬০) উপন্যাসটি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গ্রামীণ জীবনকথা। চন্দ্রদ্বীপের সামাজিক ইতিহাসে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। ইসহাক মিয়ার ছেলে ইউসুফ সামন্ত শ্রেণীর শেষ উত্তরাধিকারী এবং আলী নওয়াজ খাঁ নতুন উৎকেন্দ্রিক বুর্জোয়া। এই দুটি পরিবারের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিরোধই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে 'নাম না জানা ভোর' (১৯৬২), 'নীল যমুনা' (১৯৬৪) এবং 'শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬৭)।"

সৈয়দ শামসুল হক

(জন্ম ১৯৩৫)

"সৈয়দ শামসুল হক গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, নাটক লিখেছেন এবং কবিতা লিখেছেন। তিনি অত্যন্ত সজাগ লেখক। মূলত সাহিত্যকর্মকে তিনি সর্বমুহূর্তের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কবিতা রচনায় যেমন তিনি বিভিন্ন ভঙ্গির পরীক্ষা করেছেন, গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা আমরা লক্ষ করি। নরনারীর যৌনতা, মনস্তাত্বিক জটিলতা এবং বিকার তার উপন্যাস ও গল্পের বিষয়বস্তু। তিনি মুক্তিযুদ্ধের উপর কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশের যে কয়জন শিল্পী সফলভাবে শিল্পের উপকরণ নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক প্রধান। তাঁর সব উপন্যাসই মনোবিকলন, সহজাত প্রবৃত্তি, অস্বাভাবিক মানসিক জটিলতা নিয়ে রচিত। দ্বৈত ভালবাসা এবং সন্তান কামনার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর 'দেয়ালের দেশ' (১৯৫৯)। সন্তান কামনায় অধীর নারী তাহমিনা স্বামীকে ফেলে পূর্বপ্রণয়ী ফারুকের সঙ্গে চলে যায়। সন্তান লাভের পরই তাহমিনা ফিরে আসে স্বামী আবিদের কাছে। আবিদ এবং ফারুক দুইজনকেই সে ভালবাসে। এই দ্বৈত ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। তাঁর 'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯) নারী হৃদয়ের বিচিত্র গতিবিধির রূপায়ণ। নাসিমা স্বামীকে সরল মনে বলেছে সে একজনকে ভালবাসে। চাপা অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ স্বামী নাসিমাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয়।নাসিমার সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়। নাসিমার হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। 'অনুপম দিন (১৯৬২) রচিত হয়েছে অবচেতন দ্বৈত ভালবাসার বিশ্লেষণ নিয়ে। রাজনীতি, প্রেম এবং শিল্পীর ব্যর্থতা নিয়ে রচিত হয়েছে

www.icsbook.info

'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪)। সৈয়দ শামসুল হকের চরিত্রগুলো অন্তর্দ্বন্দ্বে সুতীব্র। তাঁর ভাষা সাবলীল এবং বেগবান। তিনি তাঁর 'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৩) উপন্যাস যৌনতার বিকার এবং অভিরুচির মধ্যে যুবক-যুবতীদের কার্যক্রমকে নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর কয়েকটি গল্প গ্রন্থের নাম 'আনন্দের মৃত্যু' (১৯৬৭), 'তাস' (১৯৫৪), 'রক্তগোলাপ' (১৯৬৪), 'শীত বিকেল' (১৯৫৯)।"

রাবেয়া খাতুন

(জন্ম ১৯৩৫)

ঢাকা শহরে যাদের আদি বসতি তাদের ইতিহাস, জীবনযাত্রা এবং পেশাকে ভিত্তি করে রাবেয়া খাতুন কয়েকটি সফলকাম উপন্যাস লিখেছেন। 'মধুমতি' (১৯৬৫) তাঁতীদের জীবনধারা নিয়ে লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'সাহেব বাজার' (১৯৬৯) এবং 'বায়ান্ন গলির এক গলি' (১৯৮৪) পুরোনো ঢাকার আকর্ষণীয় আলেখ্য। সামাজিক জীবনে সংঘর্ষ এবং শান্তি, ইচ্ছা এবং অবিবেচনা, আকর্ষণ এবং বিরাগ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের বিবেচ্য বিষয়। তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাসের নাম 'অনন্ত অন্বেষা' (১৯৬৭), 'মন এক শ্বেত কপোতী' (১৯৬৭), 'রাজাবাগ শালিমারবাগ' (১৯৬৯), 'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪) 'অনেক জনের একজন (১৯৭৫), 'জীবনের আরেক নাম' (১৯৭৬), 'মোহর আলী', 'হানিফের ঘোড়া।' তাঁর সাবপ্রতিক উপন্যাস 'পাখী সব করে রব' (১৯৮৭)। রাবেয়া খাতুন ছোটগল্প রচনায়ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

শওকত আলী

(জন্ম ১৯৩৬)

দীর্ঘদিন ধরে উপন্যাস লিখে চলেছেন শওকত আলী। ব্যক্তিহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে যেমন তিনি পারঙ্গম, তেমনি সমাজ-বাস্তবতার নানান আবর্তসমূহকেও গভীরভাবে পরখ করতে সদা-আগ্রহী। একই সঙ্গে তিনি হৃদয়-সচেতন সমাজ-সচেতন ও ইতিহাস-সচেতন ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩) ব্যক্তি হৃদয়ের নিভৃত আলাপচারিতায় মুখর। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে শহর থেকে গ্রামে অথবা অজানা গন্তব্যে পলায়ন পর মানুষের দুর্বিষহ জীবন অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত হয়েছে 'যাত্রা' (১৯৭৬) উপন্যাসে। প্রেম, রাজনীতি ও প্রখর সমাজবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর ট্রিলজী 'দক্ষিণায়নের দিন' (১৯৮৫), 'কুলায় কালস্রোত' ও 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' (১৯৮৬)। সমকালীন সামাজিক জীবনের পাশাপাশি আমাদের অতীত জীবনকেও তাঁর বহুমুখী ঘাত-সংঘাতসহ উপন্যাসের পটে উপস্থাপন প্রয়াসে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ইতিহাসের দিকে। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪) তাঁর সেই প্রয়াসেরই একটি পরিপক্ক ফসল। একেবারে মাটির কাছাকাছি অবস্থিত গণ-মানুষের জীবনচরিতকে তার হারিয়ে যাওয়া আনন্দ-বেদনা, বঞ্চনা, পীড়ন, ক্ষোভ ও দ্রোহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শওকত আলী এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। অতীতের গর্ভে বিলীয়মান জীবনের উপস্থাপনকে যথাযোগ্য করবার জন্য শওকত আলী এই

www.icsbook.info

উপন্যাসের ভাষারীতিতে এনেছেন বৈচিত্র্য। সংস্কৃতবহুল ও সমাসবদ্ধ অপ্রচলিত শব্দে শাসিত হয়েছে এ উপন্যাসের ভাষা। একটি সুনির্দিষ্ট কাল পরিপ্রেক্ষিতকে স্পষ্টতর, বাস্তবানুগ ও জীবননিষ্ঠ করে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস যথেষ্ট ফলবতী হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে চমৎকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও ইতিহাস-আশ্রিত জীবনের চেয়ে সমকালের জীবনই যে শওকত আলীর ঔপন্যাসিক সত্তাকে অধিক আলোড়িত করে– 'সম্বল' (১৯৮৬), 'ওয়ারিশ' (১৯৮৯), উত্তরের খেপ' (১৯৯১) ইত্যাদি উপন্যাসে রয়েছে তারই স্বাক্ষর।

রিজিয়া রহমান

(জন্ম ১৯৩৯)

রিজিয়া রহমান কাহিনী নির্মাণে অত্যন্ত সুপটু। বিবিধ বিষয় অবলম্বন করে তিনি কাহিনীর ক্ষেত্রে নতুন উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় এনেছেন। চা বাগানের কুলিদের নিয়ে তাঁর উপন্যাস আছে, পেশোওয়ারের রুক্ষ জীবনযাপন নিয়ে উপন্যাস আছে এবং দেহপসারিণীদের নিয়ে তাঁর উপন্যাস আছে। এ সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে আমরা লেখিকার একটি বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করি; তা হচ্ছে মানব জীবনকে বিভিন্ন পটভূমিতে আবিষ্কার করা। তাঁর প্রধান প্রধান উপন্যাস হচ্ছে 'ঘর ভাঙা ঘর' (১৯৭৪), 'উত্তর পুরুষ' (১৯৭৭), 'রক্তের অক্ষরে' (১৯৭৮), 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮), 'শিলায় শিলায় আগুন' (১৯৭৯), 'অলিখিত উপাখ্যান' (১৯৮০), 'সূর্য সবুজ রক্ত' (১৯৮০), 'ধবল জ্যোৎস্না' (১৮৮৩), 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪), 'প্রেম আমার প্রেম' (১৯৮৫)। গল্পগ্রন্থ হচ্ছে 'অগ্নি স্বাক্ষর' (১৯৭৪)।

আহমদ ছফা

(জন্ম ১৯৪৩)

ব্যক্তি জীবনের অন্তঃস্থ আবেগ-উদ্দীপনা-বেদনা-বিষাদ এবং তারই পাশাপাশি আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের নানান আলোড়নকে উপজীব্য করে দীর্ঘদিন ধরে আহমদ ছফা খানিকটা ব্যতিক্রমী ধারার উপন্যাস লিখে চলেছেন। তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। এর মধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তিনটি পূর্ণ দশক। এই বিস্তৃত সময় সীমায় শুধুমাত্র উপন্যাস লেখার মধ্যেই তিনি তাঁর সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রাখেননি। উপন্যাস ছেড়ে গল্প লিখেছেন। নিমগ্ন হয়েছেন কবিতার সাধনায়। একাধারে গবেষণামূলক ও সৃজনশীল প্রবন্ধের পসরা নিয়ে বাঙালি মুসলমানের মন ও মননের অনেক মরচে ধরা অর্গল খুলবার দুঃসাহসী প্রত্যয়ে সম্মুখে এগিয়েছেন। অনুবাদ নিয়ে মেতে উঠেছেন কিছুদিন। এবং একসময় সবকিছুকে পাশে সরিয়ে রেখে উপন্যাস নিয়ে মেতে উঠেছেন আবার। ফলে ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৫ এই উনত্রিশ বছরে অনেক কিছু করার পাশাপাশি উপন্যাস লিখেছেন ছয়টি। প্রথম উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' প্রকাশের আট বছর পরে বেরিয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ওঙ্কার'। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে পত্রিকার পাতায় এসেছে তৃতীয় উপন্যাস 'অলাতচক্র'। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি বাজারে এসেছে ১৯৯২ সালে। তবে পরবর্তী সময়ে

www.icsbook.info

লেখা 'একজন আলী কেনাজের উত্থান পতন' ও 'মরণবিলাস' উপন্যাস' দুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে আগেই–১৯৮৯ সালে। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিব হয়েছে তাঁর-সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'গাভী বিত্তান্ত'।'

প্রায় চারটি দশককে ব্যাপ্ত সময়কালকে ছুঁয়ে আহমদ ছফার ছয়টি উপন্যাস প্রকাশিত হলেও বিষয় ও বক্তব্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে একটি গাঢ় পরম্পরা লক্ষ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা হলেও এই ছয়টি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাঙ্গা-গড়া ও অবক্ষয়ের এক অবিচ্ছিন্ন পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন তিনি। জাতীয় ইতিহাসের যে পরিচয় নিয়ে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হয়েছে তাঁর একটি উপন্যাস, অপর উপন্যাস শুরু হয়েছে তার অব্যবহিত পরের অধ্যায়কে অবলম্বন করে। ফলে আহমদ ছফার প্রতিটি উপন্যাস স্বাদে ও মেজাজে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও বিষয়ের ক্রমিক বিন্যাসের এক অবিভাজ্য সম্পর্কসূত্রে তা গ্রথিত। এদিক থেকে বিচার করলে আহমদ ছফাকে দেখা যায় আমাদের জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ও উত্থান-পতনের একজন 'ক্রনিক্লার' (ChroniCler)-এর ভূমিকায় নিষ্ঠাবান থাকতে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
(জন্ম ১৯৪৩)

সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম শক্তিমান কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই।' '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালাকে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে এবং চিত্রময়

বর্ণনায় চমৎকারভাবে তিনি এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিদ্রোহ আর বিক্ষোভে মুখর অগণিত জনতার সম্মিলিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠের গর্জন সমুদ্র-কল্লোলের মতই এখানে ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে। আয়ুব শাহীর দীর্ঘ শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে যে দুর্বার গণ-আন্দোলন জেগে উঠেছিল ঢাকার বুকে, এবং ছাত্রসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল নিভৃত চরাঞ্চল পর্যন্ত; তাঁর গতি-প্রকৃতিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন ঔপন্যাসিক। পুরনো ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় এ আন্দোলন কিভাবে দানা বেঁধেছিল, কারা তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, আবার কারা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল: নিপুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তা এ উপন্যাসে মেলে ধরেছেন। অজস্র অলি-গলি ছড়িয়ে প্রশস্ত রাজপথে সেই আন্দোলন কিভাবে উদ্দামতা ছড়িয়েছিল এবং শরীক করে নিয়েছিল সর্বস্তরের মানুষকে; ধীর লয়ে তার চমৎকার 'ডিটেল'ও নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। ফলে উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন মহাকাব্যের রণহুংকার অবিরল স্বনিত হয়, তেমনি একের পর এক উন্মোচিত দৃশ্য পরম্পরা পাঠকের মানসদৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরে এক চলচ্চিত্রিক বিন্যাস। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পাত্র-পাত্রীর বিচিত্র মন-মানসিকতাকে মেলে ধরবার জন্য ঔপন্যাসিক মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্ম ও জরুরী তাগাদাটিও উপেক্ষা করেননি, এবং নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন সেখানেও।

www.icsbook.info

সেলিনা হোসেন

(জন্ম ১৯৪৭)

বিচিত্র বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন সেলিনা হোসেন। সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ বাংলা থেকে খরাপীড়িত উত্তরবঙ্গের বিপরীতধর্মী পরিবেশ প্রতিবেশ ও জনজীবনের সংগ্রামী আলেখ্য তাঁর উপন্যাসের আখ্যানকে সজীব ও গতিশীল করেছে। নাচোলের তেভাগা আন্দোলন, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে আলোড়িত করেছে। একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ বেয়ে বাঙালি জাতি তার যে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচল থেকেছে, গভীর অভিনিবেশ ও দরদ সহকারে তারই নানান ঘাত-সংঘাত, গৌরব ও গ্লানির পরিচয় সেলিনা হোসেন মেলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। শ্রেণী-শোষনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার। তাই একদিকে শ্রেণীসংগ্রামের উদ্দীপনা আরেকদিকে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন বুকে নিয়ে তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা জীবন কাটায় এবং অপেক্ষা করে একটা চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য। নদী ও সমুদ্র তাঁর উপন্যাসে কখনো মিষ্টি মূর্ছনা ছড়ায়, কখনো প্রশান্তির ছায়া বিলায়, আবার কখনো বা বিপুল জলরাশির উচ্ছ্বাস নিয়ে মৃত্যুমুখী করে তোলে অগণিত জীবনকে। কখনো আবার জলের অভাবে শুকিয়ে যাওয়া মাঠ-প্রস্তর ও নদী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাহাকার ছড়ায়। ফলে জীবন সংগ্রামের স্বরূপ তাঁর উপন্যাসে হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। বর্তমানের জীবন প্রবাহকে যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তেমনি আবার অতীতের জীবন স্পন্দনকেও তার কাল পরিপ্রেক্ষিতসহ অনুভব করবার চেষ্টা করেন কান পেতে। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরি[illegible] সংগ্রামী ও সংবেদনশীল। তাঁর বর্ণনার ভাষা কোথাও ঋজু আবার কোথাও [illegible] কাব্যিক। সংলাপের ভাষা হিসেবে অনেকক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করে[illegible]ক উপভাষাকে। বিষয় ও ভাষার পাশাপাশি উপন্যাসের আঙ্গিকেও তিনি বৈচিত্র্য সাধনের প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯), 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২), হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬), 'মগ্ন চৈতন্যে শিষ' (১৯৭৯), 'যাপিত জীবন' (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩) 'চাঁদ বেনে' (১৯৮৪), 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬), 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' (১৯৮৭)।

হুমায়ূন আহমেদ

(জন্ম ১৯৪৮)

এক মায়াময়, মনোহর ও স্নিগ্ধ লেখনী-শক্তির অধিকারী হুমায়ূন আহমেদ। হৃদয় দিয়ে তিনি লেখেন। তাই তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের জন্য যেমন তাঁর আপন অন্তরের ভালবা[illegible] উপচে পড়ে, তেমনি সেই চরিত্রগুলোও অতি-সহজেই হয়ে পড়ে পাঠকের আত্মীয়। হুমায়ূন আহমেদের অধিকাংশ উপন্যাসই শেষ হয় এক অতৃপ্ত বেদনার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, তবে আনন্দের আবেগময় মুহূর্ত সৃষ্টিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। ঘটনা ও বর্ণনার নিবিড় বুননে তিনি ভরাট করে রাখেন উপন্যাসের পুরো প[illegible]ধি। চরিত্র ও কাহিনীর মেলবন্ধনে তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য। তবে তাঁর উপন্যাসে অধিকাংশ সময়েই কোন বক্তব্য থাকে না এবং দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কোন ছায়া পড়ে না। অতি সাধারণ ও ছোট খাট

www.icsbook.info

ঘটনাও তাঁর উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্বময় হয়ে উঠে এবং আখ্যানকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি বেশ কৌশলের সঙ্গে এইসব ঘটনার গতি পরিবর্তন করেন। নাটকীয়তার চমক দিয়েও তিনি অনেকসময় পাঠককে মুগ্ধ করেন। মূলত মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, সংকট-বেদনা এবং তরুণ-তরুণীর অস্ফুট কিংবা প্রস্ফুট প্রেমকে উপজীব্য করেই হুমায়ুন তাঁর উপন্যাসের পশরা সাজান। জীবনের বহুমাত্রিকতাকে ছুঁয়ে দেখবার আগ্রহও অবশ্য তাঁর কর্ম নয়। তাই কখনো তাঁকে দেখা যায় নর-নারীর জটিল মনস্বত্ত্ব নিয়ে খেলা করতে, শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে হাওড়-বাওড় অধ্যুষিত গ্রামীণ পটভূমিতেও স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে, অতুল্য দরদী এবং তারই পাশাপাশি জটিল ও নিষ্ঠুর ধরনের চরিত্র সৃজনে মগ্ন হতে, আবার কখনো বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীকে উপন্যাসের উপজীব্য করতে। মানুষের একাকীত্বের বেদনাকে অত্যন্ত কোমল ও হৃদয়গ্রাহী করে তিনি তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আবার এরই পাশাপাশি যে মানুষ নিজের একাকীত্বকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে স্বজন, সমাজ ও সমগ্র দেশের সঙ্গে অতি সহজেই নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে, ভালবাসার বাঁধনে বাঁধতে চায় সকলকে; সেই ব্যতিক্রমধর্মী এবং আদর্শবাদী মানুষগুলোও আশ্চর্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠে তার লেখনীতে। তবে হুমায়ূন আহমেদ সমাজ রাজনীতি এবং জীবনের বহির্বাস্তব নিয়ে যতটা ভাবেন, তার চেয়ে অধিক আগ্রহ বোধ করেন ব্যক্তি হৃদয়ের রহস্য উন্মোচনে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও তাঁর উপন্যাসে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ ক'টি উপন্যাস লিখেছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। এই উপন্যাসগুলো পাঠকের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য ও মহৎবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট করে। হুমায়ুন আহমেদের কথকতার শৈলী অনন্য এবং চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি অসাধারণ কুশলী। মনোগ্রাহী এবং অব্যর্থ সংলাপ রচনাতেও তিনি পারদর্শী। তাঁর বর্ণনার ভাষা আটপৌরে হলেও আকর্ষণীয়। তবে অসংখ্য মনোরঞ্জক উপন্যাস লিখলেও বৃহৎ কিংবা মহৎ কোন সৃষ্টি আজও তিনি আমাদের উপহার দিতে পারেননি।

ইতোমধ্যে তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা শতকের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো ঃ 'নন্দিত নরকে' (১৯৭২), 'শঙ্খনীল কারাগার' (১৯৭৩), 'শ্যামল ছায়া' (১৯৭৩), 'তোমাদের জন্য ভালবাসা', (১৯৭৪), 'অচিনপুর' (১৯৭৪), 'অন্যদিন' (১৯৭৪), 'ফেরা' (১৯৮৪), 'সবাই গেছে বনে' (১৯৮৪) 'তোমাকে' (১৯৮৪), 'একা একা' (১৯৮৫), 'অমানুষ' (১৯৮৫), 'আমার আছে জল' (১৯৮৫), 'সূর্যের দিন' (১৯৮৫),' 'প্রথম প্রহর (১৯৮৫); 'দেবী' (১৯৮৫), 'এই সব দিনরাত্রি' (১৯৮৬), 'আগুনের পরশমণি' (১৯৮৬), 'অরণ্য (১৯৮৭), 'নক্ষত্রের রাত' ১৯৮৭) 'দূরে কোথায়' (১৯৮৭), 'আকাশ জোড়া মেঘ' (১৯৮৮), 'অপরাহ্ন (১৯৮৮), 'বাসর' (১৯৮৯), দ্বৈরথ' (১৯৮৯), 'রজনী' (১৯৮৯), 'অন্ধকারের গান' (১৯৮৯), 'সমুদ্র বিলাস' (১৯৯১), 'জনম জনম' (১৯৯০), ময়ুরাক্ষী (১৯৯০) 'গৌরীপুর জংশন' (১৯৯০), 'অয়োময়' (১৯৯০), 'কোথাও কেউ নেই' (১৯৯০), 'দারুচিনি দ্বীপ' (১৯৯১), 'পাখি আমার একলা পাখি' (১৯৯২), 'মিসির আলীর অমীমাংসিত রহস্য' (১৯৯২), 'হিমু' (১৯৯৩), 'জলজোছনা' (১৯৯৩), 'শ্রাবণ মেঘের দিন' (১৯৯৪), 'পেন্সিলে আঁকা পরী।' (১৯৯৫)।

www.icsbook.info

ইমদাদুল হক মিলন
(জন্ম ১৯৫৫)

সাম্প্রতিক সময়ের একজন বাজারসফল ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। তরুণ প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাদের তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। তবে কাহিনীর নিবিড় বুনন, কল্পনার ব্যাপ্তি এবং চরিত্রের নিপুণ চিত্রায়ণে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দক্ষতা তিনি আজও দেখাতে পারেননি। মূলত তরুণ হৃদয়ের প্রেম উপলব্ধিই তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। শোষণ, পীড়ন, সন্ত্রাস ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত সামাজিক ব্যবস্থার কিছু চিত্রও তাঁর উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে প্রগাঢ় অভিনিবেশের অভাবে কোথাও তা পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ে পরিস্ফুটিত হতে পারেনি। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের নাম হলো- 'দুঃখ কষ্ট' (১৯৮২), 'ও রাধা ও কৃষ্ণ' (১৯৮২), 'কালো ঘোড়া' (১৯৮২), 'এক দেশ' ১৯৮৩), 'সুন্দরী কমলা' (১৯৮৫), 'নদী উপাখ্যান' (১৯৮৫), 'ভূমিপুত্র' (১৯৮৫),'পরবাস' (১৯৮৭), 'সারাবেলা' (১৯৮৮), 'রূপনগর' (১৯৮৮), 'পরাধীনতা' (১৯৮৮), 'বনমানুষ' (১৯৮৯), 'পরকীয়া' (১৯৮৯), 'সখা তুমি সখী তুমি', (১৯৮৯)', 'আজকের দেবদাস' (১৯৮৯), "ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস (১৯৮৯), 'ভালবাসা ভাল নয়' (১৯৮৯) 'কোন কাননের ফুল' (১৯৯০), যাবজ্জীবন (১৯৯০), অদ্বিতীয়া (১৯৯১), 'সৃদূবতম (১৯৯১) 'মায়াবিনী' (১৯৯১), 'প্রিয়দর্শিনী, (১৯৯১), 'বিরহী' (১৯৯১)।

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে বিভাগোত্তর কাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত যারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে আরও যাঁদের নাম ও উপন্যাসের উল্লেখ করা প্রয়োজন— তাঁরা হলেনঃ

আবুল মনসুর আহমেদ ঃ 'জীবনক্ষুধা' (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)।

আবুল ফজল ঃ 'জীবন পথের যাত্রী' (১৯৪৮), 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৯৫৭)।

আকবর হোসেনঃ 'কি পাইনি' (১৯৫১),'মোহমুক্তি'(১৯৫২), অবাঞ্ছিত' (১৯৬০)।

আতাহার আহমদ ঃ উন্মোচন (১৯৫৫), পিপাসা (১৯৫৮) 'সূর্যের নীচে' (১৯৫৮)

হুমায়ুন কাদির 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫)।

আশরাফুজ্জামান ঃ 'মনজিল', শায়ের নামা' (১৯৫৮)।

কাজী আবুল হোসেন ঃ 'উমাপদ যশোদা সংবাদ' (১৯৫৫), নারাঙ্গী বনের ঝড় (১৯৫২), 'বনজ্যোৎস্না' (১৯৫৮)।

ইন্দু সাহা ঃ'কিষাণ বউ' (১৯৬৮), গঙ্গাপারের খেয়া (১৯৫৮)।

তাসাদ্দুক হোসেন ঃ 'মহুয়ার দেশে' (১৯৬১), ইস্পাত প্রত্যয় (১৯৭৯)।

দৌলতুন্নেছা বেগম ঃ 'বধূর লাগিয়া (১৯৬২), পথের পরশ (১৯৬৪)।

মিরজা আবদুল হাই ঃ 'যমনিস সংবাদ', 'তোমার পতাকা', 'ফিরে চলো।'

মীজানুর রহমান শেলী ঃ 'পাতালে শর্বরী' (১৯৬৫), ফেরারী প্রহর (১৯৭২)।

শামসুল হকঃ 'নয়ছয়' (১৯৫৯), 'চম্পা-চামেলী'(১৯৬১), 'নদীর নাম তিস্তা' (১৯৬৬)।

শহীদ আখন্দ ঃ 'পান্না হলো সবুজ' (১৯৬৪), 'পাখীর গান বনের ছায়া' (১৯৭০), 'দুদন্ড শান্তি' (১৯৮৩), 'একদা এক বসন্তে' (১৯৮৪), 'নরাধম' (১৯৮৪), 'এইখানে কখনো' (১৯৮৫)।

রাজিয়া খান ঃ বটতলার উপন্যাস (১৯৫৮);'অনুকল্প' (১৯৫৯), 'প্রতিচিত্র' (১৯৭৬), 'হে মহাজীবন' (১৯৮৩) 'দ্রৌপদী' (১৯৮৯)।

www.icsbook.info

রাজিয়া মজিদ : 'তমসা বলয়' (১৯৬৬), 'দিনান্তের স্বপ্ন' (১৯৬৭). 'নক্ষত্রের পতন' (১৯৮২), 'অশঙ্কিনী সুদর্শনা' (১৯৮৪), 'দিনের আলো রাতের আঁধার (১৯৮৪), 'মেঘ জল তরঙ্গ' (১৯৮৫), 'দাঁড়িয়ে আছি একা' (১৯৮৭), 'সুন্দরতম' (১৯৮৮), জ্যোৎস্নায় শূন্য মাঠ।" (১৯৮৯)।

রশীদ হায়দার : 'খাঁচায়' (১৯৭৫), 'অন্ধ কথামালা' (১৯৮২), 'নষ্ট জ্যোৎস্নায় এ কোন অরণ্য' (১৯৮২)।

হাসনাত আবদুল হাই : 'আমার আততায়ী (১৯৮০) 'যুবরাজ' (১৯৮০), 'তিমি' (১৯৮১), 'মহাপুরুষ' (১৯৮২), সুলতান' (১৯৯১)।

দিলারা হাশেম : 'ঘর মন জানালা' (১৯৬৫), 'স্তব্ধতার কানে কানে' (১৯৭৭), 'একদা এবং অনন্ত (১৯৭৬), 'আমলকীর মৌ' (১৯৭৮) 'মিউর‍্যাল।'

বদরুননেসা আবদুল্লা : 'প্রত্যাবর্তন' (১৯৬০), 'কাজল দীঘির উপকথা' (১৯৬২), 'নূপুর নিক্কন' (১৯৬৯), 'সমুদ্রের ঢেউ' (১৯৭৩), নিরুত্তর (১৯৭৪), 'মাথুরের পরে' (১৯৮৪)।

বশীর আল হেলাল : 'কালো ইলিশ' (১৯৭৯), ঘৃতকুমারী (১৯৮৪), 'শেষ পানপাত্র' (১৯৮৬), নূরজাহানদের মধুমাস (১৯৮৮)।

আবুল হাসানাত : 'বিহঙ্গ মন' (১৯৭০), 'দীপিত অরণ্য' (১৯৭৬), 'না সুখ না দুখ' (১৯৭৮)

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : 'অচেনা' (১৯৭৫), সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (১৯৯০), 'ভয় ভালবাসার নির্বাসন' (১৯৮৮), রহেনা সুবাতাস (১৯৯১),

মাহমুদুল হক : যেখানে খঞ্জনা পাখি', 'অনুর পাঠশালা' (১৯৭৩), 'নিরাপদ তন্দ্রা' (১৯৭৪), 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬), 'খেলাঘর' (১৯৮৮), প্রতিদিন একটি রুমাল' (১৯৯৪)।

মর্তুজা বশীর : 'কাঁচের পাখির গান' (১৯৬৯) 'আলট্রামেরিন'

আমজাদ হোসেন : 'অবেলায় অসময়' (১৯৭৮), 'নিরক্ষর স্বর্গে' (১৯৭৮), 'অস্থির পাখিরা' (১৯৮৩), 'আগুন লাগা সন্ধ্যা' (১৯৮৮), মাধবী সংবাদ' (১৯৯০), 'কেউ কোনদিন' (১৯৯০), 'গোলাপী এখন ট্রেনে' (১৯৯১)।

হাজেরা নজরুল : 'উপক্রমণিকা' (১৯৮৬), 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' (১৯৯০), 'শরবিদ্ধ শিশির' (১৯৯০), 'নির্বাসিত নির্ঝর' (১৯৯১), 'বরফের ফুল' (১৯৯১)।

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন : 'বাতাসীর প্রেমকথা, 'দুঃস্বপ্নের জল জল পায়রা', টাকার গাছ', 'চর আতরজান', 'ঝর্ণা ঝরে রে' 'ফেরারী', 'যুগলবন্দী।'

রাহাত খান : 'অমল ধবল চাকরী' (১৯৮২), 'ছায়া দম্পতি' (১৯৮৪), 'হে শূন্যতা' (১৯৮৪), 'সংঘর্ষ' (১৯৮৪), 'শহর' (১৯৮৪), ' হে অনন্তের পাখি' (১৯৮৯)।

মঞ্জু সরকার : 'তমস' (১৮৮৪), 'নগ্ন আগন্তুক' (১৯৮৬), 'প্রতিমা উপাখ্যান' (১৯৯০)।

মঈনুল আহসান সাবের : 'এসব কিছুই না' (১৯৮৯), 'এক রাত' (১৯৯০), 'কোনো একদিন' (১৯৯০), 'কেউ জানে না' (১৯৯০), 'পরাজয়' (১৯৯০), 'অচেনা জায়গা' (১৯৯১), 'সতের বছর পর' (১৯৯১), 'এ জীবন' (১৯৯১), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৯১), 'অপরাজিতা' (১৯৯১)।

www.icsbook.info

ছোটগল্প

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্প অনেকাংশে পিছিয়ে আছে। বিভাগপূর্বকালে মুসলিম কথাসাহিত্যিকগণ ছোটগল্প রচনাতে মনোবিবেশ করেছেন উপন্যাসের অনেক কাল পরে। এর কারণ বিচিত্রমুখী- তবে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কারণই প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ। নগরমনস্কতার ঐতিহাসিক বোধের অনুপস্থিতিও এর অন্তরালে সক্রিয় ছিল নিঃসন্দেহে।

বিভাগ-পূর্ব কাল থেকে যাঁরা গল্পরচনায় মনোনিবেশ করেছেন এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যাঁদের সৃষ্টিতে বাংলাদেশের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্যাহ, আবুল মনসুর আহমদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মাহবুবুল আলম, মবিন উদ্দীন এবং শওকত ওসমান উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে দেখা দিল নানা পরিবর্তন। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা-কেন্দ্রিক যে দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল, তা স্থানান্তরিত হল ঢাকায়; বৃদ্ধি পেলো শিল্পাঞ্চল। জীবনের নানা জটিলতা এখানকার লেখকদের জীবন সচেতন করে তুললো। মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা দিল নাগরিকতার বিকাশ। স্বাধীন দেশে গড়ে উঠলো ধনিক, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণী। আন্তর্জাতিক-বোধে আমরা হয়ে উঠলাম বিশ্বপ্রসারী। নানা ধর্মমত, রাজনৈতিক মতবাদ, পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষ-অপকর্ষ, চীনের বিপ্লব লেখক-প্রতিভাকে বিচিত্র পথে আধুনিক নগরমনস্ক ও বুদ্ধিধর্মী করে তুললো। এই নতুন পরিমন্ডলে এখানকার সাহিত্যিক গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে এগিয়ে এলো জীবনের অনুভূতি, বাস্তবতা, রূঢ়তা, স্বপ্ন এবং প্রত্যাশাকে চিত্রায়িত করতে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাহিত্যিকদের মানসিকতার ক্রমবিকাশের অর্থ নাগরিকতার উদ্ভব; বুদ্ধিধর্মিতার প্রকাশ। এ কালের ছোট গল্পকারদের সম্পর্কেও একথা যথাযথ প্রযোজ্য। বস্তুত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করেই আমাদের প্রতিভার যাত্রা শুরু।

শওকত ওসমান সমাজ-সচেতন ছোটগল্পকার। তাঁর সমাজ-সচেতনতা প্রথম পর্বে আন্তরিকতার স্পর্শে সরল, সহজ ও প্রত্যক্ষ ছিল। তাঁর 'রাতা' ও 'আব্বাস' এর দৃষ্টান্ত। তবে নগরমনস্কতার প্রভাবে গল্পগুলি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণধর্মী হয়েছে। পরবর্তীকালে শওকত ওসমান বুদ্ধিধর্মী হয়ে ওঠেন। ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে গল্পগুলিতে লেখকের বিবর্তনশীল মনের পরিচয় আছে। বর্তমানে শওকত ওসমান স্কেচধর্মী। দেশ কালের প্রভাবে শওকত ওসমানের বোধ ও বোধি লালিত ও বিকশিত। শ্রেণীদ্বন্দ্বের যন্ত্রণা, বৈষম্য ও সম্ভাব্য সমাধানের অস্পষ্ট প্রবণতা তাঁকে যেমন উৎকেন্দ্রিক করেছে, তেমনি করেছে নিরীক্ষাবাদী। শওকত ওসমানের ছোটগল্পগ্রন্থ- 'পিঁজরাপোল'

www.icsbook.info

(১৯৫০) 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫২), 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫৩), 'প্রস্তর ফলক' (১৯৬৪), 'নেত্র-পথ' (১৯৬৮), 'উপলক্ষ্য (১৯৬৫), 'উভশৃঙ্গ ' (১৯৮৬), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (১৯৭৫), 'মনিব ও তাহার কুকুর' (১৯৮৬), 'বিগত কালের গল্প' (১৯৮৬)।

মবিনউদ্দীন আহমদ আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় ও স্বাতন্ত্র্যে উচ্চকিত নন। বর্ণনা-ধর্মিতা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। মুসলিম জীবনের ক্ষীয়মান মূল্যবোধগুলিকে চিত্রায়িত করতে তিনি উৎসাহী। তাঁর 'হোসেন বাড়ির বৌ' ও 'মুসলিম আহাদের রূপালী কাহিনী' (১৯৪৯) এর দৃষ্টান্ত। মবিন উদ্দীনের রচনারীতি গতানুগতিক। তাঁর 'ভাঙ্গীবন্দর' গল্পগ্রন্থ কোন ক্রম বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে না।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের রচনা অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। প্রধানত গ্রামীণ পটভূমি তাঁর গল্পের উপজীব্য। চরিত্র সৃষ্টিতে বাস্তবতাবোধ ও রোমান্টিকতার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির প্রভাব গল্পগুলিকে মাধুর্য দান করেছে। আধুনিক জীবন সমস্যার প্রতি অনীহা ও লঘু বিশ্লেষণ পাঠক সমাজের কাছে তাঁকে আঞ্চলিক করেছে। শামসুদ্দীন পরবর্তীকালে বক্তব্যধর্মী। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অনেক দিনের আশা' (১৯৫২), 'দুই হৃদয়ের তীর' (১৯৫৫) 'পথ জানা নেই' (১৯৫৩) এবং ' ঢেউ' (১৯৫৩)।

শামসুদ্দীন গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে যেখানে রোমান্টিক কাহিনী বিস্তারে উৎসাহী, সেখানে কাজী আফসার উদ্দীন জীবন সমস্যার বাস্তবতাবোধে স্বতন্ত্র। তবে একথাও সত্য যে তাঁর উপস্থাপনরীতি গতানুগতিক; কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় সক্ষম নয়। কাজী আফসার উদ্দীন বিষয়-সর্বস্ব; আঙ্গিক সচেতন নন। কথন অতিরেক দোষ তাঁর রচনায়. দৃষ্ট হয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'জ্বালাও আলো' (১৯৫৪) ও 'নতুন প্রেম'(১৯৫৪)।

শাহেদ আলী গ্রাম-বাংলার স্বতন্ত্র পটভূমি সৃষ্টিতে ও বিষয়ের প্রতি treatment- এর আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকেই ছোটগল্পের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ফলে গল্পগুলি সরল, প্রত্যক্ষ ও অকৃত্রিম। শাহেদ আলী মানবজীবনের মন্ময় দিকটিকে প্রকাশ করতে উৎসাহী। অনেক সময় ভাষার কবিত্ব গল্পরীতিকে দুর্বল করেছে। শাহেদ আলীর ভাষা ও রচনাভঙ্গী শৈল্পিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'জিবরাইলের ডানা' (১৯৫৩) ও 'একই সমতলে' (১৯৬৩)।

এ পর্যায়ে মিন্নত আলী (মফস্বল সংবাদ, ১৯৫৮; 'আমার প্রথম প্রেম' ১৯৫৯), নূরুন্নাহার (বোবা মাটি, ১৩৫৮), আবদুল হাই মাশরেকী (কুলসুম, ১৯৫৪), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (মুস্কিল আসান, ১৯৪৮), এবং ইসহাক চাখারী (মিষ্টিমুখ, ১৯৫৭; অদৃষ্টের ফের, ১৯৫৭), রচনারীতি, বিষয় বিন্যাস ও উপস্থাপন পদ্ধতির জন্য উল্লেখযোগ্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মমনশীল ছোটগল্পকার। জীবনের বহুমাত্রিকতাকে ছুঁয়ে গেছে তাঁর গল্প। সমাজ-বাস্তবতার করুণ অসঙ্গতিগুলোকে যেমন তিনি দেখেছেন খোলা চোখে, ব্যক্তির নিভৃত অন্তর্লোককেও তেমনি উন্মোচন করেছেন নিপুণ দক্ষতায়। নিরাবলম্ব মানুষের প্রতি নিবিড় মমতা তাঁর গল্পগুলোকে তীব্র আবেদনময় করে তুলেছে। সঞ্জয় ভট্রাচার্য সম্পাদিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্প 'নয়নচারা'। পরবর্তীতে ঐ নাম নিয়েই প্রকাশিত হয় তাঁর

www.icsbook.info

গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৪৪)। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর' প্রকাশিত হয় এর একুশ বছর পর-১৯৬৫ সালে। আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধের সমন্বয়ে গড়া তাঁর গল্পগুলি আমাদের ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে তাঁর অধিকাংশ গল্পই গড়ে উঠেছে গ্রামীণ পটভূমিতে। গ্রামবাংলার নিসর্গ তাঁর গল্পে ঐশ্বর্যের ছটা ছড়িয়েছে। মনব জীবনের নৈসঙ্গ, বিষাদ ও মৃত্যু চেতনাকে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি দেখেছেন অমোচনীয় করেরেখা রূপে। তবে আনন্দ ও আশাবাদের উজ্জ্বল দীপ্তি থেকেও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেননি। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবনকে সাদা অথবা কালো রঙের একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন রঙধনুর বর্ণচ্ছটা। গল্প রচনার ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে তিনি পরিহার করেননি কোথাও। তবে বাস্তব জীবন ভিত্তিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি শুধু একজন নিপুণ কথক বা চলমান জীবন প্রবাহের নিরাসক্ত দর্শকমাত্র নন। জীবনের গভীর উপলব্ধিজাত দর্শনের দ্যুতি দিয়েও তিনি দীপ্তিশালী করে তুলেছেন তাঁর গল্পকে।

সরদার জয়েনউদ্দীনের গল্পের প্রধান উপজীব্য গ্রাম। সামাজিক জীবনের অসাম্য তাঁকে চিন্তান্বিত ও অসহিষ্ণু করেছে। তিনি মানবতাবাদী শিল্পী। গ্রামীণ গণজীবনের আশা-আকাঙক্ষা তাঁকে উল্লসিত করে; তাঁদের ব্যথা বেদনা তাঁকে যন্ত্রণাভারাক্রান্ত করে। সরদার জয়েনউদ্দীনের গদ্যরীতি সরল ও প্রত্যক্ষ। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'নয়ান ঢুলী, (১৯৫৯); 'বীরকণ্ঠীর বিয়ে' (১৯৬২) ও 'খরস্রোত' (১২৬২)।

আলাউদ্দিন আল আজাদ দেশ কাল ও সমাজসচেতন ছোটগল্পকার। শ্রেণীসংগ্রাম ও সংগ্রামের পরেই সাফল্য এই নীতিতে স্থির বিশ্বাসী আজাদকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর প্রথম পর্বের রচনাগুলিতে। এ পর্যায়ের গল্পগুলির বিষয়বস্তু অনেকক্ষেত্রে গ্রামীণ। আজাদের 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'উজান তরঙ্গে' এর দৃষ্টান্ত বিধৃত। সামাজিক কুসংস্কার ও শোষণের স্বরূপকেও আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনাভূক্ত করেছেন, আজাদের 'বৃষ্টি' একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। বাস্তববাদী জীবনভিত্তিক গল্পরচনার পটভূমি শহর। লেখকের মার্কসবাদী মানসিকতার পরিচয় এখানে সুস্পষ্ট। মার্কসবাদী লেখক হিসেবে তাঁর গল্পের মধ্যে শ্রেণী সংঘর্ষের নির্মম পরিণতি প্রকাশিত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আজাদ প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছেন। পুরবর্তী পর্যায়ে আজাদ ফ্রয়েডীয় রীতিতে বিশ্বাসী হয়েছেন। 'যখন সৈকত' গল্পগ্রন্থ এর দৃষ্টান্ত। বস্তুত, মার্কসবাদী বাস্তবতা এবং আজন্ম রোমান্টিকতা তাঁকে দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ করেছে, কিন্তু মূলত, আজাদ রোমান্টিক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনেকাংশে তাঁর কাছে রোমান্টিক সাম্যবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। এই দ্বন্দ্বের কার্যকারণ যেমন তাঁকে শিল্পসমৃদ্ধ করেছে, তেমনি তাঁকে বর্তমানে করেছে গভীর বিশ্বাস থেকে উৎকেন্দ্রিক। 'যখন সৈকত' আজাদের সাম্প্রতিক অস্থির, বিবর্ণ, ধোঁয়াটে মানসিকতাকে চিহ্নিত করে। আলাউদ্দিন আল আজাদ ভাষারীতিতে প্রত্যক্ষ অথচ কাব্যময়; ঋজু অথচ মৃন্ময়। আজাদ পূর্ব বাংলার ছোটগল্পের ইতিহাসে আত্ম-গৌরবে স্বয়ংসমৃদ্ধ। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', (১৯৫১), 'মৃগনাভি' (১৯৫৫), 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৮) 'উজান তরঙ্গে' (১৯৬২), এবং 'যখন সৈকত' (১৯৬৭)।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর ছোটগল্পের উপকরণ গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-নৈরাশ্য, কামনা-অপ্রাপ্তি, যন্ত্রণা-তৃপ্তি তাঁর গল্পের মধ্যে রূপাবয়ব পেয়েছে। পশ্চিমী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ অনেক গল্পের আবহ সৃষ্টি করেছে। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'সম্রাটের ছবি'(১৯৫৯), 'সুন্দর হে সুন্দর' (১৯৬০) ও 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫৯)।

সৈয়দ শামসুল হক রোমান্টিক ছোটগল্পকার। সমাজের গভীরের কোনও অভিজ্ঞতা নয়, আপাত মধুরতা বা তিক্ততায় তিনি সহজ ও নিরাপদ পদচারণা করেন। তাঁর

www.icsbook.info

ছোটগল্পে আন্তরিকতা ও সত্যভাষণ কম, চাতুর্য বেশি। সৈয়দ শামসুল হক রোমান্টিক দৃষ্টিতে নরনারীর হৃদয়বৈচিত্র বিশ্লেষণে অধিক আগ্রহী। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'তাস' (১৯৫৪), 'শীত বিকেল' (১৯৫৯), 'রক্তগোলপ' (১৯৬৪) ও 'আনন্দের মৃত্যু' (১৯৬৭)।

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর মননধর্মী শিল্পী। তিনি বুদ্ধিবাদী। সমাজসত্যের উপলব্ধিতে তিনি অনেকাংশে আলাউদ্দিন আল আজাদের সমগোত্রীয়। আজাদ যেখানে প্রত্যক্ষ ও উচ্চকণ্ঠ, বোরহান উদ্দীন সেখানে পরোক্ষ ও নির্লিপ্ত। তাঁর ছোটগল্পের ঘটনা ও চরিত্র নাগরিক মধ্যবিত্ত, উচ্চমধবিত্ত শ্রেণী থেকে গৃহীত। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অবিচ্ছিন্ন' (১৯৬৯), 'দূর দুরান্ত' (১৯৬৮) এবং 'বিশাল ক্রোধ' (১৯৬৯)।

জহির রায়হান মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। নাগরিক জীবনের ঘটনা ও সমস্যা তাঁর গল্পে অধিক স্থান পেয়েছে। জহির রায়হান সমাজ সচেতন বস্তুভিত্তিক রচনায় নিবিষ্ট। মানব মনের বিচিত্র স্তর উদ্‌ঘাটনে উৎসাহী। তবে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে যথাযথ নন। উপস্থাপনরীতিতে জহির রায়হান নিরীক্ষাধর্মী। অনাবশ্যক উৎকণ্ঠা ও অতি আকস্মিকতায় অনেক সময় গল্পরস ব্যাহত হয়েছে। গভীর মনোনিবেশ ও পরিচর্যার অভাব তাঁর গল্পে সহজেই লক্ষণীয়। শামসুল হকের মতই তিনি জীবনবোধের গভীরতার চেয়ে আপাত বিচার ও সহজ সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হয়ে আঙ্গিক ও রূপকল্প নির্মাণে যত্নবান। ভাষা ঋজু ও সাবলীল; স্থান বিশেষে কাব্যধর্মিতা লক্ষ করা যায়। শেষ দিকের গল্পগুলি শিল্পমানে উন্নত নয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫)।

সাম্প্রতিককালে যাঁরা নবতর রীতিবৈচিত্র্য, বক্তব্যের বিশ্বস্ততায় ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রশীদ হায়দার, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, অজিত নিয়োগী ও রিজিয়া রহমান।

হাসান আজিজুল হক উত্তর-বঙ্গের জীবনধারাকে অঙ্কন করতে উৎসাহী। উদ্বাস্তু জীবন নিয়েও তিনি গল্প রচনা করেছেন। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনচিত্রকে তিনি বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। রচনা রীতিতে তিনি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। 'সমুদ্রের স্বপ্ন ও শীতের অরণ্য' গ্রন্থে তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও প্রতীকধর্মী। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থের রচনারীতি মননধর্মী ও ইঙ্গিতাশ্রয়ী। মধুর গতিময়তা তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। 'শকুন' তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

নাজমুল আলম (জন্ম ১৯২৭) 'ফুলমতি' (১৯৭৮) নামক উপন্যাসের মাধ্যমে খ্যাতিলাভ করলেও মূলত গল্প লেখক হিসেবে তাঁর প্রভাব বেশি। ভাষার কারুকাজ এবং দীপ্তিতে এবং চরিত্র নির্মাণে, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিতে তিনি ইতিমধ্যেই সাহিত্যজগতে নিজে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'একটি অচল আনি' (১৯৬৬), 'উপস্থিত সুধীমণ্ডলী' (১৯৭৮), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৭৮), 'পাণ্ডুলিপি ও গয়নার বাক্স' (১৯৬৯)।

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন (জন্ম ১৯৩৪) বর্তমানে কবিতা, কিশোরদের রচনা, ছোটগল্প এবং উপন্যাস লিখছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালে হলেও অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপন্যাস ও গল্প রচনায় বিশিষ্টতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য (গল্পগ্রন্থ) হলো, 'নারিন্দা লেন' 'চিরকুট' 'নেপথ্য নাটক' 'ওম শান্তি'।

নুরুল ইসলাম খান (জন্ম ১৯৩৫) ঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম 'দক্ষিণ সমুদ্র থেকে', 'মায়াবন বিহারিণী', 'রাজধানীর ইতিকথা', 'মেহের জুলেখা', 'এতো আলো আকাশে,' 'প্রথম প্রহর', 'সাক্ষী নেই তবু,' 'পাতালে নৃমুণ্ডমালা', 'তিনজন' 'সূর্য নগরে বিদ্রোহ', 'গোলাপের নামে'।

www.icsbook.info

আবুল হাসানাত (জন্ম ১৯৩৬) ঃ তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'স্বর্গের সিঁড়ি', 'পরকিয়া' 'আমার বাবাই দায়ী', 'কবোষ্ণ', 'পা বাড়ালেই ফেরা', 'বাজ', 'বিহঙ্গমন', 'দীপিত অরণ্য' ও 'সুখ দুঃখ।'

আবদুস শাকুর (জন্ম ১৯৪১) ঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো 'ক্রাইসিস', 'উত্তর দক্ষিণ সংলাপ', 'এপিটাফ', 'ধস' এবং 'সরস গল্প'। তিনি ১৯৭০ সালে ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

আধুনিক গল্প লেখকদের মধ্যে রাহাত খানের নাম (জন্ম ১৯৪০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুনিশ্চিত শালীন জীবনধারায় দ্বন্দ্ব ও সংহারের কোলাহল তাঁর গল্পের মধ্যে রূপ পেয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম 'অনিশ্চিত লোকালয়' (১৯৭৩), 'অন্তহীন যাত্রা' (১৯৭৫), 'ভালমন্দের টাকা' (১৯৭৭)। শহীদ আখন্দ (জন্ম ১৯৩৫) আধুনিক নগর জীবনের বিভিন্ন অভিপ্রায়কে তাঁর গল্পের মধ্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্প গ্রন্থের নাম 'অনিবার্য বান্ধব' (১৯৭৯)। বর্তমানে এ কে এম শামসুজ্জামান গল্প লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'অন্য পৃথিবী'। হাসনাত আবদুল হাই পরীক্ষাধর্মী মনোরম কিছু গল্প লিখেছেন, তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'একা এবং একসঙ্গে' (১৯৭৭) এবং 'যখন বসন্ত' (১৯৭৮)।

সত্তরের দশকে গল্পলেখায় যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল কয়েকজনের নাম হচ্ছে, মঞ্জু সরকার, বারেক আবদুল্লাহ, সৈয়দ ইকবাল, আহমদ বশীর, বুলবুল চৌধুরী, ইমদাদুল হক মিলন।

সাম্প্রতিক সময়ের তিনজন শক্তিমান ও আলোচিত গল্পকার হলেন আবুবকর সিদ্দিক, আখতারুজ্জামানা ইলিয়াস এবং হুমায়ূন আহমেদ। সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, শ্রেণীবৈষম্য এবং নিঃস্বপ্রায় মানুষদের অন্তর্বেদনাকে তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছেন আবুবকর সিদ্দিক। এক রুক্ষ, ধূসর ও নিরানন্দ দেশ-কালের বাতাবরণ উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্পে। আবুবকর সিদ্দিকের গল্পগ্রন্থগুলোর নাম হলো, 'ভূমিহীন দেশ' (১৯৮৪), 'চরবিনাশকাল' (১৯৮৭) ও 'মরে বাঁচার স্বাধীনতা'।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দারুণভাবে "এ্যান্টি রোমান্টিক"। দাম্পত্য প্রেম, স্নেহ কিংবা বাৎসল্যের মধুর রসে তিনি কখনও তাঁর গল্পকে ভরাট করে তোলেন না। ছায়া ও শ্যামালিমাহীন সমকালের এক পোড়ো প্রান্তরে তিনি তাঁর পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন। অনাবৃত করেন মানবসত্তার জটিল ও কুটিল স্বরূপকে। নৈঃসঙ্গ, যৌনতা, বার্ধক্য, অসহায়তা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীরা পথ চলে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬), 'খোয়ারি' (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত' (১৯৮৩) ও 'দোজখের ওম' (১৯৮৯)।

পক্ষান্তরে হুমায়ূন আহমেদ জীবন ও জগৎকে দেখেছেন এক মায়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে। জীবনের ছোট-খাট সুখ-দুঃখ ও নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর এই মায়াবী দৃষ্টির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে অসামান্য হৃদয়গ্রাহী। হুমায়ূন আহমেদের গল্পগ্রন্থগুলো হলো 'নিশিকাব্য' (১৯৭৯), 'শীত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮৬), 'হোটেল গ্রেভারইন' (১৯৮৯), 'ছায়াসঙ্গী' (১৯৯০), 'আনন্দ বেদনার কাব্য'।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

নাটক

সৈয়দ আলী আহ্সান

www.icsbook.info

নাটক

'১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে যে কয়েকজন মুসলমান নাট্যকার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন শাহাদাৎ হোসেন, আকবর উদ্দীন এবং ইব্রাহীম খাঁ। এঁরা সকলেই প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এঁদের উপজীব্য ছিল না।

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪—১৯৭৮) কয়েকটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'কামাল পাশা' (১৯২৮), 'আনোয়ার পাশা।' ঐতিহাসিক নাটকগুলোর ঘটনা এতদ্দেশীয় নয়। আধুনিক তুরস্কের নবজন্মের কথা এবং কল্যাণব্রতী কামালপাশার জয়োচ্চারণ এ নাটকগুলিতে নতুনত্ব এনেছে। তৎকালীন মুসলিম সমাজ-উত্থিত জাতীয় অনুপ্রেরণা আবেগাশ্রয়ী সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত মুসলিম পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষার প্রচারই ইব্রাহীম খাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

তাঁর সামাজিক নাটক 'কাফেলা'। প্রহসনধর্মিতা এর বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সামাজিক অবনতি, বৈসাদৃশ্য ও দুর্নীতির স্বরূপ এ নাটকে তীব্র শ্লেষের ভিতর দিয়ে প্রচারিত হয়েছে। ইব্রাহীম খাঁর ঘটনাসংস্থাপন-রীতির দুর্বলতা এবং সংলাপের অমসৃণতা নাটকে শিল্প-মূল্য খর্ব করেছে।

কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর দুটি নাটিকা আছে— 'ভিস্তী বাদশা' (১৯৫০) ও 'নিযাম ডাকাত' (১৯৫০)। তাঁর 'ঋণপরিশোধ' (একাঙ্কিকা) ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

শাহাদাৎ হোসেনের (১৮৯৩—১৯৫৩) নাট্যগ্রন্থ চরটি—'সরফরাজ খাঁ' (২য় সং ১৯৩৬), 'নবাব আলীবর্দী,' 'মসনদের মোহ' (১৯৪৬) (সোনার কাঁকন উপন্যাসের নাট্যরূপ) এবং 'আনারকলি' (মরুর কুসুম উপন্যাসের নাট্যরূপ)। চারটি নাটকই ঐতিহাসিক; তবে 'আনারকলি' ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হলেও ইতিহাসের জটিলতাবিবর্জিত প্রণয়-মূলক নাটক। 'সরফরাজ খাঁ'র ঘটনা নিয়ে লেখা একটি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সরফরজ খাঁর পতন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। আর শাহাদাৎ হোসেনের 'সরফরাজ খাঁ' নাটক সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনায় রচিত।

শাহাদাৎ হোসেনের কোনো নাটকই একটি জীবনের অভিব্যক্তি হিসেবে পূর্ণাবয়ব নয়। 'মসনদের মোহ' কোনো সম্পূর্ণ কাহিনীর কথা বলে না। রাজনৈতিক স্বার্থলোলুপতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও সমাজগত মানবীয়বোধ উভয়ের মধ্যে ক্ষণিক দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের নিশ্চিত অবসানে প্রশান্তির প্রশ্রয় এ নাটকের বিষয়বস্তু। শাহাদাৎ হোসেন চরম সংকটমুহূর্ত থেকে এ নাটকের আরম্ভ করেছেন এবং সে সংকটের নিশ্চিত নিরসন দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এক কথায় তাঁর নাটক একটি চরম অবস্থারই প্রতিলিপি বহন করছে। যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে জীবনের সমস্ত মূল্যেরই চরম পরীক্ষা ঘটে এবং সর্বনাশ ও অধিকারের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে আমাদের জীবনে স্থিতির অর্থ নির্ণীত হয়, সে বিপর্যয়ের চিত্র শাহাদাৎ হোসেনের নাটকে নেই।

www.icsbook.info

'মসনদের মোহ' সংকীর্ণ পরিসরের নাটক। দুই অঙ্কে সমাপ্ত এ নাটকে ঘটনার জটিলতা নেই, চরিত্রগত দুর্জ্ঞেয়তা নেই এবং সে জন্যে তার রহস্যের মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা নেই। প্রতিটি চরিত্রের রূপকল্প পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত, কোনও চরিত্রই অগ্রসর হবার পথে আপনাকে উন্মোচিত করছে না। একমাত্র জান্নাত-উন-নিসার চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ও বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নাট্যকার সেখানেও দ্রুতগতি ও সংক্ষিপ্ত কথায় চরিত্রের পরিবর্তন স্পষ্ট করেছেন। সংকল্পের পথে বাধা এসেছিল। তাই প্রতিহত নারীচিত্ত চরম উন্মত্ততার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করলো। এ কাহিনী একদিকে যেমন শক্তিলোলুপতার, অন্যদিকে তেমনি দুর্জয় অভিমানের, আশাহীনতারও চরম হাহাকারের।

ঐতিহাসিক নাটকের জন্য কথাবার্তার ভাষাকে দীর্ঘ বিলম্বিত, আবেগময়, মঞ্চ থেকে প্রদত্ত উদ্দীপনাময় ভাষণের মত করবার চেষ্টা করেছেন গিরিশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে শাহাদাৎ হোসেন পর্যন্ত সকলেই। 'মসনদের মোহে' এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার পরিচয় সেখানে নেই, সেখানকার উপজীব্য হচ্ছে অন্তরালের অথবা অপ্রচলিত জীবন। সেখানকার নায়ক -নায়িকারা আমাদের নাটক রচয়িতাদের হাতে হয়েছে বিশেষ বিশেষ আবেগের সংকল্পের এবং হয়ত বা ঐতিহাসিক অবিমৃষ্যকারিতার প্রতীক। যাত্রার ঐতিহ্য আমরা লালন করছি। তাই দীর্ঘ ভাষণ পীড়া জাগায় না। তবে শাহাদাৎ হোসেনের নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নাটকীয় অভিব্যক্তি ও সংলাপের ঋজুতা ও আবেগধর্মিতা। শাহাদাৎ হোসেনের পর ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে আমরা আকবর উদ্দিনের (১৮৯৬-১৯৭৮) নাম উল্লেখ করতে পারি। ইনি ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উভয় প্রকার নাটকই রচনা করেছেন। 'সিন্ধু বিজয়' (১৯২৮) তাঁর সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক। মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা নিয়ে এ নাটকটি লিখিত। স্থানীয় নরপতি দাহিরের সঙ্গে বিন কাসিমের সংগ্রাম এবং অন্যায়ভাবে দাহিরের কন্যাদ্বয় কর্তৃক বিন কাসিমের উপর দোষারোপ এবং তার ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, নাটকের মধ্যে সে কাহিনী আমরা পাই।

হেজাজের খলিফা যখন শুনলেন যে বিন কাসিম দাহিরের কন্যাদের উপর অত্যাচার করেছেন, তখন তিনি আদেশ দিলেন যে বিন কাসিমকে যেন মশকের ভেতরে পুরে হেজাজে পাঠানো হয়। মশকে পুরে বিন কাসিমকে যখন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হলো তখন দাহিরের কন্যাদ্বয় মিরা এবং উমা হেসে উঠল এবং বলল যে, তারা মিথ্যা কথা বলে বিন কাসিমকে শাস্তি দিয়েছে। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের নাটক হলেও এতে নাট্যকারের শিল্পকুশলতার পরিচয় মেলে। সাধারণ ইতিহাসের ঘটনাকে পটভূমিতে রেখে, আমরা একটি বেদনাময় জীবন নাট্যের অভিনয় দেখি। মুসলমানদের ঔদার্য, সহনশীলতা এবং পক্ষপাতশূন্য নিশ্চিত বিচার এ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু হিন্দু পক্ষকে লেখক কোনও ক্রমেই হীনপ্রভ করেননি। তাদের দেশপ্রেম , স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন এবং প্রতিশোধ স্পৃহা পরিপূর্ণ মানবীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নাটকটি আরো একটু বিস্তৃত পরিসরের হলে অধিকতর সুন্দর হোত। স্বল্প পরিসর হবার ফলে নাটকের ঘটনা একটি উর্ধ্বশ্বাস গতি পায়; সুতরাং কোনও চরিত্রই কার্যকারণ সম্পর্কসূত্রে ক্রমবিকশিত হতে পারেনি। রাজকুমারীদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধিকতর

www.icsbook.info

নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হোত যদি নাটকটির ব্যাপ্তি এবং নাট্যকারের ঐকান্তিক অভিনিবেশ থাকতো।

আকবর উদ্দিনের পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটক 'নাদিরশাহ' (১৯৫৩)। আফগান সম্রাট নাদির শাহের দিল্লী বিজয়ের কাহিনী নিয়ে নাটকটি লেখা। কিভাবে তিনি বিপর্যস্ত ইরানের শাসনাধিকার পেয়ে দেশকে অকল্যাণমুক্ত করবার চেষ্টা করলেন এবং কিভাবে বিজয়-লিপ্সায় ভারতের রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত এসে উপনীত হলেন এবং সেখানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধন করলেন, নাটকচ্ছলে এই গ্রন্থে তাই বর্ণিত হয়েছে। নাটকের কোনো কেন্দ্রীভূত আবেগ নেই। বিজয়-লিপ্সাই এ গ্রন্থের উপজীব্য হওয়ায় ঘটনার অগ্রগতি আছে, কিন্তু চরিত্র এবং ঘটনাকে নিয়ে কোনও প্রকার আবর্ত সৃষ্টির প্রয়াস নেই। 'নাদির শাহ', 'সিন্ধুবিজয়ের' তুলনায় ঐতিহাসিক উপাদানের যথার্থতা ও শিল্পকর্মের প্রশ্নে দুর্বল রচনা।

'আজান' আকবর উদ্দিনের একটি সামাজিক নাটক। আকবর উদ্দিনের সর্বশেষ নাটকের নাম 'মুজাহিদ' (১৯৬৩)।

সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক আলোড়ন এবং দেশ-কালের বিচিত্রমুখী ভাবসংঘাতকে উপজীব্য করে আধুনিক নাটকের উৎপত্তি। রবীন্দ্র-উত্তর নাট্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল ভাব এবং আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নুরুল মোমেনের আবির্ভাব। সজাগ সহানুভূতি, সুতীক্ষ্ণ রসবোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ নুরুল মোমেনের নাটকের বিশিষ্টতা।

নুরুল মোমেনের (জন্ম ১৯০৮) প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে 'রূপান্তর' (১৯৫৯) ও 'নেমেসিস'কে (১৯৪৮) কেন্দ্র করে। 'নেমেসিস' নাটকের ব্যাপ্তি দুঘন্টা। চরিত্র একটি। যুদ্ধোত্তর মন্বন্তরে চোরাকারবারীর শিকার সুরজিত নন্দীর অনুশোচনা যন্ত্রণা এবং দ্বন্দ্ব এবং এর থেকে আত্মমুক্তি এর বিষয়বস্তু। পরিকল্পনায়, সংলাপের ব্যঞ্জনায় ঘটনার অনিবার্যতায় এবং উপস্থাপনায় 'নেমেসিস ' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক।

'রূপান্তর'-এ স্বামী-পরিত্যক্তা এক রমণী কৌশলে স্বামীকে বিভ্রান্ত করে এবং আপন চাতুর্যে তাকে বিহ্বল করে আবার তার প্রিয়তমা হয়। এ কাহিনীটিতে গভীরতার কোনও ব্যঞ্জনা নেই। তবে সংযত হাস্যপরিহাস এবং ব্যঙ্গের শাণিত আঘাতে নাটকটি উপভোগ্য হয়েছে। এছাড়াও নুরুল মোমেন 'আলোছায়া' (১৯৬২), 'রহরূপা' (১৯৫৮) 'যদি এমন হোত' (১৯৬২), 'নয়া খান্দান' (১৯৬২), 'শতকরা আশি' (১৯৬৭) প্রভৃতি সামাজিক নাটক রচনা করেছেন।

নুরুল মোমেনের প্রতিভার একপ্রান্তে 'নেমেসিস' (১৯৪৮) এবং অপর প্রান্তে 'নয়া খান্দান' (১৯৬২), 'যদি এমন হতো' (১৯৬২)। শেষের দুটি নাটকে শিল্প ও বিষয়বস্তুর সমন্বয়ের অভাব পাঠককে পীড়িত করে।

অন্নদামোহন বাগচী (জন্ম ১৯১২) বেশ কিছু নাটক লিখেছেন সাধারণ ভাবে মঞ্চের দিকে লক্ষ রেখে। যেমন 'ভেজামাটি' (১৯৫০), 'উষার আলো' (১৯৫৮), 'ঝড়' (১৯৪৮), 'মুক্তি' (১৯৬০), 'মসনদ' (১৯৬১), 'সূর্যমুখী' (১৯৬১), 'কাদামাটির পরে মেঘ' (১৯৬৪) এবং 'শেষ প্রহর' (১৯৬৫)।

www.icsbook.info

অবলাকান্ত মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৭) এক সময় কিছু ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, যেমন 'রাজা সীতারাম রায়' (১৯৪৩), 'হিরন্ময়ী' (১৯৫৪), 'মহাকবি মধুসূদন' (১৯৫৪)।

আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম ১৯২৫) সম্ভবত একমাত্র নাট্যকার যিনি কেবলমাত্র নাটক রচনা করেন। 'অগ্নিগিরি' (১৯৫৯), 'রক্তপদ্ম' (১৯৬৮), 'বিরোধ' (১৯৪৮), 'পদক্ষেপ' (১৯৫৩), 'বিদ্রোহী পদ্মা' (১৯৫৩), 'প্রতীক্ষা' (১৯৬০), 'অনুবর্তন' (১৯৫৯), 'বিলকাওয়ারের ঢেউ' (১৯৬১), 'এপার-ওপার', 'প্রচ্ছদপট' এবং 'অনেক তারার হাতছানি' (১৯৬৫) আসকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় আসকার ইবনে শাইখ প্রচলিত রীতিকে গ্রহণ করেছেন। আসকার ইবনে শাইখের প্রবলতম আগ্রহ হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দকে নাট্যরূপে পরিদৃশ্যমান করা।

'তিতুমীর' নাটকের নাট্যবস্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায় থেকে আহৃত হয়েছে।

'অগ্নিগিরি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। এ -নাটকের কাহিনী আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এক অধ্যায়। হেস্টিংসের কালে কোম্পানীর প্রতিনিধি দেবীসিংহ রংপুর-দিনাজপুরকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। তার অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল সংঘবদ্ধ মজনুশার দল, ভবানী পাঠক ও রাণী ভবানী।

'রক্তপদ্ম' (১৯৬৮) আসকার ইবনে শাইখের বহুল অভিনীত নাটক। 'রক্তপদ্মের' কাহিনী সিপাহী বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ থেকে গৃহীত। ইতিহাস হাতড়ে লেখক এ কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন। সেদিক দিয়ে এ পরিশ্রমের কৃতিত্ব নাট্যকারের প্রাপ্য। এ নাটক ট্র্যাজেডি। শামসুদ্দিন-আজিজনের প্রেম এবং আজিজনের আত্মত্যাগ শামসুদ্দিনের হৃদয়ে যে আলোড়ন তুলল, তা-ই 'রক্তপদ্মের' বিষয়বস্তু বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। ইতিহাস এখানে পটভূমি মাত্র। এ নাটকে অঙ্ক বিভাগ নেই। সমস্ত নাটকটিকে একটি তীব্র অনুভূতির স্ফুরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য। তবে চরিত্রের দ্বন্দ্বহীনতার কারণে কোনও যন্ত্রণাই দর্শক মনে সঞ্চারিত হয় না।

আসকার ইবনে শাইখের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের অনুবর্তন সম্পর্কে তত্ত্বজিজ্ঞাসা আছে। তবে আধুনিককালে ইতিহাসকে নাটকের বিষয়বস্তু করার মধ্যে সমকালীন জাতীয় ভাবমানসের মুক্তি সংঘটনের প্রশ্ন জড়িত থাকে। আসকার ইবনে শাইখের সৃষ্টিমানস এ সম্পর্কে কালানুগ, একথা নিঃসন্দেহ নয়।

জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ 'বিদ্রোহী পদ্মার' উপজীব্য। তাঁর সামাজিক নাটকগুলি প্রচলিত রীতির প্রকাশ-মাত্র। তাঁর 'দূরন্ত ঢেউ' একটি নাটিকা সংকলন, এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) সিদ্ধি সমালোচনা-ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতার অনুরূপ। অন্তর্দৃষ্টি, প্রাণচাঞ্চল্য এবং তীক্ষ্ণ সংলাপ তাঁর নাটককে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করেছে। 'রক্তাক্ত প্রান্তরের' (১৯৬৫) ভিত্তিভূমি ঐতিহাসিক এবং কিংবদন্তি, কিন্তু নাট্যকার সংলাপের চাতুর্যে তাকে বর্তমানের মানুষের বোধ এবং আনন্দের আয়ত্তে এনেছেন।

www.icsbook.info

যুদ্ধ-বিরোধী একটি মানসিকতা এ নাটকের প্রেরণা। যুদ্ধ কেবল বহন করে ধ্বংস আর ট্র্যাজেডি, বৃহত্তর স্বার্থের কোনও অনিবার্যতা নয়।

'কবর' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে। 'কবরে' তিনটি রচনা স্থান পেয়েছে—'মানুষ', 'নষ্ট ছেলে', 'কবর'। 'মানুষ' রচনাটিতে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে একটি বৃহৎ মানবিকতায় পৌছানোর আবেগদীপ্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'নষ্ট ছেলে' রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি ট্র্যাজেডি। 'কবর' ভাষা আন্দোলনের সময়কার ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নাট্যকারের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

'দণ্ডকারণ্যে'র প্রকাশকাল ১৯৬৬। এতেও তিনটি রচনা স্থান পেয়েছে—'দণ্ড' 'দণ্ডধর' এবং 'দণ্ডকারণ্য'। মুনীর চৌধুরী এ পর্যায়ে কৌতুকাবহ, ব্যঙ্গাশ্রয়ী, বিদ্রূপপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনায় উৎসাহী। মুনীর চৌধুরীর সমাজচেতনা 'কবরে'- প্রকাশিত হয়েছে আবেগকে আশ্রয় করে, আর তা বুদ্ধির ও মস্তিষ্কের উপলব্ধিতে 'দণ্ডকারণ্য'-এ প্রকাশিত। 'দণ্ডকারণ্য' উপস্থাপনভঙ্গিতে সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক, সুতরাং অভিনব। এ পর্যায়ে নাট্যকারের সংলাপ আরো তীক্ষ্ণ, কৌতুকাবহ ও পরিমিত হয়েছে। 'দণ্ডকারণ্য' তাঁর সংযমী সংলাপ-রচনা ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে। বিভিন্ন বিদ্যায়তনে ছাত্র-আন্দোলনে আলোড়িত রুষ্ট পরিবেশের পশ্চাতে তারুণ্যের অযৌক্তিক উদ্দীপনার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের খবরদারী ও দৃষ্টিহীনতার যে সংঘাত বিদ্যমান, 'চিঠি' (১৯৬৬) নাটক তারই এক কৌতুকাবহ রূপায়ন।

শওকত ওসমান (জন্ম ১৯১৭) মূলত নাট্যকার নন। জীবন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপনা তিনি প্রধানত করেছেন উপন্যাস এবং ছোটগল্পের মাধ্যমে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা এবং সফলতা যতটুকু নাটকের ক্ষেত্রে ততটুকু নয়; কিন্তু সমাজ এবং সংসারের অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তাঁর বিভিন্ন নাটকে বিবেচিত হয়েছে। 'আমলার মামলা', 'তস্কর ও লস্কর' 'কাঁকর মণি' ও 'এতিমখানা' তাঁর সামাজিক নাটক। ফলে নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষতা খর্ব হয়েছে। অধিকন্তু শওকত ওসমান নাট্যরচনাকে ব্যক্তি -অনুভূতি বিকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) কথাসাহিত্যিক। নাট্যক্ষেত্রেও তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। 'বহিপীর' ও 'তরঙ্গভঙ্গ' ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যপ্রতিভার পরিচয় বহন করে। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর মানসিকতা সমাজচেতনামূলক এবং সংস্কারমূলক। একটি গভীর মানবিক আদর্শ এর উৎপত্তিস্থল। 'বহিপীরের' অনুপ্রেরণাও অনুরূপ। এটি একটি পরীক্ষামূলক সফলকাম নাটক।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৪)। 'তরঙ্গভঙ্গ' নটকটি প্রথমে 'একটি বিচারকের কাহিনী' নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সংলাপে' দুটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। 'বিচারকের' বিচারালয়ের দৃশ্যে নাটকটির মূল ঘটনাংশ ও ভাববস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। এটিও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক নাটক। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে সময়ের প্রবাহকে অপসৃয়মাণ না ভেবে জীবনসত্যের ভিত্তিভূমি হিসেবে নাট্যকার পরীক্ষা করেছেন। নাট্যকার 'তরঙ্গভঙ্গে' একটি সমস্যা উপস্থিত করেছেন—সত্য-আবিষ্কার কার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, বিচারকের? না আসামীর? এবং আপেক্ষিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে কাকে বিচারক বলব, জজকে না আসামীকে?

www.icsbook.info

'তরঙ্গভঙ্গে' ভিখারিণী ও মতলুব আলীর সংলাপের মধ্যে সন্তান ও স্বামী হত্যাকারিণী আমিনার দুঃখ-যন্ত্রণা ও ট্র্যাজিক পরিণতি বিকাশ লাভ করেছে। এ নাটকের প্রতি চরিত্রের অন্তরালে দেশ কাল ও সমাজ ক্রিয়াশীল। এ নাটকের একটি চরিত্র, যাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যেতে পারে,—আসামী আমিনা, যার মুখে একটিও সংলাপ নেই। কিন্তু দর্শক ও পাঠকের মনে আমিনার উপস্থিতি যেমন নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, তেমনি আনন্দ দান করেছে। সংলাপ বুদ্ধি আশ্রয়ী তবে দীর্ঘ। দুজনের দীর্ঘ সংলাপ একঘেয়ে। 'তরঙ্গভঙে' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য বিদ্যমান। 'সুড়ঙ্গ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কিশোর নাটক। প্রকাশকাল (১৯৬৩)

আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২) সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক। তিনি নাটকও রচনা করেছেন। 'ইহুদির মেয়ে' (১৯৬২) তাঁর কাব্য-নাটক। 'মায়াবী প্রহর' (১৯৬৯) শ্রেণীদ্বন্দ্ব তথা সমাজচেতনার পরিচয় বহন করেছে। 'মরক্কোর যাদুকর' (১৯৫৯) তাঁর একটি রূপক-নাটক।

সিকান্দার আবু জাফরও (১৯১৮-১৯৭৫) রূপক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রূপকনাট্য 'শকুন্ত উপাখ্যান' প্রথমে 'সমকালে' প্রকাশিত হয়, প্রকাশকাল ১৯৬৮। এটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণাতীতকালের ময়ূর ও রাজহংসের অধিকারভুক্ত দুটি দেশের মর্মান্তিক যুদ্ধকাহিনী হলো শকুন্ত-উপাখ্যান। সাতটি দৃশ্যে রূপক নাটকটি সমাপ্ত। কাহিনী পরিকল্পনায় নাট্যকারের আন্তরিকতার চিহ্ন বর্তমান। নাটকের সংলাপে যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের সাক্ষ্য মেলে।

মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্ব; হিংসা দ্বেষ তার সমাধান হিসেবে নাট্যকার 'মৈত্রীর সন্ধির' উপরে চাপ দিয়েছেন এ নাটকে এবং এর বিজয় ঘোষণাই শকুন্ত উপাখ্যান এর মূল লক্ষ্য। এ নাটকের মূল কথা 'সন্ধি সব সময়ই হওয়া উচিত। একের অধিকার ক্ষুণ্ন করলে নিজের অধিকার নির্বিঘ্নে থাকে না এবং "মহত্ত্বের অধিকার, হৃদয়ের অধিকার, জীবনের অধিকার যে সন্ধির শর্ত তাই স্বাক্ষরিত হোক—শুধু আমাদের ভেতরেই নয়—দেশে দেশে যুগে যুগে।

সিকান্দার আবু জাফরের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৫)। 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬) তাঁর একটি জীবনী ভিত্তিক নাটক।

আবদুল হকের (জন্ম ১৯১৮) 'অদ্বিতীয়া' (১৯৫৬) সামাজিক নাটক। বহুবিবাহঘটিত সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী ও চরিত্রগুলো পরিকল্পিত হয়েছে। তবে নাট্যকার বক্তব্য ও ঘটনা উপস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেন নি। ফলে চরিত্রগুলি মতাদর্শের বাহক হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়নি। 'সোনার ডিম' (১৯৭৯) কিশোরদের উপযোগী নাটক। তাঁর জীবনীভিত্তিক ঐতিহাসিক নাটক 'ফেরদৌসী' (১৯৬৪)।

আনিস চৌধুরীর (জন্ম ১২২৯) 'মানচিত্র' ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'মানচিত্রে' স্কুল শিক্ষকের জীবনের দারিদ্র্য, হতাশা, যন্ত্রণা এবং সমস্যা অংকিত হয়েছে। সমাজ এখানে রূঢ়ভাবে উপস্থিত; তবে নাট্যকার সমাজ সত্যকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করেননি। সংলাপ সহজ ও সরল। তাঁর আর একটি সামাজিক নাটক 'এ্যালবাম' (১৯৬৫)।

www.icsbook.info

পারিবারিক জীবনের উপাদানে রচিত নীলিমা ইব্রাহিমের (জন্ম ১৯২১) কয়েকটি নাটক হল 'দুয়ে দুয়ে চার', (১৯৬৪), 'সূর্যাস্তের পর' (১৯৭৩) এবং 'যে অরণ্যে আলো নেই' (১৯৭৪)। ডাক্তার শাহাদাৎ আলী খান গ্রাম-জীবনকে নিয়ে কয়েকটি নাটক লিখেছেন, যেমন 'ছোট মা' (১৯৫৩), 'ভুল' (১৯৫৬), 'মাটির বুকে' (১৯৬০), 'প্রতিশোধ' (১৯৬৮), 'মনসবদার, (১৯৬৯)। মিয়াজান আলী বলে একজন নাট্যকারের উল্লেখ কেউ কেউ করেন। ইনি মূলত নাট্যকার নন, সংলাপের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারমূলক প্যাম্ফলেট রচনা করেছেন মাত্র।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ পাঠযোগ্য সাহিত্যশিল্প হিসেবে অনেকগুলো নাটক লিখেছেন, যেমন 'ঝড়ের পাখি' (১৯৫৯) 'যা হতে পারে' (১৯৬২), 'সংযুক্তা' (১৯৬৫) ইত্যাদি। নাটকগুলোর মঞ্চগত তাৎপর্য এবং সফলতা নেই।

ইব্রাহিম খলিল উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন, যেমন 'স্পেন বিজয়ী মূসা' (১৯৪৯) 'ফিরিঙ্গী হার্মাদ' (১৯৬০), 'নূরজাহান' (১৯৭০)। নাটকগুলো উপন্যাসের বিকল্প হিসেবে রচিত, মঞ্চের দিকে লক্ষ রেখে রচিত হয়নি।

আঙ্গিকের পরীক্ষার জন্য যে কয়টি নাটক রচিত হয়েছে, তাদের নাম হল ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম, 'মুনীর চৌধুরীর 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' ও 'মাকড়সা', সাঈদ আহমদের 'কালবেলা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'উজানে 'মৃত্যু' এবং সৈয়দ আলী আহসানের 'কোরবানী', 'জোহরা ও মুসতারী' ও 'জুলেখা'। এ কটি নাটক পরীক্ষা করলে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যরীতির সঙ্গে আমাদের শিল্পীদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছে এবং তাঁরা অনবরত নতুন সম্ভারে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্য-নাটক। এখানকার পরীক্ষা হল—কবিতাকে আবৃত্তিযোগ্য রেখেও এবং কাব্যরসাস্বাদে আঘাত না করেও কাহিনী এবং চরিত্রকে মঞ্চে পরিদৃশ্যমান করা চলে কি না? 'কোরবানী', 'জোহরা ও মুশতারী' এবং 'জুলেখা' জাপানের "নো' নাটকের আঙ্গিকে রচিত। 'নো' নাটক মূলত একটি বিশেষ মঞ্চ-ব্যবস্থায় সঙ্গীতের আবহের মধ্যে পরিস্ফুট একটি কাব্য।

অধুনা কয়েকটি অনুবাদ নাটক মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেছে—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস-এর 'ইডিপাস রেকস্'-এর ভাবানুবাদ (ইডিপাস), সৈয়দ আলী আহসান), ইবসেনের 'দি এনিমি অব দি পিপল্' (শত্রু ; কবীর চৌধুরী), বার্ণার্ড শর 'ইউ নেভার ক্যান টেল' (কেউ কিছু বলতে পারে নাঃ মুনীর চৌধুরী), গলসওয়ার্দীর 'দি সিলভার বক্স' (রূপোর কৌটা ঃ মুনীর চৌধুরী)। 'ইডিপাস' প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬২ সালে, চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে।

এ ছাড়াও যাঁরা অনুবাদে মনোনিবেশ করেছেন, তাঁরা হলেন—আবদুল হক (পুতুলের সংসার, প্রেতাত্মা, হেডডাগাবলার, মহাস্থপতি, ইলিনয়ে লিঙ্কন), আরিফুর রহমান (অনন্য রাগিনী), আসকার ইবনে শাইখ (যন্ত্রণার চাপ), কবীর চৌধুরী (সম্রাট জোন্স, সেই নিরালা প্রান্তর, ছায়া বাসনা), ফতেহ লোহানী (একটি সামান্য মৃত্যু,

www.icsbook.info

চিরন্তন হাসি), মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান (জাম্বুবান) এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (বুনো হাঁস)।

জিয়া হায়দার (জন্ম ১৯৩৬) নাট্যকলায় বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করে কয়েকটি বিদেশী নাটকের বাংলায় সফল অনুবাদ করেছেন, যেমন 'প্রজাপ্রতির নির্বন্ধ (১৯৭৩: গোগোল) 'ডক্টর ফস্টাস' (১৯৮১: মার্লো) এবং 'দ্বাররুদ্ধ' (সার্ত্র)।

বর্তমানে টেলিভিশন ও রেডিও এবং মঞ্চের কয়েকজন জনপ্রিয় দক্ষঅভিনেতা কৌশলগত দিক থেকে নাটক রচনায় সফলতা অর্জন করেছেন। এদের একজন হচ্ছেন আলী যাকের (জন্ম ১৯৪৪)। বিদেশী সাহিত্য থেকে দুটি নাটকের ভাবানুবাদ তিনি করেছেন,—'বিদগ্ধ রমণীকুল' (১৯৭৪) এবং 'দেওয়ান গাজীর কিচ্ছা' (১৯৭৮)। অন্য একজন নাট্যকার মমতাজ উদ্দীন আহমদ (জন্ম ১৯৩৫) দৃশ্যমান উপস্থাপনায় কয়েকটি উপভোগ্য নাটক লিখেছেন যেমন, 'স্প্যার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' (১৯৭৩) 'ফলাফল নিম্নচাপ (১৯৭৪) 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৭৪) ইত্যাদি। কল্যাণ মিত্রের (জন্ম ১৯৩৯), নাটকে মনোহরণের অঙ্গীকার আছে। তাঁর কয়েকটি নাটকের নাম, 'অতএব, (১৯৬৮) 'আমরা (১৯৬৭) 'কুয়াশা কান্না' (১৯৬৭), 'চোরাগলি মন' (১৯৬৭), 'টাকা আনা পাই' (১৯৬৮), 'ডাকাত' (১৯৬৭), 'পাথরবাড়ি'।

স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্য-আন্দোলন

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নাট্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে নাট্যমঞ্চে তরুণদের আগমন ঘটে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে নাট্যচক্রের 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন।' এ বছরই তরুণদের আরও যে কটি নাটক মঞ্চস্থ হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফরহাদ মাজহারের 'প্রজাপতির লীলালাস্য' এবং সেলিম আল দীনের 'সর্প বিষয়ক গল্প'। সেলিম আল দীনের অন্যান্য নাটক হচ্ছে 'সংবাদ কার্টুন', 'করিম বাওয়ালী শত্রু', 'এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা', 'চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারী', 'শকুন্তলা' এবং 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী'। 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী' একটি উল্লেখযোগ্য মিউজিক্যাল কমেডি। সম্প্রতি 'থিয়েটার' নাট্য গোষ্ঠী সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নামক একটি নাটক সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে। নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত।

বাংলাদেশের লোকনাট্য এবং জসীম উদ্‌দীন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েলী গান, রাখালী গান এবং ছেলে-ভুলানো ছড়ায় কথোপকথনের মাধ্যমে গ্রাম্য জীবনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। গাজীর গানের মধ্যেও কথোপকথনের সুযোগ আছে। বলা যেতে পারে যে এভাবে বিভিন্ন গানের সংলাপগত ভগ্নাংশ থেকেই ক্রমান্বয়ে লোকনাট্যের সৃষ্টি হয়েছে। নদীর ঘাটে মেয়ে স্নান করছে, এমন সময় কোনও এক বিদেশী নৌকা বেয়ে এল। সে মোহন এবং কমনীয় কান্তি। তখন গানে গানে দুজনে সংলাপ রচনা করল। এ ধরনের উদাহরণ গ্রামের গানে বহু পাওয়া যায়।

www.icsbook.info

গানে-গানে, সুরে, কথায় ও নৃত্যে যে সমস্ত কাহিনী গ্রামে পরিচিত, বিভিন্ন অঞ্চলে সেগুলির বিভিন্ন নাম। মালদহ জেলায়' 'আলকাফ', 'রংপুর ও মোমেনশাহীতে 'তামসা', ঢাকা-যশোর-বরিশালে 'যাত্রাগান।' উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলায় 'মোনাইযাত্রা' 'বলাই গান, 'বোষ্টম বাদিয়া', 'ময়নামতির গান', লোক-নাট্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

কবি জসিম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) বিভিন্ন লোক-নাট্য অবলম্বন করে 'পদ্মাপার' (১৯৫০) 'বেদের মেয়ে' এবং 'মধুমালা' নামে তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেছেন। 'মোনাই যাত্রা' অনুসরণ করে 'পদ্মাপার' এবং 'ছুমরা বাদ্যা' অনুসরণ করে 'বেদের মেয়ে' রচিত—একথা জসীম উদ্‌দীন বলেছেন। অনুসরণ হয়েও এগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল সৃষ্টি। গ্রাম্য জীবনের সহজ রসধারা গ্রাম্যভাষায় নির্মল অসংস্কৃতরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

জসীম উদ্‌দীনের 'বেদের মেয়ে' (১৯৫১)-এর গল্প সংক্ষেপ এই : এক গ্রামে সাপ খেলা দেখাতে এসেছে গয়া বেদে ও চম্পা বেদেনী। মোড়লের অনুচর মাইনকা চম্পা বেদেনীকে দেখে মোড়লের কাছে সংবাদ দেয়। গান শুনবে বলে মোড়ল বেদের দলকে ডেকে আনে। কিন্তু বেদের দলের উপর অকথ্য অত্যাচার করে মোড়ল চম্পাকে নিজ গৃহে রেখে দেয়। যত দিন চম্পা তার ডাকে সাড়া দেয়নি ততদিন পর্যন্ত চম্পার প্রতি মোড়লের আকর্ষণ ছিলো। কিন্তু যেদিন চম্পা তার স্ত্রীরূপে গৃহকর্মে মন দিলো, সেদিন থেকে চম্পার প্রতি মোড়লের বিতৃষ্ণা জাগলো। শেষ পর্যন্ত চম্পাকে মোড়ল পরিত্যাগ করলো। বেদের বহরের কাছে যেয়ে চম্পা তার পূর্ব স্বামী গয়া বেদেকে দেখলো; কিন্তু তখন গয়া বেদের নতুন বেদেনী ঘরে এসেছে। চম্পা গয়া বেদের নৌকায় দাসীরূপে একটু আশ্রয় চাইলো। নাটকের শেষে আমরা দেখি গয়া বেদেকে সাপে কেটেছে এবং চম্পা মুখ দিয়ে বিষ শুষে নিচ্ছে। চম্পার মৃত্যুতেই নাটকটির শেষ। শুধুমাত্র গ্রামের ভাষাই নয়, গ্রামের সাধারণ লোকদের সর্বপ্রকার ভঙ্গি, কৌতুকরস, নৃত্যগীত, ব্যবহৃত-শব্দের উচ্চারণের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারের কুশলতায় জসীম উদ্‌দীনের সমকক্ষ আর কেউ নেই। 'মধুমালা' (১৯৫৬) নাটকটি গ্রাম্য-শ্রোতাদের নিকট পরিচিত একটি রূপকথা অবলম্বন করে রচিত। নাটকটিতে ব্যবহৃত গানগুলিও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত পাল্লা গান। কবি নিজেই বলেছেন : "এই নাটকের মধ্যে মধুমালার কেচ্ছার পুরাতন গানগুলি যথাসম্ভব রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই গানগুলি সবই এ সুরের। সেই পুরাতন সুরের পাখা বিস্তার করিয়া অতীত যুগের ভাবধারা টানিয়া। আনিতে প্রয়াস পাইয়াছি।"

জসীম উদ্‌দীনের অন্য একটি নাটক 'পল্লীবধূ' (১৯৫৬)। জসীম উদ্‌দীনের একটি কাব্যনাট্যের নাম 'ওগো, পুষ্পধনু', (১৯৬৮)। এছাড়াও কয়েকটি একাঙ্কিকা তাঁর আছে যেমন, 'বাদল বাঁশী,' 'জীবনের পণ' এবং সগাজন চরে কাইজা।'

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের কয়েকজন নাট্যকার এবং তাঁদের রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম এখানে উল্লেখ করছি ঃ

মমতাজ উদ্দীন আহমদ (জন্ম ঃ ১৯৩৫), 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭৬), 'হৃদয় ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার' '(১৯৭৭)', 'কী চাহ শঙ্খচিল' (১৯৭৮), 'বিবাহ' (১৯৭৮), 'এই সেই কণ্ঠস্বর' (১৯৮৪), 'প্রেম বিবাহ সুটকেশ' (১৯৮৫), 'ক্ষত-বিক্ষত' (১৯৮৪), 'রাজা অনুস্বারের পালা' (১৯৮৬), 'জন্তুর ভেতর মানুষ' (১৯৯১), 'বকুলপুরের স্বাধীনতা' (১৯৮৬), 'সাতঘাটের কানাকড়ি' (১৯৯১)।

www.icsbook.info

আবদুল্লাহ আল মামুন ঃ 'সুবচন নির্বাসনে' (১৯৭৩), 'এখন দুঃসময়' (১৯৭৫), 'এবার ধরা দাও' (১৯৭৭), 'শপথ' (১৯৭৮), 'সেনাপতি' (১৯৮০), 'অরক্ষিত মতিঝিল' (১৯৮০), 'ক্রসরোড ক্রসফায়ার' (১৯৮১), আয়নায় বন্ধুর মুখ' (১৯৮৩), 'শাহজাদীর কালো নেকাব' (১৯৮৩), 'চারদিকে যুদ্ধ' (১৯৮৩), এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪), 'তোমরাই' (১৯৮৯), 'কোকিলারা' (১৯৮৯), 'তৃতীয় পুরুষ' (১৯৮৮), 'জিরো পয়েন্ট' (১৯৯০)।

মামুনুর রশীদ ঃ 'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮), 'ওরা আছে বলেই' (১৯৮০), 'ইবলিশ' (১৯৮২), এখানে নোঙর' (১৯৮৪) 'খোলো দুয়ার' (১৯৮৪)।

সৈয়দ শামসুল হক ঃ কাব্য নাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬), গণ নায়ক' (১৯৭৬) 'নূরুলদীনের সারা জীবন' (১৯৮২), 'এখানে এখন' (১৯৮৮)।

www.icsbook.info

প্রবন্ধ সাহিত্য

প্রাথমিক রচনা : মুহম্মদ আবদুল হাই

পুনর্লিখন : সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

প্রবন্ধ সাহিত্য

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতই বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গত ত্রিশ বছরে এদেশে যে সব প্রবন্ধের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, সংখ্যার দিক থেকে এবং সাহিত্য মূল্যের দিক থেকেও তা নগণ্য নয়। তাছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়ও বিভিন্ন লেখকের প্রচুর সংখ্যক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলো এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে এখানকার কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি শাখা সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে, প্রবন্ধ সাহিত্য ও গদ্য রচনা সম্পর্কে এখনও তা হয়নি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(১৯৮৫—১৯৬৯)

"তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর প্যারিসের সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাহ্নপাদ এবং সরহপার দোহাকোষের মূল পাঠ নির্ণয় করে এবং অপভ্রংশ ভাষার বিস্তৃত পরিচয় নির্ধারণ করে ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ Les Chants Mystique de Kanha et de Saraha নামে পরিচিত। এভাবে ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে প্রথম প্রবেশ ঘটলেও ক্রমান্বয়ে সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে ভাষা বিজ্ঞানে নতুন নতুন তথ্য সংযোজিত হলেও এবং ভাষার স্বভাব নির্ণয়ে নতুন নতুন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটলেও শহীদুল্লাহ সাহেবের দান বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর 'লে শাঁ মিস্তিক' এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'লে সঁ দ্যু বঁগালী' (Le sons du Bengalie) ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা ভাষায় একটি প্রামাণিক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ১৯৩৭ সালে। এক্ষেত্রে তিনিই প্রথম মুসলমান। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'বাংলা ব্যাকরণ'। তাঁর 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 'বাংলা সাহিত্যের কথা' দুখণ্ডে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৫৩ এবং ১৯৬৫ সালে। ধারাক্রম রক্ষা করে সমন্বিতভাবে এ ইতিহাস রচিত হয়নি কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের মূল সমস্যাগুলো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ আকারে বিবেচিত হয়েছে, যেমন 'চর্যাগীতির সময়কাল', 'চণ্ডীদাস সমস্যা', 'ময়মনসিংহ গীতিকার দেশ কাল' ইত্যাদি। 'Buddhist Mystic Songs' নামে বৌদ্ধগান ও দোহা'র একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সমিতি থেকে ১৯৬০ সালে এবং একই গ্রন্থের বাংলা একাডেমী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬

www.icsbook.info

সালে। সম্প্রতি নরওয়ের ওসলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চর্যাগীতিকার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে যেখানে ডক্টর শহীদুল্লাহর গবেষণার বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (১৯৬৪) প্রথম খণ্ড ভূমিকাসহ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ অভিধানের শব্দার্থ অন্বেষণ ও ব্যুৎপত্তি নির্মাণের দায়িত্ব ছিল ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর। মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের অর্ধাংশ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ১৯৪৬ সালে। ভূমিকায় 'পদ্মাবতী' উপাখ্যানের ঐতিহাসিক সত্যতা পরীক্ষা করেছেন এবং তুলনামূলকভাবে জায়সীর এবং সঙ্গে আলাওলের 'পদ্মাবতীর' একটি পরিচয়লিপি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হিন্দী অবধীর প্রভাবের দিকনির্দেশক হিসাবে এই গ্রন্থটি চিরকাল চিহ্নিত থাকবে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' ১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদ হিসাবে এটা কোনো সমৃদ্ধমান অনুবাদ কর্ম নয়, কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান, ভূমিকায় হাফিজের জীবনী এবং গজল শ্রেণীর কবিতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'রুবাইয়্যাত-ই-উমর খয়্যাম' ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদটিও অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু এ গ্রন্থের ভূমিকাটি গবেষণাপূর্ণ এবং মূল্যবান।

বাংলাভাষা সম্পর্কে শহীদুল্লাহ সাহেবের অনেক মৌলিক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলি পুস্তাকাকারে এখনও গ্রথিত হয় নি। এরকম কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ হচ্ছে 'প্রাকৃত ও বাংলা' (১৩৬৩), 'বাঙ্গলা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ' (১৩৩৭), 'জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা' 'বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞা', (১৩৩১) 'বৌদ্ধগানের ভাষা' (১৩৬৪), 'বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৩২৭), 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কয়েকটি পাঠ বিচার' (১৩৪৮)।"

মুহম্মদ আবদুল হাই
(১৯১৯—১৯৬৭)

"গবেষণাকর্মী এবং গবেষণায় উৎসাহদাতা হিসাবে মুহাম্মদ আবদুল হাই চিরকাল স্মরণীয় থাকবেন। বাংলা সাহিত্যে এবং বিশেষভাবে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কতগুলি মৌলিক বিচার এখনও সমর্থিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ করা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে গবেষণা সংগঠকরূপে মুহম্মদ আবদুল হাই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে পিএইচ. ডি. পর্যায়ে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। মুহম্মদ আবদুল হাই এক্ষেত্রে সফল পথিকৃৎ। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলা বিভাগ থেকে চারজন গবেষক পিএইচ. ডি. লাভ করেন। কিন্তু তা ছাড়াও আরও অনেককে তিনি গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করেছিলেন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে 'সাহিত্য পত্রিকা' সম্পাদনা যা তাঁর সম্পাদনায় দশবছর পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। 'সাহিত্য পত্রিকার' পাশাপাশি গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের কার্যক্রম তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ধ্বনিতত্ত্বের মুহম্মদ আবদুল হাই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন 'A Phonetic and Phonological

www.icsbook.info

Study of Nasals and Nasalization in Bengli,' (University of Dacca, May 1960), 'The Sound Structure of English and Bengali,' (with W. J. Ball. Department of Bengali, University of Dacca. August 1961.) ও 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৪। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের নাম 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৫৪), 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৬০), 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' (১৯৬৯), মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' গ্রন্থটিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রবন্ধ তিনটির রচয়িতা যথাক্রমে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও সৈয়দ আলী আহসান। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে এই তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অধ্যাপক আবদুল হাই কিছু পাঠ্যগ্রন্থও সম্পাদনা করেছিলেন।"

সৈয়দ আলী আহসান

(জন্ম—১৯২২)

"বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের গবেষণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগ করে সৈয়দ আলী আহসান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পদ্মাবতী' গ্রন্থটি হিন্দী অবধী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনায় প্রথম সফলকাম গ্রন্থ। মূল পদুমাবতের সঙ্গে আলওলের 'পদ্মাবতী'র বিস্তৃত এবং ব্যাপক সমালোচনা এবং পরীক্ষা এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার একটি বিশেষ পরীক্ষাও এই গ্রন্থে আমরা পাই। সৈয়দ আলী আহসান সমন্বিত পাঠ নির্ধারণের কতগুলি নীতি প্রবর্তন করেছেন যা পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং সম্পদনার ক্ষেত্রে মূল্যবান। ১৯৭৩ সালে সৈয়দ আলী আহসান 'মধুমালতী' সম্পাদনা করেন। এটাও একটি তুলনামূলক আলোচনা। হিন্দী মধুমালতী কাব্যের সঙ্গে সৈয়দ হামজার মধুমালতীর একটি তুলনামূলক আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই তুলনামূলক আলোচনায় আমরা জানতে পারি, হিন্দী কাব্যে মধুমালতী উপাখ্যানটি প্রণয়ের নিগূঢ় তত্ত্বকে বহন করেছে। এই প্রণয় কোন দৈহিক প্রণয় নয়, এক প্রকার অলৌকিক অনুভূতি। কিন্তু বাংলা মধুমালতী একটি উপভোগ্য কাহিনী মাত্র যে কাহিনীতে অসম্ভবের প্রশ্রয় ও বিস্তার আছে এবং অনবরত বিচিত্র ঘটনার আবর্তন আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে তত্ত্বের দিক থেকে হিন্দী কাব্য এবং বাংলা কাব্য সমপর্যায়ভুক্ত নয়। সৈয়দ আলী আহসান বিখ্যাত অপভ্রংশ কাব্য 'সন্দেস-রাসক' বাঙালী পাঠকের পরিচয়ের বৃত্তে এনেছেন। এ অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'সাহিত্য পত্রিকা'র শীত ১৩৮৮ সংখ্যায়। তিনি পঞ্চদশ শতকের অবধী কবি কুতবন রচিত 'মৃগাবতী' অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। এ সম্পাদনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলা ভাষায় রচিত দ্বিজ পশুপতির 'মৃগাবতী' কাব্যের সঙ্গে অবধী কাব্যের একটি তুলনামূলক

আলোচনা। তাঁর 'চর্যাগীতি' এবং 'চর্যাগীতি প্রসঙ্গ' নামক দুটি প্রাচীন চর্যার গবেষণাগ্রন্থ বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের গবষণা গ্রন্থগুলোর নাম হচ্ছে— 'নজরুল ইসলাম' (১৯৫৩), 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৬), 'Essays on Bengali Literature (Karachi University 1957), 'কবি মধুসূদন' (১৯৬৩), 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা' (১৯৬৮), 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুসঙ্গে' (১৯৭০), 'রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা' (১৯৭৩), 'মধুসূদন; কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ' (১৯৭৬)।

শিল্পকলা বিষয়ে বাংলাভাষায় গ্রন্থের সংখ্য খুবই নগণ্য। এ পর্যায়ে 'শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য' নামে সৈয়দ আলী আহসানের একটি গ্রন্থ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক (১৯৮২) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে শিল্প উপভোগের এবং শিল্প বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

১৯৭৬ সালে সৈয়দ আলী আহসান সামগ্রিকভাবে জার্মান সাহিত্যের দুটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। জার্মান সাহিত্য-নিদর্শন সূচক একত্রে সন্নিবেশিত কতগুলো রচনা দুটি খণ্ডে সৈয়দ আলী আহসানের বিস্তারিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়।"

মুনীর চৌধুরী
(১৯২৫—১৯৭১)

"মূলত নাট্যকার হলেও মুনীর চৌধুরী গবেষণার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছে, 'মীর মানস' (১৯৬৫), 'তুলনামূলক সমালোচনা' (১৯৬৯), 'বাংলা গদ্যরীতি' (১৯৭০)। 'মীর মানস' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য পর্যালোচনা এটাই প্রথম। উনবিংশ শতাব্দীতে, মুখ্যত ইংরেজি ও সেই সূত্রে প্রাপ্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিচিত্র ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমাদের যে নবীন আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব ব্যাপক ও বহুমুখী। 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থে এই প্রভাব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে ড্রাইডেনের সঙ্গে ডি এল রায়ের তুলনা, জাঁ রাসিনের সঙ্গে জ্যোতিরীন্দ্রনাথের তুলনা, মাইকেলের সাথে শেক্সপীয়রের তুলনা আছে। মূলত আলোচনাগুলো বাঙালী লেখকদের বিদেশী সাহিত্যের নিকট যে ঋণ তারই অনুসন্ধান। এই দুটি গ্রন্থের সাহায্যে মুনীর চৌধুরী বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে সম্মানিত গবেষক হিসেবে পরিচিত থাকবেন।

আহমদ শরীফ
(জন্ম—১৯২১)

"আধুনিক সমাজজীবন, সংস্কৃতি এবং সাময়িক কালের বিভিন্ন ভাবনা নিয়ে নানা ধরনের প্রবন্ধ রচনা করলেও মূলত মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে আহমদ শরীফের বিশেষ দান রয়েছে। তাঁরই বিশেষ প্রচেষ্টায় মধ্যযুগের বহু অপরিচিত কবি

আমাদের পরিচয়ের বৃত্তে এসেছেন এবং অনেক উল্লেখযোগ্য কাব্য সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলোর নাম,—'সত্য কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ', (১৯৫৯), 'মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী' (১৯৬০), 'শাহ বারিদ খানের গ্রন্থাবলী' (১৯৬৬), 'দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত লায়লী মজনু' (১৯৬৮) 'চন্দ্রবতী' (১৯৬৭), 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' (১৯৭২), 'সায়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল' (১৯৭৫)।"

আনিসুজ্জামান

(জন্ম-১৯৩৭)

"উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম মানসের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশে যে সমস্ত গবেষণাকর্ম হয়েছে তাঁর মধ্যে পথিকৃত হচ্ছে আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪)। গ্রন্থটি মূলত তাঁর ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা' নামক ১৯৬২ সালের পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ। এর পূর্বে ১৯৫৯ সালে নীলিমা ইব্রাহিমের 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক' নামক একটি পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ থাকলেও সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সাধনাকে ভিত্তি করে উনিশ শতকের মুসলিম মানস নির্ণয়ের চেষ্টা আনিসুজ্জামানই প্রথম করেছেন। মুসলমানদের জীবনে ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং আবেগ কতটা প্রবল আবার কোন অর্থে প্রবল তা নির্ধারণের চেষ্টা আনিসুজ্জামানের গ্রন্থে আছে। অন্যদিকে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবীয় ভাবধারা কিভাবে কোনও কোনও মুসলমানের সাহিত্যকর্মকে উদ্দীপ্ত করেছিলো তাও নির্ণয়ের চেষ্টা আনিসুজ্জামান করেছেন। ১৯৬৮ সালে আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি এবং ব্যাপক প্রভাব নিয়ে এ গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকের লেখা সন্নিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৭৫ সালে 'মুনীর চৌধুরী' নামে আনিসুজ্জামানের অন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আনিসুজ্জামানের অনুসন্ধিৎসা, অভিনিবেশ এবং কুশল বিশ্লেষণ তাঁকে বাংলা গবেষণা ক্ষেত্রে একজন সমাদৃত লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

(জন্ম-১৯৩৯)

"বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি হিসেবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

১৯৫৯ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে সাহিত্য পত্রিকায় একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর আধুনিক সাহিত্য বিশেষত আধুনিক কবিতা ও ছন্দ সম্পর্কে তিনি ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তথ্য সংগ্রহে যেমন অসাধারণ পরিশ্রমী তেমনি তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

২৪—

www.icsbook.info

এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর গবেষণা গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলঃ ক। গবেষণা : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৯৭০), আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৯৬৫, তৃ-স ১৯৮২), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০, দ্বি-স ১৯৭৮), আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র (১৯৬২), বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা (১৯৭৮), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৭৮), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৬৯, ১৯৮০) বাংলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব (১৯৭৪), সাময়িকপত্রে সহিত্যচিন্তা : সওগাত (১৯৮১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস (১৯৮২); খ. সম্পাদনা : ঢাকার লোককাহিনী (১৯৬৫, দ্বি-স ১৯৮২), যশোরের লোককাহিনী (১৯৭৪), প্যারীচাঁদ রচনাবলী (১৯৬৮), মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী (১৯৭০, দ্বি-স ১৯৮০), মধুসূদন নাট্য গ্রন্থাবলী (১৯৬৯), নজরুল সমীক্ষণ (১৯৭২), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ড ১৯৭৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮২, তৃতীয় খণ্ড (১৯৮২), দ্বিজেন্দ্রলাল : সাজাহান (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে, ১৯৬৮), প্রবন্ধ সংগ্রহ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সৈয়দ আকরাম হোসেন সহযোগে ১৯৭৮), আমাদের লেখক : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী (প্রধান সম্পাদক ১৯৭৪ দ্বি-স ১৯৭৪)।

সাম্প্রাতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় এই পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা পত্রিকার পূর্ব গৌরবই শুধু ফিরে পায়নি—এই পত্রিকার মান আরো উন্নত হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক উচ্চতর গবেষণায় ১৯৪৭ সাল থেকে অনেক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে এবং সেজন্য পি-এইচ-ডি উপাধিও দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত অভিসন্দর্ভের নাম হচ্ছে ঃ 'কবি হায়াত মামুদ', 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক', 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যের বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা', 'বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য', 'দি প্রোজ ওয়ার্কস অব মীর মশাররফ হোসেন', 'সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ', 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক', 'দি লাইফ এন্ড শর্ট পোয়েমস অব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'বাংলা লোক সাহিত্যে লোক সংস্কৃতির উপাদান', 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা'; উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজ সংস্কার সচেতনতার ইতিহাস এবং বাংলা নাট্য রচনায় তার প্রতিফলন', 'বাউল একটি আত্ম সাধনা', 'বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাংলা', 'বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদনের অনুসারীবৃন্দ', 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা' 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাবসম্পদ', 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ 'চেতনা লোক ও শিল্পরূপ', 'বাঙলা উপন্যাস ও রাজনীতি', রবীন্দ্রনাথের রূপক সাঙ্কেতিক আন্দোলন ও সমকালীন কবিতা', 'বাংলা সাহিত্যের সামাজিক নকশা; পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা', 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে চিন্তা ও চেতনা', 'বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার', 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান', 'জসীম উদ্দীন ঃ কবিমানস ও কাব্য সাধনা', 'ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য', 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঃ সাহিত্য কর্ম ও সমাজচিন্তা'।

www.icsbook.info

ভ্রমণ কাহিনী

"ভ্রমণ কাহিনীর দিক থেকে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্য খুবই দুর্বল। রাজা রামমোহন রায় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদেশে কিছুকাল অবস্থান করলেও বিদেশের কোন বিশিষ্টার্থক পরিচয় তাঁদের কোনও রচনায় নেই। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যাপকভাবে বিদেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বহুবিধ রচনায় এ পরিচয়লিপি স্বাক্ষরিত আছে।

আমাদের দেশে যাঁরা বিদেশে গিয়েছিলেন এবং এখনও যাচ্ছেন তাঁরা কয়েক শ্রেণীতে পড়েন। প্রথমত, সরকারী কর্মচারী যাঁদের উদ্দেশ্য দেশ দেখা নয়, কর্মসম্পাদন করা; দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের লক্ষ্যস্থল ছাড়া অন্যত্র দৃষ্টিপাত করেন না; তৃতীয়ত, বিদেশী রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে যাঁরা বিদেশে যান তাঁরা আমন্ত্রণকারী দেশের প্রশংসা করেন; চতুর্থত, যাঁরা ছাত্র, পাঠক্রমের মধ্যে অধিকাংশ সময় নিমগ্ন থাকেন বলে তাঁরা খুব বেশি কিছু দেখেন না। তবুও এদের মধ্য থেকে হঠাৎ দু-একজন সাহিত্য-স্বাদযুক্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। জহুরুল হকের (জন্ম ১৯২২) 'সাত সাঁতার' গ্রন্থটি এ পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি আমেরিকা ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ না করে সেখানকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁদের সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে। সানাউল হকের (জন্ম ১৯২৩) 'বন্দর থেকে বন্দরে' অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের কাহিনী। লেখক প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের জন্য যখন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন তখনকার অভিজ্ঞতা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। জীবনকে এবং প্রকৃতিকে লেখক যে মনোময় দৃষ্টিতে দেখেছেন এ গ্রন্থটি তারই সুন্দর আলেখ্য। সৈয়দ আবদুস সুলতানের (জন্ম ১৯১৭) 'পঞ্চনদীর পলিমাটি' (১৯৫৬) একটি উপভোগ্য রচনা। লেখক তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজীবন, সমাজজীবন এবং প্রাত্যহিক কর্মজীবনকে গল্পের মতে উপভোগ্য করে বর্ণনা করেছেন। লেখকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী 'পথের দেখা'। শহীদুল্লাহ্ কায়সারের 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' (১৯৬৬), মুহম্মদ এনামুল হকের 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ' (১৯৭৮), মুহম্মদ আবদুল খালেকের 'পদ্মা থেকে ইয়াংসী', মোহাম্মদ মোদাব্বেরের 'জাপান ঘুরে এলাম' (১৯৫৯), 'প্রবাল দ্বীপে' (১৯৬৪), রাজিয়া মজিদের 'করাচীর চিঠি' (১৯৯৩), বেগম সুফিয়া কামালের 'সোভিয়েটের দিনগুলি' (১৯৬৮), বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'আমার দেখা তুরস্ক' (১৯৫৫), আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'ওগো বিদেশিনী', ফয়েজ আহমদের 'পিকিং থেকে লিখছি', নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ানের 'দূর দূরান্তরে', জসীম উদ্‌দীনের 'চলে মুসাফির' এবং 'যে দেশে মানুষ বড়', খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের 'ভাসানী যখন ইউরোপে' (১৯৬৭), ইব্রাহিম খাঁর 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র', ইব্রাহিম খলিলের 'সীমান্তের চিঠি' (১৯৬৪), আলী আজমের 'বিশ্বনবীর দেশে' (১৯৫৫), ইবনে ইমামের 'জলে স্থলে', সলিমুল হক খান মিল্কির 'চেনা অচেনা', মুহম্মদ আবুদল হাই-এর 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন', আবদুল আহাদের 'গণচীনে চব্বিশ দিন' (১৯৬৭) প্রধানত বিদেশ পরিচিতিমূলক ভ্রমণ কাহিনী। এগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রসাদে 'ভাসানী যখন ইউরোপে' এক সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। মিল্কির 'চেনা অচেনা' গল্প বলার ভঙ্গিতে রচিত এবং সে কারণে উপভোগ্য। সৈয়দ আলী আহসানের 'প্রেম যেখানে সর্বস্ব' (১৯৮৬) বিদেশ ভ্রমণের একটি মনোজ্ঞ কাহিনী। কাব্য রসাস্বাদে

www.icsbook.info

পরিপূর্ণ এ গ্রন্থে প্রধানত ফরাসী দেশ ও জাপানের সাহিত্য জীবনের কথা আছে। আবুল ফজল শামসুজ্জামানের 'অন্য পৃথিবী' (১৯৮১) অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের একটি সুন্দর কাহিনী। আলী হোসেনের 'আজমিরের পথে' একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা ও সমালোচনার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধই এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, বিভিন্ন সাময়িকীতে ছড়িয়ে রয়েছে। আবার এ বিষয়ের অনেক পুস্তকের একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এসব পুস্তকের মধ্যে রয়েছে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' (১৯৫৯) ও 'সভ্যতা', মযহারুল ইসলামের 'সাহিত্য পথে', কাজী দীন মুহম্মদের 'সাহিত্য সম্ভার' (১৯৬৫), আবদুল হকের 'ক্রান্তিকাল' (১৯৬৪), 'সাহিত্য ঐতিহ্য, মূল্যবোধ' (১৯৬৮), 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' (১৯৭৩), 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা' (১৯৭৪), 'ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব' (১৯৭৬), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য' (১৯৬৫) সনজীদা খাতুনের 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (কলিকাতা ১৯৫৮), আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'দৃষ্টিকোণ' (১৯৫৯), আহমদ রফিকের 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'রবি পরিক্রমা' (১৯৬৩), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য' (১৯৬৫), 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৬৩), 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জাতীয়তা' (১৯৬৭), 'সমকালীন সাহিত্যের ধারা', 'মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৪), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অন্বেষণ' (১৯৬৪), হাসান হাফিজুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৬৫), বদরুদ্দিন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' (১৯৬৬) ও 'সংস্কৃতির সঙ্কট' (১৯৬৭), আনোয়ার পাশার 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' (১৩৭০) ও 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল' (১৯৬৭), আফসার উদ্দীন আহমদের 'সাহিত্যের পরিধি', মোবাশ্বের আলীর 'মধুসূদন ও নব জাগৃতি', সুফি জুলফিকার হায়দারের 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৬৪), আবুল মনসুর আহমদের 'পাক বাংলার কালচার' (১৯৬৬), মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত 'নজরুল সাহিত্য', খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিনের 'যুগস্রষ্টা নজরুল' (১৯৫৯), মুহম্মদ সফিউল্লাহ সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ' (১৯৬৭), হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী', গোলাম সাকলায়েনের 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৯৬৭), সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'প্রবন্ধ বিচিত্রা' (১৯৬৭), হাসান জামানের 'সমাজ সাহিত্য জাতীয়তা' (১৯৬৭) মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর 'যুগ বিচিত্রা' (১৯৬৭), সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জসীম উদ্দীন' (১৯৬৭), মুজীবুর রহমান খাঁর 'সাহিত্যের সীমানা' (১৯৬৭), কবি জসীম উদ্দিনের 'জারিগান' (কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশিত, ১৯৬৮), এবং আহমদ শরীফের 'বিচিত চিন্তা' (১৯৬৮)।

আবদুল মান্নান সৈয়দের (জন্ম ১৯৪৩) 'শুদ্ধতম কবি' (১৯৭২), 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (১৯৭৬), 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা' (১৯৭৯), 'নজরুল ইসলাম : 'কবি ও কবিতা' (১৯৭৭) এবং 'করতলে মহাদেশ' (১৯৮০) উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বই খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের যে কয়টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে মোহাম্মদ আকবর

www.icsbook.info

খানের 'মুছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (১৯৬৫), মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' (১৯৫৭) 'ফাঁসির মঞ্চে', 'সেকালের কথা ও কাহিনী' 'সংবাদ ও সাংবাদিক', সত্যেন সেনের 'মহা বিদ্রোহের কাহিনী' (১৯৬৫), পূর্ণেন্দু দস্তিদারের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' (১৯৬৫), সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'হজরত শাহ জালাল ও শ্রীহট্টের ইতিহাস' (১৯৬৫), সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানের 'রক্ত লেখা ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' পুস্তকটিতে মূলত চট্টগ্রামের আন্দোলনের সংগ্রামীদের ত্যাগের দৃষ্টান্তকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দিকটির উপর আজও যথেষ্ট পুস্তক রচিত হয়নি। ওয়াকিল আহমদের 'মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক' (১৮৬৮) মধ্যযুগের বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিদেশী কয়েকজন পর্যটকের বিবরণী-সঙ্কলন।

জীবনী গ্রন্থ

বিভিন্ন মনীষীর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে যেসব পুস্তক রচিত হয়েছে তার মধ্যে গোলাম মোস্তফার 'হযরত আবু বকর' (১৯৬৫), আবদুল মওদুদের 'মুসলিম মনীষা', 'হযরত ওমর' (১৯৬৭), আবুল ফজলের 'হযরত আলী' (১৯৬৮), মুস্তাফিজুর রহমানের জামাল উদ্দীন আফগানী', ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'ইকবাল', মোহাম্মদ বরকত উল্লাহর 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' (১৯৬৩), বি. ডি. হাবিবুল্লাহর 'শেরে বাঙলা' (১৯৬৪), আবদুল গফুর সিদ্দিকীর 'শহীদ তিতুমীর' (১৯৬২), মোহাম্মদ ইদরিস আলীর 'মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ' (১৯৬৪), এ. এস. এম. আবদুর রবের 'সোহ্‌রাওয়ার্দী', আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'পাকিস্তানের সুফী সাধক' (১৯৬৮), আকবার উদ্দিনের 'শহীদ লিয়াকত' (১৯৬৪), এবং মজির উদ্দিনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা' (১৯৬৭) উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য জীবনী গ্রন্থের এই সংখ্যা অপ্রচুর। অপেক্ষকৃত আধুনিক কালে যে সব মনীষী জীবিত ছিলেন তাঁদের জীবনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের যুগকে তুলে ধরার উপযোগী পুস্তক এখানে রচিত হয়নি।

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

যাঁরা নিজেকে সমাজের চলমান জীবন-প্রবাহের অংশ হিসেবে অনুভব করেন, তাঁরা যখন আত্মজীবনী কিংবা স্মৃতিকথা রচনা করেন, তখন তার মধ্যে কেবল বিচ্ছিন্ন একজন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীই বিবৃত হয় না, বরং তাতে একটি সমাজের একটি যুগের অন্তর্জীবনের কাহিনী বিবৃত হয়। এ দিক থেকে বিচার করলে কয়েকটি উৎকৃষ্ট আত্মজীবনী রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবুল ফজলের 'রেখাচিত্র' (১৯৬৫), আব্বাস উদ্দিন আহমদের 'আমার শিল্পী-জীবনের কথা' (দ্বি-স ১৯৬৫) ও জসীম উদ্দীনের 'জীবন কথা' (১৯৬৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আব্বাসউদ্দিনের 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী। জসীম উদ্দীনের আত্মজীবনীতেও প্রচুর তথ্য রয়েছে এবং ভাষা সুন্দর। এই তিনটি বই থেকে এ দেশের একটি যুগের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা জন্মে।

www.icsbook.info

আত্মজীবনী সংক্রান্ত যে সমস্ত গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সেগুলো হচ্ছে আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৬১), আতাউর রহমান খানের ও 'জারতির দুই বছর' (১৯৭০), "স্বৈরাচারের দশ বছর' (১৯৭০) সৈয়দ আব্দুস সুলতানের 'ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়' (১৯৮১), মফিজউল হকের 'জীবনের বাঁকে বাঁকে' (১৯৮৬), আবদুল মোহাইমেনের 'দুই দশকের স্মৃতি' ইব্রাহিম খাঁর 'বাতায়ন' (১৯৬৭), জসীমউদ্দীনের 'যাদের দেখেছি' এবং মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহর 'যুগ বিচিত্রা' (১৯৬৭)। এ সমস্ত গ্রন্থ থেকে এদেশের একটি যুগের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা জন্মে। সকলেই চেষ্টা করেছেন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক মানুষ ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করতে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর 'অতীত দিনের স্মৃতি (১৯৬৮) গ্রন্থে বিগত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী এদেশের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিকাশ ও অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরবার চেষ্টা কর হয়েছে।

রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি রম্য রচনার বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে কয়েকটি আমাদের মনে হয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। গ্রন্থগুলো হচ্ছে—নূরুল মোমেনের 'বহুরূপা' (কলকাতা থেকে ১৯৫৮-তে প্রকাশিত), ইবনে ইমামের 'চিত্র-বিচিত্র', জহুরুল হকের 'মুন বর্ণালী' (১৯৬৩), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'রঙীন আখর', আবদুর রহমানের 'খোলা মন', তাজাকলমের 'চেনা মানুষের ইতিকথা' (১৯৬৪), ইবনে জশমতের 'দাঁড় কাকের ডায়েরী', (১৯৫৯), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৭), এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলীর 'মণিদীপ' (প্র. স. ১৯৩৭, দ্বি. স. ১৯৪৮) প্রভৃতি।

রম্যরচনার আঙ্গিকের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ না থাকলেও সহজেই এটি চোখে পড়বে যে সাধারণত রম্যরচনা প্রবন্ধের অথবা গল্পের রূপ নেয়। এখানে গল্প অর্থ ছোটগল্প নয়। ঘরোয়া গাল গল্পের আঙ্গিকে কথা বলে যাওয়ার একটি বিশেষ রীতির কথাই এখানে বলা হয়েছে। এ রীতির শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর অনুসরণে আমাদের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের রম্যরচনা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাজাকলম রচিত 'চেনা মানুষের ইতিকথা'। ইবনে জশমতের 'দাঁড় কাকের ডায়েরী'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ সকল রচনায় চার পাশের অবিচার, অন্যায় এবং অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে। নূরুল মোমেনের 'বহুরূপা'র রচনাগুলোতে ভাষা-ব্যবহারের সযত্ন প্রয়াসের ছাপ নেই, কোনো তত্ত্ব-প্রকাশের চেষ্টাও নেই। নিতান্তই রস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সেগুলো রচিত হয়েছে। এ বইতে লেখকের ভঙ্গিটি অনায়াস এবং পাঠকের নিকট তার রস আনন্দঘন ও সহজবোধ্য।

নিভৃত মনের সংলাপ বা আত্মকথনের ভঙ্গিতে রম্যরচনার আর এ কটি কলাকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। জহুরুল হকের 'মনু বর্ণালী'তে বিজ্ঞান দর্শনের তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পীর রসদৃষ্টির সমন্বয় লক্ষ করা যাবে। রচনার সর্বাঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বের সৌরভ ছড়িয়ে পল্লী-প্রকৃতির নিভৃত সুরে কথা বলেছেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর 'রঙিন

www.icsbook.info

আখরে'। আব্দুর রহমান ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের রচনায় নাগরিক বৈদগ্ধ্যের ছাপ রয়েছে। 'খোলা-মন' গ্রন্থের বর্ণনা ভঙ্গিতে একটা গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু তার আড়ালে আছে একটা সরল ভঙ্গি। 'কণ্ঠস্বর'-এর লেখকের বিদগ্ধ ব্যক্তিসত্ত্বা এমন সহজ সুরে উন্মোচিত হয়েছে যে গ্রন্থখানি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের ভার সত্ত্বেও রম্যরচনার গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়নি। এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলীর 'মণি-দ্বীপ' যেন লেখকের মানসিক ডায়রী। অধিকাংশ রচনাতেই দেখা যাবে লেখক অতীত কালের কোন ক্ষুদ্র ঘটনাকে লক্ষ্য করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'তোষামোদ ও রাজনীতি'র কয়েকটি লেখায় রম্য রচনার আস্বাদ পাওয়া যায়।

লোক সাহিত্যের গবেষণা ও সম্পাদনা

বাংলার লোক সাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস খুব দীর্ঘ দিনের নয়; লোক সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো একেবারেই সাম্প্রতিক। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী ইউলিয়ম মর্টন কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করেন, লঙ সাহেবের প্রবাদের সংখ্যা ছিলো পাঁচশত (১৮৭২)। লঙ্ সাহেবের প্রবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলা চলিত বুলির প্রকৃতির অনুসন্ধান করা। এসময়ে যিনি পল্লী বাংলার লোক সাহিত্যে যথার্থ জীবনদান করেন তিনি লাল বিহারী দে। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ Folktales of Bengal (১৮৮৩) আজও জনপ্রিয়। প্রতিষ্ঠানগতভাবে বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রভূত পরিমাণ লোকগাথা এবং লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করেন। এগুলোর মধ্যে 'গোপীচাঁদের গান' (১৯২৪) এবং মৈমনসিংহ গীতিকা' বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। আজও 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তাৎপর্যবহ লোককাহিনী হিসেবে বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করছে। লোকসাহিত্য রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এ-গ্রন্থে 'ছেলে ভুলানো ছড়া', 'কবি-সংগীত' এবং 'গ্রাম্য সাহিত্য' নামে তিনটি প্রবন্ধ আছে। এগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ১৩০১, ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লোকসাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন এবং প্রেরণা পেয়েছিলেন।

পাকিস্তান আমলে এবং বর্তমানে আমাদের দেশে লোকসাহিত্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বাংলা একাডেমী এ বিষয়টির উপর গবেষণা করেছে এবং গবেষণার ফল হিসেবে বেশ কয়টি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়া একাডেমী কর্তৃক লোক সাহিত্যের অনেক উপাদান নতুনভাবে সংগৃহীত হয়েছে এবং উৎসাহী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সেগুলো সম্পাদনা করেছেন।

লোক সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক সাহিত্য' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ গ্রন্থে লোক সাহিত্যের বিচার করেছেন। লোক সাহিত্যের উপর রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকগুলোর মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলিল সম্পাদিত ''উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত' (১৯৬২), শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত 'যশোর খুলনার ছড়া' (১৯৬৫), রওশন ইজদানীর 'মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য', মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরীর 'লোক সাহিত্যের ছড়া', মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'ঢাকার লোক কাহিনী' (১৯৬৫), মুহম্মদ

www.icsbook.info

মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' (১ম- ৪র্থ খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড, ৭ম-খণ্ড, ১৯৬৪), বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'বাউল গান ও দুদ্দুশাহ' (১৯৬৩), বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সংকলন 'লোক সাহিত্য', আহমদ শরীফের 'বাউল মত ও বাউল গান,' আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'কিশোরগঞ্জের লোক কাহিনী' (১৯৬৭) ও আলমগীর জলিল সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (১৯৬৩) উল্লেখযোগ্য। এ পর্যায়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম মোস্তাফিজুর রহমানের 'মেয়েলী গীত', আবদুল গণির জারি গান ও পল্লীগান, মুহম্মদ আবুতালিবের লালন শাহ ও লালন গীতিকা, মুহম্মদ আবদুল হাফিজের 'লোক কাহিনীর দিকদিগন্ত।'

বিবিধ

শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে, সন্তোষজনকভাবে না হলেও দুএকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি যে না হয়েছে এমন নয়। এবনে গোলাম সামাদের 'শিল্পকলার ইতিকথা' গ্রন্থে শিল্পকলার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। নাজিমুদ্দিন আহমদের 'মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর' (১৯৬৬) প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে একখানি সুলিখিত মূল্যবান গ্রন্থ। প্রাচীন মহাস্থান, পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৌলিক তথ্যসম্বলিত নির্ভুল ও সহজ বিবরণ দানই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য যে ভালভাবেই সিদ্ধ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' নামে সৈয়দ আলী আহসানের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল্-মুতী শরফুদ্দীন

(জন্ম : ১৯৩০)

বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আল্-মুতী শরফুদ্দীন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। বিজ্ঞানকে সহজ অথচ আকর্ষণীয় ভাষায় অল্পবয়সী পাঠকদের কাছে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। তার প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের নাম, 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' (১৯৫৫), 'অবাক পৃথিবী' (১৯৫৫), 'বিজ্ঞান ও মানুষ' (১৯৭৫), 'এ যুগের বিজ্ঞান' (১৯৮০), 'বিচিত্র বিজ্ঞান' (১৯৮৫), 'বিপন্ন পরিবেশ' (১৯৮৫), 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা' (১৯৮৭)।

www.icsbook.info

বাংলাদেশের কবিতা

সৈয়দ আলী আহ্সান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বাংলাদেশের কবিতা

দেশ বিভাগ হলো ১৯৪৭ সালে। এর পূর্ব থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধাভাস দেখা যাচ্ছিলো। বিরোধ ছিলো মূলত উপকরণ নিয়ে, বক্তব্য নিয়ে, ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে। প্রথম প্রথম বাঙালী মুসলমান খ্যাতিমান হিন্দু লেখকদের কাছে তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাবী করেছিলেন, তাঁরা চেয়েছিলেন যেন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র মুসলমানদের জীবন কথা নিয়ে উপন্যাস বা গল্প লেখেন। যেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান এবং এ দেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা যে ক্ষেতখামার তার কর্মকাণ্ডের অধিকাংশ লোকগুলোও মুসলমান, সুতরাং এসব মানুষের কথা সাহিত্যে কেন থাকবে না এ-প্রশ্ন মুসলমানদের ছিল। এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন একটি কবিতায় যেখানে তিনি বলেছিলেন, "তোমার এবং আমার মধ্যে কাঁটার বেড়া ঘন হয়ে ওঠেছে এবং তা হয়েছে সহসা রাতারাতি। এ বেড়াকে স্বদেশের অশ্রুজলে আরো কি দুর্ভেদ্য করে তুলবো? এই যে সর্বনাশটি ঘটেছে তাকে আমরা ধর্মের নামে মহার্ঘ করে তুলেছি এবং আঙিনা ভাগ করে তার দু'দিকে আমরা বসবাস করতে চাচ্ছি শয়তানকে পূজা করে।" শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' নামে একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিলো অধুনালুপ্ত 'বুলবুল' পত্রিকায়। শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, "এটা অত্যন্ত বেদনার যে আমরা হিন্দু মুসলমান একে অন্যকে সামাজিক এবং ধর্মীয়বোধের দিক থেকে চিনি না। মানুষ হিসাবে কখনও কখনও চিনবার চেষ্টা করলেও সমাজের এবং ধর্মের বিবিধ ব্যবধান মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর কাছে আমরা নতি স্বীকার করি। এ দুর্ভাগ্য আমাদের সকলের। এ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সৌন্দর্য্যে, আনন্দে, সৌভাগ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনা ও দুর্ভরতায় একে অন্যের অংশীদার হওয়া। সেটা হচ্ছেনা কেননা আমরা একে অন্যকে জানতে চাচ্ছি না।" এ দুজন মহৎ ব্যক্তির কাছে ব্যবধানের স্বীকারুক্তি আমরা পেয়েছি এবং তৎকালীন ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসের একটা ইঙ্গিতও তাদের উক্তিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'কালান্তর' নামক গ্রন্থে হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রগত ইচ্ছার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান এবং দ্বিমুখী তৎপরতা রয়েছে সেসব কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন যখন হলো তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর সাহিত্য নির্মাণের আকাঙক্ষার কথা মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকরা ব্যক্ত করেছিলেন। সত্যিই যখন দেশ বিভক্ত হলো ১৯৪৭ সালে তখন কলকাতা ছেড়ে আমরা যারা চলে এলাম যেমন জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং সৈয়দ আলী আহসন, তাঁরা চেষ্টা করলেন নতুন স্বাধীনতার পটভূমিতে স্বচ্ছন্দে নতুন উপকরণ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি কর। এটা সম্ভব হলো কি হলো না সেটা পরের কথা কিন্তু দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে একটি

www.icsbook.info

ভিন্নতর ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য নির্মাণের লৌকিক কর্মকান্ড শুরু হলো। বাংলাদেশের কবিতার আলোচনা এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই যে ভাবধারকে কাব্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সচল এবং প্রবল দেখতে পেলাম তা হচ্ছে-ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকে স্মরণ করে সৃষ্ট একটি আনন্দময় রোমান্টিক ভাবধারা। এ ভাবধারার প্রধান কবিরূপে যিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন তিনি ফররুখ আহমদ। এ ছাড়া কবিতাকে শিল্প হিসেবে পরীক্ষা করে অনেকে কাব্য চর্চায় অগ্রসর হয়েছেন। আবার কেউ কেউ পল্লী জীবনের আবহ শব্দে উচ্চকিত করতে চেয়েছেন। অনেকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসকে কবিতার উদজীব্য করেছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের কবিতা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তা প্রসারিত হয়েছে।

ফররুখ আহমদ
(১৯১৮-১৯৭৪)

ধর্মীয় বিশ্বাসকে কবিতার আবেগে রূপান্তরিত করে একটি সার্থক কাব্যকলা নির্মাণ ফররুখ আহমদের একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিতে মৌল ধর্মতত্ত্ব ছিলো, সূফীবাদের ত্যাগ ও বিনয় ছিলো, ইসলামের ইতিহাসের গতিশীলতার প্রতি সমর্থন ছিলো। তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান একটি কাব্যশরীর নির্মাণ করেছিলেন যেখানে তিনি একক নায়ক ছিলেন। বাংলা কবিতার প্রবৃত্তির মধ্যে নতুন একটি মাত্রা তিনি সংযোজন করেছিলেন। ধর্ম বিশ্বাস ফররুখের কাছে কোনো উপাদান অথবা কোনো উপকরণ ছিলো না, সেটা ছিলো তাঁর অকৃত্রিম উপলব্ধি। যার ফলে তিনি তাঁর কাব্যভাষায় একটি নতুন স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিরিশের দশকের কবিকুল যারা বাংলা কাব্যে নতুন বাণীভঙ্গি প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের প্রতাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ফররুখ আহমদ নতুন একটি কণ্ঠস্বর আমাদের শুনালেন। ফররুখ আহমদের সঙ্গে সঙ্গে যে কজন তরুণ মুসলমান কাব্যশিল্পী বাংলা কবিতার প্রাঙ্গণে নতুন পদক্ষেপ রেখেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস এবং সৈয়দ আলী আহ্সান। পরিচয়ের বৃত্তে যূথবদ্ধ হয়েও এঁরা প্রত্যেকেই কাব্যকর্মে স্বতন্ত্র ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে বাংলা কবিতায় নতুন বিশ্বাস এবং অভিপ্রায়কে প্রকাশমান করেছিলেন। ফররুখ আহমদ বিশেষ করে বাংলা কবিতার জন্য একটি নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন। সে ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদ নাবিককে পাই এবং হাতেম ও নৌফেলকে পাই। একদিকে আরব্য উপন্যাস এবং পুঁথির জগৎ থেকে ঐতিহ্য তিনি আহরণ করেছেন আবার অন্যদিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কর্মকাণ্ড থেকে জীবনের উপলব্ধির সন্ধান করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতসাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এ কাব্যগ্রন্থেই সিন্দাবাদ নাবিক প্রেরণা-পুরুষ। এখানে আমরা সত্যের সন্ধানে দুর্গম পথে সমুদ্র যাত্রার উৎসাহকে রূপ পেতে দেখি। এই কাব্যগ্রন্থে কবির উদ্দেশ্য জড়তামুক্ত একটা নতুন জীবনকে আবিষ্কার করা। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নতুনভাবে আবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাসূলে খোদা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের

www.icsbook.info

সকলকে উপলক্ষ্য করে এ কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। "সিরাজুম মুনীরা" ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। "সিরাজুম মুনীরায়" 'সাত সাগরের মাঝির' ধ্বনিগত অনুবর্তন প্রকাশ পেয়েছে। 'নৌফেল ও হাতেম'ঃ একটি নাট্য কাব্য। একটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। 'মুহূর্তের কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এ কাব্যগ্রন্থটি সনেট রচনায় কবির দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। অতুলনীয় প্রসাদ গুণ, ভাব সংযম এবং ছন্দের নিটোল বাঁধুনিতে এ কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি অসাধারণ উজ্জ্বল। কাহিনী কাব্য "হাতেম তায়ী" প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। এটি একটি দোভাষী পুঁথির পূনর্নির্মাণ। অজস্র সম্পদ এবং সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশত সওদাগরজাদী হুস্‌নাবানু প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সাতটি সওয়াল করবেন। যে ব্যক্তি এই সাতটি সওয়ালের জবাব এনে দিতে পারবে তাঁকেই তিনি বিবাহ করবেন। খরজমের শাহাজাদা মুনীর শামী একজন চিত্রশিল্পীর কাছে হুস্‌নাবানুর তসবির দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু পহেলা সওয়ালের জবাব দিতে না পেরে তিনি তখন সংসার ছেড়ে অরণ্যে প্রস্থান করেন। মহাপ্রাণ হাতেম তা'য়ীর সঙ্গে সেখানেই মুনীর শামীর পরিচয় ঘটে। মুনীর শামীর দূরবস্থা দেখে হাতেম তায়ী হুস্‌নাবানুর সওয়ালের জবাব এনে দেন এবং অবশেষে মুনীর শামীর সঙ্গে হুস্‌নাবানুর পরিণয়ের ব্যবস্থা করেন। কাহিনীটির মধ্যে রহস্য আছে, রোমান্টিকতা আছে এবং বিচিত্র ঘটনাবর্ত আছে। ফররুখ আহমদ অপূর্ব কুশলতায় এ কাহিনীটি পুনর্নির্মাণ করেছেন, দীর্ঘ পরিসরের এই কাহিনীকাব্যে ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের একটি সরল প্রবাহ পাঠককে মুগ্ধ করে। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' ফররুখ আহমদের কবি জীবনের প্রথম দিকের উনপঞ্চাশটি কবিতার সংকলন। এই গ্রন্থটি ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ফররুখ আহমদ জীবিতকালেই এ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু প্রকাশ করে যেতে পারেননি। ১৯৩৬ সালের দিকে যে সমস্ত কবিতা ফররুখ আহমদ লিখেছিলেন সেগুলোর অনেকগুলো এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলো নিঃসর্গ বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক এবং বাস্তব জীবনভিত্তিক। তিনি যে প্রকৃতিকে শান্তির মধ্যে এবং দুর্যোগের মধ্যে দেখেছেন সে প্রকৃতির চিত্র তিনি অনেকগুলো কবিতায় এঁকেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু উচ্ছ্বাসটি অনেকটা সংযত। প্রেমের কবিতাগুলো আবেগবহুল। তবে সে আবেগের মধ্যে কবির সংঘাতক্লিষ্ট জীবনের ইঙ্গিত আছে। বাস্তব ভিত্তিক কবিতাগুলো বাস্তবের রূঢ়তা, সংঘাত এবং সংশয়কে ফুটিয়ে তুলেছে। এগুলোর মধ্যে 'কাঁচড়া পাড়ায় রাত্রি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরেকটি কবিতা আছে 'প্রেসম্যান', এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর 'কাফেলা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো ১৯৪৩-৪৪ সালে রচিত হয়েছিল। ফররুখের 'সিরাজুম মুনিরা' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর মিল আছে। সুতরাং 'সিরাজুম মুনিরা'কে আমরা যে মানসিকতায় বিচার করব 'কাফেলা'কেও সে মানসিকতায় বিচার করতে হবে। ফররুখের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের নাম 'পাখির বাসা' (১৯৬৫), এবং 'হরফের ছড়া' (১৯৭০)। তাঁর এ দুটি গ্রন্থ শিশু কিশোরদের জন্য লেখা। 'ছড়ার আসর' বলে তার অন্য একটি কাব্যেও শিশু কিশোরদের জন্য লেখা। 'ছড়ার আসর' বলে তার অন্য একটি শিশু পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। তাঁর

www.icsbook.info

মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত কিছু পান্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে, যেমন, 'হে বন্য স্বপ্নেরা, 'ফররখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

আহসান হাবীব

(১৯১৭-১৯৮৩)

আহসান হাবীবের জন্ম, শৈশবকাল এবং স্কুল জীবন কাটে বরিশালে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩৮ এর দিকে কলকাতায়। সেখানে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসের কাজ করেছেন, সর্বশেষ কর্মব্যবস্থা ছিল অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। সৈয়দ আলী আহসান এবং তিনি একই সঙ্গে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কজ করতেন। সে সময় থেকেই আহসান হাবীব কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যৌবনের মোহমুগ্ধতা, প্রেম, অভয় এবং সান্তনা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তখন বিকাশ লাভ করেছে। তাঁর "রাত্রিশেষ" কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এটাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শব্দ ও ছন্দের মোহময় অলসতায় এ গ্রন্থের কবিতাগুলো স্বাক্ষরিত। তখন থেকেই কবিতায় তিনি স্নিগ্ধতা এবং অলস অপরাহ্ণের বিশ্রামের আনন্দ এনেছেন। তিনি সামাজিক কর্তব্যের কথাও কবিতায় বলেছেন এবং ধন বন্টনের অসাম্যের কথাও তাঁর কবিতায় আছে। কিন্তু তাঁর বক্তব্যগুলো কোন প্রকার যন্ত্রণা নিয়ে কাব্যে সমর্পিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বিষয় নির্বাচনে তিনি আধুনিক হলেও শব্দ ব্যবহারে এবং ছন্দের নির্ভাবনাময় প্রয়াসে তিনি রোমান্টিক। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম "ছায়া হরিণ" (১৯৬২), "সারা দুপুর" (১৯৬৪), "আশায় বসতি" (১৯৭৪), "মেঘ বলে চৈত্রে যাবো" (১৯৭৬), "দুই হাতে দুই আদিম পাথর" (১৯৭১)। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষে' যে অন্তরালবর্তিতা, সংকোচ এবং বিনয় আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর সকল কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই একই বিনয় ও সংকোচ প্রবাহিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে মরমী কবি খলিল জিবরানের রহস্য মধুরতা আহসান হাবীবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলে তিনি আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন অনেক বেশী এবং নিজের জন্য নির্জনতা নির্মাণ করেছেন। "অরণ্য নীলিমা" (১৯৬২) নামে তাঁর একটি উপন্যাস আছে। এটা একটি প্রণয় উপাখ্যান। এ গ্রন্থের ভাষা রোমান্টিক অনেকটা কবিতার মতো। শিশু সাহিত্যেও আহসান হাবীবের বিশেষ দামন আছে। শিশুদের লেখা তাঁর বইগুলোর নাম, "জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্ন", "রাণীখালের সাঁকো", "ছুটির দিন দুপুরে" এবং "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।"

সিকান্দার আবু জাফর

(১৯১৯-১৯৭৫)

নানাবিধ কারণে সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তিনিই একমাত্র কবি যিনি পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে কবিতায় ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর দুটি কবিতা এ কারণে খুব বিখ্যাত হয়ে আছে, একটির নাম "বাংলা ছাড়ো", আরেকটির নাম "আমাদের সংগ্রাম চলবেই।" একটি আশ্চর্য তীব্র গতিবেগে তিনি তার ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যা তৎকালীন সময়ে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সিকান্দারের আরেকটি বিশেষ পরিচয় তিনি

www.icsbook.info

'সমকাল' নামক একটি সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি আমাদের লেখকদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর কিছুর জন্য না হলেও শুধু "সমকাল" প্রকাশের জন্য তিনি পরিচিত হয়ে থাকবেন।

সিকান্দর আবু জাফরের কবিতায় ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের উজ্জ্বল সাবলীলতা আছে। তিনি তাঁর বক্তব্যকে অনায়াস-নির্ভাবনায় প্রকাশ করেছেন। সঙ্গীত রচনায়ও তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। এক সময় ঢাকায় নাট্য আন্দোলনের একজন অগ্রণী কর্মী ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম- "প্রসন্ন প্রহর" (১৯৬৫). "তিমিরান্তিক" (১৯৬৫), "বৈরী বৃষ্টিতে" (১৯৬৫), "বৃশ্চিক লগ্ন" (১৯৭১), "কবিতাঃ ১৩৭২" (১৯৬৮); "কবিতাঃ ১৩৭৪" (১৯৭১), "বাংলা ছাড়ো" (১৯৭১)। দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় অবস্থান কালে সিকান্দার আবু জাফর কথাশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। সে সময়কার দু'টি উপন্যাসের নাম "পূরবী" (১৯৪০), এবং "নতুন সকাল" (১৯৪৩), সে সময়কার একটি গল্পগ্রন্থ আছে "মাটি আর অশ্রু" নমে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। তিনি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের বাংল অনুবাদ করেছিলেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

আবুল হোসেন
(জন্ম ১৯২১)

আবুল হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নব বসন্ত' ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। মুসলমান কবিদের মধ্যে আধুনিকতার সূত্রপাত যখন অর্থাৎ ১৯৩৯-এর দিকে তখন আবুল হোসেন কাব্য-বোধের ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। আধুনিক ইংরেজী কবিতার একটি বিশিষ্টতা অর্থাৎ সংলাপের ব্যবধানগত সহজতা আবুল হোসেন তার সার্থক পরীক্ষা করেছিলেন। সম্প্রতি আবুল হোসেন আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন 'বিরস সংলপ' এবং 'হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস' (১৯৮২)। সর্বশেষ গ্রন্থটিতে কবি তাঁর বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাংসারিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বেদনার স্মারক হিসেবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে' (১৯৮৭)। আবুল হোসেনের জন্ম খুলনার সৈয়দ মহল্লায়।

সৈয়দ আলী আহসান
(জন্ম ১৯২২)

চল্লিশের দশকে সৈয়দ আলী আহসানের আবির্ভাব একই সঙ্গে কবি হিসাবে, কথা সাহিত্যিক হিসাবে এবং সাহিত্য সমালোচক হিসাবে। কিছু নাট্যকবিতাও সেসময় তিনি লিখেছিলেন। সে সময় তাঁর সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মতো তাঁর লেখাও প্রকাশিত হত 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং 'সওগাতে'। সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'নবযুগ' পত্রিকায়। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত বিখ্যাত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় তার একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু

www.icsbook.info

আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হননি। কিন্তু কবিতা এবং সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সেসময় যেরূপে গভীরভাবে মনেনিবেশ করেছিলেন আজ পর্যন্ত সে মনোনিবেশ অক্ষুন্ন আছে।

কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ইসলামী ভাবাবহ প্রধান কবিতা দিয়ে। এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর নাম, 'মক্কা মোয়জ্জমার পথে', "কোরবানী", "জোহরা ও মুশতারী", "মহররম", "চাহার দরবেশ" কিন্তু এ সমস্ত কবিতার তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় থাকলেও তিনি শেষ পর্যন্ত এ ভঙ্গিটাকে অস্বীকার করেন এবং ষাটের দশকে এসে নিজস্ব একটি কাব্যভঙ্গি তৈরী করে নেন। যদিও প্রথম দিককার কবিতাগুলো তিনি একসময় স্বীকৃতি দিতে চাননি, কিন্তু ১৯৮৬ সালে "চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি এ কবিতাগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে তিনি আরো এক ধরনের কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। এগুলো মূলতঃ 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এ সমস্ত কবিতা প্রথম পর্যায়ে অস্বীকৃত হলেও সাম্প্রতিক "রজনীগন্ধা" নামক একটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে এগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে। 'রজনীগন্ধার' কবিতাগুলোর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা আছে, বিপ্লবের কথা আছে, দুর্ভিক্ষের কথা আছে।

কবি হিসাবে সৈয়দ আলী আহসানের যথার্থ পরিচয় আমরা আবিষ্কার করি বাংলা ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর "অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "একক সন্ধ্যায় বসন্ত" বাংলা ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই উভয় গ্রন্থটি একে অন্যের পরিপূরক। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সৈয়দ আলী আহসান অনেকবার পাশ্চাত্যে দেশসমূহে ভ্রমণ করেছেন এবং বিদেশের প্রখ্যাত কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। এই পরিচয় সূত্রে তিনি আধুনিক জার্মান কবিতা, ফরাসী কবিতা এবং ইংরেজী কবিতার ভাব প্রকল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক বাংলাদেশের প্রথম সারির কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি এবং এখনও পর্যন্ত তিনি একক ব্যক্তি যিনি আধুনিক পাশ্চাত্যের কবিদের সঙ্গে আন্তরিকতভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং তাদের কাব্যকলা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। শব্দই যে কবিতার সমৃদ্ধির প্রধান এবং একমাত্র উৎস পাশ্চাত্য কবিদের সংস্পর্শে এসে এই বোধটি সৈয়দ আলী আহসানের জাগে এবং তিনি বাংলাভাষায় একটি নতুন কাব্যধারা উপহার দেন। একটি মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে এসেছিলে। সেই দ্বন্দ্বটি হচ্ছে দেহ ও আত্মার বোধের মধ্যে দ্বন্দ। শেষ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন যে দেহই হচ্ছে সমস্ত অনুভূতির মূল। দেহকে অস্বীকার করে আত্মাকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় 'এ দেহ আত্মার বিভাষ'। 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ত্রয়ী' "আমার পূর্ববাংলা" প্রকাশ করেন। বাংলাদেশকে মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে ভালবাসার একটি নিদর্শন এই কবিতাত্রয়ীতে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে, নদীমাতৃক সচলতাকে এবং বনভূমির শান্ত আশ্রয়কে তিনি অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনায় এই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। হৃদয় এবং দেহের দ্বন্দ্বের যে কথা একটু আগে বলেছি সেগুলো 'হৃদয়' নামক একটি কবিতাত্রয়ীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে অনুভব করা যায় যে কবি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কত বিচিত্ররূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

www.icsbook.info

সৈয়দ আলী আহসানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "সহসা সচকিত" প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৭৩ সালে। এই কাব্যগ্রন্থটি একটি প্রেমের কাব্য এবং রোমান্টিক ভাবাবহের কাব্য। প্রথম কবিতা থেকে শেষের কবিতাটি পর্যন্ত একটি পারস্পরিক সংযোগ আছে। এই সংযোগটি প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ এবং পরিপূর্ণতার। এ ধরনের কাব্যগ্রন্থ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা বলা কঠিন। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "উচ্চারণ"। এখানকার কবিতাগুলোও শিরোনামহীন এবং সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। মোট বিরাশিটি বক্তব্য এই কাব্যে রয়েছে। গদ্য এবং পদ্যে বিভিন্ন বক্তব্যগুলো প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যে আত্মজৈবনিক কিছু লেখাও আছে। মূলতঃ ফরাসী কাব্যভঙ্গির অনুসরণে এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত। এক্ষেত্রে আমরা আধুনিক ফরাসী কবি রোজে কাইওয়া এবং পীয়ের ইম্যানুয়েলের কথা স্মরণ করতে পারি। বাংলা কাব্য সাহিত্যে এটাও একটি বিশেষ ধরনের কাব্য। যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এরকম কাব্যগ্রন্থ বাংলাভাষায় খুবই কম। "আমার প্রতিদিনের শব্দ" ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যকার অনেকগুলো কবিতা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের বাইরে বসে লেখা।

কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "সমুদ্রেই যাবো" ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সালে কবির স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। সে ঘটনার আভাষ এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলো কবিতায় পাওয়া যায়। সমুদ্রের প্রতি গভীর ভলবাসা এবং আকর্ষণ এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। সমুদ্রকে তিনি দেখেছেন বিচিত্রভাবে। দেশের ভিতরে থেকে এবং দেশের বাইরে গিয়ে। বিভিন্ন রূপে সমুদ্র তাকে বিভিন্ন সময়ে বিস্মিত করেছে। সেই বিস্ময়ের ছবিগুলো এখানে আছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী এবং উর্দু ও ফার্সী থেকে প্রচুর অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদ কাব্যগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা', 'ইভান গলের প্রেমের কবিতা', 'উইলিয়াম মেরিডিথের কবিতা', আধুনিক জার্মান কবিতার অনুবাদ, একাদশ শতকের অপভ্রংশ কাব্য 'সন্দেশ রাসক' -এর বাংলা অনুবাদ এবং ষোড়শ শতকের অবধি কাব্য 'মৃগাবতী' র-বাংলা অনুবাদ।

আধুনিক কবিতার গঠন প্রকৃতি, প্রতীক এবং রূপকল্প নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। তাঁর নিজের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা তাঁর কবিতাকে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য কাব্যধারা এবং প্রাচ্যের কাব্য ধারা উভয় ক্ষেত্র থেকে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোর বিশিষ্ট ব্যবহারে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আধুনিক কবিতাকে সচেতন অনুভূতির শিল্প হিসাবে বিবেচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "আবেগ যদি চিন্তার দ্বারা সমর্থিত না হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত না হয় তবে সে আবেগ কুহেলিকাই সৃষ্টি করতে পারে। জীবনের সম্ভাবনা জাগায় না; তাই শুধুমাত্র আবেগের আর নির্ভরশীল যে সব কবিতা তাতে কোন বিস্ময় নেই।"

www.icsbook.info

তালিম হোসেন
(জন্ম ১৯১৮)

পাকিস্তান-পূর্ব যুগ থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির মুহূর্ত পর্যন্ত তালিম হোসেন ইসলাম এবং ইসলামী উম্মাহ বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন যেগুলো তৎকালীন মুসলমান পরিচালিত কিছু পত্রপত্রিকায় পকাশিত হয়েছিল। এ সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে তালিম হোসেনের নিজস্ব কোন প্রকার সত্ত্বা প্রকাশ পায়নি। সে সময় কাব্যজগতে ফররুখ আহমদের একটি বলিষ্ঠ আবির্ভাব ঘটেছে। ফররুখ আহমদ ইসলামী ভাবাবহ নিয়ে কবিতা লিখলেও তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহারের একটি নৈপুণ্য ছিল এবং উপমা ব্যবহারের একটি নিজস্বতা ছিল। এর পাশাপাশি তালিম হোসেনের কবিতা অত্যন্ত নিস্প্রভ মনে হয়েছিল। তাঁর 'দিশারী' কাব্যগ্রন্থ, যেটি ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, কবির প্রাক-পাকিস্তান যুগের কবিতাগুলোর সংকলন গ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থের সবক'টি কবিতাই ফররুখের ধাঁচে রচিত। তাঁরে 'শাহীন' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এ কাবগ্রন্থের মধ্যেও ফররুখের প্রভাব অনুভব করা যয়। তালিম হোসেনের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'নূহের জাহাজ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। এ কাব্যগ্রন্থেই আমরা প্রথম কবি তালিম হোসেনকে তার নিজস্ব অভিনিবেশে আবিষ্কার করি। এখানকার কবিতাগুলোতে কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কবির বিশ্বাসের মূল প্রবৃত্তি 'নূহের জাহাজ' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এ কাব্যের প্রথম কবিতাটি বাংলাদেশের বন্যা এবং দৈব দুর্বিপাক নিয়ে। কবি বলছেন সবকিছু অতলে গেছে কিন্তু এদেশের মানুষ ধ্বংসের রাশ টেনে চেষ্টা করে চলেছে, "প্রলয়ের সিন্ধুর ওপারে ভিড়াতে জীবন্ত জয়ী নূহের জাহাজ।"

সানাউল হক
(১৯২৪-১৯৯২)

চল্লিশের দশকে যে কয়জন কবি বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নতুন বক্তব্য এবং রসবোধ আনবার চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে সানাউল হক অন্যতম। তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং সৈয়দ আলী আহসানের কলেজ জীবনের সহপাঠী ছিলেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁর লেখা কলকাতার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। প্রশাসনিক কর্মের দায়িত্বে থেকে তিনি তাঁর কাব্য সাধনায় কোনরূপ অলসতা প্রদর্শন করেননি। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এবং মানবমনের কামনা ওতপ্রোতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা তাকে কখনো আনন্দিত, কখনো নিরানন্দ এবং কখনো ব্যঙ্গমুখর করেছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম "নদী ও মানুষের কবিতা" (১৯৫৬) "সূর্য অন্যতর" (১৯৬৩), সম্ভবা অনন্যা (১৯৬২), "বিচূর্ণ আরশীতে" (১৯৬৮), "একটি ইচ্ছায় সহস্রপালে" (১৯৭৩), "কাল সমকাল" (১৯৭৫), "পদ্মিনী শঙিনী" (১৯৭৬), "প্রবাস যখন" (১৯৮১), "বিরাশির কবিতা" (১৯৮৩) "উত্তীর্ণ পঞ্চাশে" (১৯৮৪)। তাঁর 'বন্দর থেকে বন্দরে' নামক অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ কাহিনী এক সময় খুবই খ্যাতি পেয়েছিল।

www.icsbook.info

সৈয়দ আলী আশরাফ
(জন্ম ১৯২৪)

ইসলমী ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি হিসেবে সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আদর্শ বিষয়ে তাঁর অনেক ইংরেজি গ্রন্থ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। "বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য" এবং "নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়" নামক দুটি গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ তাঁর আছে। তাঁর কাব্য গ্রন্থ তিনটি- প্রথম গ্রন্থটির নাম 'চৈত্র যখন' দ্বিতীয়টির নাম 'বিসংগতি' এবং তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'হিযরত'। প্রথম গ্রন্থে আলী আশরাফ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং এর অনুরূপ 'মনোলোগ' নির্মাণ করেন। এ কাব্য গ্রন্থে ইংরেজী কবিতার কলা-কৌশলকে বাংলা কাব্যে তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'হিযরত' নামক কাব্যগ্রন্থ মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে তাঁর অবস্থানের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। এ কাব্য গ্রন্থে আল্লাহ ও রাসুলের পথে সমগ্র সত্ত্বা বিলিয়ে দেবার একটি আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

আবদুল গণি হাজারী
(১৯২৫-১৯৭৫)

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংবাদপত্রের প্রশাসনের ক্ষেত্রে আবদুল গণি হাজারী বহুদিন পরিচিত থাকবেন। দীর্ঘকাল তিনি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর কবিতায় নগরজীবনের নানা সঙ্গতি ধরা পড়েছে। বলবার ভঙ্গীতে, সোচ্চার ব্যঙ্গ ও ভাষার সাংবাদিক সুলভ সারল্য সত্ত্বেও তাঁর কবিতার যে সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা পাঠককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ তিনটি- "সামান্য ধন" (১৯৫৯), "সূর্যের সিঁড়ি" (১৯৬৫) এবং "জাগ্রত প্রদীপে" (১৯৭০)।·তাঁর কিছু অনুবাদ গ্রন্থও এছ। "কালো প্যাচার ডায়েরী" (১৯৭৬) নামে তার একটি রম্য রচনা আছে। "কতিপয় আমলার স্ত্রী" নামে একটি কবিতার জন্য তিনি ম্যানিলার পি.ই.এন ক্লাবের পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আশরাফ সিদ্দিকী
(জন্ম-১৯২৭)

লোক সাহিত্যের গবেষক হিসাবে আশরাফ সিদ্দিকী খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের ফোকলোরের' উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি পেয়েছেন। 'লোক সাহিত্য' নামক একটি গবেষণা গ্রন্থ তিনি ১৯৬৪ সালে প্রকাশ করেন। লোক সাহিত্যের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এটি দীর্ঘদিন পরিচিত থাকবে। কবিতার ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত "তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা" নামক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে তিনি প্রবেশ করেন। এরপর আরো অনেক কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। যেমন- "সাতভাই চম্পা" (১৯৫৫), "বিষকন্যা" (১৯৫৫), "উত্তর আকাশের তারা" (১৯৫৮), "তিরিশ বসন্তের ফুল ১ম ও ২য় খন্ড" (১৯৭৫) "কুচবরণ কন্যা" (১৯৭৭) ইত্যাদি। শিশুদের নিয়ে লেখা তাঁর অনেক গ্রন্থ আছে।

www.icsbook.info

আবদুর রশিদ খান
(জন্ম ১৯২৭)

সনেটের আঙ্গিকে ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালাটি নবরূপ দানের প্রচেষ্টার জন্য আবদুর রশিদ খানের 'মহুয়া' উল্লেখযেগ্য। আবদুর রশীদ খানের অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'নক্ষত্র মানুষ মন' ও 'বন্দী মুহূর্ত।'

আবদুস সাত্তার
(জন্ম-১৯২৭)

লোক সাহিত্য এবং লোকজীবন নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করে আবদুস সাত্তার খ্যাতি অর্জন করেছেন। লোক জীবনের উপর বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবনের উপর তাঁর ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। এ সমস্ত গ্রন্থ তাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। আদিবাসী বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণা কর্ম হিসাবে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'অরণ্য জনপদে' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কবি হিসাবে আবদুস সাত্তার সামাজিক, ধর্মীয় এবং গৃহগত পরিবেশের পটভূমিতে সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "বৃষ্টি মুখর" গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযেগ্য কবি হিসাবে আবদুস সাত্তার সামাজিক, ধর্মীয় এবং গৃহগত পরিবেশের পটভূমিতে সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম "বৃষ্টি মুখর" (১৯৫৯), "অন্তরঙ্গ ধ্বনি" (১৯৭০), "নামের মৌমাছি" (১৯৭৩), "আমার ঘর নিজের বাড়ী" (১৯৭৬), "আমার বনবাস" (১৯৮২), "বিম্বিত স্বরূপ", (১৯৮৫), "আমার বাবা মার কাসিদা", (১৯৮৫), "আব্দুস সাত্তার ও অন্যান্য কবিতা" (১৯৯০)।

শামসুর রাহমান
(জন্ম ১৯২৯)

শামসুর রাহমান বিশেষভাবে নাগরিক কবি। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (১৩৬৬) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিরিশের কবিদের বিশেষত জীবননান্দ দাশের প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬৩) কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। তাঁর কোনও কোনও কবিতার আবহ বাংল কাব্যে নতুন। নগর জীবনের হতাশা ও অবয়বহীনতা তার কাব্যে শব্দে সমর্পিত। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭), 'নিরালেকে দিব্যরথ' (১৯৭৫), 'নিজবাসভূমি', 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭৩), 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', 'আমি অনাহারী', 'এক ধরনের অহঙ্কার', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে', 'মাতাল ঋত্বিক' (১৯৮২), 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' (১৯৮২), 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ইত্যাদি। তাঁর অনুবাদ কবিতাগ্রন্থ ঃ রবার্ট্র ফ্রস্টের কবিতা, খাজা ফরিদের কবিতা।

শামসুর রাহমানের শব্দ-ব্যবহার মধুর ও কোমল। তাঁর সকল কবিতার মধ্যে একই প্রকৃতির রূপাভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। শামসুর রাহমান তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই একটি নিরুপদ্রব নির্জনতা সন্ধান করেছেন।

www.icsbook.info

হাসান হাফিজুর রহমান

(১৯৩২-১৯৮৩)

হাসান হাফিজুর রহমানের বিশিষ্ট কৃতিত্ব হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সম্পাদনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের পক্ষ থেকে যে সমস্ত দলিল সংগৃহীত হয়েছিল সে সমস্ত বিপুল আয়তন দলিল সমূহ থেকে নির্বাচিত দলিলগুলো নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে এগুলো প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে হাসান হাফিজুর রহমানের দান অনন্যসাধারণ।

বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যকলার ক্ষেত্রে হাসান হাফিজুর রহমান একটি প্রধান ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আধুনিক কবি এবং কবিতা বিষয়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে যে গ্রন্থে তিনি আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করেছেন। আজীবন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁর কবিতায় সাংবাদিকতা সুলভ কোন প্রকাশভঙ্গি নেই। অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার উচ্চারণ এবং নিজের বক্তব্যকে উদাত্ত কণ্ঠে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তিনি রাখতেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম–"বিমুখ 'প্রান্তর" (১৯৬৩), "আর্ত শব্দাবলী" (১৯৬৮), "অন্তিম স্বরের মত" (১৯৬৮), "যখন উদ্যত সঙ্গীন" (১৯৭২), "বজ্রেচেরা আঁধার আমার" (১৯৭৬), "শোকার্ত তরবারী" (১৯৮২), "আমার ভেতরে বাঘ" (১৯৮৩) এবং "'ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী" (১৯৮৩)।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

(জন্ম-১৯৩৪)

ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা রচনা করে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন। এসব কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর একপ্রকার সফল নিরীক্ষা ছিল। "সাতনরীর হার" (১৯৬৫) বইটি দিয়ে বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রবেশ। এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্যে অন্নদাশংকর রায়ের ছড়ার আমেজ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম "কখনো রঙ, কখনো সুর" (১৯৭০), "কলমের চোখ" (১৯৭৫), "আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" (১৯৮১), "সহিষ্ণু প্রতীক্ষা" (১৯৮২), "বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা" (১৯৮৩), "প্রেমের কবিতা" (১৯৮২), "আমার সময়" (১৯৮৭)।

সৈয়দ শামসুল হক

(জন্ম ১৯৩৫)

বর্তমানে সৈয়দ শামসুল হক কথা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাধিক পরিচিত। কবিতা নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেছেন, বিশেষ করে গ্রামীণ শব্দ ও বাকভঙ্গি নিয়ে। গ্রামীণ ক্রিয়াপদও তিনি ব্যবহার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে- "একদা এক রাজ্যে" (১৯৬১), "বিশাল বিরতিহীন উৎসব" (১৯৬৯), "বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা" (১৯৭০), "প্রতিধ্বনিগণ" (১৯৭৩), "অপর পুরুষ" (১৯৭৮), "পরানের গহীন ভিতর" (১৯৮০), "নিজস্ব বিষয়" (১৮৮২),

www.icsbook.info

"রজ্জুপথে চলেছি" (১৯৮৮), "বেজাল শহরের জন্য কোরান" (১৯৮৯), "এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি" (১৯৮৯), "অগ্নি ও জলের কবিতা" (১৯৮৯), "কাননে কাননে তোমারি সন্ধানে" (১৯৯০), "আমি জন্মগ্রহণ করিনি" (১৯৯০), "তোরাপের ভাই" (১৯৯০)। তাঁর কয়েকটি মঞ্চ সফল কাব্য নাট্য আছে। যেমন, "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" (১৯৭৬), "গণনায়ক" (১৯৭৬), "নুরুলদীনের সারাজীবন" (১৯৮২), "এখানে এখন" (১৯৮৮)।

জাহানারা আরজু

(জন্ম ১৯৩২)

দীর্ঘকাল কবিতা লিখে আসছেন এবং বর্তমানে তাঁর কবিতা একটি নিজস্ব ভঙ্গী নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি, গৃহ-সংসার, পারিবারিক সত্তা এবং বাংলা ভাষা ও শব্দের জগত এগুলোই হচ্ছে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। তাঁর মোট কবিতা গ্রন্থ সতেরটি। গ্রন্থগুলোর নাম ঃ নীল স্বপ্ন (১৯৬২), রৌদ্র ঝরা গান (১৯৬৪), শোণিতাক্ত আখর (১৯৭১), আমার শব্দে আজন্ম আমি (১৯৮৩), ক্রন্দসী আত্মজা (১৯৮৪), বিমুক্ত পঙতি মালা (১৯৮৮), তৃষ্ণার্ত পানির চুম্বন (১৯৯০), সবুজ সবুজ অবুঝ মন (১৯৮০), বাদল মেঘে মাদল বাজে (১৯৮৭), ছড়ার নুপুর (১৯৮৮)। তিনি অনেকগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঃ একুশের রাষ্ট্রীয় পদক এবং কমর মুশতরী স্মৃতি পুরস্কার। নারী জীবনের নির্যাতন এবং দুর্ঘটনা নিয়ে তিনি 'শবমেহের তোমার জন্য' নামে একটি কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতা অবলম্বনে ১৮৮৯ সালে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মিত হলে ব্যাপক নারী আন্দোলনে রূপ পায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

(জন্ম ১৯৩২)

আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাভাষার অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত। তিনি লন্ডন থেকে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি পেয়েছেন।

যদিও উপন্যাস এবং গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি অধিক কিন্তু কবিতার রচনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশিষ্টতা আছে যা অস্বীকার করা যায়। মুক্তগতি এবং দীর্ঘচরণ সম্বলিত কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলোর নাম "মানচিত্র" (১৯৬১), "ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ" (১৯৬২), "সূর্য জ্বালার সোপান" (১৯৬৪), "লেলিহান পান্ডুলিপি" (১৯৭৫), "নিখোঁজ সনেট গুচ্ছ" (১৯৮৩), "আমি যখন আসব" (১৯৮৪), "সাজঘর" (১৯৯০), "ঝড় বৃষ্টি ও শস্যের কবিতা" (১৯৯১), "আমার রুবাইয়াৎ" (১৯৯১), "হরিৎ সনেটগুচ্ছ" (১৯৯১), "গাঙচিল" (১৯৯১) "সোনামতী বর্ণমালা" (১৯৯১)। সমাজ সচেতন কবি হিসাবে আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর পাঠকদের কাছে সমর্থন পেয়েছেন।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ

(জন্ম ১৯৩৬)

মোহাম্মদ মাফুজউল্লাহর প্রথম কাব্য 'জুলেখার মন' গ্রন্থে পুঁথিসাহিত্যের উপমা ও বাক্যরীতির প্রয়োগ প্রচেষ্টা আছে। অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারে একা' সাংবাদিকসুলভ বিচিত্র সমকালীন বিষয়নিষ্ঠ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'রক্তিম হৃদয়'

www.icsbook.info

(১৯৭০) ও 'আপন ভুবন' (১৯৭৫)। 'মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কাব্যসম্ভার' প্রকাশিত হয়েছে।

ফজল শাহাবুদ্দীন

(জন্ম ১৯৩৬)

দেহজ কামনা-বাসনার অনাবৃত প্রকাশ ও জীবনের নৈরাশ্য ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' (১৯৫৫), 'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর' (১৯৭২), 'আততায়ী সূর্যাস্ত' ও 'অন্তরীক্ষে অরণ্য'। ফজল শাহাবুদ্দীন তাঁর যৌবনকালের শরীরী অস্তিত্বকে এখনও সুনিপুণভাবে ধরে রেখেছেন। শব্দ ব্যবহারের চাতুর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করে আবেগের গতির পথে তিনি তাঁর কবিতার শব্দ এবং ছন্দকে নির্মাণ করেছেন। তার 'নির্বাচিত কবিতা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

আল মাহমুদ

(জন্ম ১৯৩৬)

গ্রাম বাংলার সঙ্গে আল মাহমুদের নিবিড় আত্মীয়তা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর'-এ তার পরিচয় আছে। পরিশীলিত কাব্যমধ্যে আঞ্চলিক শব্দের সুচারু ব্যবহারের এ নিরীক্ষায় তিনি নিমগ্ন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কালের কলস' এ (১৯৬৭) তার সাক্ষ্য বর্তমান। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩), 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' বা 'আল মাহমুদের কবিতা' 'প্রহরান্তের পাশ ফেরা', 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস।'

আল মাহমুদ পল্লীপ্রকৃতি থেকে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন থেকে অর্থাৎ জীবনের কর্ম ও উৎসব থেকে তাঁর কবিতার জন্য শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এ শব্দগুলো তাদের সহজ শ্রী নিয়ে আল মাহমুদের কবিতায় নতুন বৈভবে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন বিয়ের আসরে আসীন সুসজ্জিতা কন্যার চিত্তের উদ্বেলতাকে কবি 'গাঙের ঢেউয়ের' সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আল মাহমুদ কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লিখেছেন, উপন্যাসও লিখেছেন। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তার গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চারটি। এগুলো সবই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে "পানকৌড়ির রক্ত।" এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। এ যাবত প্রকাশিত তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে "পানকৌড়ির রক্তকেই" সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবন, পরিবেশ এবং গামীণ আশ্লেষণ তাঁর গল্পগুলোর প্রতিটি শব্দে এবং বাক্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি জন্মবধি যে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন তাকে কবিতায় যেভাবে রূপ দিয়েছেন গল্পেও সেভাবে রূপ দিয়েছেন।

আল মাহমুদ অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে উপন্যাস রচনাক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ কোন অঙ্গীকার নেই। উপন্যাসের সংখ্যাও তাঁর কম নয়। প্রায় নটির মত। কিন্তু উপন্যাসের সাহায্যে তিনি কথা সাহিত্যের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলেও তাঁকে সকলেই কবি হিসাবে গ্রহণ করবে।

www.icsbook.info

আল মাহমুদের কাব্য রচনার সময়কাল ৩০ থেকে ৩৫ বছর। এ সময়ের মধ্যে তিনি মোট ১১টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। 'লোক-লোকান্তর' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৭০ সালে 'কালের কলস' প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সালে, 'সোনালী কাবিন' ১৯৭৩, 'মায়াবী পর্দা দুলে উঠো'- ১৯৭৬, 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' ১৯৮০, 'বখতিয়ারের ঘোড়া' ১৯৮৫, 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস' ১৯৮৭, 'প্রহরান্তের পাশ ফেরা' ১৯৮৮ 'এক চক্ষু হরিণ' ১৯৮৯, এবং 'মিথ্যাবাদী রাখাল' ১৯৯৩। আল মাহমুদের কবিতা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, "আল মাহমুদের কবিতার মধ্যে আছে গ্রামীণ জীবন ধারার নিরুপদ্রব সততার অহংকার এবং প্রাকৃত শব্দ সম্ভারের অসাধারণ অর্থময়তা। যে বিপুল প্রতীতীতে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, আমাদের কাব্যক্ষেত্রের জন্য তা নতুন এবং একনিষ্ঠ সংযোজন। কবিতার শব্দ ব্যবহারের নিপুণতাই নয়, কিন্তু স্বতঃবেদ্য স্বাভাবিকতা এবং বিশ্বাসের অনুকূলতা নির্মাণে আল মাহমুদ নিঃসংশয়ে আধুনিক বাংলাভাষার একজন অগ্রগ্রামী কবি। বাংলাভাষার কাব্যকর্মে তাঁর প্রতিষ্ঠার একটি স্বতঃসিদ্ধতা এসেছে।"

মোহাম্মদ মনিররুজ্জামান

(জন্ম ১৯৩৯)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুর্লভ দিন' (১৯৬১), বুদ্ধির দীপ্তি ও আবেগের প্রাবল্যের দ্বারা চিহ্নিত। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'শঙ্কিত আলোকে' (১৯৬৮) সমাজ সচেতনতা ও তির্যক ব্যঙ্গ উপস্থিত। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিপন্ন বিষাদ' (১৯৬৮) আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা, সংক্ষোভ, হতাশা ও সম্ভাবনার বিচূর্ণ সমাহার। তাঁর কবিতায় একাডেমীক এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা মেধা শাসিত ও মননসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর কবিতায় আবেগ যে নেই একথা সত্য নয়। তাঁর অনেক কবিতায় গীতিময়তা লক্ষ্য করি। সমসাময়িক কালের হতাশা, ক্ষোভ, সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও প্রেরণা তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। তিনি জীবনবাদী এবং বর্তমান সময়কে সর্বক্ষণ স্পর্শ করতে চান। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম ঃ "প্রতনু প্রত্যাশা" (১৯৭৩), "ভালবাসার হাতে" (১৯৭৬), "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার" (১৯৮৪), "তৃতীয় তরঙ্গে" (১৯৮৪), "কোলাহলের পর" (১৯৯০), "ধীর প্রবাহে" (১৯৯২), "অশান্ত অশোক" (১৯৭৬), "সঙ্গী বিহঙ্গী" (১৯৮৪)।

রফিক আজাদ

(১৯৪৩)

বর্তমান সময়ে রফিক আজাদের কবিতা শব্দ ব্যবহারের একটি নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। কবির কাছে বর্তমান সময়টি একটি দুর্ভাগ্যের সময় এবং হতাশার সময়। এ দুর্ভাগ্য এবং হতাশা যেমন এদেশের সমাজ জীবনে, রাজনীতিতে এবং কর্মের প্রবঞ্চনায়, তেমনি এ কবিতাগুলো কবির ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য ও বেদনারও।

www.icsbook.info

শুধুমাত্র নৈরাশ্য ও বেদনা কখনোই ভাল কবিতা নির্মাণ করতে পারে না কিন্তু রফিক আজাদের কবিতার মধ্যে একটি সাহসী প্রতিবাদ আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা একটি নতুন প্রতিবাদের সুর দেখতে পাই। প্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং সামাজিক। কিন্তু তাহলেও তাঁর কবিতা কোন বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি নিজস্ব সত্তায় তাঁর সময়কালের বক্তব্যকে নিপুণ স্পষ্টতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। তিনি বর্তমান কালের ধ্বংস ও শান্তির পারস্পরিক অবলম্বনগত স্থিতিকে কবিতায় প্রতিপাদ্য করেছেন। রফিক আজাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থের নাম ঃ "অসম্ভবের পায়ে" (১৯৭৩), "সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে" (১৯৭৪), "চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া" (১৯৭৭), "সশস্ত্র সুন্দর" (১৯৮২), "এক জীবনে" (১৯৮৩), "হাতুড়ীর নীচে জীবন" (১৯৮৪) এবং "পরিকীর্ণ পাঠশালা আমার স্বদেশ" (১৯৮৫)। যদিও রফিক আজাদ ঢাকা শহরেই বসবাস করেন কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের মুগ্ধতা এবং সততার সাক্ষর আছে। নগর অতিক্রম করে তিনি বারবার গ্রামের বৃক্ষলতা পরিকীর্ণ জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেলবার চেষ্টা করেছেন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ
(জন্ম ১৯৪৩)

"জন্মান্ধ কবিতা গুচ্ছ" নমক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের আবির্ভাব। তখন সকলেই কেমন যেন আহতবোধ করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন অনেকেই, কবি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কঠিন ও কোমল শব্দের অন্বয় সাজিয়ে কোন্ অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন? যখন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কবি বয়সে তরুণ এবং জীবনের অভিজ্ঞতার পথে প্রথমেই পা বাড়িয়েছেন। তাই সকলে এ কবিতারগুলোকে যৌবনের বিক্ষুব্ধ চিত্রের প্রতিবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মান্নান সৈয়দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে "জ্যোস্না রৌদ্রের চিকিৎসায়" আমরা নতুন ধরনের কিছু চিত্র রচনা পাচ্ছি। এসময়কার কবিতায় অনেক উপমা এবং শব্দ স্থাপনার প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দ দাশকে উপস্থিত দেখতে পাই। একজন কবির পক্ষে যথার্থ শব্দের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন। এই অনুসন্ধান কর্মে আবদুল মান্নান সৈয়দ দীর্ঘকাল হলো ব্রতী রয়েছেন। তার "জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ" প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, "জোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা" ১৯৬৯ সালে, "ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ" প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে, "পরাবাস্তব কবিতা" ১৯৮২ সালে এবং "কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড" ১৯৮২ সালে।

নির্মলেন্দু গুণ
(জন্ম-১৯৪৬)

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের কবিদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণ রাজনৈতিক সংগ্রামের কবিতা লিখে থাকেন বলে সবাই বলে। তিনি মনুষ্য সমাজের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের যে

www.icsbook.info

কথা মার্কসবাদীরা দীর্ঘকাল ধরে বলে চলেছেন সেই শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। এই শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি তাঁর কবি জীবনের নিত্যদিনের সংগ্রাম বলে মনে করেন। দুর্বলের প্রতি যে অত্যাচারের কথা তিনি বলেন সে অত্যাচার হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে একটি দলের অকুশল। তিনি সে অকুশলের বিরোধিতা করতে চান এবং যে দলটি রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিতদের পক্ষ নিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন সেই দলটির সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা। তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলো 'ইস্‌কা' নামক কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। একসময় নির্মলেন্দু গুণ প্রেমের কবিতা লিখতেন। তাঁর "ও বন্ধু আমার" গ্রন্থে তিনি প্রেমের একটি অমরাবতী নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আবুল হাসান
(১৯৪৭-৭৫)

আবুল হাসানের কবিতায় উত্তেজনা নেই, প্রবল প্রতিবাদ নেই কিন্তু অসহায় মানুষের শংকিত পদক্ষেপের যাত্রা আছে। একটি কবিতায় তিনি বলছেন, তাঁর সকল "অবোধ বোধ" একপ্রকার অলসতার মতো। তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত অসুস্থতার অনুভূতি বারবার এসেছে। তিনি তাঁর অসুখকে বলেছেন "অমৃতের এক গুচ্ছ অন্ধকার।" আবুল হাসানের "রাজা যায় রাজা আসে" কাব্যগ্রন্থে তাঁর স্বদেশ প্রেমের গুঞ্জরণ আছে, কিছুটা রাজনৈতিক চিন্তাও আছে। কিন্তু সকল কিছু অতিক্রম করে এমন একটি গৃহে প্রত্যাবর্তনের তার বাসনা আছে যেখানে প্রাচুর্য নেই কিন্তু দারিদ্রের অমোঘ নিয়তি আছে। আবুল হাসান বর্ণনার স্বচ্ছতায়, ঋদ্ধতায় ও সুস্পষ্টতায় এবং একটি কল্লোলিত আন্তরিকতায় আমাদের মনকে সহজেই জয় করে নেন। আবুল হাসানের কাব্যগ্রন্থের নাম "রাজা যায় রাজা আসে" (১৯৭৩), "যে তুমি হরণ করো" (১৯৭৪) এবং "পৃথক পালংক" (১৯৭৬)।

শহীদ কাদরী
(জন্ম-১৯৪২)

বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে যথার্থ নাগরিক সত্তার কবি একমাত্র শহীদ কাদরী। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই প্রথম কবি যিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে স্বকীয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "উত্তরাধিকারে" এর বিস্তৃত পরিচয় আছে। একটি নগর বিত্তবান মানুষের যেমন, তেমনি তা পথচারী অসতর্ক পথিকেরও। শহীদ কাদরীর কবিতা একজন নিসঙ্গ পথিকের একাকী অবস্থার স্মারকলিপি। যেহেতু তিনি একটি নগরে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে চলেছেন সুতরাং কোন সঙ্গীর তাঁর প্রয়োজন নেই। শহীদ কাদরী তাঁর একাকীত্বকে তাঁর বিশ্বাস ও আনন্দের উপকরণ করেছেন। তিনি যা দেখছেন তা যেন একাকী দেখছেন এবং সে দেখার সমমর্মী কাউকে সঙ্গে রাখছেন না। বৃষ্টিতে হোক, দিবালোকে হোক অথবা ইন্দ্রজাল বিস্তৃত তারকাখচিত রাত্রিতে হোক সবক্ষেত্রে সময়কালের উপভোগটা কবির একার। "উত্তরাধিকার" কাব্যগ্রন্থের দ্বারাই শহীদ কাদরীর যথার্থ কবি স্বীকৃতি। এই গ্রন্থটি ছাড়া তাঁর আরো দু'টি কাব্যগ্রন্থ আছে। কিন্তু

সেগুলোতে তিনি বড় বেশী সাম্প্রতিকতায় জড়িয়ে পড়েছেন। "উত্তরাধিকার" প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। "তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তম" ১৯৭৪ সালে এবং "কোথাও কোন ক্রন্দন নেই" প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে।

আজীজুল হক
(জন্ম ১৯৩০)

আজীজুল হক দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন। কিন্তু রচনার বৈশিষ্ট্যের কারণে যেভাবে তাকে সকলের দৃষ্টির সামনে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল সেভাবে আমরা তাকে দেখতে পাইনি। তার প্রধান কারণ তিনি রাজধানীর বাইরে থাকেন এবং সাধারণতঃ রাজধানীতে আসেন না এবং এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টাও করেন না। অথচ তাঁর মধ্যে একটি অনুভূতিপ্রবণ মন আছে। মূলত লোকজ উপাদান গ্রহণ করে তিনি কবিতা লিখে থাকেন। এবং তাঁর কবিতার মধ্যে একধরনের শান্ত ও নির্জন অনুভূতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম "ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে", "বিনষ্টের চিৎকার", "ঘুম ও সোনালী ঈগল"।

আবু বকর সিদ্দিক
(জন্ম ১৯৩৬)

আবু বকর সিদ্দিক কবিতাই প্রথমে লিখতেন। বর্তমানে কথা সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সকলের দৃষ্টিতে পৌছেছেন। তাঁর কথা সাহিত্যের মধ্যে মানবতার একটি আদিমরূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টায় তিনি সফলকামভাবে নাগরিক নিরীক্ষার বাইরে দৃষ্টি ফেলেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে লোকজ স্মৃতি এবং বিশ্বাসকে তিনি কবিতার উপাদান করবার চেষ্ট করেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম ঃ "ধবল দুধের স্বরগ্রাম", "বিনিদ্রকালের ভেলা", "হে লোক সভ্যতা", "মানুষ তোমার বিক্ষত দিন", "হেমন্তের সোনালতা", "নিজস্ব এই মাতৃভাষায়।"

ওমর আলী
(জন্ম-১৯৩৯)

দীর্ঘকাল ধরে ওমর আলী কবিতা লিখে চলেছেন এবং তিনি কবিতার উকরণ পেয়েছেন বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির পুরুষ এবং রমণীদের কাছ থেকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি একসময় খুব সুনাম অর্জন করেছিল। গ্রন্থটির নাম "এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি।" এ কাব্যগ্রন্থটিতে বাংলাদেশের গ্রাম্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শ্যামল রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। দীর্ঘকালের অভিনিবেশে ওমর আলী বাংলাদেশের কাব্য ভবনে একটি নিজস্ব মন্ডলী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের না, "অরণ্যে একটি লোক", "ডাকছে সংসার" "যে তুমি আড়ালে", "শুধু তোমাকে

www.icsbook.info

ভাল লাগে", "ছবি", "পুরনা বেগম"। এছড়াও তাঁর আরো অনেক ক'টি কবিতার বই আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে জীবন এবং স্বপ্নের সংমিশ্রণ আছে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর একটি আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

ফরহাদ মাজহার
(জন্ম-১৯৪৭)

ফরহাদ মাজহার রজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করেন, সমাজের বঞ্চনা এবং অবিবেচনা নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রখেন। এগুলো তাঁকে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পরিচয়ের বৃত্তে এনেছে। কিন্তু কবি হিসাবে ফরহাদ মাজহার যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লোকজ উপাদান এবং নাগরিক প্রত্যয়কে তাঁর কবিতায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অনেকগুলো প্রকাশিত কাব্য রয়েছে। এগুলোর নাম ঃ "আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে", "এবাদতনামা", "দরদী বকুল", "অসময়ের নোটবই", "বৃক্ষ" "অকস্মা" "রপ্তানীমুখী নারী মেশিন", "খোকন ও তার প্রতিপুরুষ"। তাঁর বইয়ের নামগুলো দেখলে বোঝা যায় যে এগুলোর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ ও শ্লেষ আছে।

মুহম্মদ নূরুল হুদা
(জন্ম ১৯৪৯)

মুহাম্মদ নূরুল হুদা দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন এবং এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটির মতো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রাগৈতিহাসিক উপাদান কবিতায় ব্যবহার করবার চেষ্টা করেন। তাঁর কবিতার নামগুলো দেখলেই এট বোঝা যয়, যেমনঃ "আমরা তামাটে জাতি", "শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি", "জাতি সত্তার প্রতীক।"

আবিদ আজাদ

বাংলাদেশের এ সময়কার কাবিদের মধ্যে আবিদ আজাদ নিজের বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতা সুসজ্জিত বাগানে পরিভ্রমণ নয়। বরঞ্চ এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে পদচারণ। যে অবস্থায় হোক তিনি কবিতার পদচারণকে সুস্পষ্ট করতে চান, সুদৃঢ় করতে চান।

কবি আবিদ আজাদ বর্তমানকালের অবক্ষয়কে এবং দুর্যোগকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন। এখানেই তাঁর কবিতার সার্থকতা। তিনি রাজনৈতিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেননি অথবা সংস্কারক হিসেবে অতিব্যস্ত হননি। তিনি নিশ্চিন্তে একজন কবি হিসেবে তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটকে উন্মোচন করেছেন। আবিদ আজাদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ 'ঘাসের ঘটনা' (১৯৭৬), 'আমার মন কেমন করে' (১৯৮০), 'বনতরদের মর্ম' (১৯৮২), 'শীতের রচনাবলী' (১৯৮৩), 'আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি' (১৯৮৭),

www.icsbook.info

'ছন্দের বাড়ি ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৮৭), 'তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?' (১৯৮৮), 'আমার কবিতা' (১৯৮০), 'খুচরো কবিতা' (১৯৯০)।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন
(জন্ম-১৯৫০)

খোন্দকার আশরফ হোসেনের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের একটি নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। এ নিপুণতাটি তৈরী হয়েছে মোটামুটি একাডেমিক ভাব প্রকল্প থেকে। এটা বাংলা কবিতার জন্য একটি নতুন অনুশাসন। তবুও একথা বলতেই হয় যে পঞ্চাশের দশকে যাদের জন্ম সেসব কবিদের মধ্যে খোন্দকার আশরাফ হোসেন নিজস্ব একটি কাব্য ভুবন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থগুলোর নাম, "তিন রমণীর ক্বাসিদা", "পার্থ তোমার তীব্র তীর", "জীবনের সমান চুমুক" এবং "সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর।"

বর্তমান সময়ে যঁরা ক্রমান্বয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নিজেদের বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায় ঃ বিমল গুহ, বেলাল চৌধুরী, জাহিদুল হক, খালেদা এদিব চৌধুরী, শিহাব সরকার, সুহিতা সুলতানা, রবিউল হুসাইন, রেজাউদ্দিন ষ্টালিন, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল প্রমুখ। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি বিশেষ মানসিকতার লক্ষ্য করা যায় তাহলো বর্তমানের বিপর্যস্ত সময়ের কারণে এক প্রকার দুঃখবোধ।

———

www.icsbook.info

www.icsbook.info

নির্ঘন্ট

www.icsbook.info

www.icsbook.info

অ

অক্ষয়কুমার দত্ত- ৬৪, ৬৫,১৮২
অক্ষয় কুমার বড়াল–২৩৩–৩৪
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী- ২৪৪
অক্ষয়কুমার চৌধুরী–২৬৩
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত–৩১৩
অজিত দত্ত–৩১৮
অতুলপ্রসাদ সেন–২৩৯
অতুলকৃষ্ণ মিত্র–২৭২–৭৩
অন্নদা মঙ্গল–২০
অন্নদাশংকর রায়–১৬২
অনুবাদ কবিতা–৩২১–২৪
অন্নদামোহন বাগচী –৩৫৫
অপেরা বা গীতাভিনয়–২৬৩
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর–১৩৯
অবলাকান্ত মুজমদার–৩৫৬
অভিজ্ঞান শকুন্তলা–২৫৬
অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন–২৬৮
অমিত্রাক্ষর ছন্দ–১৮৯,১৯১,১৯৫,২৩৬
অমৃতলার বসু–২৭০
অমিয় চক্রবর্তী–৩১৩, ৩১৭–১৮
অল ইন্ডিয়া রেডিও–২৭৭
অসহযোগ–১২

আ

আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ, মৌলানা–১১৫, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১২৫, ১৬৮
আকবর হোসেন–৩৪৪
আকবর উদ্দীন–১৫৭,১৫৮,৩৫৪–৫৫
আকবর আলী–১৬৯
আকরাম হোসেন–৩১
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস–৩৪১, ৩৫০
আঙুর–১৭৬
আজিমউদ্দীন, শেখ–২৬৫
আজিজুল হক–৩৯৫
আজিজুল হক, হাসান–৩৪৯
আতাহার আহমদ–৩৪৪
আত্মশক্তি–১৭৬
আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা– ৩৭৩–৭৪
আনন্দচন্দ্র –৫৪
আনন্দচন্দ্র মিত্র–২১১
আনন্দমঠ–২৯৪
স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক উপন্যাস–৩২৯
আনিস চৌধুরী–৩৫৮
আনিসুজ্জামান–৩৬৯
আনোয়ারুল কাদির–১৫০
আধুনিক সাহিত্য–৩,২২৮,২৪৫
আফসারউদ্দিন আহমদ, কাজী–৩৩৩
আবদুল ওহাব নজদি–৮
আবদুল করিম, মোহাম্মদ–১১৩,২৬৭
আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী–১১৬
আবদুল হাকিম, মোহাম্মদ, মৌলবী ও মোহাম্মদ আলী হাসান–১১৯
আবদুর রহমান খাঁ, খান বাহাদুর–১২০
আবদুর রহীম, মোহাম্মদ–১২২
আবদুল ওদুদ, কাজী–১৩০, ১৬০, ১৬১, ১৬৫,১৬৭
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ–১৪১–৪২ ১৭০
আবদুল কাদির–৩১১
আবদুল গণি হাজারী–৩২৪, ৩৮৭
আবদুল হক–৩২৪,৩৫৮,৩৫৯
আবদুল গাফফার চৌধুরী–৩৩৮,৩৪৮
আবদুল হাই, মুহম্মদ–৩৭১,৩৬৬–৩৬৭
আবদুল মান্নান সৈয়দ–৩৭২, ৩৯৩,৩২১
আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন–৩৭৬
আবদুর রশীদ খান–৩৮৮

www.icsbook.info

আবদুস সাত্তার–৩৮৮
আবদুস শাকুর–৩৫০
আবদুল্লাহ আল মামুন –৩৬২
আবদুস সুলতান, সৈয়দ–৩৭১
আবদুল খালেক, মুহম্মদ–৩৭১
আবদুল আহাদ –৩৭১
আবুল হোসেন, কাজী–৩৪৪
আবুল হাসনাত–৩৪৫,৩৫০
আবুল ফজল আবদুল করিম, মৌলভী–১১৯
আবুল মনসুর আহমদ–১৩০, ১৬১, ৩৪৪, ৩৪৬
আবুল হোসেন, সৈয়দ–১৬৭, ১৭২
আবুল ফজল–১৬৯, ১৭০, ৩২১, ৩৪৪, ৩৬৬
আবু ইসহাক–৩৩৫
আবুল কালাম শামসুদ্দীন–৩২৩
আবু রুশদ–৩২৪,৩৩২,৩৪৬
আবু জাফর শামসুদ্দীন–৩২৪,৩৩১
আবু বকর সিদ্দিক–৩৩৭, ৩৫০, ৩৯৫
আবুল ফজল শামসুজ্জামান–৩৭২
আবুল হোসেন–৩৮৩
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ–৩৮৯
আবুল হাসান–৩৯৪
আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন–৩৪৫,৩৪৯
আবিদ আজাদ–৩৯৬–৯৭
আব্বাস আলী, মৌলভী–১১৯
আবদুর রহীম, শেখ–১৪৯, ২১৬
আব্দুল হাই, মোহাম্মদ–১৭৫
আবদুল কাদির–১৭৫,২২০
আবদুল হামিদ খান ইউছুফজয়ী–২৪৮
আবদুল লতিফ, নবাব–১৮২, ২১৩
আমজাদ হোসেন–৩৪৫
আমীর হামজা–২০,২১
আমীর আলী, সৈয়দ–২১৩,২১৬
আমীর খসরু–২৪৯
আরিফুর রহমান–৩৫৯
আর্জুমান্দ আলী চৌধুরী–৯
আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য–১৭৫
আলালের ঘরের দুলাল–৭, ১৮৮
আলী আহসান, সৈয়দ– ১২৬, ১৭৫, ৩১০, ৩২১, ৩২৩, ৩৭১, ৩৮৩–৮৫, ৩৫৯, ৩৬' ৩৬৮
আল্লামা শিবলী নোমানী–১২৬,১৪৮
আল এসলাম–১৫৭,২১৭,২১৯
আলাওল–১৭
আলাউদ্দীন আল আজাদ–৩৩৬–৩৭, ৩৯, ৩৪৮, ৩৫৮
আলী হোসেন–৩৭২
আলী আশরাফ, সৈয়দ–৩৮৫
আলী জাকের–৩৬০
আলী আজম–৩৭১
আল মাহমুদ–৩৯১
আশরাফুজ্জামান–৩৪৪
আশকার ইবনে শাইখ–৩৫৬,৩৫৯
আশরাফ আলী খান–৩২১
আশরাফউজ্জামান–৩৩১
আশরাফ সিদ্দিকী–৩৭৫, ৩৮৭
আশরাফ হোসেন, খোন্দকার–৩৯৭
আহমদ ছফা–৩৪–৪১
আহমদ শরীফ–৩৬৮–৬৯
আহমদ বশীর–৩৫০
আহসন হাবীব–৩৮২

ই

ইউছুফ জোলেখা–২১
ইকবাল–১৪৮,৩২১
ইকবাল, সৈয়দ–৩৫

www.icsbook.info

ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজী-৩
ইতিহাসমালা-৫৪
ইদ্রিস আলী শেখ-১৬৫
ইদ্রিস আলী শেখ, মোহাম্মদ-৩১০
ইনিদ-১৯৩
ইন্ডিয়ান মিরর-৬২
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-৮৪
ইন্দু সাহা-৩৪৪
ইবসেন-৩৫৯
ইব্রাহীম খাঁ-১৫৭,৩৫৩,৩৭১
ইব্রাহীম খলিল-২৫৯
ইমাম গাজ্জালী-৯
ইমদাদুল হক, কাজী-১৫০,১৫১
ইমরুল কায়েস-৩৫
ইমদাদুল হক মিলন-৩৪৪,৩৫
ইয়ং বেঙ্গল-৫৯,৬৬,১৯১
ইলিয়াদ-১৯৩,১৯৪,১৯৮,২১১
ইলিয়ট, টি,এস-৩০৭,৩১২,৩১৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-১৯, ৬৬-৭০,
১৮৩, ১৮৮, ২০১
ঈশ্বর গুপ্ত-২৭,২৮,৭৭,১৮১-১৮৬
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-২১১
ইসলামী সাহিত্য -৯৯-১৩২
ইসলামী ইহিাস ও সংস্কৃতিমূলক রচনা-৯৯
-১০৯
ইসলাম দর্শন-১০৫
ইসলামী ফাউণ্ডেশন-১২২
ইসলাম প্রচারক-১৪১
ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ-১৪৮
-৪৯
ইসমাইল মারাঠা-২৩৬
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী- ৪,৫,১,৫২,১৮৮
ইয়েটস, উইলিয়াম বাটলার-২৮৬

উ
উইলিয়াম হান্টার-১০,
উইলিয়াম কেরী-৫৩,৫৪
উনিশ শতকের মহাকাব্যের ধারা
-১৯৯-২২১
উনিশ শতকের গীতিকাব্য-২২৩-৫২

এ
একরামুদ্দীন-১৭
একেই কি বলে সভ্যতা-২৭২
এনামূল হক, মুহাম্মাদ, ডক্টর-১১৫,১৭০
এনামূল হক,মুহম্মদ-৩৭১
এন্টনি ফিরিঙ্গী-৩০
এপিসাইকিডিয়ানে-২২৬
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ-১৪৫
এফ্রোদিতি-২৮৩
এমদাল আলী, সৈয়দ-১১৪,২৪৮-৫০
এলারটন-৫৪
এসলাম তত্ত্ব-১০
এয়াকুব আলী চৌধুরী-১২৭,১২৮

ঐ
ঐতিহাসিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস-৩২৯

ও
ওডিসি-১৯৩,১৯৪
ওভিদ-১৮৯,১৯৫
ওমর খৈয়াম-১৬৬, ৩২২
ওমর আলী-৩৯৫
ওসমান গণি-১২৭
ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ-১২৬,১৬৬,১৬৭
ওয়াল্টার স্কট-১৮৭
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ-৩৩৩-৩৪,৩৪৬-৪৮,
৩৫৭-৫৮, ৩৫৯

www.icsbook.info

ওয়াজেদ আলী, এস–১২৯,১৫৪–৫৬
ওহাবী–৯,১১,১৪,৯৯,১৪৮

ক
কথপোকথন–৫৪
কবিগান–২৮–৪০
কবিওয়ালা–১৯,২৭,২৮,১৮৬,২১৩, ২২৫
কবির চৌধুরী–৩২৪,৩৫৯
কমলাকান্তের দপ্তর–১৬২
করুণানিধন–৩০
কলিকাতা কমলালয়–৫৯
কলকাতা কেন্দ্রিক নতুন সাহিত্য
জীবন–১৭৯,১৯৮
কল্লোল–৩১৮
কল্লোল যুগ–৩১৩
কল্যাণ মিত্র–৩৬০
কংগ্রেস–১৪৮, ১৬৮
কাঙ্গাল হরিনাথ–৮৫
কাছাছোল আম্বিয়া–২৫
কাজী আকরাম হোসেন–১৯
কাদের আলী–২৬৮
কাদের নেওয়াজ, কাজী–৩১১,৩১২
কামাল পাশা–৩৬
কামিনী রায়–৩১১,২৩৫–৩৬
কারবালা সংক্রান্ত সাহিত্য–১৩১,১০২
কালী বন্দনা–৪৫,৪৭
কালিপ্রসন্ন সিংহ–৭১,৭২,২৫৬,২৫৭
কালিদাস–২৩
কালীয়দমন–২৫৫
কালিদাস রায়–৩০
কালিকলম–৩১৮
কালিপ্রসন্ন ঘোষ–১৩৯
কাশিদাস–৫৩
কাশিনাথ তর্কালঙ্কার–৫৪
কায়কোবাদ–১,৩,১৪,১৪৮,২১২.২০৬,২৩৬
কিপলিঙ–৩৭
কিরণধন–৩০
কীটস–১৯১
কীর্ত্তিবিলাস নাটক–২৫৭
কেদারনাথ মিত্র–১১৩
কেষ্টা মুচি–৩২
কুলীনকুল সর্বস্ব –২৫৬, ২৬১
কুদরত–ই–খুদা, মুহম্মদ, ডক্টর –১২০
কোরআনের অনুবাদ ও মর্মবাণী
সংকলন–১১৮,১২২
কোরবান আলী, মোহাম্মদ–১৬৫
কৃত্তিবাস–৫৩,২৬৯
কৃপায় শাস্ত্রের অর্থভেদ–৫১
কৃষ্ণচন্দ্র–৪৬
কৃষ্ণচন্দ্র মুজুমদার –২৪৪
ক্লাইভ বেল–১৭৩, ১৭৪
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ–২৭৪, ২৭৫
খয়েরন্নেসা খাতুন–১৫৩, ১৫৪
খালিদা এদিব হানুম–১৭৭
খেলাফত আন্দোলন–১৬৮,৩০৬,৩০৯
খোন্দকার শামছুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী–৭২
খোন্দকার মোঃ ইলিয়াস–৩৭১

গ
গগন হরকরা–৪৫
গরীবুল্লাহ–২
গল্পগুচ্ছ–২৯৩
গফুসওয়ার্দী–৩৫৯
গারসাঁ দ্য তেসি–৫৮
গিরিশচন্দ্র সেন– ১১০, ১১৮, ১২৩
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী–২৩৫
গিরিশচন্দ্র ঘোষ– ২৬৯–৭

www.icsbook.info

গুলিস্তাঁ–১৫৫
গোলে বকাওলি–২৬
গোস্বামীর সহিত বিচার–৫৭
গোলাম হোসেন–৭৩,২৬৬,
গোলাম রসুল খোন্দকার–১১৫
গোলাম মোস্তফা–১২৫. ৩০৯–১০, ৩২১
গোলাম হোসেন, মোহাম্মদ–১৭২,১৭৩,২৫২
গোবিন্দচন্দ্র দাস–৩১৯
গৌড়ীয় ব্যাকরণ–৫৭
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য–৬১
গৌরদাস বসাক–১৯০,
গাঁজলা গুঁই–৫৪
গ্রামবার্তা–৮৫
গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস–৩২৭–২৮
গ্যয়টে–১৯২,৩১৫

চ

চন্ডীদাস–৩০
চন্ডীমঙ্গল–৩১৯
চন্দ্রনাথ বসু–৮৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত–৫

ছ

ছমিরদ্দীন আহমদ–১৪৪
ছহি জৈগুনের পুঁথি–২৩,২৪
ছায়াবীথি–১৭৫
ছোটগল্প–৩৪৬–৫০

জ

জগদীশচন্দ্র বসু–১৩৭
জঙ্গনামা–২১, ২৬
জসিম উদ্দীন –৩১৯,৩৬১,৩৭১
জয়েনউদ্দীন, সরদার–৩৩৪,৩৪৮
জহির রায়হান–৩৩৭,৩৪৯
জহুরুল হক–৩৭১
জব্দাতুল মাসায়েল–১১৮
জাতীয়তামূলক কয়েকটি নাটক–২৬৪
জামী–১৬৬
জারিগান–৩১
জালাল উদ্দীন রুমি–১৬৬
জাহ্নবী–২৩৫
জিয়া হায়দার–৩৬০
জীবনানন্দ দাস–৩১৩, ৩১৫–১৬
জীবনীগ্রন্থ–৩৭৩
জেমস্ লঙ–২৬১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর–২৬৩–৬৪
জোহায়ের–৩০৫

ট

টমাস হার্ডি–১৪৪
টাসো–১৮৯
টেকচাঁদ ঠাকুর–৭১,১৮৮

ড

ডাকঘর–২৭৬
ডিভাইন কমেডী–২৫
ডিরোজিও– ৫৯,৭০
ড্রিংক ওয়াটার বীটন–১৯০

ঢ

ঢাকা প্রকাশ–২৪৪

ত

তত্ত্ববোধিনী–২৬৩
তত্ত্ববোধিনী সভা–৬১–৬৩,২৩১
তত্ত্ববোধিনী যুগ–৬৭–৭৩

www.icsbook.info

তরিকুল আলম–১৫২
তাফসীরে ইবনে কাসির–১২২
তাফহীমুল কোরআন–১২২
তারাচাঁদ–১৮২
তারাচাঁদ দত্ত–৫৯
তারা কানাথ গঙ্গোপাধ্যায়–৮৩
তারাচরণ শিকদার–২৫৬–৫৭
তারাশংকর তর্করত্ন–৬৫
তালিম হোসেন–৩৮৬
তাসাদ্দুক হোসেন–৩৪৪
তীতুমীর– ৮, ৯
তুহ্‌ফাতুল মুয়াহ হে দীন–৫৮
তোতা ইতিহাস–৫৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়–৮৪

দ

দাদ আলী. মুনশী–২৪৭–৪৮
দান্তে–১৮৯,১৯৩,২০৫
দামোদর মুখোপ্যাধ্যায়– ৮৩
দাশোরথী রায়– ৩৯. ৪০
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর–১৪০.২৩০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়–২৪৫–৪৭.২৭৩–৭৪
দিলারা হাশেম–৩৪৫
দীওয়ান–২৪৫
দীওয়ান–ই হাফিজ–১২৬
দীনবন্ধু মিত্র–১৮২,২২৯,২৬১,২৬৩,২৬৭
দীন মোহাম্মদ, কাজী, ডঃ–১২১, ১৬১,১৬২
দীন মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায়–১০৭–১০৮
দীনেশচন্দ্র সেন–৪৮
দুদু মিয়া–৮
দুর্গেশনন্দিনী–৭০
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– ৬১.২৮২
দেবেন্দনাথ সেন–২৩২–৩৩

দোভাষী পুথি, কবিগান, কয়েকজন কবিওয়ালা, পাঁচালী, বাউল, কালিবন্দনা. যাত্রা–১৭–৪৮
দৌলতুন্নেসা বেগম–৩৪৪

ধ

ধুমকেতু–১৬৩.১৬৪,৩০৭

ন

নঈমুদ্দীন, মৌলভী–১৮৮
নওরোজ–১৬৩, ১৭৬
নওয়াব আলী চৌধুরী, সৈয়দ–১১৪
নওয়াব ফয়েজুন্নেসা–৮৯
নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী–১৪০–৪১।
নগর জীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস–৩২৮
নগর ও গ্রামের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস–৩২৮
নজরুল, ইসলাম, কাজী–১৫, ১২৯, ১৬৩. ১৬৪, ১৬৮. ১৭৬, ২৩৯, ২৭৫–৭৭. ৩০১, ৩০৫, ৩০৯, ৩১০,৩-১২, ৩১৩, ৩১৯. ৩২১–২২
নজিবর রহমান, মোহাম্মদ–১৬৪–৬৫
নন্দন কুমার রায়–২৫৬
নবনূর–১৪১, ২৪৮
নববাবু বিলাস–৬০
নবযুগ–১৬৭
নববিবি বিলাস–৬০
নবাব আবদুল লতিফ–১২
নবীবংশ–৭
নবীনচন্দ্র সেন–২৭, –১১. ːː১২. ২১৩, ২১৫. ২৩৪. ২৩৯. ২৪১, ২৮৯
নাজমুল আলম–৩৪৯

www.icsbook.info

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ
সুফিয়ান-১৭৫,৩৭১
নাটক-৩৫৩-৩৬২
নামদার, মুনশী-২৬৫
নিখিল আসাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
সম্মেলন-১৫৬
নিত্যকৃষ্ণ বসু-২৪৫
নিতাই বৈরাগী-৩০,৩৪
নির্মলেন্দু গুণ- ৩৯৩-৯৪
নিযামী-১৬৬
নীল দর্পন-২৬৭
নীলিমা ইব্রাহীম-৩৫৯
নুরুল ইসলাম খান-৩৪৯
নুরুল মোমেন-৩৫৫
নুরুল হুদা, মোহাম্মদ-৩৯৬
নুরুন্নেছা খাতুন-১৫২,১৫৩
নৃসিংহ-২৯,৩৩

প

পর্তুগীজ পাদ্রী-৫১
পথ্য প্রদান-৫৭
পদ্মলোচন চূড়ামণি-৫৪
পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দিন আহমদ
মাশহাদী-৯৫-৯৬,১৪৩
পরশুরাম-১৬২
পল ভালেরী-৩১৫
পল্লী সমাজ-১৫০
পাঁচালি-৩৮-৪০
পাগ্লাশাহ-৪৩-৪৪
পাষন্ড পীড়ন-৫৭
পুঁথি সাহিত্য-১৪
পুরুষ পরীক্ষা-৫৫
পেত্রার্ক-১৯৭
প্রগতি-৩১৮
প্রথম বিয়োগান্ত নাটক-২৫৭
প্রবর্তক ও নিবর্তের সম্বাদ-৫৭
প্রবাসী-২৮৮
প্রবন্ধ সাহিত্য-৩৬৩-৭৬
প্রবাসী-২৮৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-১৪২
প্রমথ চৌধুরী-১৩৮,১৭৪,২৯৩,৩০১
প্রমিথিউস-২২৬
প্রিয়ম্বদা দেবী-২৩৮-৩৯
প্রেমেন্দ্র মিত্র-৩১৩
প্যান ইসলামী-১৪৮
প্যারাডাইস লস্ট-১৯৩-৯৪
প্যারীচাঁদ মিত্র-৭০

ফ

ফজল শাহাবুদ্দীন-৩২৪, ৩৯১
ফজলুল করিম, শেখ-১৫৮-৬০, ২৩৯-৪১
ফজলুর রহীম চৌধুরী-৩১১
ফতেহ লোহানী-৩৫৯
ফরস্টার-৫৩
ফরহাদ মাজহার-৩৬০
ফরহাদ মাজহার-৩৬০, ৮৬
ফরিদ উদ্দিন আত্তার-১৬৬
ফয়েজ আহমদ-৩৭১
ফাউস্ট-১৯২
ফাতেমা খানম, মমলুকুল-১৬৭
ফারায়েজী-৮৯, ৯৯
ফুলমনি ও করুণার বিবরণ-৭০
ফেরদৌসী-১৬৬
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-৫৩, ১৩৫

ব

বঙ্গদর্শন-২০৮, ২৬৭
বঙ্গভঙ্গ-১২
বঙ্গদূত-১৮২

www.icsbook.info

বঙ্কিমচন্দ্র–১৪, ৭৭–৮২, ১৩৫, ১৪৫, ১৪৮, ১৬২, ১৭২, ১৮২, ১৮৩, ২২৯, ২৬৭
বঙ্গদর্শন–২০৮, ২৬৭
বঙ্গভঙ্গ–১২
বঙ্গদূত–১৮২
বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ–৩৪৫
বন্দে আলী মিয়া –৩১১
বজলুর রশীদ, আ, ন, ম–৩৫৯, ৩৭১
বরকত উল্লাহ–১৬৬
বশির আল হেলাল–৩৪৫
বাউল–৪০, ৪৫, ১৭৪
বাঙ্গাল গেজেট–১৮২
বারেক আবদুল্লাহ–৩৫০
বার্নার্ড শ–৩৫৯
বায়রণ–১৮৯
বাংলা একাডেমী–১৭৬
বাংলাদেশের কবিতা–৩৭৭, ৩৯৭
বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ–৫১–৭৩
বাংলা গদ্যের পরিণতি–৭৭–৯৬
বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ–২৫৩–৭৭
বাংলাদেশের লোকনাট্য ও জসিম উদ্দিন–৩৬০–৬১
বিদ্যাসুন্দর–৫৩, ২৫৫–৫৬
বিদ্যাপতি–৫৫, ৩০০
বিদ্যাসাগর–১৪, ১৩৫
বিবেকানন্দ–১৪০
বিভাগোত্তর কথা সাহিত্য–৩২৫–৫১
বিশ্বভারতী–২৮১
বিশ্বনাথ কবিরাজ–১৯২
বিশ্বনবী–১২৫
বিষবৃক্ষ–৭০
বিষাদ সিন্ধু–১৩১, ২১৯, ২৩২
বিষ্ণু দে –৩১৩, ৩১৬–১৭
বিহারীলাল–১৩৫, ২২৫–২৮, ২৩০, ২৩২
বুদ্ধদেব বসু–৩১৩, ৩১৮–১৯
বুলবুল–১২৬, ১৬৬, ১৭৬
বুলবুল চৌধুরী–৩৫০
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ–২৬২
বেথুন কলেজ–৬৬
বেদান্ত গ্রন্থ–৫৭
বেদান্ত সার–৫৭
বেদান্ত চন্দ্রিকা–৫৭
বেদুঈন–৩০৫
বেনজীর আহমদ–৩০৯
বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর–৩৪৯
বাট্রান্ড রাসেল–১৭৬
ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ–৫১
ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি–১–১৫
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়–৫৯, ১৮২
ভদ্রার্জুন–২৫৬, ২৫৭
ভারতচন্দ্র–১৯, ২০, ২৯, ৫৩, ১৮৩, ১৮৬, ৩০৪
ভারতী–১৩৬, ২৩১, ২৩৫
ভারতবর্ষ–১৫২
ভার্জিল–১৯৩
ভান্ডারী–৪১
ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়–৮৪
ভিক্টর হুগো–২৮১
ভ্রমণ কাহিনী–৩৭১

ম

মইনুল আহসান সাবের–৩৪৫
মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা–১২২
মদনমোহন তর্কালঙ্কার–৬৩
মধুমালতী–২১, ২২, ২৩

www.icsbook.info

মধুসূদন–১৪, ১৮৬, ১৮৮–৯৮, ২০৬,
২১০, ২২৫, ২৩৬, ২৪১, ২৫৯–৬১, ২৬২,
২৬৩, ২৮১, ২৮৯, ৩০৬, ৩৭১
মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ–৪১, ১৭৪
মনসুর উদ্দীন আহমদ–৩৭৫
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী–১০৫, ১০৭,
১১৩, ২১৬,
মনিরুদ্দীন ইউসুফ–৩২১, ৩২২, ৩২৪
মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ–৩২৪, ৩৬০, ৩৬৯,
৩৭০, ৩৯২
মনোএল দ্যা আস্ সুমসাম–৫১
মনোমোহন বসু–২৬৩
মঞ্জু সরকার–৩৪৫–৪৭
মমতাজ উদ্দীন আহমেদ–৩৬০–৬১
মরুভাস্কর–১১৬
মর্তুজা বশির–৩৪৫
মশাররফ হোসেন, মীর–১৪, ১৫, ৪২,
৮৫–৮৮, ১৩১, ১৪৮২৩১–৩২, ২৪৯,
২৬৬-৬৭
মসনভী–১১৬
মহাভারত–৫৩, ১৮৯, ২৪৪, ২৫৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং –৫৫
মহিউদ্দীন খান, আল্লামা শিবলী
নোমানী–১২৬
মহীউদ্দীন ৩২৪, ৩৩৯
ময়মনসিংহ গীতিকা–৩১৯
মাগন ঠাকুর–১৭০
মানকুমারী বসু–২৩৬
মানসী–২২৭
মামুনুর রশীদ–৩৬২
মারিফাত–১১৩
মার্লো–১৯২
মার্শম্যান–৫৪
মালার্মে–৩১৫
মাসিক পত্রিকা–৭০
মাসিক মোহাম্মদী–১৬৭, ১৬৮, ১৬৯
মাহমুদুল হক–৩৪৫
মাহবুব-উল-আলম–১৬২, ১৬৩, ৩৪৬
মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ–৩৯০
মিন্নাত আলী–৩৪৭
মিরজা আবদুল হাই–৩৪৪
মিলটন –১৮৯, ১৯৩
মিহির ও সুধাকর–১০৫, ১৪১
মীজানুর রহমান শেলী–৩৪৪
মীরাতুল আকবর–৫৭
মুজাফ্ফর আহমদ–৩০৬
মুনীর চৌধুরী–৩৫৬-৫৭, ৩৫৯, ৩৬৮
মুন্সী মেহেরুল্লাহ–১৩, ৯৯
মুন্সী রেয়াজউদ্দীন–১৩
মুন্সী নামদার–৭৩
মুন্সী গোলাম কিবরিয়া–৯০
মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ–৯৪, ৯৫
মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন–৯৯, ১০২
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ–১০১, ১০২
মুন্সী আবদুল লতিফ–১০৯
মুন্সী আজিম উদ্দীন–১১৩
মুসলীম লীগ–১২, ১৪৮
মুসলীম সাহিত্য সমাজ–১৬০, ১৭৩,
১৬৮, ১৬৮
মুসলিম রচিত প্রথম সামাজিক নক্সা–২৬৫
মুহম্মদ খাতের–২৬
মেঘদূত–২৩০
মেঘনাদবাধ কাব্য–২১৮-১৯
মেশকাত শরীফ–১৩০
মেসফীল্ড, জন–৩১৫
মোজাম্মেল হক–১৩, ৮৯, ৯১-৯৪, ১১৩,
১২৯, ১৪৮, ১৬৫, ২১৬, ২৩৬-৩৮, ২৪১
মোতাহের হোসেন, কাজী–১৬৭, ৩২৪

www.icsbook.info

মোতাহের হোসেন চৌধুরী–১৭৩-৭৪
মোসলেম প্রতিভা–১০৫
মোসলেম হিতৈষী–১০৫
মোস্তফা চরিত্র–১২৫
মোহাম্মদী–১৫৭
মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি–১৮২,২১৩
মোহিতলাল মজুমদার–৩০১, ৩০৪-৫, ৩১৩
মোয়াল্লাকা-৩০৫
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার–৫৪

য
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত–২৪৪
যতীন্দ্রমোহন বাগচী–৩০০
যাত্রী–৪৭, ৪৮, ২৫৫
যোগীন্দ্রনাথ বসু–২১৫, ২২১
যৌন বিকৃতি, মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস–৩২৯

র
রঘু মুচি–৩০
রঘুনাথ দাস–৩২
রঙ্গলাল–১৮২, ১৮৬-৮৮, ২০৮, ২১৫, ২৮৯
রজনীকান্ত সেন–২৪২–৪৩, ২৮৮
রণজিৎ সিং–১০,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–৪২, ৪৫, ৬২, ১৩৩–৩৭, ১৬৬, ১১৭, ১৪৫, ১৭৪, ২২৭,২২৮, ২৩১, ২৩৪, ২৪৩২, ২৪৪-৪৫, ২৭৬, ২৮১-৮৯, ৩০৬, ৩১২, ৩১৩, ৩১৯, ৩৭১, ৩৭৯
রবীন্দ্রযুগ, বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি–১৩৩-৭৮
রবীন্দ্রনাথের নাটক–২৭৫, ২৮৯–৯২
রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস–২৯৩-৯৫
রবীন্দ্রজীবনের ঘটনাপঞ্জী–২৯৫–৩০০
রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কাব্য–৩০০–৩০১
রবীন্দ্রকুমার ঘোষ–৩০৬
রফিক আজাদ–৩৯২–৯৩
রমেশচন্দ্র দত্ত–৮২, ১৪৮
রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ–৩৭৪
রশিদ করিম–৩৩৫
রশিদ হায়দার–৩৪৫
রাজকৃষ্ণ রায়–২৬৪
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র–৫৫
রাজিয়া খান–৩৪৪
রাজিয়া মজিদ–৩৪৫, ৩৭১
রাজীবলোচন–৫৪
রাধাকান্ত দে–৫৯
রাবেয়া খাতুন–৩৩৯
রামমোহন রায়–৬, ১২, ১৩, ৫৩, ৫৬–৬১, ৬৩, ১৬০, ২০১, ২৮১, ২৮২, ৩৭১
রামকৃষ্ণ পরমহংস–১৩
রামবসু–২৯, ৩০, ৩৫
রামপ্রসাদ–৩১–৪৬
রামনিধি গুপ্ত–৩৫-৩৮
রামায়ণ–৫৩, ১৮৯, ২৬৯
রামনাথ বাচস্পতি ৫৪
রামরাম বসু–৫৪, ৫৫
রামকমল–৫৮
রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী–১৩৭
রামনারায়ণ তর্করত্ন–২৫৬, ২৫৮, ২৫৯
রাসু–২৯, ৩৩
রাহাত খান–৩৫০
রিজিয়া রহমান–৩৪০
রিয়াজউদ্দীন আহমদ, মুহম্মদ–২৪৭
রিয়াজ উদ্দীন মাসহাদী–২১৬
রুবাইয়াত–ই–ওমর খৈয়াম–১৫২
রুমি, মৌলনা–১১৬, ৩২২
রুশো–৩১৫, ৩১৬
রুশবিপ্লব–৩০৬
রোকেয়া, বেগম–১৪৬, ১৭৬, ২৫০–৫১
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান–১৪
রৌশন আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ–১৪৬

www.icsbook.info

ল
লরেন্স, ডি. এইচ–৩১৫
লহরী–২৩৭
লাইলী মজনু–২৬
লাঙল–৩০৮
লালন শাহ–৪২, ৪৩
লিপিমালা–৫৫
লুই ফিলিফ–৫৮
লুৎফর রহমান–১৫০, ১৫১–৫২
লেবেডফ–২৫৬
লোক সাহিত্যের গবেষণা ও সম্পাদনা–৩৭৫
শওকত আলী–৩৩৯
শওকত ওসমান–৩২৪, ৩৩১, ৩৪৬, ৩৫৭
শব্দকল্পদ্রুম–৫৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–১৪৩, ১৪৬, ১৫০, ১৬৬, ৩৭৯
শরৎচন্দ্রের নাটক–২৭৫
শরিয়তুল্লাহ–৮
শহীদে কারবালা–২৬
শহীদুল্লাহ কায়সার–৩৩৪, ৩৭১
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ডক্টর–৭২, ১১৫, ১২০, ১২৫, ১৭৫ ১৭৬, ৩১২–২৩, ৩৬৫–৬৬
শহীদ আখন্দ–৩৪৪
শহীদ কাদরী–৩৯৪
শামছুল হক, মাওলানা–১১৩
শামসুন্নাহার মাহমুদ–১৭৬, ৩৭১
শামসুর রাহমান–৩২৪, ৩৮৮
শামসুদ্দীন আবুল কালাম–৩৩৬, ৩৪৬-৪৭, ৪৩৬
শামসুল হক, সৈয়দ–৩৩৮, ৩৪৮, ৩৬০, ৩৬২, ৩৮৯
শামসুল হক–৩৪৪
শাহ ওয়ালী উল্লাহ–৯,১০
শাহাদাত হোসেন–১৫৬–৫৭, ৩১০, ৩৫৩
শাহেদ আলী–৩৪৭
শেক্সপীয়র–২৫৭, ৩১৫
শেক্সপীয়রের অনুবাদ–২৭১–৭২
শেখ আবদুর রহীম–১৩, ১৪, ৮৯, ১০৩, ১০৫, ১৪৯
শেখ আজীমদ্দী–৭৩
শেখ আবদুল লতিফ–৮৯
শেখ আবদুল জব্বার–১০৮
শেখ ফজলুল করিম–১১৩
শেলী–২২৫, ২২৬
শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই শিকওয়াহ–১২৬
শিখা–১৬০, ১৬৭–৬৮, ১৭৩
শিবনাথ শাস্ত্রী–৮৪, ১৮৩, ২৬৩
শিমুয়েল পীরবক্স–২৬৬
শীতলং শাহ–৪৪
শূন্যপূরাণ–৫১
শ্রীকৃষ্ণবিজয়–৭
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়–৫৪
শ্রীরামপুর মিশন–৫৪, ১৩৫, ১৮১
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার–৮৪

স
সওগাত–১৫২, ১৫৭
সংবাদ কৌমুদী–৫৯, ১৮২, ২৫৬
সংবাদ প্রভাকর–১৮২–৮৩, ১৮৬
সংবাদ সাধুরঞ্জন–১৮৩
সংবাদ রত্নাবলী–১৮৩
সত্যেন সেন–৩৩০-৩১
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত–৩০১-৪
সনেট–১৮৯, ২৩৩
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–৮৩
সফোক্লিস–৩৫৯
সবুজপত্র–১৩৬, ১৩৮-৩৯, ১৫২
সমর সেন–৩১৩

www.icsbook.info

সমাচার চন্দ্রিকা-৫৯, ১৮২
সমাচার দর্পণ-৫৫, ১৮২
সহচর-১৫২
সাঈদ আহমদ-৩৫৯
সাদী, শেখ-১৬৬, ২৪৪, ৩২২
সাধনা-১৩৬
সানাউল হক-৩২৪, ৩৭১, ৩৮৬
সামশ রাশীদ-৩৩২
সারিগান-৩১
সাহাবী এবং অন্যান্য পীর পয়গম্বরদের জীবনী ও বাণী-১২৩-২৭
সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা-৩৭২-৭৩
সিকান্দার আবু জাফর-৩২২-২৩, ৩৫৮, ৩৮২-৮৩
সিপাহী বিদ্রোহ-১০, ১১, ১২, ২৬৩
সিরাজউদ্দৌলা-১৫৩
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-৩৬০
সীরাতে ইবনে হিশাম-১২৬
সুইনবার্ন -২৮৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-১৭৪
সুধাকর দল-৯৯, ১২৩, ১৪৮
সুধাকর পত্রিকা-১০০
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-৩১৩-১৫
সুফিয়া কামাল-৩১১, ৩৭১
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-২২৯
সুশীল কুমার দে-২৭, ২৯, ৪৭
সেলিনা হোসেন-৩৪২
সেলিম আল দীন-৩৬০
সোনাভানের পুঁথি-২১
সৈয়দ আহমদ-৮, ১০, ১২
সৈয়দ আমীর আলী-১২
সৈয়দ হামজা-২১
স্বদেশী আন্দোলন-২৮৮, ২৯৫
স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলন-৩৬০
স্বর্ণকুমারী দেবী-২৩৪-৩৫
স্বর্ণলতা-৭০
স্কট-২০৯

হ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-১৪০
হরু ঠাকুর-২৮, ৩০, ৩৩
হাইনে-৩১৫
হাতেম তাই-২১
হাবিবুল্লাহ বাহার-১২৬, ১৩০, ১৭৬
হাবিবুর রহমান, শেখ, সাহিত্যরত্ন-১১৪, ১৭২, ৩১০, ৩২২
হাফিজ-১৬৬, ২৪৪, ৩২২
হারামণি-৪১
হ্যালহেড-২০, ৫৩, ৫৪
হাসন রাজা-৪৫
হাসনাত আবদুল হাই-৩৪৫, ৩৫০
হাসান আজিজুল হক-৩৪৯
হাসান হাফিজুর রহমান-৩৮৯
হেদায়েতুল্লাহ, মোহাম্মদ-১৫৪
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-২০১, ২০৭, ২০৮, ২১২, ২১৫, ২১৭, ২৩৪
হিতবাদী-৩২১
হিতোপদেশ-৫৫
হিন্দু কলেজ-৬, ১৮৯
হিন্দু থিয়েটার-২৫৬
হিরোয়দাস-১৯৫
হুমায়ুন আহমেদ-৩৪২-৪৩, ৩৫০
হুমায়ুন কবির-১৭০, ২৮৯, ৩২১
হুমায়ুন কাদির-৩৪৪
হোমার-১৮৯, ১৯৩, ১৯৮, ২১১, ৩২৩

www.icsbook.info